Ganotantro Bangabond
Pathak Shamabesh
Since 1987
4382304
Tk. 500.00

গণতন্ত্র বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা | ড. আলী আসগর

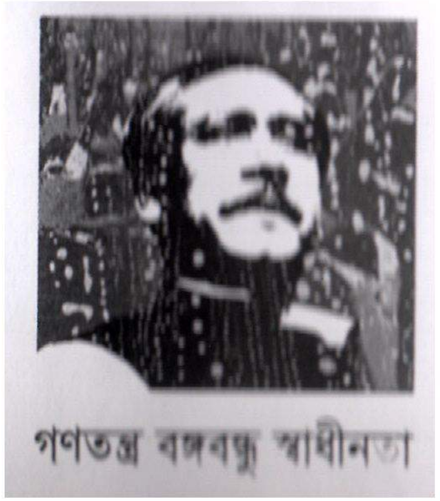
গণতন্ত্র বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা

ড. আলী আসগর



অনিন্দ্য প্রকাশ

অনিন্দ্য প্রকাশ



গণতন্ত্র বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা

গণতন্ত্র বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা

ড. আলী আসগর



অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২০ বইমেলা ২০১৪

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১-৬৬৪৯৭০

বিক্রয় কেন্দ্র
৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা) ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১২ ৪৪০৩, ০১৭১৮-০৮২৫৪৫

বর্ণবিন্যাস
শাওন কম্পিউটারস্
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৭২০-২৮৪৯০১

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : ধ্রুব এষ

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১-৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৫০০ টাকা

Ganotantro Bangabondhu Shadhinota by Dr. Ali Asgor
Published by Afzal Hossain, Anindya Prokash
30/1 Ka, Hemendra Das Road, Dhaka 1100
Phone : 9573769, 01711 664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com.

First published : February 2014
Price : Taka 500.00
US $ 25

ISBN 978 984 90802 0 6

ঘরে বসে বই পেতে অর্ডার করুণ : ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১
অথবা লগঅন করুন : www.rokomari.com

উৎসর্গ

আমার ভাগ্নে, কিশোর মুক্তিযোদ্ধা মাহবুবুল হক প্রদীপ, যে নবম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় চলে যায় মুক্তিযুদ্ধে কাউকে না জানিয়ে, এবং ওর সহযোদ্ধাদের স্মৃতির উদ্দেশে—

যাদের আমরা হারিয়েছি স্বাধীনতার মূল্য পরিশোধ করতে। অনেকে ফিরে আসেনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অথবা ফিরে এসেছে হাত-পা হারিয়ে। অনেকে ফিরে আসতে পারেনি পারিবারিক স্বাভাবিক জীবনে বা ক্লাসে সহপাঠীদের সঙ্গে যোগ দিতে। ওরা হারিয়ে গেছে নানাভাবে, আত্মোৎসর্গের বিচিত্র পথে।

ভূমিকা

বক্ষ্যমাণ লেখাগুলো আসলে কতকগুলো প্রবন্ধের সংগ্রহ, যা প্রায় সবই নানা সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে বিশেষ সামাজিক ও বাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া ও উপলব্ধি প্রকাশের লক্ষ্যে। ফলে দুটি ত্রুটি এখানে পবিলক্ষিত হবার। একটি হলো পবিকল্পিত বইয়ের ক্ষেত্রে যে ধারাবাহিকতা, সামগ্রিকতা ও পূর্ণাঙ্গতা প্রত্যাশিত, তা এখানে নেই। গবেষক ও বিশ্লেষকরূপে বিস্তৃত তথ্যের সমারোহ ঘটাবার প্রচেষ্টাও নেই, সেই সঙ্গে ভুলত্রুটি সন্ধানেব ছিদ্রান্বেষী দৃষ্টি। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে অবদান বেখেছেন যাঁরা, তাঁদেব মনে রেখেও এবং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁদের নানা মিথষ্ক্রিয়ার গুরুত্ব অনুধাবন কবেও, তাঁদের উল্লেখ এই সংকলনে প্রায় নেই।

এখানে প্রধানত গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা, এই দুটি ধারণা বা কনসেপ্ট সম্পর্কে আমার উপলব্ধি ভাগ করে নিতে প্রয়াস পেয়েছি পাঠকেব সঙ্গে। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিকশিত ও সমন্বিত করতে এবং তা মুক্তিযুদ্ধের পর্যায়ে নিযে যাওয়া ও স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি তাঁর গুণ অবধারণের আবহে, সমালোচক ও বিশ্লেষকেব অবস্থানে নিজেকে স্থাপন কবে নয়। ফলে ছিদ্রান্বেষীর পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টিতে নয়, যেভাবে বড় ক্যানভাসে আঁকা বিশাল শিল্পকর্মকে দেখতে হয় স্পষ্ট দৃশ্যমানতাব ন্যূনতম দূরত্ব থেকে, যাতে ছোট খুঁটিনাটিকে বর্জন করে শিল্পকর্মের মূল আবেদনকে উপলব্ধি কবা যায়, তেমন করেই দেখতে চেয়েছি গণতন্ত্রের জন্য জনতার আন্দোলন, এবং স্বাধীনতারূপে এর বাস্তব রূপদানেব কেন্দ্রবিন্দু বঙ্গবন্ধুকে।

দ্বিতীয় যে ত্রুটি উল্লেখ্য তা হলো, কিছু বক্তব্যেব পুনরাবৃত্তি। এর কাবণ, প্রবন্ধগুলো পৃথক পৃথকভাবে লেখা। এছাড়া প্রতিটি প্রবন্ধের পূর্ণাঙ্গতাব জন্যও কোনো কোনো বক্তব্য বারবার ফিরে এসেছে। কিন্তু একটি কারণে এই ত্রুটি সম্ভবত মার্জনীয় এবং তা হলো, প্রবন্ধগুলো পৃথক পৃথকভাবে পাঠক পড়তে পারবেন; সেই সঙ্গে আমার কাছে যে ধারণাগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, পুনরাবৃত্তির ভেতর দিয়ে সে সবের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়েছে।

বাঙালি জাতির দীর্ঘ যে সংগ্রাম গণতান্ত্রিক অধিকার, অর্থনৈতিক মুক্তি, ভাষা ও সংস্কৃতির মুক্ত বিকাশের জন্য—সে সবই নানা সামাজিক ঢেউ নানা আকাবেব যা পর্যায়ক্রমে নানা রূপ পরিগ্রহ কবেছে এদের উপরিপাতনে।

একদল দার্শনিক, বিশেষজ্ঞ, পণ্ডিত ব্যক্তির ভাবনা যতই উন্নত, বিশেষত্ব প্রাপ্ত হোক, তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের ভাবনার ব্যবধান থেকে যায়। রেসিং কারের মতন যাত্রীহীন একা মিছেমিছি ছুটতে পারা নয়, শেখ মুজিব ছিলেন প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ইঞ্জিন, সবগুলো যাত্রীবাহী বগিকে নিয়ে তার যাত্রা। বুদ্ধিজীবীদের মতন একাকী উড্ডয়ন নয় মাটি ছেড়ে আকাশে অথবা বাঁধানো পথে ছোটা নয় নির্ভার রেসিং কারের। তাকে চলতে হয়েছে পথ নির্মাণ করে। কখনো পাহাড়ের মতন অচলায়তন সংস্কারের জড়তা অতিক্রম করে, কখনো অস্ত্রধারী, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী, কখনো সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁকে দাঁড়াতে হয়েছে। সেখানে তাঁর শক্তির উৎস দেশ, মাটি ও মানুষের জন্য অকৃত্রিম ভালোবাসা, স্বচ্ছ দৃষ্টি, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতায় গভীর বিশ্বাস। বঙ্গবন্ধুর সমস্ত শক্তির উৎস ছিল তারই সৃষ্ট জনমতের নিরঙ্কুশ সমর্থন লাভ। তাঁর বিরুদ্ধে যেসব দুর্বলতার কথা বলা হয়ে থাকে, যেমন অতিসরলতা, উদার ক্ষমাশীলতা, শত্রুকে চিনতে না পারা, নিজেকে ও নিজের পরিবারের সদস্যদের রক্ষা করতে না পারা ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে—সে সবই ছিল মানুষের ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাসের জন্য, এবং এখানেই ছিল তাঁর সমস্ত শক্তিরও উৎস।

বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি, কর্মধারা ও সামগ্রিক জীবনদর্শন ছিল গতানুগতিকতা বর্জিত ও তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবনী দৃষ্টি, মৌলিক ভাবনা ও সৃজনশীলতার ফসল। বঙ্গবন্ধু কী অর্থে গতানুগতিকতা ও প্রচলিত ধারা থেকে ভিন্ন ছিলেন তা বুঝতে হলে আমাদের বিশ্লেষণের ও বিচারের দৃষ্টিকেও উদ্ভাবনী করতে হবে।

আমরা যত সফল বিপ্লবী ও রাষ্ট্রনায়কদের দেখতে পাই ইতিহাসে, তাঁদের মূলত দুই দলে আমরা ফেলতে পারি। একটি শ্রেণীতে আছেন সফল বিপ্লবী যাঁরা সাহসিকতা প্রতিবাদ ও সংগ্রাম করে সমাজে পরিবর্তন আনেন। অন্য দলে পড়েন তাঁরা, যাঁরা সমাজ ও দেশকে সংগঠিত করে মানুষকে সংঘবদ্ধ করে দেশ ও রাষ্ট্রকে গড়ে তোলেন। বিপ্লব করে একটি স্বাধীন দেশ সৃষ্টি ও জাতি গঠনের কাজ তাই দুই ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে সংজ্ঞায়িত

রূপান্তর ঘটাতে পুরোনো ব্যবস্থাকে ভাঙতে হয়। সেখানে ক্ষোভ, ক্রোধ, প্রতিবাদ, হিংস্রতা, সংগ্রাম, যুদ্ধ, বিরোধিতা প্রাধান্যপ্রাপ্ত। কিন্তু জাতি গঠন হলো সৃষ্টির, নির্মাণের শান্তি ও শৃঙ্খলা , সহনশীলতার, দূরদৃষ্টির, মমত্ববোধ ও স্বপ্ন দেখার। প্রথমটি ঘটতে পারে ক্ষুদ্র কালের বিস্তৃতিতে যা দশা পরিবর্তনের ক্রান্তিক ঘটনা। দ্বিতীয়টি দীর্ঘমেয়াদি, ক্রমসঞ্চিত, সমন্বিত ও সংগঠিত। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন ও কর্মপ্রেরণা উৎসারিত মানুষের জন্য ভালোবাসা থেকে, দেশপ্রেম থেকে, জাতীয়তাবোধ থেকে। কিন্তু স্বজাতির জন্য ভালোবাসা কি অন্যের মধ্যে তাদের দেশপ্রেমের বিপরীতে কাজ করে?

এসবই ছিল প্রস্তুতিপর্ব একটি বড় সামাজিক ও জাতীয় জাগরণের। অধিকার প্রাপ্তির, আত্মপ্রকাশের, মানবিক চেতনা লাভের এবং সব ধরনের দারিদ্র্য থেকে মুক্তি অর্জনের নানা আন্দোলন সমন্বিত ও একীভূত হয়ে, মুক্তিযুদ্ধের মতন ব্যাপক একীভূত সমবায়ী রূপ পরিগ্রহ করেছে। সব মিলে এক প্রপঞ্চ ঘটনা, একটি প্রতিভাস—যার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে শেখ মুজিব, যিনি বঙ্গবন্ধু উপাধি পেয়েছেন জনতার মঞ্চে। গণতন্ত্রের জন্য বাঙালি জাতির দীর্ঘ সাধনা, নানা সংগ্রাম ও সমন্বয় সাধনে নেতৃত্ব দানের ভেতর দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ও স্থপতিরূপে বঙ্গবন্ধুর উদ্ভব এবং অবশেষে একটি মহান মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম আসলে একটি বড় একীভূত গল্পের তিনটি অধ্যায়।

গভীর অর্থে গণতন্ত্রের জন্য বাঙালি জাতির সংগ্রাম, স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া, গণতন্ত্র মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার চেতনা জাগরণকারী বঙ্গবন্ধুর উদ্ভব—সবই ইতিহাসের অংশ। মানবজাতির মুক্তি লাভের যে চিরন্তন সংগ্রাম এবং সেখানে জনতার ও নেতৃত্বের যে অবদান, তার আধুনিক ও সজীব পরিচয় বিধৃত বাংলাদেশের উদ্ভবের দৃষ্টান্তে। আমাদের জন্য মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা লাভ একটি স্থানীয় ও নির্বাচিত ঘটনা মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এটি সমগ্র মানবজাতির মুক্তিসংগ্রামের ব্যাপক ইতিহাসের অংশ। মানুষ যে ভালো এবং মানুষ যে মন্দ, মানুষ যে নিষ্ঠুর, নৃশংস আধিপত্যবাদী ও চরম অত্যাচারী হতে পারে, হতে পারে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অমানবিক, সংকীর্ণ, পরম স্বার্থপর ও দখলদার, এবং একই সঙ্গে এর বিরুদ্ধে মানুষই যে হতে পারে সাহসী, ন্যায়ের জন্য, অধিকারের জন্য ত্যাগী, মানবিক, উদার, এবং নিঃস্বার্থভাবে জীবনকে উৎসর্গ করতে পারে আদর্শের জন্য—তার জ্বলন্ত চিত্র ধারণ করা আছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে।

শুধু স্থানীয়ভাবে নয়, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভালো-মন্দের, ন্যায়-অন্যায়ের, মানবিকতা ও অমানবিকতার, স্বার্থপরতা ও উদারতার পরস্পরবিরোধী চিত্র আমরা দেখেছি।

পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝরনা, জলস্রোত, নদীর জলপ্রবাহের দীর্ঘপথ পরিক্রম করে এসে সমুদ্রপাড়ের কোনো নুড়িপাথর যখন অপরূপ রূপ লাভ করে আঘাতে-আঘাতে, ক্ষয়ে ক্ষয়ে রূপান্তরিত হয়ে; সাধারণ কার্বন যখন প্রচণ্ড তাপ ও চাপের প্রভাবে পারমাণবিক বিশেষ বন্ধন ও বিন্যাস লাভ করে হীরা হয়ে ওঠে মাটির গভীরে, এবং এর বিশেষ আকৃতির কল্যাণে আলো বিচ্ছুরণের অসাধারণ গুণ লাভ করে, তেমনিভাবে উদ্ভব ঘটেছে বঙ্গবন্ধুর। সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, সাধারণ মানুষের সান্নিধ্যে, ইতিহাসের নানা ঘটনার সাক্ষী হয়ে, সংসার, সমাজ ও দেশের সব ঘটনার অভিঘাতে, জনতার ভিড়ে, মিছিলে, কখনো বক্তৃতার মঞ্চে, কখনো ফাঁসির মঞ্চে, কখনো পার্লামেন্টে প্রতিবাদী কণ্ঠ হয়ে তিনি বদলেছেন ভেতর থেকে সেই সঙ্গে বদলে দিয়েছেন জনমতকে।

অধিপ্রতিসাম্য বা Super symmetry হচ্ছে এই সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে যাওয়া, যেখানে নিজের দেশ ও নিজেব ভাষা এবং স্বজাতিকে ভালোবাসা, অন্যদেশ, অন্য ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতির প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে না, বরং গভীরতব এক উপলব্ধিতে অন্যদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রীতি, মাতৃভাষা ও দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা জাগায় এক ব্যাপকতর ও গভীরতর উপলব্ধিতে। এ জন্যই আমরা দেখতে পাই, অনেক সফল বিপ্লবী বিপ্লব-উত্তর দশায় অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ করেন। অনেকে ভুল-ভ্রান্তিতে জড়িয়ে পড়েন। অনেকে শুধু ক্রোধ, প্রতিক্রিয়া, ক্ষোভেব আগুনে জ্বলে উঠতে সক্ষম। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে ধৈর্য, কর্মতৎপরতা, স্বার্থত্যাগ নিয়ে দেশ গড়াব কাজে অংশ নিতে ব্যর্থ। এর কারণ, প্রথম কাজটি বিপ্লবাত্মক হলেও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ামূলক, স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু দ্বিতীয় কাজটি সচেতন সিদ্ধান্তেব, উপলব্ধিমূলক দূরদৃষ্টিব। প্রথমটি ঘটে ঢেউয়ের মতন, উত্তাল মিছিলের উচ্ছলতায, কিন্তু দ্বিতীয়টির জন্ম ভালোবাসা, দূরদৃষ্টি, প্রজ্ঞা ও সৃষ্টিশীলতায়।

নতুন গৃহ নির্মাণে একটি পুরোনো দালান ভাঙতে হতে পারে। সে কাজটি ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমসাধ্য ও সাহসিকতার। এখানে সৌন্দর্য, বুদ্ধি ও নির্মাণ কুশলতা অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু যে নতুন বাড়ি নির্মাণ করবে তাকে শৈল্পিক দৃষ্টি নিয়ে স্থপতি হতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর অবদান ও রাজনৈতিক কর্মধারাকে বুঝতে হলে সামগ্রিক দৃষ্টিতে তা করতে হবে। আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধ—যার নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু, তা শুধু আন্দোলন, প্রতিবাদ প্রতিরোধ ও ক্ষুব্ধতার অভিব্যক্তি ছিল না। সেখানে একটি চেতনা সৃষ্টি ছিল—সংস্কারমুক্ত, শোষণমুক্ত, আত্মনির্ভর, আত্মসচেতন জাতিরূপে আত্মপ্রকাশেব স্বপ্ন।

সমুদ্রের ঢেউ যেমন এর শক্তি সঞ্চয় করে অতিক্রান্ত বিপুল জলরাশির কম্পন থেকে এবং সামনের জলরাশিতে সেই ঢেউযের শক্তিকে সঞ্চারিত করতে—বাংলাদেশের স্বাধীনতা তেমনি এক প্রতিভাস। এব সীমানা বিস্তৃত বাঙালি জাতির সংগ্রামের মধ্যে যেমন, তেমনি স্বাধীনতা লাভেব প্রপঞ্চ ঘটনায়। এর সমগ্রতাকে যিনি তাঁর স্বপ্নে ধারণ করেছিলেন তিনি বঙ্গবন্ধু। বইটি পড়ে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সমর্থক এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল কোনো পাঠকের আনন্দ লাভ যেমন এই বইয়ের সার্থকতা বলে বিবেচিত হবে, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রবিরোধী, সেই অর্থে বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুর প্রতি যারা বিরূপ, তাদেব ক্ষুব্ধ হওয়াটাও সমভাবে এই বইয়ের সার্থকতা বলেই বিবেচিত হবে।

আলী আসগর

সূচিপত্র

গণতন্ত্রের প্রকৃতার্থের সন্ধানে ১৩
নতুন শতাব্দীর গণতন্ত্র ১৫
শিক্ষার বিস্তার ও গণতন্ত্রের বিকাশ ১৮
গণতন্ত্র ও তথ্যের মিথষ্ক্রিয়া ২১
গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার ২৪
গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করার প্রশ্নে ২৮
গণতন্ত্রের উন্মুক্ততা ও তত্ত্বহীনতা ৩১
আদর্শ গণতন্ত্র ৩৪
গণতন্ত্রের বিবর্তন ও উত্তরণ ৩৭
গণতন্ত্রের বিকাশমানতা ৪১
গণতন্ত্র ও জনগণের দায়িত্ব ৪৫
গণতন্ত্র যেখানে সামাজিক পরীক্ষণ : বহুমাত্রিক ও সর্বজনীন ৪৮
বিজ্ঞান ও পার্লামেন্ট ৫২
রাজনীতির প্রভাববলয় ৫৫
গণতন্ত্র ও অর্থনীতি ৫৮
গণতন্ত্র ও নেতৃত্ব ৬১
গণতন্ত্র কোন পথে? ৬৪
গণতন্ত্রের পরিবর্তী পথ ৬৭
নিরপেক্ষতার ভিত্তি যেখানে তথ্যহীনতা ৭১
নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্বরূপ :
সর্বদলীয় বনাম নির্দলীয় সরকার ৭৫
অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রস্তাবনা অসাংবিধানিক হতে পারে,
কিন্তু তা কি অগণতান্ত্রিকও? ৮১
গণতন্ত্র হচ্ছে সম্ভাব্যতার শিল্প ৯৯
গণতন্ত্রের পথ ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভুল-সংশোধনের ১০২
গণতন্ত্রে বিরোধী দলের অপরিহার্যতা ১০৬
গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও বিরোধী দলের কৃত্য ১০৯
গণতন্ত্রের বিস্তারণ : স্থান, কাল ও সংগঠনের বহুতায় ১১৩
গণতান্ত্রিক সরকার যেখানে ভিন্ন তত্ত্বাবধায়ক সরকার থেকে ১১৬
দলবদ্ধতা যেখানে গণতন্ত্রের নীতিবিরুদ্ধ ১১৯
গণতন্ত্রের লক্ষ্য যেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক সমতা ১২২
জোটবদ্ধতা ও গণতন্ত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব ১২৬
এই নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ কেন? ১৩০
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কৃত্য ১৩২
গণতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতা ১৩৫
গণতন্ত্র : একটি বিশ্বজনীন চেতনার নাম ১৩৮

একবিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্র ১৪০
বঙ্গবন্ধু : একজন রাজনীতির কবি ১৪৩
বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি ১৪৬
জাতীয় ঐক্য ও বঙ্গবন্ধু ১৫০
নেতৃত্ব যেখানে আদর্শ সৃষ্টির, বল প্রয়োগের নয় ১৫৩
বঙ্গবন্ধু : রাজনৈতিক প্রতিভা ও নেতৃত্বের সৌভাগ্যে অনন্য যিনি ১৫৬
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি ১৬৯
বিমূর্ত নাম যেখানে উৎস আনন্দ অথবা যন্ত্রণার ১৮০
চিরঞ্জীবী বিজয় দিবস ১৮৪
বঙ্গবন্ধুর মুখোমুখি হবার অনন্য অভিজ্ঞতা ১৮৭
বিজয় দিবসের অফুরন্ত বৈভব ১৯৪
স্বাধীনতা : সম্মুখদৃষ্টিতে ১৯৭
স্বাধীনতা প্রিয় স্বাধীনতা ২০০
স্বাধীনতা অসংজ্ঞায়িত এক শব্দ ২০৩
স্বাধীনতা কোনো যান্ত্রিক ঘটনা নয় ২০৬
বিজয় দিবসের সর্বজনীনতা ২০৯
চাই সৌন্দর্যবুদ্ধি ও মানবিকতার বিজয় ২১২
সত্য ও স্বাধীনতা ২১৫
একটি বহুমাত্রিক প্রতিভাস ২১৮
স্বাধীনতার জন্য বিজ্ঞান বিজ্ঞানের জন্য স্বাধীনতা ২২১
বিজয় দিবস ও ভবিষ্যতের প্রত্যয় ২২৬
বিজয় দিবস–প্রসারিত দৃষ্টিতে ২২৯
বিজ্ঞান ও স্বাধীনতা ২৩৩
স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস প্রসঙ্গে ২৩৭
ইতিহাসের দৃষ্টি ২৪৩
শিক্ষা ও রাজনীতির সীমানা ২৪৬
সন্ত্রাস দমনের বিকল্প পথ ২৪৯
অস্ত্রের ভাষা বনাম মুখের ভাষা ২৫১
দুর্নীতি যেখানে স্থানীয় ও আপেক্ষিক পরম ও আন্তর্জাতিক না হয়ে ২৫৪
সন্ত্রাসীরাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত—প্রয়োজন এর বিপরীত ব্যবস্থা ২৫৯
সুবিচার ও অর্থনীতি ২৬৩
কিছু উক্তি কিছু প্রশ্ন ২৬৬
বাংলাদেশের মানুষ কেন সন্ত্রাসী নয় ২৭০
চাই ইতিবাচক পদক্ষেপ গতিশীল ভারসাম্য ২৭৩
সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গড়ার প্রয়াসে ২৭৬
সমস্যা : ব্যক্তিগত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ২৮০
একুশ শতকের সমাজ– প্রত্যাশা ও চ্যালেঞ্জ ২৮৩
বাজেট কেন? কাদের জন্যে? ২৮৫

গণতন্ত্রের প্রকৃতার্থের সন্ধানে

গণতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট কোনো অর্থ নির্ধারণ যে সম্ভব নয়, তার ইঙ্গিত গণতন্ত্রের সংজ্ঞার্থের মধ্যেই নিহিত। গণতন্ত্র যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতের দ্বারা পরিচালিত একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, যেখানে সবাই স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকারী, সেহেতু কোনো পূর্বনির্ধারিত নীতিবাক্য বা আদর্শের দ্বারা গণতন্ত্র পরিচালিত নয়। যাদের মতের ভিত্তিতে সরকার পরিচালিত হওযাব কথা, তাদের শিক্ষা, যোগ্যতা ও বিশ্বাস সম্পর্কে কোনো পূর্বশর্ত আরোপিত নয। ফলে, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দেশের বয়ঃপ্রাপ্ত নাগরিকেরা তাদের মত প্রকাশ করবে, দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে এমন একটি অবাধ স্বাধীনতাকে মেনে নেওযার মধ্যে একটি ঝুঁকি আছে। আমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এবং যোগ্য ও অযোগ্যের বিচার করে থাকি একটি পূর্বনির্ধারিত মানদণ্ডে; কিন্তু গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে একজন ভোটদাতার আচরণকে ভালো বা মন্দ বলে, সঠিক বা ভ্রান্তরূপে যাচাই করার স্বাধীনতা দেওয়া হয় না। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, গণতন্ত্র কি তাহলে নীতিবিবর্জিত একটি বিশৃঙ্খল ব্যবস্থা?

অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও নৈতিকতার মাপকাঠিতে আমরা যেখানে সব কাজে যাথার্থ্য যাচাই করি, সেই বিচারের দণ্ড একজন ভোটদাতার রাজনৈতিক আচরণে কেন নেই? একজন শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি এবং একজন অশিক্ষিত ও অজ্ঞ মানুষের অভিমত কেমন করে সমান মূল্যে সমর্থনযোগ্য, যা গণতন্ত্রে ঘটে। আসলে গণতন্ত্রে সব মানুষের মত প্রকাশের এই অবাধ স্বাধীনতা এবং ভোট গণনায় তা সমান মূল্য পাওয়ার যে রীতি, তার মূলে একটি স্বীকার্য কাজ করে তা হলো, কোনো রাজনৈতিক মতকে পূর্বমত দ্বারা যাচাই করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, একজন বয়স্ক নাগরিক তার সমস্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে, রুচি ও প্রত্যাশা নিয়ে যেভাবে তার রাজনৈতিক মত প্রকাশ করে, তা একটি মৌলিক ঘটনা; কিন্তু পবমভাবে যাচাই করা সম্ভব নয় কোন মতটি সঠিক। আপাতদৃষ্টিতে এই ব্যবস্থাকে এক ধরনেব নৈরাজ্য ও লক্ষ্যহীন মনে হতে পারে; কিন্তু গভীর বিশ্লেষণে দেখা যাবে মানুষেব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের জগৎ যেখানে বিকাশমান, সেখানে যেকোনো আদর্শ বা বিশ্বাস দ্বারা অন্যসব মত বা বিশ্বাসকে যাচাই করার মধ্যে একটি জড়তা ও কালনিরপেক্ষ স্থিব কাঠামোকে ধরে নেওয়া হবে; কিন্তু মানুষের সব জ্ঞান ও

উপলব্ধি যেখানে এক গতিশীলতায় রূপান্তরিত হচ্ছে, সেখানে মূল্যবোধের ও বিশ্বাসের কোনো অবিচল বিচারের কাঠামো নির্ধারণ করা অসম্ভব।

প্রকৃতিতেও আমরা দেখি কোনো স্থির প্রসঙ্গকাঠামো নেই বিশ্বজগতে—যার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো বস্তুর পরম অবস্থান বা গতি নির্ধারণ করা সম্ভব; কিন্তু যেকোনো দুই বস্তুর মধ্যে আপেক্ষিক যে গতি তাকে সত্য বলে মেনে নিয়েও প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক মতামত যাচাইয়ের পরম অবিচল বিচারের দণ্ড না থাকলেও পারস্পরিক বিচারে যে আপেক্ষিক মতপার্থক্য তার ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিনির্ধারণ সবচেয়ে যৌক্তিক। এর বিপরীতটাই হবে কোনো অন্ধবিশ্বাস ও অবিচল সংস্কারনির্ভরতা। প্রাচীন সমাজে রাজতন্ত্র বা ধর্মতন্ত্রের ভিত্তিতে যখন রাষ্ট্রপরিচালিত হতো, সেখানে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও অপরিবর্তী মূল্যবোধের ভিত্তিতে নাগরিকদের আচরণ ও মতবাদ যাচাই করা হতো। এখানে বিশ্বাস করা হতো যে, যা পরম সত্য ও নৈতিক, তা সমাজের জন্য মঙ্গলকর। ফলে, সেই সুনির্দিষ্ট বিশ্বাস ও নীতির কাঠামোতে প্রতিটি মত ও আচরণের যথার্থতা পরিমাপযোগ্য ছিল। এখন যারা অপরিবর্তী বিশ্বাস ও পরম জ্ঞানে আস্থাশীল তাদের কাছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অসংগতিপূর্ণ ও স্বেচ্ছাচার বলে মনে হতে পারে; কিন্তু পরম সত্য ও অপরিবর্তী নীতির ধারণা যে অবাস্তব ও ভ্রান্ত, সেই উপলব্ধি অর্জন করলে গণতন্ত্রের যৌক্তিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গণতান্ত্রিক সমাজে ক্রমাগত সত্য উদ্‌ঘাটনের ও শুদ্ধতর পথের অনুসন্ধানে জ্ঞানী মানুষের অবশ্যই বর্ধিত অবদান আছে এবং স্বাধীনতা। এই অবদান রাখার ও স্বাধীনতা প্রকাশের ভিত্তি হলো আপন শুদ্ধতর জ্ঞান ও গভীরতর উপলব্ধি প্রকাশ করার ভেতর দিয়ে অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ মানুষগুলোকে আলোকিত ও অন্তর্গতভাবে প্রভাবিত করা; কিন্তু নিজেকে শ্রেষ্ঠরূপে জাহির করে কর্তৃত্বব্যঞ্জক আধিপত্য খাটিয়ে অন্যের স্বাধীনতা খর্ব করার অধিকার নেই। কোনো উত্তপ্ত বস্তুর সংস্পর্শে এসে শীতলতর বস্তুগুলো সহজাতভাবেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তাপ প্রবাহের দিক থেকে নির্ধারিত হওয়ার কথা কোন বস্তুটি উচ্চতর তাপমাত্রায়।

সমাজে যখন নানা মতের নানা অভিজ্ঞতার ও নানা বিশ্বাসের মানুষ একত্রে বাস করে সমাজবদ্ধ হয় অথচ পরমভাবে জানার কোনো পূর্বনির্ধারিত মানদণ্ড নেই যাচাই করার, কোন মতটি শ্রেয় এবং কোন মতটি ভ্রান্ত। তখন একমাত্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার পথ নির্ধারিত হওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। এখানে একটি প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস কাজ করে যে, একটি মুক্তসমাজ ব্যক্তিগত মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে যখন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের বিনিময় ঘটায়, তখন শুদ্ধতর ও সঠিক কল্যাণকর সমাজের জন্য সেটাই শেষ পর্যন্ত গৃহীত হবে। এখানে কিছুটা অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি আছে সাময়িকভাবে ভুল করার, এবং সেটা গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার মূল্যরূপেই গ্রহণীয়।

নতুন শতাব্দীর গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্বভাবতই স্বাধীনতার। এই স্বাধীনতার উৎস মানুষের জ্ঞান ও উপলব্ধির জগতের গভীরতা, বস্তুগত প্রাচুর্য ও ভৌত পরিবেশের আনুকূল্য, ব্যাপকতর ও দ্রুততর যোগাযোগসাধ্যতা এবং দীর্ঘতর অবকাশ। সংক্ষেপে গণতন্ত্রের শুদ্ধতর ও ব্যাপকতর অভিব্যক্তি নিধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় বস্তুগত ও মানসিক স্বাধীনতা বৃদ্ধি দ্বারা। সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ যদিও অবিচ্ছিন্ন এক ধারায় সংঘটিত হয়েছে দীর্ঘকালের মধ্যে, তবু অনেকগুলো আকস্মিক ধাপ আমরা লক্ষ করি বিশ্বজগৎকে উপলব্ধির ক্ষেত্রে ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতায়। কল্পনার জগৎ ও বাস্তব জগতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার কথা আমরা বলেছি মানবসভ্যতার প্রাথমিক স্তর প্রসঙ্গে। তার মূলে কাজ করেছে আমাদের জ্ঞানের অপ্রতুলতা, প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা এবং পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিরূপ পরিবেশ-সম্পর্কিত আতঙ্ক ও অসহায়ত্ববোধ। আমরা এর দৃষ্টান্ত লক্ষ করি খ্রিষ্টপূর্ব গ্রিক দার্শনিকদের ভাবনায়। যেমন এরিস্টটল মনে করতেন, স্বর্গলোকের সবকিছু নির্ভুল ও বিশুদ্ধভাবে পরিচালিত হয়। আকাশের গ্রহরা যে বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করে তার কারণ, বৃত্ত হচ্ছে প্রতিসাম্য ও শুদ্ধতার প্রতীক। ভূপৃষ্ঠে বস্তুর গতিপথ যে বিক্ষিপ্ত ও প্রতিসাম্যহীন, তার কারণ এই পৃথিবী পাপী-তাপীদের আবাসস্থল।

দুই সহস্রাধিক বছর আগের পরিপ্রেক্ষিতে অসাধারণ মেধাবী বিজ্ঞানীরাও তাঁদের বিশুদ্ধ ভাবনার জগৎ এবং বাস্তব পার্থিব জগৎকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করে দেখতেন। জ্ঞানের ও উপলব্ধির জগতের এই বিভাজন গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে সমাজব্যবস্থা, জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র, কর্মের জগৎ ও চেতনার জগৎকে। রেনেসাঁস ও শিল্পবিপ্লব প্রথমত মানবিক চেতনা, শিল্প ও সাহিত্যকে এবং দ্বিতীয়ত প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা, কার্যকারণ সম্পর্ক ও ভৌত পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে নতুন পরিবর্তনের ধারায় নিয়ে গেছে। এই পরিবর্তন অত্যন্ত নাটকীয় ও আকস্মিক মনে হয়। অনেকটা বরফগলা বা পানির বাষ্পীভূত হওয়ার ভেতর দিয়ে যেমন দশা পরিবতন, অনেকটা তেমন। বরং বলতে পারি ভৌতদশা পরিবর্তনের চেয়েও বেশি নাটকীয়— যেমনটি ঘটে অঙ্কুরোদগমন বা ডিমের খোলস ভেঙে

পাখির ছানার আত্মপ্রকাশে। এসব আকস্মিক পরিবর্তনের পেছনে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব আছে নিঃসন্দেহে, জ্ঞানেব ক্রমসঞ্চয এবং অভিজ্ঞতা ও উদ্ভাবনের ক্রমসংগ্রহের।

কিন্তু অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির একটি ক্রান্তিক স্তর অতিক্রমণ সম্ভব হযেছে কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, ডারউইন প্রমুখের বিস্ময়কর সৃজনশীলতা ও প্রতিভার কল্যাণে। নিউটন তার আবিষ্কৃত বলবিদ্যার নিয়ম উপস্থাপন করে দেখালেন যে, আকাশেব বস্তু ও পৃথিবীব বস্তু অভিন্ন গতিবিদ্যাব সূত্রের দ্বারা ব্যাখ্যাত। স্বর্গলোক ও পার্থিব জগৎ এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ভেতর দিযেই সমন্বিত ও একীভূত হলো। প্রায এর আবিষ্কারকের অবচেতনায, বিজ্ঞানীদের ব্যবহৃত সাধারণ ভাষায়, তাদের দৈনন্দিন জীবন ও আচরণে পুরোনো অভ্যাস ও ঐতিহ্য যদিও সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়নি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক যে পদ্ধতি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যন্ত্রনির্মাণ, পর্যবেক্ষণ ও সত্য যাচাইয়ের এবং গাণিতিক যে ভাষা পরিমাণগত ও যৌক্তিকভাবে বিমূর্ত ও নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানকে ধারণ ও প্রকাশের, তা গভীবভাবে বদলে দিয়েছে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধিকে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তিন শতাব্দী ধরে ধাপে ধাপে মানুষকে মুক্ত করেছে প্রকৃতি ও পরিবেশের আধিপত্য থেকে এবং অজ্ঞতা, কুসংস্কাব ও ভীতির প্রভাববলয় থেকে। মানুষের এই বর্ধিত স্বাধীনতা আসলে বহুমাত্রিক।

ক্রমাগত শুদ্ধতররূপে প্রকৃতিব নিয়মগুলো জেনে মানুষ একদিকে যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার শক্তি অর্জন করেছে, তেমনি লাভ করেছে খাদ্য উৎপাদন, গৃহনির্মাণ, চিকিৎসা ও যোগাযোগ সৃষ্টিব বর্ধিত দক্ষতা। ক্ষুধানিবৃত্তি, রোগ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার শক্তি মানুষকে দিয়েছে আত্মবিশ্বাস, বর্ধিত অবকাশ এবং ভয় ও শঙ্কা থেকে মুক্তি। আকস্মিকভাবে পাওয়া বা দৈনন্দিন জীবনধাবার ভেতর দিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতার সঞ্চয যেখানে একমাত্র জ্ঞানের উৎস ছিল, সেখানে পরিকল্পিতভাবে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি আধুনিক সভ্যতার একটি বড় উদ্ভাবন। ক্রমসঞ্চিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও উদ্ভাবন মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছিল আত্মরক্ষার এবং প্রচলিত জীবনধারাকে সংরক্ষণ ও সঞ্চারণেব। কিন্তু গত দুই শতাব্দী ধরে ক্রমান্বয়ে যে ধারা সৃষ্টি হয়েছে পরিকল্পিত আয়োজন ও প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে নতুন জ্ঞান সৃষ্টির, তা মানুষের দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছে ভবিষ্যতের দিকে। বিশ্বজগৎ সম্পর্কে নতুন যে উপলব্ধি তা বস্তুগত সমৃদ্ধির চেয়েও অনেক বেশি গভীর ও ব্যাপক। একসময় মানুষ তার অসহায়ত্ব, অজ্ঞতা ও অক্ষমতা নিযে বাস্তব জগৎকে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করতে চাইত এবং যা কিছু আকাঙ্ক্ষিত, সুন্দব ও শুদ্ধ, তা অতীতে অর্জিত ছিল এবং ভবিষ্যতে স্বর্গবাজ্যে তা প্রাপ্তিযোগ্য এমন একটি ভাবনায় মোহমুগ্ধ হয়ে থাকত, অথবা তাদেব মোহমুগ্ধ করে রাখা হতো দুবভিসন্ধিমূলকভাবে।

আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে নতুন কালিক চেতনা, ফলে বর্তমান বিচ্ছিন্ন

নয় অতীত থেকে অথবা ভবিষ্যৎ থেকে। জ্ঞানের ক্রমবিকাশের ভেতর দিয়ে সভ্যতার অবিচ্ছিন্ন এক ধারা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে একাকার করেছে একই বাস্তবতায়। সভ্যতার সমস্ত অর্জন আত্মস্থ করে ক্রমাগত নতুন জ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচিত করে অন্তহীন এক বিকাশের পথে মানুষ অভিযাত্রী। মানুষের সৃষ্ট জ্ঞান, তার আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত গভীরতর উপলব্ধির দৃষ্টি মানুষকে দিয়েছে অভূতপূর্ব এক স্বাধীনতা ভবিষ্যৎ নির্মাণের। একবিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্র স্বভাবতই গভীরতর ও ব্যাপকতর, এবং সেই সঙ্গে বহুমাত্রিক নতুন এই স্বাধীনতার আলোকে বিকাশ লাভ করার কথা।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর যেসব জাগরণ ও মুক্তি, বিশ্বাসের জড়তা ও বৃদ্ধির বন্দিদশা থেকে, তার একটি গভীর প্রভাব রয়েছে মানসিক মুক্তিলাভের ক্ষেত্রে। মানসিক এই আলোক প্রাপ্তিতে যাঁরা অবদান রেখেছেন, তাঁরা ছিলেন সাহসী ও সৃজনশীল মানুষ। বুদ্ধিগত পেশার বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে এদের আবির্ভাব ঘটেছিল। দার্শনিক জন লক ছিলেন চিকিৎসক; এডাম স্মিথ, ইমানুয়েল কান্ট প্রমুখ ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক; হিউম, ভলতেয়ার ছিলেন বিদগ্ধ পণ্ডিত; মান্টসক্য, কন্ডরসেট প্রমুখ ছিলেন উচ্চপদস্থ অভিজাত ব্যক্তি। এদের সবারই মতের ভিন্নতা ছিল, কিন্তু ঐক্য ছিল সত্যানুসন্ধানের সাহসিকতা ও সততায়। এরা কখনো কখনো কাজ করেছে, একত্রে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে চেতনার উদ্ভাস, তার পেছনে কাজ করেছে এসব বুদ্ধিজীবীর প্রচেষ্টায় অপসারিত এক অস্বচ্ছ পর্দা, যা দীর্ঘদিন যৌক্তিকভাবে সবকিছুকে দেখার আলোকে আড়াল করে রেখেছিল।

খ্রিষ্টপূর্ব গ্রিক দার্শনিকেরা জ্ঞান সাধনার যে বাস্তব দৃষ্টির সূচনা করেছিলেন, যা খ্রিষ্টধর্মের আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক ভাবনা, অবাস্তব ও অলৌকিকতার কুয়াশা সৃষ্টি করে বাইরের বিশ্বজগৎ ও মানুষের অন্তর্গত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তার পুনর্জাগরণ ঘটল। নবজাগরণের এই আলোকিত বুদ্ধিজীবীরা জ্ঞানের বিচিত্র ক্ষেত্রে বিচরণ করেছে, যা দীর্ঘদিন ধর্মযাজকদের একচ্ছত্র অধিকারভুক্ত ছিল। এদের বিচিত্র ভাবনা ভৌতজগৎ সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিল। সেই সঙ্গে ব্যক্তিমানুষ, সমাজ, ধর্ম ও ইতিহাস সম্পর্কে সূচনা ঘটাল প্রশ্ন উত্থাপনের ও উদ্ভাবনী চিন্তার। এই নবজাগরণের সামগ্রিক আয়োজনে গভীর ও মৌলিক চিন্তা, সাহস ও স্বাধীনতা যেমন কাজ করেছে, সেই সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করেছে জনবোধ্য করে নতুন দর্শন ও নতুন জ্ঞানকে অসংখ্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার। দর্শনের বিষয়কে নির্বাচিত পণ্ডিতদের শুধু অধিগম্য বলে মেনে না নিয়ে সাধারণ্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়। নবজাগরণের প্রবক্তারা গভীর এক অনুপ্রেরণা ও আশাবাদ নিয়ে মধ্যযুগের অন্ধকার ও জড়তা কাটিয়ে ওঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইউরোপের নানা দেশে নানা নামে এই যুগকে আলোকিত যুগ, মুক্তবুদ্ধির যুগ, বৈদগ্ধ্যের যুগরূপে অভিহিত করা হয।

শিক্ষার বিস্তার ও গণতন্ত্রের বিকাশ

যে জানে না তাকে জানানোই শিক্ষা নয়, বরং যে আচরণ শেখেনি তাকে আচরণ শেখানো শিক্ষার লক্ষ্য। একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনো ব্যক্তি বা সমাজ কীভাবে আচরণ করে অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সেটি একটি গভীর ও জটিল বিষয়। ব্যক্তি বা সমাজের যে অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, বিচারশক্তি, অনুভব ও সংবেদনশীলতা, উপলব্ধির ক্ষমতা ও কর্মতৎপরতা—তার সামগ্রিক প্রভাব আমরা দেখতে পাই বিশেষ পরিস্থিতিতে সেই ব্যক্তি বা সমাজ কী অভিব্যক্তি প্রকাশ করে তা থেকে। শিক্ষা এ কারণেই উপাত্ত ও তথ্যের আত্মস্থকরণ নয়, নিয়ম পালন বা যান্ত্রিক দক্ষতা অর্জনও নয়, একটি সামগ্রিক ও সজীব ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা—যা মানুষকে যোগ্য করে তোলে সৃজনশীল সক্রিয়তায় নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে।

একজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের ভেতর দিয়ে প্রস্তুত করার যে আয়োজন, সেখানে তথ্য ও জ্ঞানের সংগ্রহ ও চর্চার অনুষঙ্গরূপে একটি সজীব ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার প্রয়াস থাকে। মানুষের প্রতি গভীর আস্থা, তার বিচারশক্তি, যোগাযোগের ক্ষমতা, সৃষ্টিশীলতা, সাহসিকতা ও কর্মতৎপরতা সেই বৈশিষ্ট্য প্রদান করে, যা সহজভাবেই তাকে প্রস্তুত করে যেকোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে। গণতন্ত্রে মূল স্বতঃসিদ্ধ হলো সবার ওপরে মানুষ সত্য। এই মানুষ কোনো কাল্পনিক আদর্শ মানুষ নয়; বাস্তব মানুষ— যে মানুষ কাজ করে, অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করে, জীবনকে ভালোবাসে, যে মানুষ আনন্দিত হয় অথবা রাগান্বিত অন্যের আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে, যে মানুষ শিক্ষালাভের যোগ্য, মূল্যবোধ ও বিচারের শক্তি যার মধ্যে সঞ্চারিত করা যায়। শিক্ষার ভেতর দিয়ে ব্যক্তি মানুষ, এবং সেই কারণে যূথবদ্ধভাবে সামাজিক মানুষ যে ক্রমাগত জ্ঞানের সঞ্চয়, অভিজ্ঞতার বিনিময়, বুদ্ধি প্রয়োগ ও উদ্ভাবন ঘটিয়ে বিশ্বজগৎ ও পরস্পরকে জানতে পারে এবং পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, এই বিশ্বাস আছে বলেই শিক্ষার অধিকার সব মানুষেরই জন্মগত। শিক্ষা মানুষকে দক্ষতা দেয় বিরূপ পরিবেশের মুখোমুখি হতে, সৃজনশীলভাবে চিন্তা করার ও নিজের ভাবনাকে প্রকাশের এবং সেই সঙ্গে অন্যের চিন্তা-ভাবনা ও আচরণকে বিচার ও উপলব্ধি করার।

মানুষ যে জন্মগতভাবেই ভালো বা মন্দ নয়, যোগ্য অথবা অযোগ্য নয়; বরং শিক্ষালাভ, স্বাধীন বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ, নৈতিকতা ও সততার ভেতর দিয়ে প্রতিটি মানুষ নিজেকে গড়ে তুলতে পারে বলেই সে তার কাজের জন্য স্বীকৃতি বা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। মানুষ যদি পরিবর্তনীয় না হয়ে জন্মগতভাবেই নির্দিষ্ট দোষ-গুণের বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত হতো, অর্থাৎ শিক্ষার ভেতর দিয়ে এবং ব্যক্তিমানুষের আপন সচেতন প্রচেষ্টা ও বিকাশমান রুচির প্রভাবে নিজেকে বিকশিত করতে না পারত, তাহলে তার ন্যায়-অন্যায়ের জন্য, সফলতা বা ব্যর্থতার জন্য তাকে বিচারের মুখোমুখি করা অযৌক্তিক হতো। শিক্ষার আয়োজন তাই মানুষেরই সৃষ্ট এমন একটি ব্যবস্থা যার ভেতর দিয়ে মানুষকে রূপান্তরিত করা যায় তার জ্ঞানে, কর্মদক্ষতায়, মূল্যবোধ, রুচি ও সার্বিক আচরণে। শিক্ষা তাই মানুষের হাতে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, যার স্বাধীন প্রয়োগে ব্যক্তিমানুষ ও সমাজ আপন ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। শিক্ষালাভ ও শিক্ষা প্রদানের স্বাধীনতাই সবচেয়ে বড় স্বাধীনতা, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সভ্যতার বিকাশকে উন্মুক্ত ও অন্তহীন করেছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসের মূলে মানুষের এই আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মবিকাশ ও প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকৃত। ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো অনুশাসন নয়, ঐশ্বরিক বা অতিমানবিক কোনো নীতিমালা বা দর্শন নয়, সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও বিচারশক্তির আলোকে সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিই হলো গণতন্ত্র। সব মানুষই শিক্ষালাভের ভেতর দিয়ে যোগ্য হয়ে উঠতে পারে। জ্ঞানের চর্চা ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয় মানুষকে কর্মদক্ষ, উৎপাদনশীল ও যোগ্য করে তুলতে পারে—এই বিশ্বাস, মানুষের প্রতি গভীর আস্থা, মানুষের সমান অধিকার ও শিক্ষালাভের স্বাধীনতার ভিত্তিও এখানে নিহিত। শিক্ষার প্রতি এই প্রত্যয় ও গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা মূলত মানুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনেরই এক অভিন্ন প্রকাশ। শিক্ষা ও গণতন্ত্র দুটোই মানুষের অন্তহীন সম্ভাবনাকে শুধু তুলে ধরে, কিন্তু সম্ভাবনার পরিস্ফুটন ঘটাতে হলে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চাই—শ্রম, সাধনা, জ্ঞানের চর্চা, সততা ও সাহসিকতা নিয়ে সভ্যতার যে অগ্রযাত্রা, সেখানে সাফল্য ও বিফলতার দায়িত্ব মানুষের ওপরই বর্তায়। অন্ধ আনুগত্য, আত্মসমর্পণ, ভীতি, আবেগ বা অভিমানের কোনো অবকাশ নেই।

শিক্ষালাভের ও জ্ঞানার্জনের ভেতর দিয়ে বিশ্বজগৎকে জানার ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের যে আয়োজন আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায়, সেখানেও পূর্বনির্ধারিত ও আরোপিত কোনো নীতিমালা নেই। ক্রমসঞ্চিত অভিজ্ঞতা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের ভেতর দিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি লাভ আধুনিক শিক্ষায় অপরিহার্য।

গণতন্ত্রের পথ শিক্ষার আলোকে শুধু অতিক্রমণের। গণতন্ত্রের যে পূর্বনির্ধারিত কোনো লক্ষ্য নেই, ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ভুল সংশোধন, সমালোচনা, মূল্যায়ন ও যাচাইপর্বের ভেতর দিয়ে যে এর অভিযাত্রা উন্মুক্ত পথে, তার কারণ গণতন্ত্রের

নিয়ন্ত্রক হলো মানুষ—যে মানুষ শিক্ষালাভের যোগ্য, অনুপ্রাণিত, সৃজনশীল, সচেতন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতাপ্রাপ্ত। গণতন্ত্র ও শিক্ষা কোনোটিই স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর নয়; দুটোই পরীক্ষানির্ভর অর্জনসাধ্য অপার সম্ভাবনার পথ ধরে বিকাশ লাভ করে।

মানুষ অজ্ঞ, অসহায়; কুসংস্কারপ্রবণ ও অনভিজ্ঞ বলেই শিক্ষা এত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য মানুষের জন্য। কিন্তু শিক্ষালাভ যে সম্ভব তার কারণ, মানুষ অনুসন্ধিৎসু, সৃজনশীল, পরীক্ষাপ্রবণ, ভাষালাভের যোগ্য, সাহসী ও অনুপ্রেরণাপ্রাপ্ত। গণতন্ত্র যে অপরিহার্য তার কারণ মানুষ ভুল করে এবং অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে ক্রমাগত সংশোধন, পরীক্ষার ভেতর দিয়ে সত্যোদ্‌ঘাটন এবং মতবিনিময়, যোগাযোগ সৃষ্টির ভেতর দিয়ে শুদ্ধতর পথের সন্ধান পেতে আগ্রহী।

শিক্ষা মানুষকে বিচারশক্তি ও সঠিক পথ নির্বাচনের যোগ্যতা দেয় বলেই গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারে। আধুনিক শিক্ষা ও গণতন্ত্রের বিকাশ তাই অবিচ্ছেদ্য এক সম্পর্কে আবদ্ধ—স্বাধীনতা ও আনুষঙ্গিক দায়িত্ব পালনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সৃজনশীলতা, সততা ও কর্মতৎপরতায়। একটি মানুষের আচরণ এবং সেই অর্থে একটি রাষ্ট্রবদ্ধ সমাজের প্রতিক্রিয়া গভীরভাবে সম্পর্কিত প্রতিটি মানুষের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, বিচারশক্তি, সততা ও রুচির দ্বারা—যার ভিত্তি যথার্থ শিক্ষা। মোট কথা, ব্যক্তি বা জাতির যে আচরণ বা প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ নতুন কোনো পরিস্থিতি, সাফল্য বা দুর্যোগে, তা ব্যক্তি বা সমাজবদ্ধ মানুষের অর্জিত শিক্ষার অপেক্ষক। গণতন্ত্রের জন্য যে মুক্তচিন্তা, সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যোগাযোগসাধ্যতা, সহনশীলতা ও প্রজ্ঞা প্রয়োজন নিজেকে প্রকাশ করার ও অন্যের বক্তব্যকে অবধারণের পারস্পরিকতায়, তা একমাত্র ব্যাপক শিক্ষার ভেতর দিয়েই অর্জিত হতে পারে।

গণতন্ত্র ও তথ্যের মিথস্ক্রিয়া

গণতন্ত্রের যে বাহ্যিক যান্ত্রিক রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক নির্বাচন নির্ধারণ করে কোনো রাজনৈতিক দল বা নেতৃত্ব নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সরকার পরিচালনা করবে। এই নির্বাচন পরিচালনা, ভোট গণনা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সংসদে দেশ পরিচালনার নীতিমালা নির্ধারণ, আইন পাসকরণ এবং সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে সরকার গঠন অনেকটা আচরণপরায়ণতার মতো মনে হয়। ধর্মবিশ্বাসের মতো গণতন্ত্রে বিশ্বাসও যেন এই আচরণ পালনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। বাস্তবে প্রতিটি ভোটের আড়ালে একজন ভোটার থাকেন, যিনি তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন ভোট প্রদানের মাধ্যমে তার সমর্থন বা বিরুদ্ধতা প্রকাশ করে। আসলে গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে যদিও বলা হয়ে থাকে, আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব, বাস্তবে এই ইচ্ছা প্রকাশ বাহ্যিকভাবে যতটাই অবাধ, মুক্ত ও নিরপেক্ষ হোক, ভোটদাতার নিজের পক্ষ থেকে কখনোই তা স্বাধীন, মুক্ত ও নিরপেক্ষ নয়।

ভোট প্রদানের মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিক যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন তা তার সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব, প্রজ্ঞা ও বিচারশক্তির গোপন অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তি প্রকাশ্যেও ঘটতে পারত, কিন্তু অসততা, প্রলোভন বা পারস্পরিক প্রভাব নির্বাচন পরিচালনাকে বিঘ্নিত করতে পারে, সেই আশঙ্কায় গোপন ব্যালটে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কখনো কখনো প্রকাশ্যেও মত প্রকাশ ঘটতে পারে, এমনকি সেই মতের সপক্ষে যুক্তি প্রদান ও বিতর্ক হতে পারে, যেমনটি আমরা লক্ষ করি সংসদে।

স্বভাবতই নির্বাচন পরিচালনা ও ভোট প্রদানের পদ্ধতি একটি কৌশলগত যান্ত্রিক ব্যাপার। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো ভোটদাতার সিদ্ধান্তের প্রকাশ, সাধারণ মানুষের মতামতকে মূল্য দেওয়ার এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার আড়ালে একটি গভীর মূল্যবোধ, একটি তত্ত্ব ও নৈতিক আদর্শ কাজ করে। নৈতিক আদর্শটি হলো প্রতিটি মানুষের মতপ্রকাশের ও নিজেকে নিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান। এই স্বীকৃতি শর্তহীন। একজন বয়োপ্রাপ্ত, মানসিকভাবে সুস্থ মানুষ মাত্রেই নিজেকে পরিচালনার ও সার্বিক অভিব্যক্তি ঘটাবার স্বাধীনতা আছে। যেহেতু একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে অন্য অনেকের সঙ্গে সে বাস করে,

ফলে সবার মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সমান অধিকার দিতে হলে একমাত্র সুষ্ঠু পথ হলো সবার মতকে একত্রে যাচাই করে তার আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। কিন্তু এই বিপুলসংখ্যক মতামতকে একত্রে যাচাই করে এর লব্ধি বা ফলাফল নির্ধারণের একমাত্র বা অনুপম কোনো পদ্ধতি নেই। একটি সহজ উপায় হলো প্রতিটি মতকে সমান মূল্য দিয়ে ভোটের সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে লব্ধি নির্ধারণ। অন্যটি হলো বিভিন্ন মতামতের মধ্যে সজীব মিথস্ক্রিয়া ঘটতে দেওয়া এবং এই মুক্ত পারস্পরিক প্রভাবের ভিত্তিতে লব্ধি নির্ধারণ। কৌশলগত কারণে প্রথম পদ্ধতিটি মেনে নেওয়া হয় সাধারণ ভোট গ্রহণের সময় এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিটি বা প্রথম ও দ্বিতীয় পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটে সংসদে। যেটা আদর্শ পদ্ধতি তা হলো বিভিন্ন মতের মিশ্রণ ও পারস্পরিক প্রভাব অর্থাৎ মিথস্ক্রিয়া ঘটানো এবং তার ভেতর থেকেই লব্ধি মত নির্ধারণ। ব্যাপারটি খুব জটিল। প্রথমত, প্রতিটি মানুষের মত একক কোনো ঘটনা নয়। নানা বিষয়ে বিভিন্ন মাত্রার প্রত্যয় নিয়ে প্রতিটি মত বহুমাত্রিক ও জটিল, সেই সঙ্গে পরিবর্তী ও নমনীয়। এই ধরনের অসংখ্য জটিল মত এদের বহুমাত্রিকতা নিয়ে ব্যক্ত হয় ব্যালট পেপারের মাধ্যমে প্রতীকী সংখ্যায়। এর আড়ালে থাকে জটিল এক মিশ্রণ বহুমাত্রিক অসংখ্য মতের।

এই মিশ্রণের ফলাফল নির্ধারণের কোনো গাণিতিক প্রক্রিয়া এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু একটি দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরতে পারি পদার্থবিজ্ঞানের জগৎ থেকে। পদার্থবিজ্ঞানে দুটো ব্যবস্থার মধ্যে যখন মিথস্ক্রিয়া ঘটে যার প্রত্যেকটির অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তখন এর প্রত্যেককে প্রকাশ করা হয় একেকটি মেট্রিক্স দ্বারা। দুটো এমন ব্যবস্থা বা সিস্টেম যখন মিথস্ক্রিয়া ঘটায়, তার লব্ধিকে নির্ধারণ করা হয় এদের প্রতিনিধিত্বকারী দুটো মেট্রিক্সের গুণফল দ্বারা। এই গুণফল নিজেও একটি মেট্রিক্স অর্থাৎ সারি ও কলামে সাজানো অনেকগুলো সংখ্যা। স্বভাবতই অনুমান করা যায় যে, সুষ্ঠু গাণিতিক হিসাবে ভোট গ্রহণের মাধ্যমে যদি সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে হয় তা মেট্রিক্স গুণনের মতোই একটি জটিল গাণিতিক প্রক্রিয়া হতে হবে এবং সেই গাণিতিক নিয়মটি এখনো অনাবিষ্কৃত। তবু বর্তমানের অনুসৃত পদ্ধতিটি একটি সান্ত্বনা, গণতন্ত্রের আদর্শকে গ্রহণ করার পক্ষে।

নৈতিক আদর্শ ছাড়াও গণতন্ত্রের একটি তত্ত্ব আছে এবং তা হলো, যৌথ জীবনধারাকে যদি সুচরম কর্মদক্ষতা, স্থিতিশীলতা, অগ্রগতি ও স্বাধীনতা দিতে হয় তাহলে তা নিশ্চিত করার একমাত্র পথ হলো রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে অনুসরণ করা। লক্ষণীয় যে, অনেকগুলো শর্ত যথা—কর্মদক্ষতা, স্থিতিশীলতা, অগ্রগতি ও স্বাধীনতাকে আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি এবং সেটা রাষ্ট্রের অন্তর্গত সব মানুষের জন্য। জটিল ও বহুমাত্রিক এই সমাজবদ্ধ জীবনের নানা চাহিদা ও উপকরণকে স্বভাবতই তথ্যরূপে প্রকাশ করতে হবে। ধারণাটি আসলে বিমূর্ত ও গাণিতিক। আমরা যখন মতপ্রকাশ করি কথা বলে, লিখে, দৈনন্দিন নানা কাজে

বিকল্প পথের ভেতর থেকে একটি পথকে নির্বাচন করে, ক্ষোভ বা আনন্দের ভেতর দিয়ে নানা ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়ে, তখন আসলে আমরা তথ্যের আদান-প্রদান ঘটাচ্ছি। এই মতামত প্রকাশের, পরস্পরকে প্রভাবিত করার ও তথ্য বিনিময়ের সংক্ষিপ্ত ও প্রতীকী রূপ হলো আনুষ্ঠানিক নির্বাচন। যে জটিল গাণিতিক হিসাবটি বাস্তবে করা দুঃসাধ্য অর্থাৎ বহু মানুষের নানা মতামতের লব্ধি বা ফলাফল নির্ধারণ যেখানে আপাতদৃষ্টিতে অসাধ্য, তাকে আমরা সহজ করে নিয়েছি সরল ভোট গণনার নিয়মে। কিন্তু গণতান্ত্রিক তত্ত্বানুসারে সব মানুষের মতামত সুষ্ঠুভাবে মিশ্রণ ও তার লব্ধি নির্ধারণ সমাজ পরিচালনার জন্য অপরিহার্য। সেখানে ভুল করার বা মতামতের মূল্যকে অবজ্ঞা করার কোনো অবকাশ নেই। ভোট গণনার কাজটি সহজ করতে গিয়ে একটি জটিল হিসাব আমরা ন্যস্ত করেছি ভোটদাতাদের ওপর। ভোটদানের স্বাধীনতা তাই নির্বিকার—নির্বিচার নিরপেক্ষ নয়।

প্রতিটি ভোটদাতা একজন গভীর দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারক। তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় তথ্যের আলোকে। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যা কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য, যথা—খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুবিচার, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, মানবিক মূল্যবোধ ও অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা—সবকিছুর সুচরম প্রাপ্তি কীভাবে ঘটতে পারে, তারই প্রতিফলন আমরা প্রত্যাশা করি প্রতিটি ভোটদাতার সিদ্ধান্তে। এ ব্যাপারে ভোটদাতাকে সাহায্য করতে পারে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও লক্ষ্যকে সুস্পষ্টভাবে জনগণের কাছে উপস্থাপন করে এবং সেই লক্ষ্য অর্জনে তাদের যোগ্যতার প্রমাণ উপস্থিত করে। পুরো ব্যাপারটাই শেষ পর্যন্ত তথ্যের সমাবেশ, তথ্যের উপস্থাপন ও তথ্যের বিশ্লেষণ।

প্রত্যেক নাগরিক তার শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, রুচি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভেতর দিয়ে যে ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে সেটাও একটি তথ্যের সংগ্রহ ও বিন্যাস। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গবেষণাকেন্দ্র, যোগাযোগমাধ্যম ও সামাজিক সমাবেশে বিশেষজ্ঞ, বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত লেখা, বক্তৃতা ও সংলাপের ভেতর দিয়ে তথ্যের যে প্রকাশ ও বিনিময় ঘটায়, সেটাও একটি তথ্যের জাল বা ধাত্র সৃষ্টি করে। এ সমস্ত তথ্যই মূলত সজীব, সক্রিয়, সংবেদী ও প্রভাববিস্তারী। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র পরিচালনা তাই গভীর এক দায়িত্ব, যেখানে প্রতিটি নাগরিককে শেষ বিশ্লেষণে তথ্যের উৎস, ধারক ও গ্রাহকরূপে অমরা গণ্য করতে পারি। গণতন্ত্রের সার্থকতা ও সাফল্য নির্ভর করে কতটা সততা, ব্যাপকতা ও গভীরতা নিয়ে বিচিত্র তথ্যের মিশ্রণ, বিন্যাস ও লব্ধি আমরা নির্ধারণ করতে পারি সবার অংশগ্রহণের ভেতর দিয়ে তার ওপরে।

গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার

গণতন্ত্র একটি মুক্ত সমাজব্যবস্থা। যেকোনো ব্যবস্থা বা সিস্টেম সংরক্ষিত হবার ও টিকে থাকার প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত হতে হয়, অর্থাৎ একধরনের বন্ধন বা শাসন সেখানে কাজ করে। ব্যবস্থা বলতে একটি সংগ্রহ, একটি সমাবেশ বা সংঘবদ্ধ আয়োজন বুঝি, যা হতে পারে বস্তুগত, সামাজিক, এমনকি বিমূর্ত ধারণা বা বিশ্বাসের। কিন্তু সমাবেশ মাত্রই একটি ব্যবস্থা নয়। কারণ, একটি ব্যবস্থা বা সিস্টেমের মূল বৈশিষ্ট্য হলো, এর গঠনকারী সমস্ত উপাদানের মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক ও পরিপূরকতা থাকবে। একটি গাড়ি, একটি বৃক্ষ এমনকি একটি মানুষকে ব্যবস্থা বলতে পারি। একটি মোটরগাড়ির ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করি, এর প্রতিটি যন্ত্রাংশ বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পন্ন করলেও একটি চলন্ত গাড়ির ক্ষেত্রে এদের সক্রিয়তা ও কার্যকারিতার একটি ছন্দময় সমন্বয় অপরিহার্য। একটি গাছের শেকড়, কাণ্ড, পাতা সবই বৃক্ষের সজীবতা ও অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে ও বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পন্ন করে। কিন্তু গাছের এ বিভিন্ন অংশ এদের নির্বাচিত কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। ফলে গাছের বিভিন্ন অংশ একটি পরিপূরকতায় ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় সমগ্র বৃক্ষকে রূপদান করে।

আমাদের দেহের প্রতিটি প্রত্যঙ্গ তেমনি সুনির্দিষ্ট এবং পৃথক পৃথক ক্রিয়া সম্পন্ন করেই দেহকে সুস্থ, সবল ও সক্রিয় রাখে। এরা পরস্পর থেকে ভিন্ন, জটিল, জৈবক্রিয়া সম্পাদন ও বিচিত্র সব দায়িত্ব পালনের জন্য। কিন্তু একটি জীবন্ত মানুষ বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের সমন্বিত ক্রিয়া এবং এদের পারস্পরিক নির্ভরতা ও পরিপূরকতায় পূর্ণতা লাভ করে। কোনো প্রত্যঙ্গকেই বিচ্ছিন্নভাবে জীবন্ত রাখা সম্ভব নয়, তেমনি কোনো একটি প্রত্যঙ্গের অনুপস্থিতি বা নিষ্ক্রিয়তা পূর্ণাঙ্গ জীবনের সমাপ্তি ঘটায়। এসব কিছুর তুলনায় একটি দেশ বা সমাজ অনেক বেশি জটিল ব্যবস্থা। সভ্যতার বিকাশের ভেতর দিয়ে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভবে যে সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, তা আরো বেশি জটিল, সূক্ষ্ম, গতিশীল ও সমন্বিত। কারণ, আধুনিক সমাজে প্রতিটি মানুষ যেখানে নিজেই একটি ব্যবস্থা তার বিশেষ কর্মদক্ষতায়, দায়িত্ব পালনে, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসে— সর্বোপরি ব্যক্তিস্বাধীনতা ও চেতনায়, সেখানে ক্রমাগত তথ্য বিনিময় বিচার-বিবেচনা, মূল্যায়ন ও সমালোচনার ভেতর

দিয়ে একটি অবিচ্ছিন্ন ব্যবস্থারূপে টিকে থাকে এবং ক্রমাগত পরিবর্তনের ধারায় বিকাশ লাভ করে।

যখন মানুষের জ্ঞান সীমিত ছিল সেই সঙ্গে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও, তখন নানা অন্ধবিশ্বাস, কঠোর শাসন ও যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সমাজ পরিচালিত হতো। রাজতন্ত্র, একনায়কত্ব, মিলিটারি শাসন— এসবই দৃষ্টান্ত সমাজকে যান্ত্রিকভাবে পেশিবল বা ভীতি প্রদর্শন দ্বারা নিয়ন্ত্রণের। এই অশ্লীল যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য হলো, মানুষকে পরিচালনার জন্য আরোপিত যে শক্তি তা বাহ্যিক ও স্থূল। শুধু ভয় দেখিয়ে, বল প্রয়োগ করে অথবা আবেগ বা কুসংস্কারকে অবলম্বন করে সমাজকে যেখানে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, সেখানে ব্যক্তিমানুষ তার বুদ্ধি, রুচি, মূল্যবোধ ও দায়িত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশে ব্যর্থ। তার স্বাধীনতা খর্বিত ও প্রতিহত।

গণতান্ত্রিক সমাজের মানুষ যখন সক্রিয়, বুদ্ধিমান, দায়িত্বশীল, উন্নয়নপ্রত্যাশী— সর্বোপরি সৃজনশীল ও স্বাধীন মানুষ হিসেবে বিবেচিত, সেখানে সমাজ নিয়ন্ত্রণ বাহ্যিকভাবে প্রযুক্ত বল বা প্রদর্শিত ভীতি নয়, প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের রুচি, বিচার শক্তি ও মূল্যবোধ। অবশ্য যৌথ জীবনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা, বিচ্ছিন্ন একক মানুষের স্বাধীনতা থেকে ভিন্ন। যেখানেই সৃজনশীলতা, মুক্তবুদ্ধি, পরিবর্তনীয়তা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে, সেখানেই মতভেদ, বিতর্ক ও পথের অনৈক্য সৃষ্টি হবার প্রবণতা দেখা দেয়। কর্মক্ষেত্রের ভিন্নতা, উন্নত সমাজে দক্ষতা লাভের প্রয়োজনে, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও কাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র ভিন্ন হয়ে পড়ায় নানা শ্রেণী বিভাজন ও এদের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য সৃষ্টি হতে বাধ্য।

বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠা, কর্মক্ষেত্রের বিভাজন সৃষ্টির এবং মুক্তচিন্তার সামগ্রিক প্রভাবকে একটি বিকর্ষণ ক্রিয়া বলতে পারি, যা সমাজের প্রতিটি মানুষকে বা পেশাজীবীকে পরস্পর থেকে দূরে ঠেলে দেয়। যে সমাজে শিক্ষা, সৃজনশীলতা, পরিবর্তনের গতি, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা যত প্রবল, প্রতিটি মানুষের রুচি, মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্ব ততই অনন্য ও ভিন্ন পরস্পর থেকে। সভ্য সমাজের প্রতিটি মানুষ তাই নিজস্ব একটি জগৎ সৃষ্টি করে একধরনের নিঃসঙ্গতা অর্জন করে। এটি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, অভিজ্ঞতার সংগ্রহ, রুচি ও ব্যক্তিত্বের ফসল। এখানেই নিহিত ব্যক্তিমানুষের অন্তহীন, অন্তর্নিহিত স্বাধীনতা। কোনো অন্ধ মোহ, লোভ, ভীতি, আবেগের মাদকতা ও দলগত স্বার্থের দ্বারা সৃষ্ট উচ্ছৃঙ্খলতা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে ব্যক্তিমানুষের এ স্বাধীনতা সবচেয়ে বড় শক্তি।

এই যে পৃথক হয়ে ওঠা ব্যক্তিত্বে, অভিজ্ঞতায় ও বিচারের শক্তিতে তা সমাজবদ্ধ মানুষকে স্বভাবতই বিকশিত করে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে। এই বিচ্ছিন্নতা ও বিকর্ষণের বিপরীতে স্বভাবতই একটি আকর্ষণ বল চাই সামাজিক ঐক্য ও সমন্বিত জাতীয় অগ্রগতির জন্য। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই ঐক্য ও সমন্বয় ঘটে একটি সাংস্কৃতিক বন্ধনে। সংস্কৃতির এই প্রভাববলয় সৃষ্টি করে শিক্ষা, যোগাযোগসাধ্যতা,

ভিন্নমত ও ভিন্ন পেশার মানুষকে উপলব্ধি করার তাদের ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে। অন্ধবিশ্বাস, আরোপিত নিয়ম, ভীতি প্রদর্শন ও অনুশাসন, বল প্রয়োগ বা লোভ দেখানোর পরিবর্তে, রুচি, সৌন্দর্য, বুদ্ধি, বিবেক, দায়িত্ববোধ, দেশপ্রেম ও সর্বোপরি মানবিকতার কাছে আবেদন রেখেই মাত্র সামাজিক এ বন্ধন সৃষ্টি হবার কথা গণতান্ত্রিক সমাজে।

আবেগের পরিবর্তে বুদ্ধি, ভীতির পরিবর্তে রুচি, প্রবৃত্তির পরিবর্তে সৌন্দর্যচেতনা, লোভ ও মোহের পরিবর্তে ত্যাগের প্রেরণা ও সুন্দরের সাধনা এখানে উৎস, ঐক্য সৃষ্টির ও সমন্বয় সাধনের। গণতান্ত্রিক সমাজে তাই একই সঙ্গে একটি অপসারী ও অভিসারী বল কাজ করে, যা ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা ও বিশিষ্টতা অক্ষুণ্ন রেখেও একটি সাংস্কৃতিক বন্ধনে সমাজকে সমন্বিত করে। এই প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি হচ্ছে জ্ঞানের সাধনা, অভিজ্ঞতার সংগ্রহ, উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতা এবং নানা মানুষের ও নানা কর্মক্ষেত্র থেকে অর্জিত জ্ঞানকে যাচাই-বাছাই ও বিন্যস্ত করা। সব মিলেই সৃষ্টি হয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রভাববলয়।

বিচিত্র ও বিচ্ছিন্ন এ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে সমন্বিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করার একমাত্র পথ হলো যোগাযোগ সৃষ্টি। অন্ধত্ব ও মোহমুগ্ধতা কাটিয়ে, ভীতি ও লোভের শিকার না হয়ে ব্যক্তিমানুষ যে তার কর্মতৎপরতা ও সৃজনশীলতার অভিব্যক্তি ঘটাতে পারে, একটি গণতান্ত্রিক সমাজে তার প্রধান কারণ, মানুষের যাচাই ও অন্যকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা। একত্রে বাস করতে গেলে সমন্বয়, শৃঙ্খলা ও সহযোগিতা প্রয়োজন। আর সে জন্যই আইনের শাসন ও সুবিচার অপরিহার্য। কিন্তু গণতান্ত্রিক দর্শনে মানুষকে গ্রহণ করা হয় তার স্বাধীনতায়, সৃজনশীলতায়, বিকাশমানতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতায়। একই সঙ্গে স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণকে সমন্বিত করার অপরূপ কৌশল উদ্ভাবন যে সম্ভব, এটাই গণতন্ত্রের মূল স্বীকার্য।

গণতন্ত্রের যে নিয়মশৃঙ্খলা ও অনুশাসন তা মানুষের নিজস্ব সৃষ্টি, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত গ্রহণ, বিচার-বিশ্লেষণ ও পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে। এখানে উদ্ভাবন, নতুন প্রস্তাবনা, যোগাযোগ সাধন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণ সৃষ্টি করে সেই চঞ্চল পরিবর্তিত উত্তপ্ত কটাহ, যেখানে সমাজ বিন্যস্ত হয় উচ্চতর দশা পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে। নানা ধাপে, শ্রমের বিভিন্ন বিভাজনে, অসংখ্যের অবদানে এ গতিশীল পরিবর্তিত ধারা সংরক্ষিত হতে পারে একমাত্র তথ্য সৃষ্টি, তথ্য বিনিময় ও তথ্যের যথার্থতা যাচাই করে—গতিশীল সমাজকে এর বৈচিত্র্যে, বহুতায়, সৃজনশীলতা ও স্বাধীনতায়। একই সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও ন্যায়বিচার যথাযথ রাখতে হলে শুদ্ধ ও স্বচ্ছ সংস্কৃতি চাই। সংস্কৃতি হচ্ছে এ ক্ষেত্রে ভাগ করে নেওয়া অসংখ্য মানুষের অভিজ্ঞতা—যা একটি মাধ্যম বা প্রভাববলয় সৃষ্টি করে, এবং যার ভেতর দিয়েই আমরা পরস্পরকে প্রভাবিত করি ও যোগাযোগ সৃষ্টি করি।

সুবিচার বলতে গণতান্ত্রিক সমাজে সেসব নিয়ম বা আইনেরই প্রয়োগ বুঝি, যা সমাজবদ্ধ মানুষ তাদের যৌথ সংগঠনের জন্য নিজেরাই সৃষ্টি করেছে, মতামত প্রকাশ, যাচাই, বিশ্লেষণ ও নির্বাচনের ভেতর দিয়ে।

গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মূলনীতি তাই সমালোচনা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, যা হতে হবে বুদ্ধিগত সততায়, সৃজনশীলতায় ও মানুষের জন্য ভালোবাসায়। নিয়ম বা আইনকে সমুন্নত রাখার অপরিহার্যতা আসে সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল রাখার প্রয়োজনে। কিন্তু সমাজের অগ্রগতি, এর জনগণের প্রত্যাশা পূরণ, স্বাধীনতা ও নৈতিক অধিকার বজায় রাখার জন্য সাহসিকতা ও সৎ সমালোচনা চাই।

রাতের অন্ধকারে কোনো দস্যু বা ডাকাতদল যখন অস্ত্র হাতে ভীতি প্রদর্শন করে ঘোষণা করে যাত্রীদের সব সম্পদ তাদের হাতে তুলে দিতে হবে, সেটাও একটি ঘোষিত আইন যার সপক্ষে যাত্রীদের কোনো মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই। কিন্তু মেনে নেওয়ার বাধ্যবাধকতা আছে জীবনের ভয়ে। একই ভীতি প্রদর্শন ও ঘোষিত আইনের অমোঘতা একটু ব্যাপকভাবে ও ভিন্নতর পরিসরে ব্যবহৃত হয়েছে রাজতন্ত্রে, একনায়কত্বে ও সেনা শাসনে। সেখানেও আইন ছিল, বিচারকের নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা ও অপরিসীম ক্ষমতা ছিল। কিন্তু যা ছিল না তা হলো, প্রযুক্ত আইনের পেছনে এর নির্মাণে ও পরিবর্তনে, জনমানুষের অভিমত, সৃজনশীল সমালোচনা ও সমর্থন।

গণতন্ত্রে মানুষের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অন্তহীন বিকাশের পথ যে উন্মুক্ত তার কারণ, মানুষ যৌথভাবে নিজেরাই নিয়ন্ত্রক সমাজের। তাদের সৃষ্ট রাষ্ট্রীয় নিয়ম ও বিচারের আইন নির্বাচন করে। কোনো নিয়ম বা আইন যথার্থ ও সৎ কি না তা যাচাই করার পন্থা হলো, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সমালোচনা, সার্বিক মঙ্গলচিন্তা ও দায়িত্ববোধে জনগণই তা সৃষ্টি করেছে কি না, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহসিকতা ও স্বাধীনতার আবহে, তার ওপর।

গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করার প্রশ্নে

গণতন্ত্র একটি বিকাশমান ধারণা। গণতন্ত্র কেমন হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অবশ্যই যেকোনো নাগরিকের আছে। দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, সমাজকর্মী, রাজনীতিবিদ এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা যেমন, তেমনি কৃষক, খেতমজুর, সাধারণ নাগরিক, ছাত্রছাত্রী— সবাই তাদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে পারে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। কিন্তু পূর্বনির্ধারিত কোনো বিশ্বাস, আদর্শ, নীতিমালা চাপিয়ে দেওয়ার অবকাশ নেই গণতন্ত্রে। গণতন্ত্রের অর্থের সীমানার এই অস্পষ্টতা, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির এই অনির্বচনীয়তার কারণে, এই ব্যবস্থাকে যথেচ্ছাচার ও অদক্ষতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে থাকেন অনেকে। স্পষ্টভাবে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু না বললেও গণতন্ত্রের সাথে নানা বিশেষণ যুক্ত করে গণতন্ত্রকে হত্যা করার নানা কৌশলও বিভিন্ন স্বার্থান্বেষীগোষ্ঠী উদ্ভাবন করেছে।

মৌলিক গণতন্ত্র, শোষিতের গণতন্ত্র, আসল গণতন্ত্র, দুর্নীতিমুক্ত গণতন্ত্র, ইসলামি গণতন্ত্র, খ্রিষ্টীয় গণতন্ত্র ইত্যাদি বিশেষণে গণতন্ত্রকে পরিশোধিত করার অজুহাতে কখনো সেনানায়ক, কখনো স্বৈরাচার, কখনো কোনো সুবিধাবাদী শোষক বা সাম্প্রদায়িক শক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেছে জনগণকে বিভ্রান্ত করে। বস্তুত নিরাবরণ ও বিশেষণহীন সাধারণ গণতন্ত্র যে গভীর অর্থ ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বহন করে, তা ক্রমাগতভাবে আবিষ্কারের ও উপলব্ধির, এর বিকাশমানকালের মধ্যে ও অসংখ্য মানুষের অভিজ্ঞতার আলোকে। গণতন্ত্র যে বিশেষ কোনো পণ্ডিতের আপ্তবাক্য, কোনো চিরন্তন নীতি, কোনো পূর্বনির্ধারিত আদর্শ বা ধর্মীয় বিশ্বাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার নয়, সেটি গণতন্ত্রের অনন্য বৈশিষ্ট্য। গণতন্ত্রের সমস্ত স্বাধীনতা, উন্মুক্ততা ও বিকাশমানতা নিয়ন্ত্রিত এর নিয়ন্ত্রিত না হওয়ার পূর্বশর্তে।

প্রতিটি মানুষের যে অধিকার আছে শুধু বেঁচে থাকার নয়, মতপ্রকাশেরও এবং তার সেই অভিমত যে মূল্যপ্রাপ্ত হওয়ার, একটি স্বাধীন মত হিসেবে নিজস্ব মূল্যে, পূর্বনির্দিষ্ট নীতিমালার ধারা যাচাই করে নয়— তা সৃষ্টি করেছে মানুষের বিচারশক্তি ও স্বাধীনতার প্রতি গভীর আস্থা। মানুষ যে সুন্দর, সৃজনশীল, মুক্ত ও স্বাধীন, তার জীবনধারা ও উপলব্ধির জগৎ সে যে নিজেই সৃষ্টি করতে পারে আপন প্রতিভায়,

তার সম্ভাবনা যে অপার এবং তার বিকাশের পথ অন্তহীন—এসব কিছুই এক গভীর আত্মবিশ্বাস থেকে উদ্ভূত।

মানুষের নিজের ওপর এই আস্থা অন্ধবিশ্বাসের নয়, স্বাধীনতাবোধের সচেতনতা লাভের, সাহসিকতার ও দায়িত্ববোধের। কোনো একটি মানুষ পণ্ডিত বা জ্ঞানী বিশেষ সম্প্রদায় বা বিশ্বাসের স্বার্থের অনুকূল—এমন শর্তসাপেক্ষে নয়, একজন মানুষ যে শুধু মানবপ্রজাতির একজন সদস্য, সেই পরিচয়েই সে অধিকারপ্রাপ্ত আপন অভিমত প্রকাশের ক্ষেত্রে। কিন্তু মানুষ মাত্রেই কোনো সমাজে বা দেশে নিঃসঙ্গ নয়। যে মতপ্রকাশের ও আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা তার নিজের, তা অন্যের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে মানুষের সাথে মানুষের যে অপার্থক্যযোগ্যতা, সেটাই গণতান্ত্রিক অধিকারের মূল উৎস। সমাজবদ্ধ বা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্গত মানুষ তাই আত্মকেন্দ্রিক, নিঃসঙ্গ ও সংকীর্ণ হয়ে বাঁচতে পারে না। একত্রে যূথবদ্ধ হয়ে সমবায়ী যে জীবন, বিপুলসংখ্যক মানুষের একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে, সেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও আত্মপ্রকাশের অধিকার রূপান্তরিত হতে বাধ্য সমষ্টিগত স্বাধীনতা ও যৌথ বিকাশের ভেতর দিয়ে।

সমস্যাটি পরিসংখ্যানগত, এক থেকে অনেকে পরিবর্তিত হওয়ার এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রভাবিত করার ও প্রভাবিত হওয়ার ও পারস্পরিকতার। বস্তুজগতেও আমরা এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হই। একটি বিচ্ছিন্ন পরমাণু তার ইলেকট্রনগুলোর বিন্যাসে ও বর্ণালি সৃষ্টির ক্ষমতায় যে বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত, তা যখন একটি কেলাসের অসংখ্য পরমাণুর সারিবদ্ধ ভিড়ে অন্যতম সদস্য হয়ে ওঠে;, তখন এর ইলেকট্রনের শক্তিস্তর এবং বর্ণালি বৈশিষ্ট্য ভিন্নতা পায়। আর এ জন্যই একটি কঠিন বস্তুর মধ্যে আণবিক বন্ধনে আবদ্ধ পরমাণুর যে আচরণ, তা একক বিচ্ছিন্ন পরমাণুর আচরণ থেকে ভিন্ন। যে সাধারণ লবণ আমরা ব্যবহার করছি কেলাসিত অবস্থায় বা অণুবন্ধনে আবদ্ধ ক্লোরিন ও সোডিয়াম পরমাণুকে, এদের কখনোই আমরা আলাদাভাবে ব্যবহার করতে পারতাম না পারমাণবিক অবস্থায়। যেমন ক্লোরিন রীতিমতো বিষাক্ত একটি অণু এবং সোডিয়াম অণু পানির উপস্থিতিতে দাহ্য।

অবশ্য একটি মানুষ একটি পরমাণুর তুলনায় অনেক বেশি সজীব ও জটিল। যেমন একটি কেলাসিত বস্তুর তুলনায় সজীব ও জটিল একটি মানবসমাজ। কিন্তু এই উপমা টানার সার্থকতা এখানে যে, বস্তুজগতের অভিজ্ঞতাগুলো অনেক বেশি নৈর্ব্যক্তিক ও মোহমুক্তভাবে আমরা জানতে পারি এবং সফল তুলনা যেখানে টানা সম্ভব বস্তুজগৎ ও সামাজিক জীবনের মধ্যে, সেখানে অগ্রসর বস্তুবিজ্ঞানের জ্ঞান আমাদের সাহায্য করতে পারে জটিল এই সমাজকে বুঝতে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিমানুষের নানা সংকীর্ণতা, দুর্বলতা, নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতা শেষ পর্যন্ত একটি সামাজিক মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক প্রভাববলয়ের

মধ্যে রূপান্তরিত, সংশোধিত ও সহনীয় হয়ে উঠতে পারে। নীতিবাক্য, অন্ধবিশ্বাস, উৎকট, আবেগ, মোহ, লোভ ও ভীতি প্রদর্শন করে গণতন্ত্রের সহজ বিকাশকে যারা ব্যাহত করছে, তারা মানবজাতির শত্রু নিঃসন্দেহে। গণতন্ত্র কোনো ব্যক্তিমানুষের আবিষ্কার নয়, অথবা কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট কোনো আদর্শ।

বস্তুজগতে যেমন শক্তি, ভর, আধান, ভরবেগ ও কৌণিক ভরবেগের নিত্যতার নিয়ম আমরা দেখতে পাই—যা কোনো চাপিয়ে দেওয়া নিয়ম নয়। স্থান-কালের প্রতিসাম্যের কারণে প্রকৃতির এই নিয়মগুলো অপরিহার্য। গণতন্ত্রও তেমনি সভ্যতার চলার পথে এর বিকাশমানতায় সামাজিক নীতিমালা, প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ ও শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে চলেছে। গণতন্ত্রে আর একটি গভীর সত্য অন্তর্গতভাবে কাজ করে, তা হলো, কালের অনিবার্যতা ও বহমানতা। সময়ের মধ্যেই সভ্যতার বিকাশ— অভিজ্ঞতায়, অভিজ্ঞানে ও সৃজনশীলতায়। প্রতিটি মানুষের, সব মানুষের, বুদ্ধি, অভিমত, অভিজ্ঞতা ক্রমসংগৃহীত, সমন্বিত ও সঞ্চারিত হয়ে যে সভ্যতার বিকাশ ঘটাবে কালের মধ্যে, সেই সম্ভাবনাকে স্বীকার করাই হচ্ছে গণতন্ত্রের বিশ্বাস। যারা মানুষের অন্তর্গত ও অন্তর্নিহিত সৃজনশীলতাকে অবিশ্বাস করে এবং অস্বীকার করে কালের প্রবাহের সত্যতায়, তারাই নানা মুখোশ পরে গণতন্ত্রের, তথা সভ্যতার যাত্রাপথে দাঁড়িয়ে আছে নানারূপে বাধা সৃষ্টি করে। একমাত্র শিক্ষার বিকাশ, জ্ঞানের আলোর উদ্ভাস ও নির্ভুল তথ্যের অবাধ প্রকাশ মানবজাতিকে রক্ষা করতে পারে সভ্যতার এসব শত্রুর প্রভাব থেকে।

গণতন্ত্রের উন্মুক্ততা ও তত্ত্বহীনতা

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশ্বধারণা সবকিছুর মূল্যায়ন ও পরিমাপে মানুষকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করতে শুরু করে। ধর্মীয় বিশ্বাস ও আধিপত্যকে সরাসরি অস্বীকার না করে অথবা এর বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে একটি নতুন দর্শন ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে। মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব, জন্মগতভাবে সব মানুষ সমান অধিকারপ্রাপ্ত এবং মানুষের একটি সংজ্ঞায়ন অসাধ্য, অনির্বচনীয় স্বাধীনতা আছে— এমন একটি ধারণা ধীরে ধীরে স্বীকৃতি লাভ করে। একটি দর্শন রুশো ও গ্যালিলিওর কাছ থেকে আমরা পাই, বিশ্বজগতের যে রহস্য তা লিপিবদ্ধ আছে প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে— শুধু ধর্মগ্রন্থে, যথা বাইবেলে নয়। প্রকৃতি তাই একটি বিকল্প ধর্মগ্রন্থ যা পাঠ করতে হবে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে, যথা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও বুদ্ধি প্রয়োগের ভেতর দিয়ে। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে একই সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিকভাবে ভীতি, আত্মসমর্পণ, অন্ধ আনুগত্য, নিষ্ক্রিয়তা ও হতাশা থেকে মুক্ত করে একটি সাহসিক, স্বাধীন কর্মতৎপর, সৃজনশীল ও আশাবাদী মানুষরূপে অভিব্যক্ত করেছে। চিন্তার স্বাধীনতা, তথ্য যাচাই, সত্যোদ্‌ঘাটন ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বিভিন্ন মানুষের পক্ষে অভিন্ন মত পোষণ, যুক্তি প্রদর্শন, প্রমাণ স্থাপন, মানুষের বুদ্ধির বিকাশ ও দক্ষতার অগ্রগতি যেমন ঘটিয়েছে, তেমনি একটি প্রতিযোগিতার পরিবেশে মানুষ ক্রমাগত গভীরতার উপলব্ধিপ্রাপ্ত, অধিকতর কর্মতৎপর ও সৃজনশীলরূপে অভিব্যক্তি ঘটিয়েছে তার প্রতিভার।

মানুষের দৃষ্টি অতীতের দিকে আবদ্ধ না থেকে প্রসারিত হয়েছে সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে। হতাশা কাটিয়ে জন্ম নিয়েছে আশাবাদ, লোভের বিপরীতে আনন্দ ও সৌন্দর্য-বুদ্ধি জুগিয়েছে কর্মপ্রেরণা। কুসংস্কার, মোহ সৃষ্টি, অলৌকিক ও অবাস্তব ভাবনা মানুষের দৃষ্টিকে অস্বচ্ছ করে রেখেছিল। বুদ্ধি প্রয়োগ, সত্য যাচাই, অনুসন্ধিৎসা ও সৃষ্টিশীলতা মানুষকে সাহসী এবং অন্তহীন অজানা পথের অভিযাত্রী করেছে। উদার গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি সৃষ্টি হয়েছে অন্তর্গত ও বাহ্যিক জাগরণের ভেতর দিয়ে। এই প্রক্রিয়া এখনো সর্বজনীন, সর্বত্রগামী, সুসম্পন্ন নয়। বস্তুত গণতন্ত্রের পথ অশেষ পথ পরিভ্রমণের, যার লক্ষ্য অনির্বচনীয়।

গণতন্ত্রের জন্য মানুষের অন্তর্নিহিত মনস্তাত্ত্বিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে

ক্রমাগত প্রকৃতির নিয়মগুলো জানা ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের, শক্তিলাভের ভেতর দিয়ে। ভৌতজগৎ যে প্রাকৃতিক নিয়মাবলি দ্বারা পরিচালিত এই উপলব্ধি মানুষের অন্তর্গত স্বাধীনতাকে বিকশিত করেছে। অন্যদিকে চিন্তার এই স্বাধীনতা ও মানসিক মুক্তি সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও কর্মতৎপরতাকে উদ্দীপিত করে বিশ্বজগৎকে ক্রমাগত শুদ্ধতররূপে জানা ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের শক্তি জুগিয়েছে। গণতন্ত্রের এই বুদ্ধিগত ও বস্তুগত অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি যেমন সহায়ক হয়েছে ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, তেমনি গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধকে আশ্রয় করেই মানুষ এই ভৌতজগৎ সম্পর্কে জানতে এবং প্রাকৃতিক নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে।

গণতন্ত্রের মূল স্বীকার্য হচ্ছে মানুষের আত্মসম্মান, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মবিকাশের অন্তহীন সম্ভাবনায় বিশ্বাস, তার স্বাধীনতা ও অধিকার সম্পর্কে আস্থা। যেহেতু এই বৈশিষ্ট্যগুলো ও অধিকারগুলো জন্মগত প্রাপ্তি নয়, যেমনটি আদিম সভ্যতায় ভাবা হতো, বরং মানুষের নিজস্ব অর্জন, যৌথ জীবনসংগ্রাম ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রচেষ্টায়; তাই গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও অধিকারের অবিচ্ছেদ্য উপাদানরূপে স্বীকার করে নিতে হবে মানুষের ওপর অর্পিত একটি দায়িত্ব। এই দায়িত্ব অবহিত হওয়ার ও অবহিত করার, বিশ্লেষণ ও সমালোচনার দৃষ্টিতে উপস্থাপিত তথ্য ও বক্তব্যকে যাচাই করার, দৃষ্টির ও উপলব্ধির স্বচ্ছতা নিয়ে চারপাশের ঘটনাপ্রবাহকে দেখার।

গণতন্ত্রের বিকাশ দীর্ঘকালের মধ্যে ক্রমসঞ্চিত জ্ঞান, ক্রমাগত উন্মোচিত দূরদৃষ্টি, বিভিন্ন জাতি ও দেশের অসংখ্য মানুষের অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র সব ভাবনার পারস্পরিক প্রভাব, মিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটিয়ে। গণতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধারা, এর ব্যাপ্তি, সজীবতা, ক্রমসংশোধিত ও উত্তরিত হওয়ার প্রবণতা গণতন্ত্রকে দিয়েছে এর স্থিতিশীলতা ও সর্বজনীনতা। গণতন্ত্রের যা কিছু ভুল-ত্রুটি, ব্যর্থতা ও বিচ্যুতি তা এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও উদ্ভাবন প্রক্রিয়ারই মূল্য। সব মানুষ সব সভ্যতার সম্মিলিত অর্জনরূপে গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশকে দেখলে অভিযোগের কোনো অবকাশ থাকে না এর বিরুদ্ধে। যদিও ক্রমাগত প্রতিকার ও পরিশোধনের দায়িত্ব থাকে আমাদের সকলের, গণতন্ত্র যেখানে প্রতিহত ও বিপর্যস্ত।

প্রতিদিনের, প্রতিজনের, ছোট-বড় উদ্ভাবন ও অবদান গণতন্ত্রের উত্তরণকে যেমন সাহায্য করছে তেমনি ব্যক্তিমানুষের দায়িত্বহীনতা, অস্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে অথবা অসততায় কুসংস্কার ও অজ্ঞতাকে প্রশ্রয় প্রদান বা লালন গণতন্ত্রের বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। একটি মানুষ বা জাতি জ্ঞানের ক্ষেত্রে, উপলব্ধির জগতে, বিশ্বজগৎকে দেখার স্বচ্ছ দৃষ্টি ও চেতনা সৃষ্টিতে যে অবদান রাখে, সেটাই নির্ধারণ করে সভ্যতার কোন স্তরে তাদের অবস্থান। গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের কার কী দায়িত্ব তা তাই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত আমাদের শিক্ষা ও চেতনার স্তর দ্বারা।

গণতন্ত্রের সূচনা ঘটেছিল বিচ্ছিন্ন একেকটি অপেক্ষাকৃত সম্পদশালী নাগরিক অধিবাসীর মধ্যে, তাদের সীমিত ইচ্ছা প্রকাশের স্বাধীনতায়। দীর্ঘ সময় ধরে সঞ্চিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতার সঞ্চয় মানুষের আত্মবিশ্বাস ও স্বাধীনতাবোধের চেতনাকে ক্রমাগত ব্যাপক ও গভীর করেছে। মানুষের দৃষ্টি যেমন প্রসারিত হয়েছে নিজস্ব ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাড়িয়ে বৃহত্তর পৃথিবীতে, তার কালিক ভাবনাও তেমনি বিস্তৃত হয়েছে অব্যবহিত সময়কে অতিক্রম করে। মানুষের মতপ্রকাশের, প্রত্যাশার ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের যে দিগন্ত, তা একই সঙ্গে বিস্তৃতি ও বহুমাত্রিকতা লাভ করেছে। গণতন্ত্রের বিবর্তন ও উত্তরণকে এই ব্যাপকতর স্থান, কাল ও বহুমাত্রিকতায় উপলব্ধি করতে হবে।

আদর্শ গণতন্ত্র

আমরা যখন কোনো ধারণা, কোনো তত্ত্ব, কোনো স্বতঃসিদ্ধ বা মডেলকে বর্ণনা করি বা কোনো কিছুর সংজ্ঞার্থ নির্ধারণ করি, তখন এদের প্রত্যেকের একটি আদর্শ রূপ আমরা ফুটিয়ে তুলতে চাই—যা বিশুদ্ধ ও নির্ভুল, বাস্তবে তা অর্জনযোগ্য না-ও হতে পারে। কিন্তু আমাদের সমস্ত যুক্তি প্রয়োগ, বিশ্লেষণ ও বিতর্ক সংঘটিত হয় ওই আদর্শ চিত্র বা সংজ্ঞার্থকে সামনে রেখে। ইউক্লিডের জ্যামিতির কথাই ধরা যাক। ইউক্লিডীয় যেসব উপপাদ্য আর জ্যামিতিক প্রমাণ নিয়ে ইউক্লিডীয় জগৎ, যার আলোকে সনাতনী পদার্থবিজ্ঞান ও বিশ্বজগতের বর্ণনা, প্রাকৃতিক নানা নিয়ম ও রহস্যোদ্‌ঘাটন সম্ভব হয়েছে। সেখানে বিন্দু, সরল রেখা, বৃত্ত ইত্যাদি আদর্শ সংজ্ঞার্থ ব্যবহৃত, যদিও রেখা মাত্রই একমাত্রিক, ফলে প্রস্থহীন। বিন্দুমাত্রই বিস্তারহীন, এবং বৃত্ত আদর্শ এক বিন্দুর গতিপথ যা একটি আদর্শ বিন্দু থেকে সমান দূরত্ব বজায় রাখে। বাস্তবে যদিও ইউক্লিডের আদর্শ বিন্দু, রেখা বা বৃত্ত আমরা আঁকতে পারি না এবং সেই অর্থে এদের প্রকৃত অস্তিত্ব নেই। তবু ইউক্লিডীয় বিশুদ্ধ জ্যামিতিক সংজ্ঞার্থকে ভিত্তি করে ইউক্লিডীয় জগতের কাঠামো সৃষ্টি এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহ-নক্ষত্র ও সমস্ত বস্তুকণার গতিপথ ও চলাচলের নিয়ম আবিষ্কার ও বর্ণনার মধ্যে কোনো অযৌক্তিকতা নেই। এই ধারণা থেকেই আমরা গণিতকে নির্ভুল ও বিশুদ্ধ এবং বিমূর্ত জগৎরূপে গ্রহণ করতে পারি। বস্তুত বাস্তব জগৎকে নিকটতম কোনো গাণিতিক বিশুদ্ধ চিত্রের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে আমাদের ভৌতজগতের সমস্ত তত্ত্ব ও বর্ণনা অগ্রসর হয়েছে সনাতনী পদার্থবিদ্যায়।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের মূল বৈশিষ্ট্য হলো বিশুদ্ধ গাণিতিক চিত্র বা আদর্শ প্লাটোনিক ভাবনার প্রতিচ্ছবিরূপে বাস্তব জগৎকে বর্ণনা করা নয়, বরং অভিজ্ঞাত, পরীক্ষালব্ধ যে বাস্তব জগৎ তাকে বর্ণনার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক সব ধারণা ও গাণিতিক যুক্তির অবতারণা করা। এভাবেই আপেক্ষিকতার তত্ত্বে নিউটনীয় পরম সময় ও ঘটনার যুগপত্তা বর্জিত হয়েছে। কোয়ান্টাম তত্ত্বে এসেছে অনিশ্চয়তার বিধি। কার্যকারণ সম্পর্ক হারিয়েছে এর মৌলিক ভিত্তি। তরঙ্গ ও কণিকার ধারণা এদের সুস্পষ্ট অর্থের সীমানা হারিয়ে জন্ম দিয়েছে নতুন সম্পূরকতার ধারণার। মহাবিশ্বের বর্ণনায় ইউক্লিডীয় জ্যামিতি প্রতিস্থাপিত হয়েছে নন-ইউক্লিডীয়

জ্যামিতির দ্বারা। প্রশ্ন হলো, গণতন্ত্রের কোনো আদর্শ সংজ্ঞার্থ আছে কি না? অথবা কোনো মৌলিক অপরিবর্তী আদর্শ কিছু ধারণার ভিত্তিতে গণতন্ত্রকে বর্ণনা করা যায় কি না? আসলে গণতন্ত্রের কোনো পূর্বনির্ধারিত সংজ্ঞার্থ নেই যাকে আমরা গণতন্ত্রের আদর্শ রূপ বা বিশুদ্ধ গণতন্ত্র বলতে পারি। কিন্তু গণতন্ত্রের একটি বাস্তব দিক আছে যা পরিবর্তী ও বিকাশমান। গণতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ চিত্র বা আদর্শরূপ বর্ণনা করা সম্ভব না হলেও এর মূলনীতি, এর বৈশিষ্ট্য ও বিকাশের ধারাকে চিহ্নিত করা, এমনকি গুণগতভাবে বর্ণনা করাও সম্ভব। গণতন্ত্রের পরম সংজ্ঞার্থ না দিতে পারলেও কোন গণতন্ত্র অধিকতর অগ্রসর তা নির্ধারণযোগ্য। বাস্তবে এমন ঘটনা বা পরিস্থিতির আরো দৃষ্টান্ত আছে। যেমন কোনো বস্তুর পরম ভর বা তাপমাত্রা অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারণ করা সম্ভব না হলেও ভর ও তাপমাত্রার তুলনা অনেক সহজরূপে করা সম্ভব।

গণতন্ত্রের অর্থ ও লক্ষ্য উদ্‌ঘাটনে এই উপলব্ধিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, গণতন্ত্রের কোনো আদর্শ রূপ ওপর থেকে দেওয়া নয়, এটা কোনো স্বর্গীয় ধারণা নয় অথবা কোনো মহান ব্যক্তির আবিষ্কার বা উদ্ভাবন। গণতন্ত্রের সংক্ষিপ্ততর পরিচয় হলো, একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে যৌথ জীবনে আবদ্ধ জনগণ তাদের জীবনধারা তারা নিজেরাই নির্ধারণ করবে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় বিধিমালা সম্মিলিত মতামতের ভিত্তিতে প্রণীত হবে। এই মতামত কতটা নির্ভুল, সবার জন্য কতটা কল্যাণকর, সবার প্রতি কতটা সুবিচার এবং সবার স্বাধীনতা কতটা সংরক্ষণ করল বিশেষ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়, সেটাই নির্ধারক গণতন্ত্রের অগ্রগতির। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাই একটি মূল লক্ষ্য আছে বা স্পিরিট, যেখানে জনগণ সম্মিলিতভাবে তাদের জীবনযাত্রা, তাদের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারে। যে বিশ্বাসটি এখানে কাজ করে তা হলো, মানুষ নিজেকে পরিচালনার মতো যথেষ্ট যোগ্যতা ও বিচার-বুদ্ধির অধিকারী। অধিকারী না হোক অন্তত সেই সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ।

মানুষের সিদ্ধান্তে, তার আত্মনিয়ন্ত্রণে, তার স্বাধীন মত প্রকাশে, তার অর্জিত জ্ঞান ও উপলব্ধিতে ভুল থাকতে পারে। কিন্তু তাদের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা, বিচার-বিশ্লেষণ ক্রমাগত শুদ্ধতর জ্ঞান ও উপলব্ধি অর্জনের বিকল্প কোনো উৎস নেই। এখানে একটি বিশ্বাস এবং একটি অবিশ্বাস একই সঙ্গে কাজ করে। বিশ্বাসটি আত্মশক্তি, যৌথ বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে শুদ্ধতর জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা এবং অবিশ্বাসটি হলো বাহ্যিক, অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক কোনো জ্ঞান বা নীতির অস্তিত্ব। গণতন্ত্র তাই একটি প্রক্রিয়া যৌথ জীবনের, যা মানুষ উদ্ভাবন করেছে সভ্যতার দীর্ঘ পথ অতিক্রমণের ভেতর দিয়ে। বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে, টিকে থাকার সংগ্রামে, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার পথ ধরে অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, প্রকৃতির নিয়ম ও মানুষের প্রকৃতি উদ্‌ঘাটনের ভেতর দিয়ে অর্জিত আত্মবিশ্বাসে মানুষ একটি স্তরে গিয়ে

জেনেছে। এই বিচিত্র প্রতিকূল বিশ্বে একত্রে বাস করা, টিকে থাকা এবং আত্মবিকাশের একটিমাত্র পথ, তা হলো নিজের অভিজ্ঞতা, অভিমত ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের স্বাধীনতা এবং পরস্পরের সঙ্গে তা বিনিময়ের। গণতন্ত্রে অনেকগুলো আপাত-পরস্পরবিরোধী ধারণা কাজ করে। আমরা ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা বলি। অথচ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংখ্যাধিক্যের মতামতের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল রাষ্ট্র পরিচালনা করে; গণতন্ত্রে আমরা সবার সমান অধিকারের কথা বলি। অথচ সংসদে আইন প্রণয়ন করেন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয় রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচি ও প্রতিযোগী প্রার্থীদের যোগ্যতা যাচাইয়েব ভিত্তিতে এবং তা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে। যারা ভোটদাতা তাদের যোগ্যতা, শিক্ষা ও বিচারশক্তি স্বভাবতই অসম। কিন্তু তাদের মত প্রকাশের ও সমর্থনের মূল্য সমমানে যাচাই হয় সবার জন্য একটি ভোট প্রদানের অধিকার থেকে।

কোনো রাজনৈতিক দলের ম্যানিফেস্টো যেখানে নানা কর্মসূচি ধারণ করে, সেখানে কোন কর্মসূচির প্রতি কতটা সমর্থন জানিয়ে কতজন ভোট প্রদান করল তা বিশ্লেষণের সুযোগ নেই স্থূল ভোটগ্রহণ পদ্ধতিতে। একটি বিশেষ সময়ে গৃহীত মতামত যাচাই করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পরিমাপ করা হয়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ক্ষমতায় থাকে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে। এই সময়ের মধ্যে জনগণের মত বদলে যেতে পাবে, সেই সঙ্গে রাজনৈতিক দলের ম্যানিফেস্টোও। গণতন্ত্র যেহেতু কাজ করে বহুত্ব নিয়ে, ফলে এর সমাধান একক বস্তুর কার্যকারণ সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত না হয়ে পরিসংখ্যানগতই হতে হবে।

কোনো বস্তুখণ্ড যখন এর বিভিন্ন অংশের সমাবেশে একত্র থাকে তখন এর গঠনকারী কণিকাগুলোর মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ উভয়ই প্রয়োজন। বিকর্ষণ না থাকলে অণু-পরমাণুগুলোর পারস্পরিক আকর্ষণে ক্রমাগত এদের দূরত্ব কমতে থাকত এবং শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণবিবরে রূপান্তরিত হতো। অন্যদিকে অণু-পরমাণুগুলোর মধ্যে আকর্ষণ না থাকলে এরা পরস্পর থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যেত এবং অখণ্ড বস্তুখণ্ডরূপে কোনো পদার্থকেই আমরা পেতাম না। কিন্তু যেটি মজার ব্যাপার তা হলো, কণিকাগুলোর আকর্ষণজনিত যে শক্তি তা অবশ্যই বিকর্ষণজনিত শক্তির চেয়ে বেশি হতে হবে কোনো অখণ্ড বস্তুতে। তেমনি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিরোধিতার শক্তির চেয়ে দেশপ্রেমেব কারণে ঐক্যের শক্তি অনিবার্যভাবেই বেশি হতে হবে। যখন এই শর্তের ব্যতিক্রম ঘটে, তখনই বিচ্ছিন্ন হয় রাষ্ট্র। যেমন ভেঙে পড়ে কোনো প্রস্তরখণ্ড আকর্ষণ শক্তির ওপর বিকর্ষণ শক্তির আধিপত্যে।

গণতন্ত্রের বিবর্তন ও উত্তরণ

গণতন্ত্র যেহেতু ব্যক্তিস্বাধীনতাকে লালন করে ও প্রশ্রয় দেয়, কোনো বাহ্যিক সহানুভূতি বা সাময়িক অনুগ্রহরূপে নয়, মৌলিক অধিকাররূপে, ফলে গণতন্ত্রের বিকাশ ও উত্তরণ সাধিত হতে হবে এর অন্তর্নিহিত গঠন ও ক্রিয়াশীল বলগুলোর টানাপড়েন ও প্রভাবে। গণতন্ত্রের সূচনা ঘটেছে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে সভ্যতার দীর্ঘ পথ অতিক্রমণের পর। গ্রিসের নগরসভ্যতার পরিবেশে গণতন্ত্রের প্রথম সূচনা ঘটে, যা ২/১ শতাব্দী পর আবার হারিয়ে যায়। রোম ও ইতালির নগরভিত্তিক সভ্যতার আলোকে ছোট ছোট শহরে একধরনের গণতন্ত্র পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সামরিক আধিপত্য ও একনায়কত্বে তা হারিয়ে যায়। দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কিছু কিছু দেশ স্বশাসিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজতন্ত্র বা সেনাতন্ত্র এসে স্বশাসনের এসব প্রচেষ্টা ধ্বংস করেছে। আধুনিক গণতন্ত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রথম রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা শুরু হয় সুইজারল্যান্ডের ফেডারেশন গঠনের ভেতর দিয়ে। এর পরই গণতন্ত্রের পরীক্ষা চলে ডেনমার্কের প্রজাতন্ত্রে।

সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রথম প্রবর্তন ঘটে ইংল্যান্ডে। সেটাও সপ্তদশ শতাব্দীতে। ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে গণতন্ত্রের সূচনা খুব বেশি দিনের পুরোনো নয়। ফলে দেখা যাচ্ছে, সভ্যতার বিকাশে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে নানা উত্থান-পতন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফসলরূপেই গণতন্ত্রের বিকাশ। গণতন্ত্রের ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত গণতন্ত্র সীমিত ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশে এবং সেটাও ছোট শহরগুলোতে আধুনিক নাগরিক সভ্যতার পরিবেশে। রাজনীতি ও স্বশাসন কিছু পরিমাণে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যে প্রচলিত থাকলেও তা ছিল নিতান্তই স্থানীয় রাজধানীভিত্তিক এবং রাষ্ট্র পরিচালনার যে বিষয়গুলো মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হতো তার পরিসর ছিল সীমিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত পণ্ডিত ও দার্শনিকদের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য এমনকি শ্রেয় হলেও বৃহত্তর এলাকার জন্য তা কার্যকর নয়। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মন্টেস্কু, এমনকি রুশো এই ধারণা পোষণ

করতেন যে, বড় এলাকা বা দেশব্যাপী গণতন্ত্রের চর্চা ও গণতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব নয়। এর প্রধান কারণ ছিল, যোগাযোগের ও তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা। গণতন্ত্রের জন্য স্বভাবতই পরস্পরকে নানা প্রয়োজন। এজন্য মনে করা হতো, নির্বাচিত ব্যক্তি বা জনপ্রতিনিধিকে তার সমর্থনকারীরা সবাই চিনবে ও জানবে।

আধুনিক কালে গণতন্ত্রের চর্চা যে বড় দেশ বা বৃহৎ রাষ্ট্রেও সম্ভব তার কারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে এবং শিক্ষা প্রসারের ভেতর দিয়ে যোগাযোগসাধ্যতা ও তথ্যের বিনিময় অনেক দ্রুত ও অনেক বিস্তৃত পরিসরে সম্ভব হয়েছে। গণতন্ত্রের আদর্শ ও গণতন্ত্রের বাস্তবতা, গণতন্ত্রের অধিকার এবং গণতন্ত্রের সুযোগ আসলে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু এরা ভিন্ন উপাদান, গণতন্ত্রের। সুস্থ ও সুন্দর জীবনের জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দক্ষ ও কার্যকর, এমনটি যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হতে পারে আদর্শ গণতন্ত্রের চর্চার ভেতর দিয়ে। এর সপক্ষে বাস্তব প্রমাণও উপস্থাপিত হতে পারে। কিন্তু গণতন্ত্র শুধু একটি পন্থা নয় যৌথ নাগরিক জীবন ও রাষ্ট্র পরিচালনার; যা শুধু এর কৌশলগত দক্ষতা ও কার্যকারিতার কারণেই সমর্থব্য। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সফল, আকর্ষণীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে সবার জন্য কল্যাণকররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে এর ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রমকে যথাযথ এবং দক্ষ করতে হবে নিঃসন্দেহে।

কিন্তু গণতন্ত্রের পক্ষে সমর্থন শুধু রাষ্ট্র পরিচালনার একটি ব্যবস্থারূপে গৃহীত হওয়ার নয় দক্ষতার ভিত্তিতে, বরং গণতন্ত্র যে মানুষের নৈতিক অধিকার আদর্শগতভাবে, সেটি এর প্রধান ভিত্তি। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সামাজিক পশ্চাৎপদতা, অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও অসচেতনতার পরিবেশে বিকল্প নানা অগণতান্ত্রিক ধারা যথা—রাজতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র, একনায়কত্ব, সমাজতন্ত্র বা ধর্মতন্ত্র কখনো কখনো দক্ষতর মনে হতে পারে। প্রাকৃতিক কোনো বাধা অতিক্রম করতে উৎপাদন বা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে জাত্যভিমান বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দাপট প্রদর্শনে অগণতান্ত্রিক নানা পন্থা সামাজিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে। মানুষকে যান্ত্রিকভাবে কঠোর নিয়ম দ্বারা শাসন করে সুশৃঙ্খল, কর্মঠ এবং দক্ষ করা সম্ভব বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যার্জনে।

মিসরের পিরামিড, চীনের প্রাচীর নির্মাণে অসংখ্য শ্রমিকের বাধ্যতামূলক শ্রম নিয়োগ করেই শুধু সম্ভব হয়েছে। নেপোলিয়ন, হিটলার— এরা সেনানায়ক হিসেবে শুধু যুদ্ধে নিয়োজিত অসংখ্য সৈন্য নয়, সাধারণ মানুষদেরও মোহমুগ্ধ করেছে যুদ্ধের দাবানলে আত্মাহুতি দিতে। যান্ত্রিক পেশিশক্তি, বস্তুগত সম্পদ, একনায়কত্বের আধিপত্য, বংশগৌরব, জাত্যভিমান, বর্ণবাদ, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস সবকিছুই মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে খর্ব করে।

মানুষের ভীতি, লোভ, অজ্ঞতা, কুসংস্কারপ্রবণতা, আবেগ ও অধিবিদ্যক

ভাবনাকে ব্যবহার করে তাকে নিয়ন্ত্রণের যে চেষ্টা তা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। মানুষকে বঞ্চিত, শোষিত ও অধীনস্থ করার বিচিত্র যে কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে একমাত্র প্রতিষেধক হলো মানুষের আত্মবিশ্বাস ও আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তিকে জাগ্রত করা এবং সেটা বাইরের অনুশাসন নয়। ভীতি প্রদর্শন বা নীতিবাক্যের প্রচার ও আদর্শের প্রভাব নয়। মানুষের নিজস্ব অর্জিত যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান, বিচারের ক্ষমতা ও বিশ্লেষণী দৃষ্টি ক্রমান্বয়ে অর্জিত তার সম্মিলিত ব্যবহার। ভৌত প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে মানুষের টিকে থাকার যে চ্যালেঞ্জ তারই সমান্তরাল আরেকটি চ্যালেঞ্জ মানবজাতির জন্য, যেখানে নানা ভুল ধারণা, কুসংস্কার ও জড়তার বিরুদ্ধে মানুষের চেতনা, সৌন্দর্য বুদ্ধি, আত্মবিশ্বাস ও সৃজনশীলতাকে বিকশিত করতে হয়। ক্রমসঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ঝুঁকি গ্রহণের ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠা আত্মবিশ্বাস মানুষকে আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি ও স্বাধীনতা দেয়। এই শক্তি ও স্বাধীনতার উৎস মানুষ নিজেই।

বদ্ধমূল নানা ধারণা দীর্ঘদিন ধরে লালিত হওয়ার ফলে সামাজিক অবিচলতা ও জড়তার সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিমানুষের অনুসন্ধিৎসা, প্রশ্নপ্রবণতা, পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সাহসিকতা, ছোট ছোট আলোড়ন সৃষ্টি করে সংস্কারের অচলায়তনে এবং প্রতিহতও হয় সামাজিকভাবে। আনুষ্ঠানিক নিয়ম বা বিধিবদ্ধ, স্থায়ী ও সার্বিক নীতিমালা বা আদর্শ সৃষ্টি করে এই জড়তা অ করা সম্ভব নয়। একটি সহজাত অনির্বচনীয় যে প্রশ্ন, অতৃপ্তি ও মোহমুগ্ধতা, ক কখনো সম্ভাবনার নিয়মে ব্যক্তিমানুষকে আলোড়িত করে, সেটাই সম পরিবর্তনের ও সভ্যতাকে এগিয়ে নেওয়ার চালিকা শক্তি।

গণতন্ত্র যেখানে সব মানুষের নৈতিক অধিকার, তার ভিত্তি এই পরিবর্তনের ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিমানুষের অবদান। সমাজকে টিকিয়ে রাখার কাজে এর ধারাবাহিকতা ও ঐতিহ্যকে অব্যাহত রাখার শক্তি জোগাতে প্রতিটি মানুষকেই শ্রম, বুদ্ধি ও সময় বিনিয়োগ করতে হয়। এই গতানুগতিক শক্তি জোগানের বাইরেও প্রত্যেক মানুষের আরো একটি অবদান আছে তা হলো, সৃজনশীলতায়, বিচারের দৃষ্টিতে, অভিজ্ঞতার আলোকে সমাজকে যাচাই করা। বাহ্যিকভাবে অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীন এই ব্যক্তিমানুষের উন্মুক্ত ভাবনা প্রতি মুহূর্তে বিকল্প নানা পথের ভেতর থেকে একটি পথকে নির্বাচন করে। অসংখ্য মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও নানা ভাবনার সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে একধরনের যৌথ নিয়ন্ত্রণ সমাজ লাভ করে।

মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি, আত্মনিয়ন্ত্রণের এই ক্ষমতা, চিন্তার এই স্বাধীনতা হঠাৎ করে আসেনি। অভিজ্ঞতার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বিকল্প নানাপথ ও ভাবনার গলি পেরিয়ে উত্তরণ ঘটেছে মানুষের স্বাধীনতার। আদি মানুষের অজ্ঞতা ও অসহায়ত্ব মানুষকে যে ভীতি, সংশয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে বন্দী করে রেখেছিল,

সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সমাজে দুটি প্রবণতা প্রশ্রয় পেয়েছে। একটি হলো, আধিপত্যবাদ আর অন্যটি আত্মসমর্পণ। সমাজকে নিয়ন্ত্রণের মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিরূপে দেবতাদের শক্তি ও রোষকে কল্পনা করা হতো। একমাত্র আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ ছিল দৈব শক্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়। কাল্পনিক এই দেবতাদের প্রতিনিধি হয়ে আত্মপ্রচার করেছে ধর্মযাজক ও নৃপতিরা। মনস্তাত্ত্বিক এই অবরোধ, সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ-ক্ষুধা, মৃত্যু ও ব্যাধি মানুষকে ভেতর থেকে এবং বাইরে থেকে পঙ্গু করে রেখেছে দীর্ঘদিন।

সাধারণ মানুষ যেখানে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ভীতি ও সংশয়ের শিকার হয়েছে সেখানে সমান্তরালভাবে চলেছে মিথ্যাচার, ভণ্ডামি ও শোষণের নানা আয়োজন শাসকদের পক্ষ থেকে। এই ধারাকে বজায় রাখার কৌশলরূপে রক্ষণশীলতা ও পশ্চাৎ দৃষ্টি ছিল সহায়ক দর্শন। অতীতকে আকর্ষণীয়, আদর্শ ও উজ্জ্বলরূপে বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎকে অন্ধকার ভয়াবহ ও ভীতিপ্রদ পরিণতিরূপে চিহ্নিত করা হতো। পার্থিব জগৎকে অর্থহীন ও লক্ষ্যহীনরূপে চিত্রিত করার কাজে আরেকটি প্রলোভন যুক্ত হয়েছে যেখানে মরণোত্তর জীবনকে পার্থিব জীবনের বিপরীতে আকর্ষণীয়রূপে দেখানো হয়েছে।

চিন্তার এই অস্বচ্ছতা, মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতা, আত্মপ্রত্যয়হীনতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে অতিক্রম করার একমাত্র পথ হলো বিশ্বজগৎ ও প্রকৃতিকে এর নিজস্ব রূপে আবিষ্কার করা। গ্রিক দার্শনিকেরা দেবতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করলেও তাদের অনেকটা সহজ দৃষ্টিতে ও ভীতিমুক্ত মনোভাব নিয়ে চিত্রিত করার প্রয়াস পান। দেবতাদের আধিপত্য ও প্রভাবকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে প্রতিস্থাপনের চেষ্টা চলে। আধিপত্য ও আনুগত্য এ ক্ষেত্রে দেবতা ও মানুষের মধ্যে যথাক্রমে আরোপিত না করে, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রবদ্ধ জনগণের ওপর তা আরোপ করা হয়। এর ফলে মানুষ অনেকটা স্বাধীনভাবে আপন ইচ্ছায় তার আনুগত্য ও মনস্তত্ত্ব গড়ে তোলার সুযোগ পায়। দেবতাদের তারা অস্বীকার করেনি, কিন্তু বিশ্বজগৎ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রকৃতির যে নিয়ম তা দেবতাদের যথেচ্ছাচার বা খেয়ালখুশির ব্যাপার না হয়ে একটি স্থায়ী বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্য লাভ করে। বিশ্বজগতের এই রহস্য আবিষ্কার ও প্রকৃতির নিয়ম উদ্‌ঘাটন মানুষের সচেতন বুদ্ধিনির্ভর কাজরূপে স্বীকৃতি পায়। বিশ্বজগৎ ও মানবজাতি সম্পর্কে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভবত প্রধান কারণরূপে কাজ করেছে গ্রিক দর্শন ও গ্রিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের উদ্ভবের আড়ালে।

গণতন্ত্রের বিকাশমানতা

সভ্যতার বিকাশে ব্যক্তিমানুষের জীবনধারা, তার কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা ও উপলব্ধির জগৎ যেমন বদলেছে তেমনি তার সমাজবদ্ধ রূপ, যৌথ কর্মসূচি ও প্রত্যাশা, পারস্পরিক প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তিত হয়েছে। কোনো পাত্রের যেটুকু স্থান পানিতে পূর্ণ থাকে; বাকিটা পানির বাষ্প অধিকার করে নেয়। সভ্যতার আদিপর্বে মানুষের অর্জিত বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান ছিল যৎসামান্য, বাকি সবটাই ছিল অধিবিদ্যা, অবাস্তব কল্পনা ও আধ্যাত্মিক চিন্তা দ্বারা পূর্ণ। কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ভৌতিক আচ্ছন্নতা মানুষকে দুর্বল করে রেখেছে যা তাকে অধীনস্থ করার, শাসন করার আনুকূল্য দিয়েছে। মানুষের যেটুকু কল্পনাশক্তি, স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যের আকাঙ্ক্ষা তা রূপ পেয়েছে অতীতের হারিয়ে যাওয়া আদর্শ জীবনচিত্রে।

প্রাকৃতিক সমস্ত দুর্যোগ, রোগ-ব্যাধি ও দুর্ভিক্ষ দেবতার রোষ হিসেবে প্রচারিত হয়েছে, যেখান থেকে মুক্তির পথ হিসেবে প্রলোভন দেখানো হয়েছে স্বর্গলোকের। বিশ্বকে বিভক্ত করা হয়েছে দুই জগৎরূপে, যার একটি হলো এই পার্থিব বাস্তব জগৎ যা ভ্রান্তিপূর্ণ, অশুদ্ধ, বিশৃঙ্খল; ফলে অবাঞ্ছিত ও অসুন্দর। অন্যটি স্বর্গ জগৎ যা সুশৃঙ্খল সুন্দর ও আকাঙ্ক্ষিত, বিশ লাখ বছর আগের বুদ্ধিমান মানুষের উদ্ভব যে সম্ভাবনা তাকে দিয়েছে, বিবর্তনের ধারায় অর্জিত তার মস্তিষ্কের অনন্য গঠনের কারণে, তা আধ্যাত্মিকতা, ভৌতিক ভাবনা, শঙ্কা ও কল্পনার দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হওয়ার বৈশিষ্ট্য যেমন লাভ করেছিল, তেমনি এর মধ্যে নিহিত ছিল বুদ্ধিমান প্রাণীরূপে বিশ্বজগৎকে উপলব্ধি ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের শক্তি লাভের যোগ্যতা। একটি বিপৎসংকুল, ঝঞ্ঝাপূর্ণ, দুর্গম পথ ধরে সভ্যতার অভিব্যক্তি ঘটেছে ধাপে ধাপে।

প্রাথমিক যে সমাজবদ্ধ জীবন মানুষের, সেখানে শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্য, দলবদ্ধভাবে পশু শিকার—এসবই ছিল বাস্তব প্রয়োজনবোধ, সমাজবদ্ধ হওয়ার। একত্রে কাজ করার এ আয়োজনগুলো ছিল স্বভাবতই ক্ষণস্থায়ী। এরই দীর্ঘস্থায়ী ও পরিব্যাপ্তরূপ আমরা দেখতে পাই সমাজবদ্ধ জীবনে ও যৌথ সহযোগিতায়—যখন মানুষ কৃষিকাজ শুরু করেছে, বৃক্ষরোপণ ও পশুপালন শিখেছে এবং স্থায়ী বসবাসের

জন্য গুহার পরিবর্তে গৃহনির্মাণ করেছে। এসব কাজ দীর্ঘতর সময় ধরে যৌথভাবে সম্পন্ন করার প্রয়োজনে, সমাজবদ্ধ জীবনের ভিত্তিকে গভীরতর ও দৃঢ়তর করেছে। পারস্পরিক নির্ভরতা, দক্ষতার স্বীকৃতি, শ্রমের শ্রেণীবিভাগ সমাজকে নির্দিষ্ট গঠন দিয়েছে; হাতিয়ার নির্মাণ ও বিভিন্ন কৃৎকৌশলের উদ্ভাবন মানুষের বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর করেছে।

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ফসলের চাষ করতে গিয়ে মানুষ লাভ করেছে কালিক চেতনা; উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ, জমির সীমা চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি। উৎপাদিত সামগ্রীর বিনিময় করতে গিয়ে মানুষ হিসাব কষতে শিখেছে ও জ্যামিতির ধারণা সৃষ্টি করেছে। এসব যৌথ কাজে নিশ্চয়ই এ ধরনের যোগাযোগ সৃষ্টি, তথ্যবিনিময় ও মত প্রকাশের এবং একধরনের নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল।

গণতন্ত্রের সূচনা বস্তুত ঘটেছে যৌথ জীবনের অনিবার্য ফসলরূপে। কিন্তু প্রাথমিক স্তরে যৌথভাবে কাজ করার ভেতর দিয়ে প্রচ্ছন্ন যে অভিন্ন ইচ্ছার প্রকাশ, তাকেই শুধু একধরনের গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যরূপে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। কোনো সমস্যার সমাধানে নিশ্চয়ই যৌথ পরামর্শ বা সমর্থন প্রয়োজন পড়েছে; অন্তত একই দলভুক্ত মানুষ একত্রে একটি কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে যতক্ষণ বিরোধ সৃষ্টি করেনি, তা ঐকমত্যেরই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু এই ঐক্য ছিল আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। সচেতন ভাবনা বা ইচ্ছা প্রকাশের সুযোগ এখানে ছিল না। সমাজকে নিয়ন্ত্রণের কৌশলরূপে সামজপতিরা একদিকে যেমন অস্ত্র ও পেশিবলের প্রভাবে উৎপাদনশীল মানুষদের ভীতিপ্রদর্শন ও অধীনস্থ রাখার প্রয়াসে কাল্পনিক কিছু ধারণা ও বিশ্বাসকে তাদের ওপর চাপিয়ে দিত। মানুষ কল্পনাপ্রবণ, স্বপ্নবিলাসী, ভীতি ও লোভপ্রবণ বলে, তাদেরকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব ছিল কল্পনার জগৎ সৃষ্টি করে।

মানুষের কালিক চেতনা তাকে অতীত ও ভবিষ্যতের ধারণা লাভের শক্তি প্রদান করে। যেহেতু বর্তমানের কষ্টসাধ্য সংগ্রামের জীবনই তাদের কাছে উপলব্ধ ছিল, ফলে অতীত ও ভবিষ্যতের যা কিছু চিত্র তারা লাভ করত, তা ছিল পুরোটাই কল্পনাপ্রসূত। সুন্দর জীবনের স্বপ্ন বাস্তবে পূরণের কোনো সুযোগ ও সম্ভাবনা যেহেতু ছিল না, তাই এই অতীত ও ভবিষ্যতের জগৎ মানুষ কল্পনায় নির্মাণ করত সেই সব ঘটনা, শক্তির প্রকাশ প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের সমাবেশ ঘটিয়ে, যা তাদের আকাঙ্ক্ষিত ছিল। লোভ ও প্রত্যাশা পূরণে এসব ঐশ্বর্যপূর্ণ কাল্পনিক চিত্র যেমন সহায়ক ছিল, তেমনি ভীতিপ্রদর্শন ও শাসনের জন্য মরণোত্তর নানা শাস্তির চিত্রও কার্যকর ছিল।

লক্ষণীয় যে অতীতের কোনো ভয়াবহ নারকীয় চিত্র ওসব কাল্পনিক বর্ণনায়

পাওয়া যায় না। কারণ ভয় দেখানোর কাজে অতীতের বীভৎস চিত্র সহায়ক নয়। কিন্তু কাল্পনিক ভবিষ্যতের যে চিত্র সেখানে একই সঙ্গে স্বর্গীয় সুখ ও নারকীয় যন্ত্রণার চিত্র আমরা দেখতে পাই। কারণ তা একই সঙ্গে মানুষের লোভ প্রকাশ ও ভীতিপ্রবণতা, তার ওপর প্রভাব রাখতে পারে। মানুষ যে কল্পনাপ্রবণ এবং কাল্পনিক নানা চিত্রে সে যে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে, এটা তার অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা মানুষকে একই সঙ্গে বিভ্রান্ত ও সৃষ্টিশীল হওয়ার সম্ভাবনা দিয়েছে। সুন্দর জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা কখনো কখনো নির্দোষ, বিশুদ্ধ, কাল্পনিক গল্প সৃষ্টি করেছে। যেমনটি আমরা দেখতে পাই শিশুদের জন্য লিখিত নানা কল্পকাহিনিতে। পরির গল্প, ভূতের গল্প, এমনকি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি মানুষের বিশুদ্ধ কল্পনাশক্তির প্রকাশ ঘটায়। কখনো বা সৎ মানুষদের জন্য মরণোত্তর সুন্দর ঐশ্বর্যপূর্ণ জীবনের কাল্পনিক আশ্বাস প্রদান করে সমাজ নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টাও চলেছে। আবার কখনো মানুষকে শোষণের জন্য ভীতি বা লোভ প্রদর্শন করার লক্ষ্যে মরণোত্তর দুঃখ ও সুখের কাল্পনিক চিত্র আঁকা হয়েছে। যে লক্ষ্যেই অতীত ও ভবিষ্যৎকে কল্পনার জগৎরূপে দীর্ঘদিন উপস্থাপন করা হয়ে থাকুক, এ কথা সত্যি যে, মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও নিয়ন্ত্রণসাধ্য জগৎ সীমাবদ্ধ ছিল শুধু বর্তমানকে ঘিরে।

প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কারের ভেতর দিয়ে মানুষ কার্যকারণের ভিত্তিতে ধীরে ধীরে অতীতকে আবিষ্কার করতে পেরেছে। ফলে ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে অতীতের ঘটনাপ্রবাহকে মানুষ অবধারণ করেছে বাস্তবতায় এবং তা বর্তমানের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে অভিন্নতা লাভ করেছে। বিভিন্ন ঘটনার সংযোগ ও সম্পর্ক যৌক্তিকভাবে সৃষ্টি করে এবং লিখিত তথ্যেও প্রত্নতত্ত্ববিদদের উদ্‌ঘাটিত উপাত্তের ভিত্তিতে সভ্যতার একটি বাস্তব ইতিহাস আমরা লাভ করেছি মাত্র অল্পদিন পূর্বে। প্রথম দিকের সমাজবদ্ধ জীবন যেমন বাস্তব ও অবাস্তব জীবনের মিশ্রণ ঘটিয়ে একটি আলো-ছায়ার অস্বচ্ছ জগৎ সৃষ্টি করেছিল মানুষের জন্য, তা ক্রমাগত যৌক্তিক বাস্তব জগতের অংশকে প্রসারিত করে জীবনকে বিজ্ঞানভিত্তিক করেছে। কল্পনা ও প্রেরণা এখনো মানসিক ক্রিয়ারূপে গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল কাজে। কিন্তু কাল্পনিক কোনো ধারণা বা তত্ত্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ভেতর দিয়ে যাচাই করেই মাত্র প্রতিটি কল্পনাপ্রসূত ধারণা মূল্যপ্রাপ্ত হয়।

সমাজ নিয়ন্ত্রণে সভ্যতার প্রথম ধাপে আধ্যাত্মিক ভাবনা ও ধর্মীয় প্রভাব যে গুরুত্ব বহন করত, সেখানে মানুষের বিশ্বাসের জগৎ নৈতিকতার ও প্রেরণার উৎস ছিল প্রধানত অবাস্তব জগৎ, যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও কার্য-কারণের যুক্তিনির্ভর ছিল না। আবেগ, বিশ্বাস, আধ্যাত্মিকতা, আত্মিকতা একটি অস্পষ্ট আচ্ছন্নতা দিয়ে সমাজকে প্রধানত নিয়ন্ত্রণ করত। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ও প্রাকৃতিক জীবনের

প্রয়োগ, নির্মিত নানা হাতিয়ার ও উদ্ভাবিত কৌশল, কর্মরত উৎপাদনশীল মানুষেরা অবশ্যই ব্যবহার করত, কিন্তু এই বাস্তব জগতের সঙ্গে কল্পনার জগতের কোনো সংযোগ ছিল না বলে সমস্ত হাতের কাজকেই অসম্মানজনকরূপে অবমূল্যায়ন করা হতো। সমাজ যেহেতু নিয়ন্ত্রিত হতো ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা এবং ধর্মীয় জ্ঞানের মূল উপাদান ছিল অপার্থিব ও কাল্পনিক জগৎ, ফলে পার্থিব জগৎকে অশুদ্ধ, বিশৃঙ্খল ও ক্ষণস্থায়ীরূপে অবজ্ঞা করেই মাত্র ধর্মযাজকেরা তাদের আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করত সাধারণ মানুষের ওপর। উৎপাদনশীল কর্মী মানুষের মতামত ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রকাশ যতটুকুই ঘটত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, সার্বিক সমাজ নিয়ন্ত্রণে তার প্রভাব ছিল সামান্য, গণতন্ত্র যেখান থেকে সমতার উত্তরণে ক্রিয়াশীল।

গণতন্ত্র ও জনগণের দায়িত্ব

আমরা প্রায়শ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শুধু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোকে দায়ী করে থাকি। দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে সাফল্য ও ব্যর্থতার কৃতিত্ব ও গ্লানি প্রায় সার্বিকভাবে গিয়ে বর্তায় প্রথমত ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ওপর, সেই সঙ্গে অংশত বিরোধী দলগুলোর ওপর। কিন্তু যথার্থ বিশ্লেষণে দেখা যাবে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এমন একটি চক্রাকার ব্যবস্থা যেখানে নিয়ন্ত্রক ও নিয়ন্ত্রিত, শাসক ও শাসিত, উত্তমর্ণ ও অধমর্ণরূপে ভিন্ন দুই দলে বিভাজন করা সম্ভব নয় জনগণকে। নির্বাচনের ভেতর দিয়ে যদি যোগ্যতর রাজনৈতিক দল নির্বাচিত না হয়, সে দায়িত্ব জনগণের ওপর বর্তায়। কোন রাজনৈতিক দল যোগ্যতর, তা পরিমাপের কোনো পরম মাপকাঠি নেই। কারণ, অসংখ্য বিষয়ে অসম গুরুত্ব নিয়ে সংকলিত হয় নির্বাচন মেনিফেস্টো। এই মেনিফেস্টো বা কর্মসূচি শুধু সমর্থনযোগ্য হলেই যথেষ্ট নয়, তা বাস্তবায়নযোগ্য কি না সেটাও বিচার্য। বাস্তবায়নসাধ্যতা আবার নির্ভর করে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা, পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য অর্থাৎ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ভারসাম্য ও পরিপূরকতা, সর্বোপরি সার্বিক পরিকল্পনার প্রতি জনগণের আস্থার ওপর। আর এই আস্থা নির্ভর করে কর্মসূচির প্রস্তাবক রাজনৈতিক দলের সততা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার প্রতি জনগণের বিশ্বাস স্থাপনের ওপর।

প্রত্যেক নাগরিকের বিচার করার ক্ষমতা নির্ভর করে তার শিক্ষা, রুচি, রাজনৈতিক সচেতনতা, মূল্যবোধ ও দূরদৃষ্টির ওপর। ভোটকেন্দ্রে গিয়ে একজন ভোটার ভোট প্রদান করেন বলেই আমরা সাধারণভাবে জানি। আসলে কোনো প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন জানানোর আড়ালে কিছু প্রদান করার নেই, আছে গ্রহণ করার। ভোটদাতা তার ভোটকে নিক্ষেপ করছেন না, বরং বিকল্প নানা প্রার্থীর ভেতর থেকে বা রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতর থেকে বিশেষ প্রার্থী বা দলকে সমর্থনযোগ্য বলে গ্রহণ করছেন। গ্রহণ ও ত্যাগের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। যা দান করা হয় অথবা প্রদান, তার সঙ্গে দাতা বা প্রদানকারীর সম্পর্ক অস্থায়ী এবং তাৎক্ষণিক। কিন্তু যা গ্রহণ করা হয়, তা স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি। কোনো জিনিস প্রদান বা বর্জনের সময়ও একটি বিবেচনা ও বিচার হয়তো কাজ করে।

আমি কোনো প্রার্থীকে তার চাহিদা অনুসারে অর্থ ও পরামর্শ দিতে পারি, সেটা প্রার্থীর কল্যাণের কথা ভেবে, অনুগ্রহ করে বা দয়াপরবশ হয়ে। কিন্তু আমি যখন কিছু গ্রহণ করি, সেটা নিজের মঙ্গল চিন্তা করে, আপন স্বার্থে। যা গ্রহণ করি তা আমার সঙ্গেই থেকে যায় এবং স্থায়ীভাবে প্রভাব বিস্তার করে। দেওয়ার ব্যাপারটা ঋণাত্মক, গ্রহণ করার ব্যাপারটা ধনাত্মক। ভোটকেন্দ্রে গিয়ে কোনো নাগরিক ভোট প্রদানের পর কিছু হারান না বা বিসর্জন দিয়ে আসেন না। বরং একটি অঙ্গীকারের সঙ্গে একটি কর্মসূচি ও পরিকল্পনার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে কিছু অর্জন করেন। প্রতিটি নাগরিকের এই ভোট প্রদানের ভেতর দিয়ে একটি ধনাত্মক ও ইতিবাচক সমর্থন থাকা চাই কোনো কর্মসূচির প্রতি। এর ভেতর দিয়ে সে একটি দায়িত্বও গ্রহণ করে নিজস্ব অবস্থান থেকে এবং তা হলো সচেতন ও সক্রিয়ভাবে আপন দক্ষতা ও কর্মতৎপরতায় তার সমর্থিত কর্মসূচিকে সম্পন্ন করার অঙ্গীকার গ্রহণ। ভোট প্রদান তাই কারো বিরুদ্ধে নয়, বিশেষ কর্মসূচির পক্ষে সমর্থন।

একজন ব্যক্তিমানুষের বা জাতির শিক্ষা, যোগ্যতা ও বিচারশক্তি হঠাৎ করে বদলে দেওয়া সম্ভব নয়। সেটা একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, আয়োজন ও প্রচেষ্টার ফসল। কিন্তু শিক্ষা, চেতনা ও দক্ষতার যে স্তরেই একটি জাতি বা ব্যক্তি থাকুক, সবার বুদ্ধি ও বিবেচনার উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার সুচরম প্রতিফলন ঘটতে পারে—যদি প্রত্যেকে সততার সঙ্গে ইতিবাচকভাবে যাচাই করে যোগ্যতম ব্যক্তি ও দলকে সমর্থন জানায়।

যে বিষয়গুলো ভোটদাতার পক্ষে বিবেচনার, তা হলো—কোন কর্মসূচিগুলো তার বিচারে তার নিজের জন্য সেই সঙ্গে দেশের জন্য কল্যাণকর। কর্মসূচিটি বাস্তবসম্মত কি না, যে ব্যক্তি বা দল বিশেষ প্রস্তাব নিয়ে প্রার্থীরূপে উপস্থিত, সে তার অতীত কর্মকাণ্ডে, তার শিক্ষা, দক্ষতা ও যোগ্যতায়, পরিকল্পনা সম্পাদনে যোগ্য কি না; কতটা সততার সঙ্গে পরিকল্পনা উপস্থিত, পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনার মধ্যে সর্বজনীনতা ও দীর্ঘকালীনতা আছে কি নেই; অর্থাৎ ব্যক্তি, সমাজ ও বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষা, কল্যাণ ও অগ্রগতি সার্বিকভাবে প্রতিফলিত কি না। কালিক বিচারেও অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ধারাবাহিকতা, বিশেষ করে আগামী দিনের প্রয়োজন, প্রত্যাশা ও সম্ভাবনার আলোকে সবকিছুকে যাচাই করতে হবে। ভোটদাতাকে মনে রাখতে হবে, নির্বাচনের ভেতর দিয়ে একটি জটিল পরীক্ষা সম্পাদিত হচ্ছে, যেখানে সব নাগরিকের অভিমত, আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার একটি গণনা ও পরিমাপ চলছে। এই আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন অবশ্য ঘটছে বিভিন্ন দলের নির্ধারিত কর্মসূচি বা ইচ্ছার ছাঁচের ভেতর দিয়ে। ব্যক্তিবিশেষের সামগ্রিক ইচ্ছার সঙ্গে হয়তো কোনো দলের কর্মসূচি হুবহু মিলবে না। ফলে, একটি তুলনামূলক বিচারে মতামত যাচাই বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি

ভোটদাতার দায়িত্ব তাই অত্যন্ত জটিল ও গভীর। নিজেকে বিচারকের আসনে বসিয়েই তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

নির্বাচন তাই একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যেখানে নানা বিষয় সম্পর্কে অসংখ্য মানুষের বিচিত্র মতামত যাচাই করে সবচেয়ে বেশি সমর্থনপ্রাপ্ত কর্মসূচিকে জাতীয়ভাবে গ্রহণ করাই লক্ষ্য। মনে রাখতে হবে, ভোটের সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হলেও এর আড়ালে মূল যে লক্ষ্য তা হলো, জনগণের বিচার-বিবেচনার আলোকে অধিকতর সমর্থিত কর্মসূচি নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা। এখানে একটি অনিশ্চয়তা আছে যা প্রতিটি পরীক্ষার ক্ষেত্রেই থাকে। আমরা ব্যক্তিগতভাবে সততার সঙ্গে বিশেষ প্রত্যাশায় যখন কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করি, তা বাস্তবে সফল হবে কি না পরীক্ষা করেই মাত্র যাচাই করা যায়। আমরা যা করতে পারি তা হলো, অভিজ্ঞতা ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে দক্ষতা ও সততার সঙ্গে এমন একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা, যাতে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা ন্যূনতম হয়। সবার মত যেহেতু এক নয় এবং সঠিক পথ এককভাবে কারো জানা সম্ভব নয়; বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে একেক গুচ্ছ পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে একটি বিশেষ দলের মতকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য তাদের সুযোগ দেওয়া হয় রাষ্ট্র পরিচালনার। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় জনগণের দায়িত্ব খাটো করে দেখার অবকাশ নেই।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোনো রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতা আসতে পারে নানা কারণে, যথা, রাজনৈতিক দলের অদক্ষতা ও অসততা, কর্মসূচির অন্তর্নিহিত ত্রুটি ও অবাস্তবতা, জনগণের নিষ্ক্রিয়তা ও অদক্ষতা অথবা কোনো বাহ্যিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনা। কিন্তু সাফল্য আসতে পারে শুধু একটি শর্তে, যেখানে উল্লিখিত সব উপাদান সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সমন্বিতভাবে কাজ করে। নির্বাচনের সময় একজন ভোটদাতা বাহ্যিকভাবে শুধু একটি প্রতীককে চিহ্নিত করে তার সমর্থন জানায়। কিন্তু এর আড়ালে একটি জটিল হিসাব-নিকাশের প্রক্রিয়া চলার কথা প্রতিটি ভোটদাতার মস্তিষ্কে। ভোটদাতার জটিল কাজটিকে রাজনৈতিক দলগুলো অনেকটা সহজ করে দিতে পারেন তাদের মেনিফেস্টো পরিচ্ছন্ন, স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে উপস্থাপন করে। যে বিষয়গুলো বস্তুনিষ্ঠ, পরিমাপসাধ্য, যুক্তিনির্ভর এবং সবার বোধগম্য, তাকেই শুধু সততার সঙ্গে তুলে ধরা উচিত কর্মসূচিতে। আবেগ, অবাস্তব বিষয়ে অপরীক্ষণযোগ্য বক্তব্য উপস্থাপন, সাম্প্রদায়িকতা, বিদ্বেষ ও মিথ্যাচারের ভেতর দিয়ে কুয়াশা সৃষ্টি ভোটদাতার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ও বিভ্রান্ত করে শুধু। নির্বাচনের মূল লক্ষ্য এবং গণতন্ত্রের জটিল পরীক্ষাটি সেখানে ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

গণতন্ত্র যেখানে সামাজিক পরীক্ষণ : বহুমাত্রিক ও সর্বজনীন

পরীক্ষণ কথাটি ইংরেজি Experimentation শব্দের অর্থ ও বৈশিষ্ট্যকে বোঝানোর লক্ষ্যে এখানে ব্যবহার করছি। সাধারণ অর্থে পরীক্ষা বলতে যাচাই করা বোঝায়। কিন্তু এর বৈজ্ঞানিক অর্থ অনেক বেশি ব্যাপক এবং অনির্দিষ্ট, প্রায় অনির্বচনীয়। পরীক্ষা পরিচালনার কোনো পূর্বনির্ধারিত পদ্ধতি নেই। তথ্যোদ্‌ঘাটনে, কোনো তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ে অথবা নানা মত ও ধারণার মধ্যে সামঞ্জস্য নির্ধারণে পরিচালিত হতে পারে পরীক্ষা। অজানা রহস্যপূর্ণ জগৎ থেকে তথ্যোদ্‌ঘাটনের জন্য পরীক্ষা পরিচালনা হচ্ছে ঘটনা ঘটানো। বিকল্প যে পথ তথ্যলাভের তা হচ্ছে পর্যবেক্ষণ। চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনামালাকে সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে উপাত্ত লাভ এবং তা যৌক্তিকভাবে বিন্যস্ত করার ভেতর দিয়েও আমরা জ্ঞানার্জন করতে পারি। পর্যবেক্ষণ তাই শুধু দেখা নয়, তার চেয়েও সচেতন ও সক্রিয়ভাবে দৃষ্টিকে ব্যবহার করা, বরং বলা উচিত শুধু দৃষ্টিশক্তিকে নয়, আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে প্রয়োগ করে সেই সঙ্গে আমাদের মস্তিষ্ক অর্থাৎ বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন।

সব দেখাই যে পর্যবেক্ষণ নয়, তার বড় প্রমাণ সভ্যতার প্রথম পর্যায়ে দীর্ঘদিন ধরে মানুষ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই শিখেছে এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে; কিন্তু অনেকটা অবচেতনভাবে, যেমনটি ঘটে প্রাণীদের ক্ষেত্রে। অন্ধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়তো তখনো ঘটেছে আকস্মিকভাবে। কিন্তু সেখানে কোনো সচেতন পরিকল্পনা ছিল না। প্রাণীদের তুলনায় মানুষ বরং অনেক বেশি অবাস্তব জগতে বাস করেছে দীর্ঘদিন। কল্পনাশক্তির কারণে অলৌকিক নানা ভাবনা ভেবেছে ও অন্যের কাছে শোনা অনেক কল্পকাহিনি বিশ্বাস করার ফলে বাস্তব ও কল্পনা মিলিয়ে এক অদ্ভুত আলো-ছায়ার জগতে বাস করেছে মানুষ—যার প্রভাব এখনো অব্যাহত। মোহমুক্ত, নিরপেক্ষ, অনুসন্ধিৎসু ও সন্দেহবাদিতাপূর্ণ মানসিকতা নিয়ে বাস্তবতার আলোকে প্রকৃতি, পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও বিশ্বজগৎকে দেখা একটি বড় উত্তরণ বৈদগ্ধ লাভের পথে।

আমাদের শিক্ষা, দর্শন, জ্ঞানার্জন ও পাণ্ডিত্য লাভের ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন

উত্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং তা হলো, আমাদের বিশ্বধারণা কতটুকু বাস্তব অভিজ্ঞতানির্ভর এবং কতটা কল্পনা ও অবাস্তব বিশ্বাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত? স্বভাবতই একটি মিশ্র চিত্র আমরা লাভ করি এবং আমাদের কর্মকাণ্ড, আচরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পরিচালিত হয় সদ্ ও অসদ্ ধারণার এক মিশ্র প্রভাবে। পর্যবেক্ষণকে অতিক্রম করে পরীক্ষার জগতে সভ্যতার যে উত্তরণ তা একটি উচ্চতর দশা পরিবর্তন। মানুষ আশ্চর্য কৌশল উদ্ভাবন করেছে এখানে, যেখানে সে তার কল্পনাশক্তির, তার স্বজ্ঞা ও অনুমান করার ক্ষমতাকে তার পর্যবেক্ষণ করার বাস্তব দৃষ্টির পরিপূরকরূপে ব্যবহার করেছে। সাধারণ সামাজিক জীবনে ভাষার গতানুগতিক ব্যবহারে, সাহিত্য, ইতিহাস দর্শন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষালব্ধ উপাত্ত প্রায়শ ব্যবহৃত হলেও— বিশ্বাস, নীতিকথা, কাল্পনিক ধারণা অবচেতনভাবে মিশে থাকে জ্ঞানের প্রকাশে। এখানে যুক্তি প্রয়োগের ও যুক্তি গ্রহণের প্রক্রিয়ায় পরীক্ষালব্ধ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধির সঙ্গে কাল্পনিক, আদর্শগত ও অনভিজ্ঞাত উপলব্ধির মধ্যে প্রায়শ পার্থক্য করা হয় না।

কিন্তু বিজ্ঞান যেখানে ভিন্ন, মানবিক এসব বিষয় থেকে, সেখানে সব অভিজ্ঞান ও উপলব্ধির ভিত্তি হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতা। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ও অর্জন হলো কল্পনা ও স্বজ্ঞাকে অবাস্তব ও অপ্রয়োজনীয় বলে এখানে বর্জন করা হয় না, অথবা বাস্তবের সঙ্গে অপার্থক্যযোগ্য ও অভিন্ন সত্তা বলে গৃহীতও হয় না। কল্পনা, অনুমান, স্বজ্ঞা, সম্ভাব্য চিত্রে সবকিছুকে ব্যবহার করা হয় যৌক্তিকভাবে তত্ত্বনির্মাণের কাজে। এমনকি গণিতের মতো বিমূর্ত ও নির্বস্তুক ভাষাও বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বাস্তব জগতের স্বরূপ নির্ধারণে। পরীক্ষা তাই পর্যবেক্ষণ থেকে ভিন্ন নানা দিক থেকে।

পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা কোনো ঘটনা ঘটাই না, শুধু ঘটে যাওয়া ঘটনামালাকে সচেতনভাবে প্রত্যক্ষ করে লব্ধ উপাত্তকে সাজাই তথ্যে। কিন্তু পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমরা ঘটনা ঘটাই। কোনো বস্তুকে গরম অথবা ঠান্ডা করে, প্রচণ্ড তাপ, বৈদ্যুতিক বা চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করে, অথবা কোনো দৈহিক রোগীকে পীড়ন করে কিংবা মানসিক রোগীকে বিব্রতকর প্রশ্নের মুখোমুখি করে আমরা যে তথ্যোদ্‌ঘাটন করি সেটি পরীক্ষার একটি দিক। অন্যদিকে টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ ও ইলেকট্রনিক যন্ত্র দিয়ে কোনো বস্তুর আচরণকে সূক্ষ্মতররূপে পর্যবেক্ষণ করাও পরীক্ষার একটি অংশ। যেমন এক্স-রে, থার্মোমিটার বা এনএমআর ব্যবহার করে রোগীর অবস্থা সূক্ষ্মতররূপে পর্যবেক্ষণ ও পরিকল্পিতভাবে সংঘটিত এসব ঘটনা থেকে অর্জিত তথ্য এবং সহজাতভাবে প্রকৃতিতে সংঘটিত ঘটনা থেকে পাওয়া তথ্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। পরীক্ষা এখানে শুধু আমাদের অভিজ্ঞাত ঘটনার জগৎকে বিস্তৃততর করেছে। এর ফলে অনেক অবাস্তব কল্পনা, নীতিকথা ও অন্ধবিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে ভ্রান্ত তথ্য যেখানে দখল করে

ছিল আমাদের বিশ্বচিত্রকে, তথ্য সংগ্রহের পরীক্ষা সেই চিত্রকে অনেক বদলে দিতে পারে বাস্তবতাসমৃদ্ধ করে। এ ধরনের পরীক্ষাকে বলা হয় বেকনীয় পরীক্ষা। যেখানে আরোহণ পদ্ধতিতে পরীক্ষালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় বিশ্বধারণা। কিন্তু আরো একধরনের পরীক্ষা আছে যেখানে কল্পনা, অনুমান স্বজ্ঞা ও যুক্তিকে ব্যবহার করে এবং কিছুটা পুরোনো অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা তত্ত্ব নির্মাণ করি, এবং সেই তত্ত্বকে কখনো প্রত্যক্ষ ও কখনো পরোক্ষভাবে যাচাই করা হয় পরীক্ষার মাধ্যমে। অর্থাৎ নির্মিত তত্ত্ব যে যে ঘটনা ঘটা সম্পর্কে পূর্বাভাস দেয় বিশেষ পরিবেশে, বাস্তবে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করে সেই সব ঘটনা ঘটানো যদি সম্ভব হয়, তাহলে তত্ত্ব উত্তীর্ণ হয় বিশ্বজগতের অঙ্কিত বাস্তব চিত্ররূপে।

মানুষের এই বিশ্বচিত্র বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নির্ভরতার বৈশিষ্ট্য হলো এটি যথাসাধ্য নির্ভুল চিত্র সন্ধান করে বিশ্বজগতের। কিন্তু তা অপরিবর্তী বা চিরন্তন নয়, সাময়িক এবং সংশোধনযোগ্য। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাভিত্তিক তথ্যানুসন্ধান তাই একটি নতুন সংস্কৃতি, যেখানে কাজ করে সংশয়, সৃজনশীলতা, ক্রমাগত সংশোধন ও রূপান্তর। ভৌতবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে এর ভেতর দিয়ে। আমরা সূক্ষ্ম ও গভীর উপলব্ধি অর্জন করেছি বিশ্বজগতের এবং উদ্‌ঘাটিত প্রকৃতির নিয়মের প্রয়োগ দিয়েছে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের বিপুল স্বাধীনতা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাফল্য যার মূলে রয়েছে এই অগ্রগতির নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি। লক্ষণীয় যে, আধুনিক পরীক্ষাপদ্ধতি হচ্ছে ঐতিহ্যগতভাবে প্রাপ্ত জ্ঞান, নানা উপদেশ, পাণ্ডিত্য, প্রচারিত নীতি ও বিশ্বাসভিত্তিক বিশ্বধারণা অতিক্রম করে যে পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানের জগৎ, তারও উন্নততর এক পদ্ধতি বিশ্বজগৎকে জানার ও সভ্যতাকে এগিয়ে নেওয়ার।

জ্ঞানের মানবিক শাখাগুলোতে এবং সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এখনো পাণ্ডিত্য, ঐতিহ্য, নানা বিশ্বাস, আরোপিত নৈতিকতা, অবাস্তব ভাবনা, ভ্রান্ত প্রত্যাশা এবং অপ্রমাণিত ও অপ্রমাণসাধ্য তত্ত্বকথা একত্র হয়ে সামাজিক দৃষ্টি ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করছে। এখানে বাস্তব ও কল্পনা, সদ্ ও অসদ্, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভাবনার মধ্যে পার্থক্য খোঁজার কোনো পদ্ধতি নেই। এর ফলে যোগাযোগের ভাষাও দ্ব্যর্থহীন নয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিকল্প নানা তত্ত্ব ও ধারণা উপস্থাপিত হয়ে থাকে কল্পনা ও অনুমানের ভিত্তিতে। কিন্তু পরীক্ষাপদ্ধতি বিকল্প নানা তত্ত্ব ও ধারণার ভেতর থেকে সঠিকতর ধারণা ও তত্ত্বকে বাছাই করতে সক্ষম।

সমাজবিজ্ঞানেও বিকল্প নানা তত্ত্ব ও ধারণার মধ্যে কোনটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য তা নির্ধারণ করার দুটি পথ খোলা আছে। একটি হলো যুদ্ধবিগ্রহ, বলপ্রয়োগ ও আধিপত্য বিস্তারের ভেতর দিয়ে একটি বিশেষ তত্ত্ব, মত বা ধারণা সবার ওপর চাপিয়ে দেওয়া। অন্যটি হলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যুক্তিপ্রয়োগ, বিশ্লেষণ ও যাচাই-প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে বিকল্প নানা তত্ত্ব ও ধারণার ভেতর থেকে সঠিকতর

তত্ত্বটি নির্বাচন করা। গণতন্ত্রের আধুনিকতম রূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাছাই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে সঠিকভাবে পথ নির্বাচনে প্রয়াসী। আধুনিক গণতন্ত্র শুধু সংখ্যাধিক্যের সমর্থন লাভের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপরিচালনার কথা নয়; এখানে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্র, যথা শিক্ষা, শিল্পায়ন ও প্রশাসন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও নৈতিকতার বিকাশে বিকল্প নানা মতবাদ ও তত্ত্বের ভেতর থেকে সঠিকতর তত্ত্ব ও ধারণাকে বাছাই করতে হলে একটি পরিচ্ছন্ন, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ পরীক্ষা চাই। এ জন্য প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মতোই তথ্যভিত্তিক যৌক্তিক কাঠামো সৃষ্টি, যা মানুষের চাহিদা ও প্রত্যাশার প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্জনযোগ্য ও প্রমাণসাধ্য পূর্বাভাস দেবে।

জনগণ সেই প্রস্তাবিত উন্নয়ন পরিকল্পনার যথার্থতা যাচাই করবে প্রস্তাবকারী দলের দক্ষতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, পরিকল্পনার অর্জনসাধ্যতা এবং তাদের প্রত্যাশার সঙ্গে এর সামঞ্জস্যতায়। স্বভাবতই এখানে একটি ঝুঁকি আছে ও অনিশ্চয়তা, রাজনৈতিক দলের দিক থেকে এবং জনগণের দিক থেকেও, যেমনটি থাকে যেকোনো তত্ত্বের ক্ষেত্রে। পুরোনো অভিজ্ঞতা, উপাত্ত, পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য, সৃজনশীলভাবে যুক্তি ও স্বজ্ঞার প্রয়োগে যে তত্ত্ব সৃষ্টি হয়, তার সঠিকতা যাচাই হতে হয় পরীক্ষার মাধ্যমে। কিন্তু ব্যয়বহুল পরীক্ষা পরিচালনার আগে তত্ত্বের যৌক্তিক কাঠামো এবং তা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে আস্থা স্থাপিত না হলে পরীক্ষাটি কেউ পরিচালনা করে না। এর পরও একটি অনিশ্চয়তা থেকে যায় পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রস্তাবিত পরিকল্পনা ও অভিক্ষিপ্ত কর্মসূচির ক্ষেত্রে কিছুটা অনিশ্চয়তা অনিবার্যভাবেই থেকে যায় প্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এবং একে গ্রহণকারী জনগণের পক্ষ থেকেও।

এই ঝুঁকি গ্রহণ ও সাফল্য লাভের অনিশ্চয়তা পরীক্ষাভিত্তিক পথচলার অন্তর্নিহিত ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদিক থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সত্যানুসন্ধান আর গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার সঠিক পথ নির্ধারণ একটি অভিন্নতা লালন করে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাভিত্তিক অগ্রগতির আড়ালে অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি আছে, ভুল করা আছে এবং অপচয়ও আছে—যা অনির্বচনীয়, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে, গতিশীলতায় ও পরিবর্তনীয়তায় অগ্রসর হওয়ার অনিবার্য মূল্য। কিন্তু এখানে চাই সততা, সৃজনশীলতা, চিন্তার উন্মুক্ততা ও আশাবাদ। গণতন্ত্রে পরীক্ষানির্ভর সঠিক পথ নির্ধারণও তেমনি ঝুঁকিপূর্ণ, অনিশ্চিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও চাই সততা, সৃজনশীলতা, স্বজ্ঞা, যৌক্তিক কাঠামো, শ্রম এবং সুন্দর ভবিষ্যতের আশাবাদ। জনগণের শিক্ষা চেতনার স্তর ও বিচারশক্তি, সেই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও সততা নির্ধারণ করে কতটা অপচয় কাটিয়ে সঠিক পথ অনুসন্ধান সম্ভব হবে গণতন্ত্রের পথে।

বিজ্ঞান ও পার্লামেন্ট

জাতীয় সংসদ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান ইঞ্জিন। ইঞ্জিন বললে অর্থটা যথাযথ হয় না। কারণ গণতন্ত্রের চালিকা শক্তি শুধু সংসদের ভেতর দিয়ে সঞ্চারিত ও বণ্টিত নয়; এর পরিচালনা, এমনকি পরিচালনার নীতিও এখানে নির্ধারিত হয়। গণতন্ত্রের মূল বীজ এবং শক্তির প্রবাহ যদিও আদর্শ অর্থে খুঁজে পাওয়ার কথা প্রতিটি নাগরিকের স্বাধীন চিন্তা, মতামত ও সিদ্ধান্তে, বাস্তবে অসংখ্য মানুষের বিচিত্র ও বিভিন্ন মতামতের সম্মিলিত লব্ধি নির্ধারণ ছাড়া মতামতের ভিন্নতা শেষ পর্যন্ত বিশৃঙ্খলা ও হট্টগোলে রূপ লাভ করে। প্রতিটি মানুষেরই মত প্রকাশের জন্মগত অধিকার আছে এবং গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা; এটি একটি নীতি হিসেবে গ্রহণ করাই গণতন্ত্রের একমাত্র ভিত্তি নয়। বস্তুত বিকল্প নানা চিন্তার উপস্থিতি ও ভাবনার ভিন্নতা যে বিস্তৃতি ও অনির্দিষ্টতা দেয় জাতীয় চিন্তা-ভাবনা ও সিদ্ধান্তের, তা অপরিহার্য, প্রগতি ও টিকে থাকার জন্য। এর মূল কারণ, এই পরিবর্তনশীল বিচিত্র ও বিপুল বিশ্বে আমাদের অস্তিত্ব ও বিকাশ এক জটিল প্রতিভাস। অনেকগুলো অনিশ্চয়তা ও ভিন্নতার মধ্যে আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ও বিকাশ লাভের যে সংগ্রাম, সেখানে অভিজ্ঞতা অর্জন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ক্রমাগত ভুল সংশোধন অপরিহার্য। আমাদের অবস্থান ব্যাপক স্থানের মধ্যে, বিস্তৃত কালের মধ্যে, অসংখ্য মানুষের মধ্যে। নানা অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, বিচিত্র সব ঘটনার অভিঘাত, প্রত্যাশা ও আশঙ্কার বৈচিত্র্য প্রতিটি মানুষকে ভিন্নতা দিয়েছে তার অভিজ্ঞানে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে।

ফলে বিতর্ক, বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা ক্রমাগত সৃষ্টি করেছে বিশৃঙ্খলা। এই বিভিন্নতার মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি, এবং বিভক্ত নানা দৃষ্টিভঙ্গিকে অভিসারী বা একমুখী করার যৌক্তিক কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে, নানা স্থূল ও বর্বর শক্তি প্রয়োগের পথ সমাজ বেছে নিয়েছে। দীর্ঘদিন একনায়কত্ব, রাজতন্ত্র, সমরতন্ত্র, আধিপত্যবাদ—এ সবই সেই স্থূল ও বর্বর পদ্ধতির অভিব্যক্তি ঘটিয়েছে। গণতন্ত্র যে এসব কিছু থেকে ভিন্ন ও বিকল্প এক পথ হতে পারে সমাজ পরিচালনার, সেখানে মতের ভিন্নতা অবদমিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়ার বিপরীতে মূল্যপ্রাপ্ত ও সমন্বিত হতে পারে, তা এক গভীর ও বিপ্লবাত্মক ধারণা। এর আড়ালে গুরুত্বপূর্ণ একটি আবিষ্কার আছে, আছে একটি উপলব্ধি; তা হলো আমাদের চিন্তার ভিন্নতা জীবনধারার বৈচিত্র্য,

অজ্ঞতা ও পরিবর্তনশীল বিশ্বে ক্রমাগত অভিযোজন-প্রক্রিয়ায় টিকে থাকার পথে শুধু সহায়ক নয়, অত্যাবশ্যকও।

প্রকৃতিতে প্রাণীদের টিকে থাকার ও অভিব্যক্তি লাভের যে বিবর্তনের ধারা, সেখানে ক্রমাগত একটি বিকিরণ প্রক্রিয়া চলছে। এই বিকিরণের অর্থ হলো প্রতিটি প্রজাতি হুবহু এক না হয়ে সামান্য ভিন্নতা লাভ করছে। এটা অবশ্য ঘটছে বাহ্যিক কোনো শক্তিকণিকা যথা গামারশ্মির প্রভাবে একই প্রজাতির জিনের গঠনে কিছুটা বিচ্যুতি ঘটার ফলে। আপাতদৃষ্টিতে এটি অবাঞ্ছিত মনে হতে পারে। কারণ এই বিচ্যুতি বেশি হলে মৃত্যু বা অবলুপ্তি ঘটতে পারে প্রাণীবিশেষের। কিন্তু সব পরিবর্তনই প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে না; অনেক ক্ষেত্রে অনুকূলতা এনে দেয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ যেহেতু পরিবর্তনশীল এই বিকিরণ, অর্থাৎ বিশেষ প্রজাতির মধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টির ভেতর দিয়ে, ফলে বৈশিষ্ট্যের বিচ্যুতি অভিযোজন প্রক্রিয়াকে সহায়তা দেয়। পুরো ব্যাপারটি যেন প্রাকৃতিক এক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধরে অগ্রসর হওয়া।

বিখ্যাত নোবেল বিজয়ী এক পদার্থবিজ্ঞানী আলোর সরল পথে চলাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, আলো যে সংক্ষিপ্ততম পথ বা সরল পথ বেছে নেয় তা কেমন করে সম্ভব? অবশ্যই এ আলোর কণিকাকে এর আশপাশের পথকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে যাচাই করে বেছে নিতে হবে কোনটি সংক্ষিপ্ততম পথ। অর্থাৎ আলোকে সরল পথে চলতে হলে এর তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। এই উপমা টেনে বলতে পারি, একটি সমাজ কখনোই পূর্বনির্ধারিত, অপরিবর্তী ও সুনির্দিষ্ট জীবনধারা অনুসরণ করে টিকে থাকতে পারে না। প্রথমত, আমরা জানি না কোন পথটি শুদ্ধতম। প্রতিটি মানুষ মূলত সৃজনশীল বাস্তবতা ও কল্পনা, ঐতিহ্য ও নতুনত্ব, অতীতের ভাবনা ও ভবিষ্যতের প্রত্যাশাকে লালন করে একেকটি জটিল অস্তিত্বরূপে। সমাজ ও বৃহত্তর মানবজাতির টিকে থাকার ও অভিব্যক্তি লাভের একমাত্র পথ হলো, ক্রমাগত অভিজ্ঞতার সমন্বয়, পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ তথ্যের বিশ্লেষণ, চেতনা, মূল্যবোধ এবং প্রত্যাশার অভিযোজন।

সমাজবিজ্ঞানে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জিত ও লব্ধ হওয়ার অনেক আগেই, প্রায় অবচেতনভাবে, বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ বেছে নিয়েছিলেন প্রকৃতির রহস্যোদ্‌ঘাটনে। সংকীর্ণ ও নির্বাচিত ক্ষুদ্র এলাকায় প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ অনুসরণ করে সাফল্য পেয়েছেন, সেটি সমাজবিজ্ঞানেরও পথ; শুধু আরো জটিল, আরো গভীর ও ব্যাপক। বিজ্ঞানীরা সংখ্যায় অল্প, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও বিশেষজ্ঞ হয়ে দীর্ঘ সময় নিয়ে নির্দিষ্ট বিষয়কে নির্বাচন করেছেন গবেষণার জন্য; কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সব মানুষই অন্তর্ভুক্ত ও অংশগ্রহণকারী সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে।

যে বিষয়গুলো আধুনিক রাষ্ট্রের বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি রাখে, তা ক্রমেই ব্যাপক ও বিস্তৃত হচ্ছে। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনুমোদিত সময় অত্যন্ত নগণ্য। ফলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে সবার মতকে মূল্য দিয়ে সর্বজনীন ও সর্বব্যাপী একটি সঠিক পথ গণতান্ত্রিকভাবে নির্ধারণ করা সীমাহীনভাবে কঠিন এক চ্যালেঞ্জ নিঃসন্দেহে। একটি সময় ছিল যখন কৃষি উৎপাদন, শিল্পায়ন, চিকিৎসা, যোগাযোগ— এমনকি শিক্ষা একটি অবিচল প্রতিষ্ঠিত ধারায় চলত পৌনঃপুনিকভাবে। মানুষ তার মূল্যবোধে, ধর্মীয় বিশ্বাসে, নৈতিকতায় অতীতকে ব্যবহার করত প্রমিত আদর্শরূপে।

সংসদে জনপ্রতিনিধি হয়ে যারা সমগ্র জাতির পক্ষ হয়ে সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন শিক্ষা, শিল্প, চিকিৎসা, যোগাযোগ, আবাসন, পরিবেশ, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, নিরাপত্তা, বিচারব্যবস্থা সবকিছুর ব্যাপারে, তাদের সে পথ অবশ্যই হতে হবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার, বিশ্লেষণ, বিবেচনা, সংশ্লেষণ ও সমন্বয়ের। এ জন্য প্রয়োজন যে অভিজ্ঞান, সৃজনশীলতা, দক্ষতা ও সততা, শিক্ষা ও দেশপ্রেম তা প্রথমত সৃষ্টি হতে হবে ব্যাপক ও গভীর শিক্ষালাভের প্রক্রিয়ায় এবং যথাসম্ভব সেই যোগ্য ব্যক্তিদের বাছাই, চিহ্নিত ও নির্বাচিত করার পদ্ধতিতে।

সেই পথ নিঃসন্দেহে দুর্গম ও দুঃসাধ্য এক চ্যালেঞ্জের, অথচ বিকল্প অন্য কোনো পথ নেই এই দ্রুত পরিবর্তনশীল জটিল বিশ্বে। যে খবরটি এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি এবং সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক জনসাধারণের জন্য, তা হলো তার অট্টালিকা নির্মাণের জন্য একজন স্থপতির কাছে তিনি যেতে পারেন, যন্ত্রনির্মাণের জন্য যন্ত্রপ্রকৌশলীর কাছে, বিদ্যুতের জন্য তড়িৎপ্রকৌশলীর কাছে, চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের কাছে, বিশ্বজগতের রহস্য জানতে পদার্থবিজ্ঞানী, গণিতবেত্তা, রসায়নবিদ, জীববিজ্ঞানীর কাছে। কিন্তু সংসদীয় গণতান্ত্রিক ধারায় দেশ পরিচালনায় প্রতিটি নাগরিকের যে দায়িত্ব আপন বিচারশক্তি ও রুচির প্রতিফলন ঘটাবার নির্বাচনের ভেতর দিয়ে, সেখানে কোনো বিশেষজ্ঞ নেই তাকে সাহায্য করার। এক অপার দায়িত্ব এখানে অর্পিত প্রতিটি মানুষের ওপর।

রাজনীতির প্রভাববলয়

রাজনীতি গভীরভাবে সম্পর্কিত সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনধারার সঙ্গে। একত্রে সংঘবদ্ধ হয়ে অনেক মানুষের বসবাস একধরনের নিয়ন্ত্রণ অনিবার্য করে তুলেছে। এই নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া, এর ব্যাপকতা ও অন্তরঙ্গতা স্বভাবতই রূপান্তরিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে একত্রে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জীবনধারার দ্বারা। সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক নানা উপাদান মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত করেছে। খাদ্যোৎপাদন, আশ্রয়সন্ধান, আত্মরক্ষা, চিকিৎসা, হাতিয়ার নির্মাণ—এসব বস্তুগত ও ভৌত প্রয়োজন ছাড়াও শোক, দুঃখ, আনন্দ, উৎসব, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, প্রত্যাশা, অনুসন্ধিৎসা ও সৌন্দর্য বুদ্ধির প্রকাশ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে একটি নির্বস্তুক মানসিক রূপ দিয়েছে। যৌথ জীবনের এই যে বিচিত্র সব সম্পর্ক ও পারস্পরিক আদান-প্র তা কখনো ঘটেছে ক্ষুদ্র পরিসরে, পারিবারিক সম্পর্কে, পেশাগত সহযোগিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে।

আধুনিক নগররাষ্ট্রের উদ্ভবের আগে মানুষের যৌথ জীবন ও পারস্পরিক সম্প অতি ক্ষুদ্র পরিসরে সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ, উৎপাদনব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, যোগাযোগ ও তথ্যের বিনিময় সংকীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাণিজগতের উদ্ভব ও বিবর্তন যেমন এককোষী প্রাণী থেকে শুরু করে বহুকোষী প্রাণী এবং পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত উন্নত প্রাণীতে রূপলাভ করেছে, সভ্যতাও তেমনি ক্ষুদ্র পরিসরে খণ্ড খণ্ড এলাকার বিচ্ছিন্ন জীবনধারা থেকে ক্রমাগত সমন্বয় ও সংযোজন ঘটার প্রক্রিয়ায় ব্যাপকতর, নিবিড়তর সমাজ ও রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছে।

সব ধরনের সংযোগ ও বন্ধনই একধরনের বিনিময় বল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য পারস্পরিক যে নির্ভরতা ও সহযোগিতা, সেখানে বিনিময় ঘটে উৎপাদিত সামগ্রীর, উদ্‌ঘাটিত তথ্যের, অর্জিত জ্ঞান বা উপলব্ধির। মানুষের জীবনযাত্রা যত বৈচিত্র্য ও জটিলতা লাভ করেছে, নতুন সব হাতিয়ার নির্মাণ এবং অভিনব সব কৌশল উদ্ভাবনের ভেতর দিয়ে বিশেষ বিশেষ কৌশল জেনে, নির্বাচিত জ্ঞানার্জন করে সমাজের বিভিন্ন মানুষ যখন পরস্পর থেকে ভিন্ন ও বিশেষ হয়ে উঠেছে, সমাজে তাদের অপরিহার্যতা ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাপক ও দৃঢ় সম্পর্কের

জন্য ভিন্নতা ও পরিপূরকতা একই সঙ্গে প্রয়োজন। উন্নত কোনো জীবের ক্ষেত্রে যেমন স্বতন্ত্র এবং বিশেষ সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকাশ লাভ করেছে বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র এদের নিয়ন্ত্রণ করছে ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভেতর দিয়ে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সমন্বয় রক্ষা করে, আধুনিক রাষ্ট্রও তেমনি নানা কাজে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ ও কর্মীদের পরিচালনা করছে রাষ্ট্রীয় নানা নীতি ও আইনের প্রয়োগে।

একটি আধুনিক রাষ্ট্রে উৎপাদনব্যবস্থা, শিক্ষা, গৃহায়ণ, যোগাযোগ, চিকিৎসা ও জনকল্যাণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক—সবকিছুই দ্রুত পরিবর্তন ও রূপান্তরের ভেতর দিয়ে সাম্প্রতিকতম তথ্য ও জ্ঞানকে আত্মস্থ করতে বাধ্য। এটি ঘটছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি এবং জীবনযাত্রার প্রতিক্ষেত্রে এদের সূক্ষ্ম ও ব্যাপক প্রভাবের ফলে। পুরোনো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একটি দেশের মানুষকে সংঘবদ্ধ বা একত্র করে রাখা হতো অনেকটা বাণিজ্যিকভাবে, কখনো অস্ত্র ও পেশি বলে ব্যবসা-বাণিজ্য, চলাচল ও তথ্য আদান-প্রদানকে নিয়ন্ত্রণ করে। কখনো বা ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা, ধর্মীয় বিশ্বাস, ঐতিহ্য বা জীবনধারার অভিন্নতাকে ঐক্যের ভিত্তিরূপে ব্যবহার করে।

এসবই ছিল নেতিবাচক পদ্ধতি—একটি জাতিকে একসঙ্গে ধরে রাখার। ভিন্ন জাতির প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানো ও যুদ্ধের মনোভাব স্থাপন ছিল আরেকটি কৌশল জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির। স্বভাবতই রাজনীতির ঐক্য ও উদ্দেশ্য এবং এর কর্মপদ্ধতি সীমিত ছিল দেশের প্রতিরক্ষা, আইন প্রয়োগ ও প্রশাসনের মাধ্যমে জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং জনগণের অর্জিত সম্পদ থেকেই রাষ্ট্রের কল্যাণসাধন। জনগণের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর সম্পর্ক ছিল তাই খাজনা দেওয়ার ও খাজান নেওয়ার, শাসিত হওয়ার ও শাসনের, সেই সঙ্গে শোষিত হওয়ার ও শোষণের। রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা, প্রতিরক্ষা এবং জনগণকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ তাই রাজনীতির মূল কাজ বলে বিবেচিত হতো। জনগণের প্রত্যাশাও ছিল সীমিত।

আধুনিক রাষ্ট্র পরিচলনা, সেই কারণে রাজনীতি, গভীর ও ব্যাপকভাবে বদলে গেছে নতুন রাজনৈতিক দর্শন, নতুন আদর্শ বা জনকল্যাণমূলক কোনো ভাবনা থেকে নয়, গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য জনসাধারণের জাগ্রত চেতনা ও সংগ্রাম থেকেও নয়, অন্তত শুধু এসব কারণেই নয়, বরং সভ্যতার অগ্রগতির ফলেই সৃষ্ট একটি অন্তর্নিহিত কারণে। মানবসভ্যতা একটি ক্রান্তিলগ্নে এসে পৌঁছেছে। জ্ঞান সৃষ্টিতে, উৎপাদন কৌশল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, বিশ্বজগতের রহস্যোদ্‌ঘাটনে, দুরারোগ্য কঠিন ব্যাধির নিরাময়ে। পরিবেশ সংরক্ষণে বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সঙ্গে জাতীয় উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনসাধারণের সচেতন অংশগ্রহণ সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা।

রাজনীতির সংজ্ঞার্থ, এর কর্মক্ষেত্র ও প্রভাববলয় আমূলভাবে বদলে গেছে।

আধুনিক কালে ভয় দেখিয়ে, বাধা সৃষ্টি করে, শোষণ ও নিয়ন্ত্রণের পথ ধরে মানুষকে কুসংস্কার ও অলৌকিক ভাবনায় বিভ্রান্ত করার সময় এখন অতিবাহিত; যদিও অনেক রাষ্ট্র এবং রাজনীতিক (!) সেই পদ্ধতি মেনেই চলার চেষ্টা করছে। উপলব্ধি ও জ্ঞানের যে নতুন আলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সৃষ্টি করে চলেছে, সেখানে ভীতি প্রদর্শন ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির যে রাজনৈতিক ভূত—তা অপসৃত হতে বাধ্য। জাগ্রত, সুন্দর জীবনের প্রত্যাশী, কর্মঠ ও স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণই শুধু একটি আধুনিক রাষ্ট্রকে পরিবর্তন ও উন্নয়নের ধারায় দিতে পারে স্থিতিশীলতা। এই স্থিতিশীলতা গতির, স্থবিরতার নয়। রক্ষণশীলতার নয়, সৃজনশীলতার। জ্ঞানের বিকাশমান ধারায় অবগাহন করেই মাত্র একটি জাতি তার মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে পারে। একটি রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মূলত এখন অজ্ঞতার বিরুদ্ধে; কারণ ক্ষুধা, অপুষ্টি, ব্যাধি, শক্তিহীনতা ও অসহায়ত্ববোধের বিরুদ্ধে একটিমাত্র অমোঘ অস্ত্র রয়েছে মানুষের হাতে, তা হলো জ্ঞানের সাধনা। রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক কর্মসূচির পরিধি ও গভীরতা নিয়ন্ত্রণ করছে দ্রুত বিকাশমান জ্ঞানের জগৎ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতি, তথ্যের জগতে সংঘটিত বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন, সেই সঙ্গে মানুষের প্রত্যাশার বিস্ফোরণ। অজ্ঞতার, পশ্চাৎপদতার ও রক্ষণশীলতার কোনো স্থান নেই আধুনিক রাজনীতিতে, যেমন স্থান নেই সেই সব রাজনীতিবিদের যারা আধুনিক জ্ঞান ও উপলব্ধির জগতের অধিবাসী নয়।

গণতন্ত্র ও অর্থনীতি

প্রতিটি আধুনিক সমাজের মধ্যেই রয়েছে গণতন্ত্রের দাবি ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। লক্ষ্য ও আদর্শের দিক থেকে এই দুই ধারণার ভিন্নতা যেমন উপলব্ধির, তেমনি উপলব্ধির এদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও পরিপূরকতার বিষয়টিও। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যেমন গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র, এমনকি সামরিক শাসন, একনায়কতন্ত্র বা রাজতন্ত্রের মধ্যে তুলনা টানতে গিয়ে কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দক্ষতর, তাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে অনেকে। সমাজতন্ত্র অথবা গণতন্ত্রের শ্রেয়ত্ব যাচাই করতে গিয়ে, উৎপাদনশীলতা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, প্রযুক্তির বিস্তার, অর্থনৈতিক সুবিচার ইত্যাদি প্রসঙ্গকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেয়ত্ব যাচাইয়ের মাপকাঠিরূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এ কথা সত্য যে, ভিন্ন দুই ধারণা, ব্যবস্থা বা অস্তিত্বের মধ্যে তুলনা করতে হলে এদের মধ্যে সাধারণ, অর্থাৎ যা উভয়ের মধ্যে উপস্থিত এমন বৈশিষ্ট্য বা উপাদানই শুধু তুলনীয় হতে পারে। যেমন, ভিন্ন দুই প্রাণীর মধ্যে আমরা যদি তুলনা টানতে চাই, তাহলে এদের উচ্চতা, ওজন বা শক্তি এমন সব গুণকে আমরা তুলনা করতে পারি, যা এই ভিন্ন দুই প্রাণীর মধ্যে উপস্থিত। কিন্তু বিশেষ গুণের সমতা অথবা অসমতা দুই প্রাণীর অন্য সব বৈশিষ্ট্যকে তুলনীয় করে না যা উভয় প্রাণীর মধ্যে উপস্থিত নয়।

গণিতের ভাষায় একই সেটের দুই উপাদানের মধ্যে শুধু তুলনা চলে, ভিন্ন ভিন্ন সেটের সদস্যদের মধ্যে তুলনা টানা যায় না। যোগ-বিয়োগের যে নিয়ম এবং সেই কারণে গুণ, ভাগ বা তুলনা টানার যে প্রক্রিয়া আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ঘটছে; সেখানে আমরা সচেতনভাবে লক্ষ করি না যে, গণিতের হিসাবের এই নিয়মগুলো একই সেটের উপাদানের মধ্যে শুধু প্রযোজ্য। যেমন পাঁচটি গরু ও তিনটি ভেড়া যোগ করলে কী হয়? অথবা এদের বিয়োগফল? আসলে গরুর সাথে ভেড়া যোগ করা যায় না অথবা বিয়োগ। যদি গরুকে শুধু প্রাণী বলে চিনি এবং সে কারণে ভেড়াকেও; তাহলে পাঁচটি প্রাণীর সাথে আর তিনটি প্রাণী যোগ করা যায় অথবা এদের সংখ্যার পার্থক্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। আমরা তাহলে দেখতে পাচ্ছি, যেকোনো হিসাবপ্রক্রিয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে সেট বা শ্রেণী নির্ধারণ। গরুকে এর সকল বৈশিষ্ট্যে গরুরূপে সংজ্ঞায়িত করলে তা ভেড়া থেকে

ভিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রাণীর সাধারণীকৃত বৈশিষ্ট্যে গরু এবং ভেড়াকে যদি শুধু প্রাণী বলে চিহ্নিত করা হয়, তখনই মাত্র এদের মধ্যে তুলনা টানা এবং এদের নিয়ে গাণিতিক হিসাব কষা সম্ভাব। এই সংজ্ঞায়নের কাজটি ভাষার এবং হিসাবের কাজটি গণিতের। ভাষা ও গণিতের ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব সুচারুরূপে পালিত হওয়ার পর এদের সমন্বয় ঘটিয়েই কেবল আমরা আমাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির জগতের মধ্যে তুলনা করতে পারি।

গণতন্ত্র একটি রাজনৈতিক অধিকারের ধারণা— রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও প্রাপ্তির। অর্থনীতি একটি ভিন্ন ধারণা ও ব্যবস্থা, যেখানে মানুষের বস্তুগত প্রয়োজনবোধ, উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদিত সামগ্রীর বণ্টন ও বিনিময় অন্তর্ভুক্ত। মানুষের যদি খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, যোগাযোগ ইত্যাদি প্রয়োজন মেটাতে শ্রম ও সম্পদের বণ্টন বা বিনিময়ের প্রয়োজন না হতো, তাহলে অর্থনীতির উদ্ভব ঘটত না। বস্তুত এমন অনেক আদিম সমাজ আছে যেখানে নিজস্ব উৎপাদন, শ্রম বা অভিজ্ঞতার ওপর একান্তভাবে নির্ভর করে মানুষ বাস করতে পেরেছে, যেমনটি এখনো ঘটছে প্রাণিজগতে। এমন কোনো সমাজের অস্তিত্ব যদি আমরা ভাবতে পারি, যেখানে বস্তুগত প্রয়োজনবোধ ও উন্নয়ন-আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত সীমিত অথবা প্রয়োজনীয় সামগ্রীর প্রতুলতা এত বেশি যে চাহিদা মেটাবার জন্য কোনো সামাজিক নীতিমালার প্রয়োজন পড়ে না; সেখানে অর্থনীতি বলে কিছু থাকবে না, কিন্তু এমন সমাজেও রাজনীতির অস্তিত্ব থাকতে পারে, যদি রাজনীতি বলতে সমাজবদ্ধ মানুষের চলাফেরার নিয়ম, মতপ্রকাশের বিধিনিষেধ ও স্বাধীনতা, নেতৃত্ব প্রদান ও যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

বাস্তবে অবশ্য আমরা লক্ষ করি, অর্থনীতি ও রাজনীতি দুটোই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে সমাজবদ্ধ জীবনে ও বিকাশমান সভ্যতায়। প্রতিটি সমাজ একটি জটিল, পরিবর্তী ও বিকাশমান ব্যবস্থা। একই সাথে অস্তিত্ব টিকাবার ও প্রয়োজন মেটাবার সংগ্রামে মানুষকে লিপ্ত হতে হয়েছে প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগের বিরুদ্ধে, যুদ্ধে—ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য, খাদ্যোৎপাদনে, আশ্রয়ের জন্যে গৃহনির্মাণে, আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র তৈরিতে ও ক্রমবর্ধিত আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য উদ্ভাবন ও কৌশল প্রয়োগে। টিকে থাকার এই সংগ্রাম এবং যৌথ জীবনধারার নিয়ন্ত্রণে ও আধিপত্য বিস্তারে নানা বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগ, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও নীতিমালার প্রয়োগ অপরিহার্য ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে।

ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি— এসবই সমাজবদ্ধ মানুষকে নিয়ন্ত্রণের একধরনের অধিবিদ্যা। মানুষ বস্তুগত অস্তিত্বপ্রাপ্ত, জৈবিক গঠনলব্ধ, ক্ষুধার্ত ও আশ্রয়প্রত্যাশী; বস্তুগত নানা প্রয়োজনবোধের শিকার এবং তা পূরণের শক্তি, বুদ্ধি ও যোগ্যতা অর্জনযোগ্য বলেই সে লাভ করেছে বস্তুগত উৎপাদন সামগ্রীর প্রয়োজনবোধ ও তা

মেটাবার দক্ষতা। অর্থনীতির উদ্ভব ঘটেছে এই উৎপাদনশীলতা ও বস্তুগত প্রয়োজনবোধকে মোকাবিলা করার যৌথ ব্যবস্থারূপে।

উৎপাদনশীল ও উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদাপ্রাপ্ত যে অর্থনৈতিক মানুষ বা Economic Man, সে আসলে কোনো যন্ত্র নয়; সে শুধু ভৌত প্রয়োজনবোধ দ্বারা বা উৎপাদনশীলতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। যে মানুষ সৃজনশীল, সৌন্দর্যবুদ্ধি প্রাপ্ত, আবেগপ্রবণ, ভাবুক, আদর্শবাদী, কল্যাণকামী, বন্ধুপ্রিয়, প্রতিযোগী, প্রভাববিস্তারী, ক্ষমতাপ্রত্যাশী ও প্রশংসা-আকাঙ্ক্ষী, তাকে অর্থনৈতিক মানুষ হিসেবে সামগ্রিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়।

এ কথা সত্য যে মানুষের বুদ্ধির বিকাশ, ভাষাপ্রাপ্তি, মত, বিশ্বাস, আদর্শ বা নীতি লাভ সম্ভব হয়েছে ভৌতজগৎকে নিয়ন্ত্রণের জন্য দীর্ঘ সংগ্রামের ভেতর দিয়ে। বস্তুগত সমস্যা মেটাতে গিয়েই মানুষ অর্জন করেছে বুদ্ধি, চেতনা, উপলব্ধি ও বিশ্বধারণা। যৌথ জীবনযাপন করতে গিয়ে লাভ করেছে যোগাযোগসাধ্যতা ও ভাষা। নানা কাজে দক্ষতাপ্রাপ্ত ও নানা উৎপাদনশীলতায় নিয়োজিত যে অর্থনৈতিক মানুষ এবং নানা মতে, নানা বিশ্বাসে, নানা আকাঙ্ক্ষায় ও প্রভাব বিস্তারে মগ্ন যে সমাজবদ্ধ রাজনৈতিক মানুষ—এরা ভিন্ন এদের মৌলিক লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্যে। কিন্তু সামাজিক বিকাশ ও সভ্যতার অগ্রগতির ভেতর দিয়ে অর্থনৈতিক মানুষ যেমন তাত্ত্বিক, আদর্শবাদী, প্রতিযোগী ও প্রভাববিস্তারী হয়ে উঠেছে, অর্থাৎ, রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত, তেমনি ধার্মিক, দার্শনিক ও রাজনৈতিক মানুষ, তাদের প্রভাববিস্তারের, সমাজ নিয়ন্ত্রণের ও নেতৃত্ব লাভের কৌশলরূপে অর্থনৈতিক নানা উপাদানকে ব্যবহার করছে।

এর ফলে, ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে বিকাশ লাভ করলেও অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যে প্রাবরণ ঘটেছে বা উপরিপাতন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে হলে সমাজবদ্ধ মানুষকে উদ্বুদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা এবং সেই কারণে মতামত গ্রহণ ও বিভিন্ন মতের সমন্বয় ঘটাবার ব্যবস্থারূপে, গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধরে। অন্যদিকে শিক্ষা প্রদান, যোগাযোগসাধন, যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি, রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি—এসব কিছুর জন্যই প্রয়োজন অর্থনৈতিক ভিত্তি ও উৎপাদনশীলতা। আধুনিক রাজনৈতিক মানুষ তাই হয়ে উঠছে অর্থনৈতিক মানুষ এবং একইভাবে অর্থনৈতিক মানুষ হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক। কিন্তু কখনোই এই দুই বৃত্ত বা দুই সেট অভিন্ন ও একীভূত হয়ে উঠবে না। ক্রমবিকাশের ভেতর দিয়ে রাজনীতি ও অর্থনীতির বিস্তারমান দুই বৃত্ত একই সাথে অধিক প্রাবরণ যেমন ঘটাবে, তেমনি পরস্পর থেকে ভিন্ন এমন এলাকার বৃদ্ধি ঘটবে, দুই বৃত্তের জন্য।

গণতন্ত্র ও নেতৃত্ব

একটি বিতর্কিত প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে দার্শনিক, ইতিহাসবেত্তা ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিয়ে। যেসব রাজনীতিবিদ তাদের নেতৃত্বে ব্যাপক ও গভীর পরিবর্তন এনেছেন রাজনৈতিক ধারায়, তারা কি আসলে ইতিহাস স্রষ্টা অথবা ইতিহাস তাদের সৃষ্টি করেছে? গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এ প্রশ্নটি আরো গভীরভাবে উত্থাপিত হয়ে থাকে; কারণ এই ব্যবস্থায় নেতা হিসেবে যার উদ্ভব ঘটে তিনি সাধারণ মানুষের একজন। একজন জননেতা জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে সমান অধিকারপ্রাপ্ত এবং জনসাধারণের মতামত দ্বারা প্রভাবিত। তার পক্ষে সবার চেয়ে ভিন্ন ও অসাধারণ কেউ হয়ে ওঠা প্রত্যাশিতও নয়, গণতান্ত্রিক আদর্শে এমনটি ভাবাই স্বাভাবিক। সব শক্তির উৎস জনগণ, এই ধারণার মধ্যে একটি ইঙ্গিত থাকে যে, একজন রাজনৈতিক নেতার ক্ষমতা ও আধিপত্য একজন নৃপতি বা একনায়কের তুলনায় কম।

রাষ্ট্রপরিচালনায়, রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধনে ও সামগ্রিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় জনগণের অবদান ও গুরুত্ব যত বেশি বৃদ্ধি পাবে, সেই অনুপাতে নেতৃত্বের গুরুত্ব ও আধিপত্য হ্রাস পাবে—এটাই সাধারণভাবে অনেকে মনে করেন। অথচ বাস্তবে আমরা লক্ষ করি একটি জাতির উদ্ভবে, এর স্বাধীনতা অর্জনে, অগ্রগতি ও সাফল্যে, জননেতার প্রভাব, খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। ইতিহাস রচনায় জনসাধারণ পরিসংখ্যানের মধ্যে প্রায়শ হারিয়ে যায়। যাদের সাফল্য ও কৃতিত্ব এমনকি যাদের ব্যর্থতা ও কুকীর্তি ইতিহাসে স্থায়ীভাবে স্থান পায় এবং যাদের দায়ী করা হয় রাজনৈতিক সাফল্য ও ব্যর্থতার জন্য, তারা রাজনৈতিক নেতৃবর্গ। রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি গুরুত্ব প্রদান কি অনবধানতাজনিত? ইতিহাসবিদদের ভুল বিচার এবং অযৌক্তিক পক্ষপাতিত্বের ফসল?

ইতিহাসের ঘটনার আড়ালে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অবদান যাতে বড় হয়ে দেখা না দেয় সেই লক্ষ্যে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি বিমূর্ত ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ নানা ধারণার প্রবর্তন ও প্রচারে উচ্চকণ্ঠ হয়েছেন। যেমন, আমরা জাতি, সমাজ, বিপ্লব, প্রগতি, জনগণের ইচ্ছা, কালিক চেতনা, ইতিহাসের ঘটনা ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগের ভেতর দিয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে আড়াল করার প্রচেষ্টা চালাই। ইতিহাসের

নিশ্চয়তা বা কার্যকারণের অনিবার্যতায় যারা বিশ্বাসী তারা রাজনৈতিক মহান নেতাদেরও নিছক ইতিহাসের দাসরূপে গণ্য করেন অথবা নিষ্ক্রিয় পুতুলরূপে। এদের মতে, ঘটনাপ্রবাহ ও ইতিহাসের কার্য-কারণ সম্পর্কের অনিবার্যতা সময়ের প্রয়োজনে নেতা সৃষ্টি করে—যারা নিছক প্রতীক বা লেবেলমাত্র, যা কৃত্রিমভাবে ইতিহাসের বড় ঘটনার গায়ে এঁটে দেওয়া হয়। কিন্তু মূল ঘটনাপ্রবাহের ওপর এদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ নগণ্য। ইতিহাসের এই নির্ণেয়বাদ নানা রূপ নিতে পারে। যেমন মার্ক্সবাদে এটি হলো শ্রেণীসংগ্রামের নিশ্চয়তা। ইতিহাসবিদ টয়েনবির কাছে নেতা হচ্ছে সভ্যতার উত্থান-পতনের অনিবার্য ঘটনাপ্রবাহের ক্রান্তিলগ্নের পুতুল। এমনকি মুক্তবাজার অর্থনীতিতে কোনো নেতার উত্থান-পতন, নির্ধারিত বাজারজাত সামগ্রীর জোগান ও চাহিদা এবং বিনিময় মূল্যের ওঠানামার ফসল।

এই সব যুক্তি ও আদর্শবাদ, ব্যক্তিমানুষ ও সাধারণ নাগরিককে গুরুত্ব দিতে গিয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অস্বীকার করতে চেয়েছিল বটে; কিন্তু মানুষের সৃজনশীলতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা এতে খর্ব হয়েছে এবং সভ্যতাকে একটি যান্ত্রিক নিশ্চয়তার ও কার্যকারণের ফসলরূপে দেখানো হয়েছে। এঙ্গেলস বলেছিলেন, নেপোলিয়নের অনুপস্থিতিতে আর কেউ তার স্থান দখল করত। টলস্টয়, হার্বার্ট স্পেন্সার এবং এদের অনুসারী অনেকেই ইতিহাসের মহান নেতাদের অস্বীকৃতি জানিয়েছেন নানাভাবে। কখনো সাধারণ মানুষের আসনকে উঁচুতে স্থাপনের যুক্তিতে নেতৃত্বকে অস্বীকার করেছেন। কখনো ইতিহাসের ঘটনাকে কার্যকারণের অনিবার্য ফসলরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে নেতৃত্বের অবদান ও গুরুত্বকে অবমূল্যায়ন করেছেন। ইতিহাসের সমস্ত ঘটনাকে একান্তভাবে কালের ফসলরূপে দেখাতে গিয়ে অগ্রাহ্য করেছেন নেতৃত্বের ভূমিকাকে। যেমন টলস্টয় তার বিখ্যাত উপন্যাস War and Peace-এ প্রশ্ন তুলেছেন, কেন মানুষ তাদের অনুভূতি, বিচারশক্তি ও মানবিকতাকে হারিয়ে ক্রমাগত হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে ইউরোপে? আবার নিজেই তার জবাব দিচ্ছেন এইভাবে— যুদ্ধ ঘটছে কারণ যুদ্ধ ঘটতে বাধ্য, এটি ইতিহাসের অনিবার্যতা। সভ্যতার বিকাশে ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণে মানুষের যে শক্তি আছে, সেই সঙ্গে স্বাধীনতা, অধিকার ও দায়িত্ববোধ— এই উপলব্ধি ও প্রেরণা আমরা হারিয়ে ফেলি, যখন নেতৃত্বকে অস্বীকার করতে গিয়ে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও স্বাধীনতাকেই আমরা হারাই।

আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে এ কথা কখনোই গ্রহণযোগ্য মনে হয় না যে, আব্রাহাম লিংকন, শেক্সপিয়র, নিউটন, আইনস্টাইন এমনকি নেপোলিয়ন, হিটলার যদি না আসত অথবা শিশুকালে মৃত্যুবরণ করত, তাহলে অনিবার্যভাবেই তাদের স্থান তাদেরই অবিকল অনুরূপ কেউ এসে পূরণ করত। আসলে সনাতনী পদার্থবিজ্ঞানের যান্ত্রিক কার্য-কারণের সম্পর্ক ও নির্ণেয়বাদকে অবলম্বন করে বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহকে ব্যাখ্যা করার যে ধারণা তা যেমন আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের বিধির

আলোকে ভ্রান্ত, তেমনি আমাদের সর্বজনীন মানবিক চেতনার আলোকে অগ্রহণযোগ্য।

নেতৃত্ব হচ্ছে সেই দক্ষতা যা জনগণকে অনুপ্রাণিত করে, সংঘবদ্ধ করে এবং উদ্দীপিত করে আত্মবিশ্বাস, কর্মতৎপরতা ও সৃজনশীলতায়। নেতৃত্বের মহত্ত্বকে খাটো করে দেখে সাধারণ মানুষের আসনকে উঁচু করা যায় না। কারণ একটি সম্ভাবনার নিয়মে ব্যক্তিমানুষের মধ্যে নিহিত শক্তি আত্মপ্রকাশ করে সার্থক জননেতার ভেতর দিয়ে।

জড় জগতেও আমরা দেখতে পাই, পরমাণুর সুশৃঙ্খল বিন্যাসে একটি কেলাস যে সৃষ্টি হয় তা সম্ভব করে তুলতে হলে বীজরূপে একটি ক্ষুদ্র কেলাসের প্রয়োজন পড়ে। জীবনের উদ্ভব যে ঘটেছিল প্রথম ডিএনএ অণু সৃষ্টি হওয়ার ভেতর দিয়ে, সেটাও একটি সম্ভাবনার নিয়মের অভিব্যক্তি। কোটি কোটি বছর ধরে অণুদের এলোমেলো ছোটাছুটির ভেতর দিয়ে একটি বিন্যস্ত ডিএনএ অণু যখন সৃষ্টি হলো, তখনই সম্ভব হলো জীবনের বিকাশ। একটি বিশৃঙ্খল লক্ষ্যহীন জাতিও যথার্থ নেতৃত্বের উদ্ভাবনী চিন্তা, লক্ষ্য নির্ধারণ ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টির প্রভাবে জেগে ওঠে। ডিএনএর প্রতিসাম্যের নিয়ম মেনেই যেমন অণুগুলোকে বিন্যস্ত হতে ও পৌনঃপুনিকভাবে জীবন সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের এলোমেলো ভাবনা তেমনি একটি সুশৃঙ্খল ভাবনা, একটি ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও অনুপ্রাণিত কর্মতৎপরতা লাভ করে যথার্থ নেতৃত্বকে গ্রহণ করে।

গণতন্ত্র কোন পথে?

গণতন্ত্রের সংজ্ঞার্থ নিয়ে বিতর্ক, গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়ে মতপার্থক্য এবং গণতন্ত্রের চর্চা ও বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। অনেকের কাছে গণতন্ত্রের এই অনিশ্চিত রূপ ও পরিবর্তনশীল ধারা গণতন্ত্র সম্পর্কে অতৃপ্তির অনুভব সৃষ্টি করে। স্বভাবতই মানুষ একটি নির্ভুল, নিশ্চিত আদর্শের অভিব্যক্তি দেখতে চায় সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রীয় নীতিমালায়। নির্ভুল ও অপরিবর্তী সত্য উদ্‌ঘাটন বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও ধর্মযাজকদের লক্ষ্য বলে আমরা জেনে এসেছি। আমাদের সামাজিক আচরণে ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কল্পিত এই বিশুদ্ধ, নির্ভুল ও চিরন্তন নীতিমালা প্রত্যাশিত সাধারণ্যে। বস্তুত প্রকৃতি ও সমাজ সম্পর্কে একটি কাল্পনিক অবাস্তব ধারণা সৃষ্টি হয়েছে মানুষের ভুল প্রত্যাশা থেকে এবং সেই প্রত্যাশাকে বিবর্ধিত ও বিকশিত করার লক্ষ্যে ধর্মপ্রচারক, দার্শনিক এমনকি অনেক সমাজবিজ্ঞানী ও প্রকৃতিবিজ্ঞানী দীর্ঘদিন ধরে বিভ্রান্তিকর প্রচার চালিয়ে আসছেন। সভ্যতার বিকাশের ধারা নিয়ন্ত্রণ করেছে মানুষের উদ্ভাবিত নানা উৎপাদনব্যবস্থা, প্রকৃতি ও মানবজাতি সম্পর্কে নানা বৈশিষ্ট্য ও সম্পর্কের আবিষ্কার, সেইসঙ্গে সমগ্র বিশ্বজগৎ সম্পর্কে একটি বিকাশমান উপলব্ধি।

যে সত্যটি মানুষের উদ্ভাবিত জ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশ সম্পর্কে উপলব্ধি করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, কোনো সত্যই অভিজ্ঞতা অর্জন ও যাচাইপ্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে না গিয়ে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়। মানুষ তার বেঁচে থাকার তাগিদে প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে সহজাত অনুসন্ধিৎসায়, নির্মাণ করেছে নানা হাতিয়ার, আবিষ্কার করেছে বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক এবং লাভ করেছে অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর উপলব্ধি প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে। সভ্যতার এই দীর্ঘ পথযাত্রায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে মানুষ শুধু প্রকৃতির নিয়মই আবিষ্কার করেনি, নিজেকে প্রস্তুত ও নির্মাণ করেছে ভেতর ও বাইরে থেকে। এই অনুসন্ধিৎসু, বুদ্ধিমান, উদ্ভাবক, পরীক্ষক, কল্পনাপ্রবণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সংগ্রামী সর্বোপরি সত্যানুসন্ধানী মানুষ একত্রে বাস করতে গিয়ে লিপ্ত হয়েছে সংঘাতে, সামাজিক সম্পর্কে, সমাজ গঠনে, জ্ঞানের কাঠামো সৃষ্টিতে ও সভ্যতার নির্মাণে।

মানবজাতির এই বিকাশ নানা ঘটনার অভিঘাতে, উদ্ভাবন, ভাবনা, কল্পনা ও আবিষ্কারের বৈচিত্র্য পরিবেশ যেন এক উত্তপ্ত কটাহ— অস্থির, চঞ্চল ও পরিবর্তী

ফলে সভ্যতার বাস্তব ইতিহাস, জ্ঞানের কোনো নির্ভুল চিত্র কখনোই অপরিবর্তী, কালনিরপেক্ষ, সর্বজনীন দাবি করতে পারে না। সত্য মানুষেরই আবিষ্কার এবং তা এককভাবে কেউ সাধন করতে পারে না। অসংখ্য মানুষ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মতপার্থক্য ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার আলোকে গড়ে তুলেছে জ্ঞানের জগৎ ও সভ্যতা। বিশ্বজগৎ সম্পর্কে উপলব্ধিও একটি গ্রহণযোগ্য সামাজিক জীবনধারা শুধু যে অসংখ্য মানুষের অবদানের ভেতর দিয়ে সৃষ্টি তা-ই নয়, আবিষ্কৃত সে সত্য, উপলব্ধ সে জ্ঞান ও গৃহীত যে জীবনধারা, তা সবার কাছে বোধগম্য ও গ্রহণীয় করে তুলতে হলে অসংখ্য মানুষের বিচিত্র ভাবনার সমন্বয় ঘটাতে হয়।

জ্ঞানের বিকাশ ও সভ্যতার আত্মপ্রকাশে সবচেয়ে জটিল যে কাজ তা হলো, নানা ধরনের মানুষের বিচিত্র ভাবনা, নানা স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা, তাদের কর্মতৎপরতা, সৃজনশীলতার সমন্বয় ও ঐক্য ঘটিয়ে সভ্যতাকে বিকশিত করা। অনেক পরস্পরবিরোধী শক্তি ও প্রবণতার সমন্বয় ও সংশ্লেষণ এখানে ঘটাতে হয়। যারা এটি ঘটান তারা এক ধরনের সৃজনশীল স্থপতি সভ্যতার বিভিন্ন শাখার। ধর্ম, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি—সব ক্ষেত্রেই একদিকে যেমন সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের জন্য মুক্ত ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অবাধ পরিবেশ চাই, তেমনি যূথবদ্ধ জীবনের স্থিতিশীলতার প্রয়োজনে চাই সমন্বয়।

সভ্যতার প্রতিটি শাখায় গতিশীল ভারসাম্য রক্ষার কাজটি অত্যন্ত জটিল এক চ্যালেঞ্জ। জ্ঞানের বিকাশমানতা, অভিজ্ঞতার ক্রমসঞ্চয় উপলব্ধির অভিনবত্ব, প্রত্যাশার অন্তহীনতা, সর্বোপরি এদের অন্তর্নিহিত বৈচিত্র্য কোনো স্থির স্থান দেয়নি দাঁড়াবার। অথবা কোনো অপরিবর্তী প্রসঙ্গ কাঠামো, যার পরিপ্রেক্ষিতে পরম সত্য বা চিরন্তন আদর্শ বলে কোনো কিছুকে গ্রহণ করা যায়। মানুষ নিজেই তার জ্ঞানের জগৎ, পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, সামাজিকভাবে একত্রে বাস করার পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং সভ্যতাকে বিকশিত করার গুরুদায়িত্ব সৃষ্টি করেছে। সবচেয়ে বড় কথা ভালো-মন্দের বিচার, সত্য-মিথ্যার যাচাই যে সৌন্দর্যবুদ্ধি, নীতিবোধ ও রুচির দ্বারা পরিচালিত সেটাও মানুষের সৃষ্টি। মানুষের স্বাধীনতা ও দায়িত্ববোধ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত মানবসভ্যতার আত্মপ্রকাশ ও অভিব্যক্তির জন্য।

গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো এই উপলব্ধি যে, মানুষ সৃজনশীল ও স্বাধীন, সে নিয়ন্ত্রক আপন ভাগ্যের। একই সঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও যৌথ জীবনের নিশ্চয়তা অর্জন করতে হলে বিচিত্র অভিজ্ঞতা, অসংখ্য মানুষের সৃজনশীলতাকে মূল্য দেওয়া এবং সবার কাছে তা অধিগম্য ও গ্রহণীয় করে তোলার যে চ্যালেঞ্জ, তা একমাত্র গতিশীল এক সমাজব্যবস্থায় সম্ভব। এই সমাজব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্যগুলো বড়জোর চিহ্নিত করা যেতে পারে। কিন্তু তা পূর্বনির্ধারিত করা সম্ভব নয়। বৈচিত্র্য, পরিবর্তনশীলতা ও কালিক বিকাশের অনিশ্চয়তা, সেই সঙ্গে পরম কোনো সত্য বা চিরন্তন নীতির অনুপস্থিতিতে; মানবসভ্যতার বিকাশের জন্য সহনশীলতা,

বিচারশক্তি, আত্মপ্রত্যয়, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনকে গ্রহণের মানসিকতা—এসব কিছুই অপরিহার্য শর্তরূপে ভেতর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এর জন্য বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো নীতি বা আদর্শের প্রয়োজন হয় না। মানুষের বুদ্ধি, তার স্বাধীনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, যৌথভাবে বাস করার যোগ্যতা ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সত্য যাচাইয়ের ভেতর দিয়ে শুদ্ধতর পথের অনুসন্ধানের ক্ষমতা যে মানুষের আছে, সেটাই গণতন্ত্রের অঙ্গীকার।

গণতন্ত্রে মানুষকে এককভাবে ভুলভ্রান্তি, অসততা ও অসম্পূর্ণতার ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হয় না; বরং তাকে গ্রহণ করা হয় তার আপন বাস্তবতায়, যেখানে সে ভুল করলেও অভিজ্ঞতার আলোকে ওই ভুল থেকে মুক্ত হওয়ার শক্তি রাখে। অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির ভেতর থেকেও মানুষ জ্ঞানের উদ্ভাস ও সত্যের আলোকিত পথ চিনে নিতে পারে। অসততা, মানসিক দৈন্য ও রুচিহীনতা তাকে স্পর্শ করলেও একটি অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যচেতনা ও রুচিবোধ তাকে উত্তরণের পথ দেখাতে পারে। অসংখ্য মানুষের সৃজনশীলতা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির সংমিশ্রণ যেখানে ঘটে, সেখানে যা সুন্দরতর, অধিকতর সত্য ও কল্যাণকর সামাজিকভাবে, তা-ই শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করবে—এটাই গণতন্ত্রের প্রতিজ্ঞা। মানুষের জন্য কোনো নির্ভুল চিরন্তন আদর্শ পথ যে পূর্বনির্ধারিত নেই, মানুষ যে ভুল করে, সে যে আদর্শ ব্যক্তি নয় অথবা সর্বজ্ঞানী, সেই জন্যই গণতন্ত্রের প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক ধারার প্রবর্তনে কোনো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি নেই কালনিরপেক্ষ, চিরন্তন সত্য বা আদর্শ নীতিমালার। কারণ, বাস্তবে তেমন সত্যের বা নীতিমালার কোনো অস্তিত্ব নেই।

মানুষ একই সঙ্গে ঐতিহ্যের ধারক ও ভবিষ্যতের স্বপ্নদ্রষ্টা, নিজস্ব ব্যক্তিতে ভিন্ন এবং যৌথ জীবনে সহনশীল ও উদারতায় সামাজিক; মানুষ রক্ষণশীলতায় ও জড়তায় স্থবির এবং সৃজনশীলতায় ও সম্মুখদৃষ্টিতে গতিশীল; তাই গণতন্ত্র মানবসভ্যতার এক জটিল ব্যবস্থা মানুষের নানা বিপরীত বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতার ধাত্ররূপে। গণতন্ত্রের নির্ধারক সেসব মানবিক গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য, যা বাস্তব বিকাশমান ও অনির্বচনীয়। আর সে কারণেই কল্পিত, অবাস্তব, পরম কোনো আদর্শ চিরন্তনতা নিয়ে প্রতিফলিত নয়। সত্যের স্বরূপ মানুষ যেভাবে উদ্‌ঘাটন করেছে, তার আলোকেই গণতন্ত্রের অন্তহীন পথযাত্রা। এখানে ভুল করা আছে, অনিশ্চয়তা আছে, কিন্তু মিথ্যাচার নেই অবাস্তব ও কাল্পনিক আদর্শের।

গণতন্ত্রের পরিবর্তী পথ

গণতন্ত্রের কোনো সুনির্দিষ্ট পূর্বনির্ধারিত ও একীভূত তত্ত্ব নেই। গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে অসংখ্য মানুষের মুক্তচিন্তা, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নানা পরিস্থিতিতে, নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন পেশার ও বিভিন্ন দেশের মানুষের সংগ্রামের ভেতর দিয়ে। রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, শিল্পী, সাহিত্যিক, ধর্মযাজক ও মানবতাবাদী অসংখ্য মানুষের প্রজ্ঞা, মানুষের অধিকার নিয়ে আদর্শ ও নীতির জন্ম দিয়েছে। এসব বিচিত্র মতামত, নীতিবাক্য ও আদর্শ যে পরিমাণ অভিন্ন পরিবেশে, মৌলিক অভিজ্ঞতায়, নির্ভীকতা ও স্বাধীনতায় অভিব্যক্ত হয়েছে সৃজনশীলভাবে, সেই পরিমাণে এসব মতামত এবং প্রদর্শিত পথ ভিন্ন ও অনন্য। গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত যে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা তা গণতন্ত্রের প্রচার ও প্রসারে স্বভাবতই একটি অন্তরায় সৃষ্টি করে।

মানুষের জন্য মঙ্গল, সুবিচার, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও অগ্রগতি কোন পথে ও কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুনিশ্চিত করা যাবে, সে সম্পর্কে বিশেষ এলাকার বিশেষ পেশার মানুষের অভিন্ন অভিমত থাকতে পারে। কিন্তু এমন কোনো আদর্শ ব্যবস্থাপনার কথা আমরা ভাবতে পারি না, যা স্থান-কাল নিরপেক্ষভাবে সব মানুষের সর্বাধিক মঙ্গল সাধন করবে ও তাদের আকাঙ্ক্ষার পূর্ণাঙ্গ স্ফুরণ ঘটাবে। অপরিবর্তী, একীভূত সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শুধু নেই তাই না, বস্তুত একাধিক কারণে গণতন্ত্রের একীভূত তত্ত্ব উদ্ভাবন সম্ভব নয়, এমনকি প্রত্যাশিতও নয়।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বহুতা ও উন্মুক্ততা এঁকে রেখেছে বিকাশমান গতিশীল ও বৈচিত্র্যময়। যে নমনীয়, ব্যাপক ও উদার একটি উপপাদ্য বা প্রস্তাবনা কোনো একীভূত তত্ত্বের বিপরীতে কাজ করে তা হলো জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে সুযোগের সমতা এবং এই দুইয়ের মাধ্যমে সমাজের নানা পেশা ও মতের মানুষের নানামুখী স্বাধীনতাকে সর্বাধিক নিশ্চয়তা প্রদান। স্বভাবতই গণতন্ত্রের এ ধরনের প্রতিজ্ঞা বা শর্ত অনেকটা অস্পষ্ট ও বিমূর্ত। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির এই অনির্দিষ্টতা গণতন্ত্রকে নাটকীয়, আবেগতাড়িত, আকস্মিক ও আকর্ষণীয় করার পথে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু গণতন্ত্রের শক্তি ও সততার ভিত্তি

ক্রমাগত বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিভিন্ন মতের সমন্বয় ঘটিয়ে অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত পথে অগ্রসর হওয়া।

মানুষের সৃজনশীলতা, চিন্তার স্বাধীনতা, রুচির বৈচিত্র্য, প্রতিভা ও কর্মক্ষমতার ভিন্নতা— সর্বোপরি মানুষের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা অনিবার্যভাবেই সভ্যতার পথযাত্রাকে অনিশ্চিত ও অনির্দিষ্ট করে রেখেছে। সময় যে একটি বাস্তবতা নিয়ে উপস্থিত আমাদের ব্যক্তি ও সমাজবদ্ধ জীবনে, ফলে আগামী দিনগুলোতে কী ঘটবে, সমাজ, পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্পর্কে কী নতুন জ্ঞান এবং উপলব্ধি আমরা অর্জন করব তা আগে থেকেই জানা সম্ভব নয়। তাই যারা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বা আদর্শের প্রচার ঘটায় দুর্বিনীত স্লোগান ও দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশের মাধ্যমে, তারা অবাস্তবতা ও অজ্ঞতা থেকে তা করে, অথবা জনগণকে ঠকানোর কৌশলরূপে ভণ্ডামির আশ্রয় নেয়। গণতন্ত্রের বিকল্প যেসব পদ্ধতি প্রচলিত বা প্রচারিত সেখানে মানুষের লোভ, ভীতি, কুসংস্কার, বিদ্বেষ ও অজ্ঞতাকে ব্যবহার করা হয় নানা কৌশলে। ফলে, মানুষের যে অন্তর্নিহিত স্বাধীনতা কালিক প্রবাহের মধ্যে অভিজ্ঞতার আলোকে ভুল সংশোধনের, আত্মবিশ্বাস ও আত্মোপলব্ধির, তা বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

যান্ত্রিকভাবে পেশিবল বা শক্তি প্রদর্শন, মানুষের অভিজ্ঞতাজনিত কুসংস্কারকে ব্যবহার করা; ধর্ম, বর্ণ, পেশা বা সামজিক যে বৈষম্য তাকে ভিত্তি করে পারস্পরিক বিদ্বেষ, অবিশ্বাস, ঘৃণা সৃষ্টি, নানা কৌশলে ও ছদ্মবেশে ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষকে শোষণের ও শাসনের সহজ পদ্ধতি হচ্ছে তাই মানুষের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, লোভ ও ভীতির সুযোগ নিয়ে তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার। যুদ্ধাস্ত্র, অর্থনৈতিক প্রভাব বা ভৌত শক্তি প্রয়োগের মতোই কুসংস্কার, ভুল নীতিবাক্য বা আদর্শের প্রচার মানুষকে মোহমুগ্ধ, আবেগাপ্লুত, উচ্ছৃঙ্খল ও উত্তেজিত করতে পারে। সমাজকে নিয়ন্ত্রণের জন্য মানুষের এসব দুর্বলতাকে নানা কৌশলে চমকপ্রদ নানা স্লোগানের আবরণে ব্যবহার করা হয় শোষণের হাতিয়ার রূপে। গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো মানুষের জন্মগত অধিকার ও স্বাধীনতাকে বিকশিত করা। বাহ্যিক, চমকপ্রদ স্লোগান বা আকস্মিক কোনো বিপ্লব দ্বারা মানুষের এই অধিকার ও স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব নয়।

রাজনৈতিক অধিকার ও সব মানুষের সমান অধিকারের কথা এক মুহূর্তেই ঘোষিত হতে পারে। কিন্তু চিন্তার স্বাধীনতা, আত্মবিশ্বাস, উদার ও সহনশীল মানবিক সম্পর্ক, যা গণতন্ত্রের ভিত্তি, তা নির্ভর করে সমাজ ও প্রকৃতিকে যথার্থভাবে ও বাস্তবতায় জানা। এটি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। রুশো এ জন্যই খুব গুরুত্বের সঙ্গে বলেছিলেন, শুধু সংখ্যাধিক্যের ভোটের ভিত্তিতে সরকার গঠনই গণতন্ত্র নয়। ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ মানুষের মূল্যবোধ ও চরিত্র গঠন, অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন, শিক্ষালাভ— এসবই অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিলভাবে একটি জাতিকে প্রস্তুত

করে গণতন্ত্রের জন্য। গণতন্ত্র তাই ধর্ম বা তন্ত্রের মতো সামাজিক অবকাঠামো, শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিরপেক্ষভাবে স্থানান্তরযোগ্য নয়।

সব তত্ত্বেরই প্রবণতা থাকে সর্বজনীন কিছু নীতিমালা, সুনির্দিষ্ট কিছু ধারণা, অপরিবর্তী সম্পর্ক— সূত্ররূপে উপস্থাপন করা। সাধারণীকৃত এসব তত্ত্ব বৈচিত্র্যের পরিবর্তে অভিন্নতা ও পরিবর্তনীয়তার বিপরীতে নির্দিষ্টতা, এবং কালনির্ভরতার পরিবর্তে কালনিরপেক্ষতার সন্ধান করে। সবকিছুকে ব্যাখ্যা করা; ভিন্নতা, বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনীয়তার যে ব্যাপক ও বিস্তৃত জগৎ তাকে সংক্ষিপ্ত ও একীভূত করার একটি লক্ষ্য থাকে সব তত্ত্বেরই। সব পরিবর্তন ও বৈচিত্র্যকেও একটি অপরিবর্তী ও অভিন্ন নিয়মের মধ্যে ধারণ করাই সব তত্ত্বের লক্ষ্য। ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক এমনকি প্রাকৃতিক যেসব নীতিমালা, সেখানে একটি বিশ্বাস থাকে স্থান-কালনিরপেক্ষ সম্পর্ক অর্থাৎ কোনো নির্ভুল নীতি বা সত্যের সন্ধান। গণতন্ত্র গভীরার্থে এমন কোনো চিরন্তন সত্য বা নীতিমালার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয় না।

মানুষের যে সার্বভৌমত্ব গণতন্ত্রে স্বীকৃত, সেখানে মানুষ সৃজনশীল, মুক্তচিন্তার অধিকারী এবং যৌথ জীবনের স্বাধীন নিয়ন্ত্রক। গণতন্ত্র লক্ষ্যহীন নয় বা বিশৃঙ্খল যথেচ্ছাচার, কিন্তু গণতন্ত্রের লক্ষ্য অনির্দিষ্ট। মানুষ এখানে মুক্ত ও স্বাধীন একাধিকার্থে। নতুন জ্ঞান সৃষ্টি, অভিজ্ঞতা অর্জন ও উপলব্ধির আলোকে আগামীকাল নতুনভাবে দেখা দেবে বলে এই মুহূর্তে কালনিরপেক্ষভাবে অনাগতকালের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়। ক্রমাগত শুদ্ধতর পথের সন্ধান একটি বাস্তবতা ও অপরিহার্যতা বলে, সব কালনিরপেক্ষ নীতিবাক্য বা আদর্শের প্রচারই ভ্রান্ত। গণতন্ত্রের এই সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয় বলে দুর্বিনীত, নাটকীয় স্লোগান দ্বারা মানুষকে মোহমুগ্ধ করার অবকাশ এখানে নেই। গণতন্ত্রের নামে যারা মানুষের বুদ্ধি ও বিচারশক্তির পরিবর্তে তাদের অন্ধবিশ্বাস, লোভ, মোহ, অজ্ঞতা ও ভীতিকে ব্যবহার করে, তারা গণতন্ত্রের বাহ্যিক, আনুষ্ঠানিকতা অর্থাৎ ভোটের সংখ্যাকেই ব্যবহার করে। কিন্তু প্রতিটি ব্যালট পেপারের আড়ালে যে একজন ভোটদাতা রয়েছে—সজীব, সক্রিয়, রুচিসম্পন্ন, দায়িত্বশীল, স্বাধীন মানুষ, তাকে আচ্ছন্ন ও মোহগ্রস্ত করতে প্রয়াস পায় নানা আদর্শের প্রচার ও স্লোগানে।

মানুষের মঙ্গল কামনা, অগ্রগতি ও নিশ্চিত ভবিষ্যতের আশ্বাস প্রদান করে যেসব নীতিবাক্য ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় তা গণতন্ত্রের পথ নয়। প্রতিটি মানুষ আপন দায়িত্বে, স্বাধীনতায়, কর্মতৎপরতায় ও অবদানের ভেতর দিয়ে গণতন্ত্রের পথকে নির্মাণ করে। সবার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কোনো ব্যক্তিমানুষ তার পেশিশক্তি, বংশগৌরব, আদর্শবাদ— এমনকি একচ্ছত্র পাণ্ডিত্য দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না গণতন্ত্রে। গণতন্ত্র তাই ব্যক্তিস্বাধীনতার পথকে সবচেয়ে বেশি উন্মুক্ত রেখেছে। প্রতিটি দেশ বা জাতি এর নিজস্ব ঐতিহ্য, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড,

জীবনধারা, অভিজ্ঞতা, সৃজনশীলতা, রুচি ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বাধীনভাবে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটাবে বলেই অনুকরণ বা স্থানান্তরণ সম্ভব নয় গণতন্ত্রে। গণতন্ত্রের জন্য সার্বিক স্বাধীনতা চাই, সেই সঙ্গে আত্মপ্রত্যয়, দায়িত্ববোধ, শ্রম ও সাহসিকতা—নিজস্ব ধারার গণতন্ত্রকে নির্মাণে। ব্যক্তিস্বাধীনতা গণতন্ত্রকে বিচ্ছিন্নতা দেয় না, বরং জ্ঞানার্জনের, অভিজ্ঞতা লাভের ও কর্মতৎপরতার যে ব্যক্তিস্বাধীনতা তা পারস্পরিক প্রভাব সৃষ্টির ভেতর দিয়ে সমন্বয় ঘটায় বিভিন্ন মানুষের মধ্যে। শিক্ষাদানের ও শিক্ষা গ্রহণের, মতপ্রকাশ ও মতপ্রদানের স্বাধীনতা যে মিথস্ক্রিয়া ঘটায় চিন্তা কর্মের জগতে তা গণতন্ত্রকে মুক্তি দেয় বিচ্ছিন্নতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও অহংবোধ থেকে। গণতন্ত্রের এই বহুমুখী অন্তর্নিহিত স্বাধীনতা ও সরকারের মধ্যে ক্রমাগত শুদ্ধতররূপে আত্মপ্রকাশ গণতন্ত্র মুক্ত রেখেছে একীভূত কোনো তত্ত্ব বা আনুষঙ্গিক উত্তেজক ধারণা ও স্লোগান থেকে।

নিরপেক্ষতার ভিত্তি যেখানে তথ্যহীনতা

যারা জন্মান্ধ, ফলে দৃষ্টিহীনভাবে অন্ধকারে পথ চলে অভ্যস্ত দীর্ঘদিন ধরে, তাদের যদি হঠাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়া যায়; দেখা গেছে তারা চলতে পারে না। বিজ্ঞানীরা এই আপাত-উদ্ভট ফলের ব্যাখ্যা আবিষ্কার করেছেন এইভাবে যে, ছোটবেলা থেকে দৃষ্টির মাধ্যমে পাওয়া বিপুল তথ্যকে সুবিন্যস্তভাবে ব্যবহার করার কাজটি সময় সাপেক্ষ। চারদিক থেকে তথ্য পাওয়াটাই বড় কথা নয়, বিভিন্ন তথ্যকে মস্তিষ্কে প্রক্রিয়াজাত করা, বিন্যস্ত করা। সংরক্ষণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রয়োগ করার যে কাজ তা দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতানির্ভর। যে তথ্য আমরা আমাদের দৃষ্টি, শ্রবণেন্দ্রিয় এবং অন্যান্য স্নায়বিক যন্ত্রের মাধ্যমে ক্রমাগত লাভ করি, প্রতি সেকেন্ডে তা বিপুল—কম্পিউটারের ভাষায় কয়েক মিলিয়ন বিট। হ্যাঁ বা না বলার মধ্যে ন্যূনতম একক তথ্য থাকে, তাকেই আমরা এক বিট বলি।

আসলে নানা ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভেতর দিয়ে আমরা যে সংকেত পাই, সেগুলি নিছক উপাত্ত—লক্ষ্যহীন ও নিরপেক্ষ। এই উপাত্তকে আমরা যখন বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার করি তখনই মাত্র তা হয়ে ওঠে তথ্য। আমাদের লক্ষ্য ও রুচি এবং মস্তিষ্কে পূর্বেই অভিজ্ঞতার আলোকে ধারণকৃত তথ্যের সঙ্গে যেসব উপাত্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ, তার ভিত্তিতে প্রাপ্ত উপাত্তের সামান্য ভগ্নাংশ শুধু আমরা ব্যবহার করি। বাকি সব উপাত্তই প্রায় বর্জন করা হয়। পূর্বধারণা, পছন্দ-অপছন্দ ও বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্বাচিত উপাত্তই আমাদের কাছে তথ্যরূপে গৃহীত হয়। এই তথ্যের আলোকেই আমরা পথ চলি। প্রকাশ করি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।

একটি দৃষ্টিসম্পন্ন শিশু যে বিপুল পরিমাণ উপাত্তের মধ্যে বড় হয়, সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অভিজ্ঞতা অর্জন, শিক্ষা, প্রয়োজনবোধ ও রুচি সৃষ্টির মাধ্যমে যে আচরণবিধি সে অর্জন করে, তা একটি অভিব্যক্তি। যথেষ্ট উপাত্ত পাওয়াই তাই সহায়ক নয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও পথ চলার জন্য। বরং যার বিচারশক্তি বিকাশ লাভ করেনি, বিপুল পরিমাণ তথ্য ও উপাত্তকে বিশ্লেষণ ও বিন্যস্ত করে সামঞ্জস্যপূর্ণ সঠিক তথ্য গ্রহণে যে ব্যর্থ, তার জন্য উপাত্ত রূপান্তরিত হয় না তথ্যে এবং তথ্য উত্তীর্ণ হয় না যথাযথ সিদ্ধান্তের স্তরে। অনেক ক্ষেত্রে অবিন্যস্ত বিশৃঙ্খল তথ্য বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জন্মান্ধরা দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার পরও

স্বাভাবিকভাবে পথ চলতে যে ব্যর্থ হয় দীর্ঘদিন ধরে, এবং তারা যে চোখ বুজে দৃষ্টিহীনভাবে পথ চলতেই বরং পছন্দ করে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর কারণ, তথ্যকে ব্যবহারের দক্ষতা সে অর্জন করেনি।

যেসব কারণে প্রচুর উপাত্ত ও তথ্য লাভই যথেষ্ট নয়, বরং তা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে, তাদের সংখ্যা একাধিক। প্রথম যে কারণ তা হলো ভুল তথ্য বা অসম্পূর্ণ তথ্য; দ্বিতীয় কারণ, উপাত্তকে তথ্যে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজনীয় যে সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য তার অনুপস্থিতি। তৃতীয়ত, অনেকগুলো উপাত্ত ও তথ্যকে বিশ্লেষণ ও সমন্বিত করার যে বুদ্ধি ও যোগ্যতা তার অনুপস্থিতি। চতুর্থত, বুদ্ধিগত সততার অভাব।

প্রকৃতির একটি অন্তর্নিহিত শর্ত বা দাবি আছে—যেখানে নানা ঘটনার মধ্যে যে সম্পর্ক তা উদ্‌ঘাটন না করলে হিসাব মেলে না, এবং বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অভিজ্ঞতা অর্জন, তত্ত্ব সৃষ্টি—সবকিছুই হচ্ছে সত্যানুসন্ধানের সেই পথ, যেখানে সামঞ্জস্য, সৌন্দর্যবুদ্ধি ও রুচি সহায়তা করে সত্য আবিষ্কারে। প্রকৃতিবিজ্ঞানে এ পথ অনুসরণ করেই অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সব তত্ত্ব এ ক্ষেত্রে যাচাই হয় পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের আলোকে। কোনো তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারিত হয় কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কত বেশি উপাত্তকে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে সমর্থ তার ওপর। সেই সংযোগের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও সাযুজ্য কতটা গভীর তার দ্বারা।

বর্তমান বিশ্বে এবং আমাদের দেশে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং বিপর্যয় পরিলক্ষিত হচ্ছে তার ব্যাখ্যা সমাজবিজ্ঞানীরা দিতে পেরেছেন বলা চলে না। এর কারণ অবশ্যই তথ্যের ঘাটতি নয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অভূতপূর্ব অগ্রগতি সম্ভব করেছে; তার কল্যাণে আমরা পেরেছি তথাকথিত তথ্য বিপ্লব, বরং বলা উচিত উপাত্ত বিপ্লব এবং বিপুল প্রাচুর্য। জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধির পরও প্রকৃতার্থে যে খাদ্যাভাব নেই পৃথিবীতে এই মুহূর্তে এবং জীবনযাত্রা, শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতের তুলনায় যুদ্ধের আয়োজনে যে বেশি অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, সেটা বস্তুগত প্রাচুর্যই প্রমাণ করে। রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, কৃত্রিম উপগ্রহ ও তন্তু কাচের ব্যবহার, ইলেক্ট্রনিক্স ও ফোটোনিক্সের কল্যাণে তথ্যের আদান-প্রদান সহজতর হয়েছে বিপ্লবাত্মকভাবে। কিন্তু এর পরও মানুষের যে নিরাপত্তাহীনতা, অপমৃত্যু, মানসিক রুগ্‌ণতা, পারস্পরিক বিদ্বেষ ও যোগাযোগহীনতা তার মূলে কাজ করছে সমাজ ও রাষ্ট্র চালনার ক্ষেত্রে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের অযোগ্যতা ও ব্যর্থতা। যদিও আমরা বলছি তথ্য বিপ্লবের ভেতর দিয়ে আমরা অভিষিক্ত, সমাজ ও রাষ্ট্রে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংঘটিত দুর্ঘটনা, বিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস ও বিপর্যয় প্রমাণ করে যে আমরা সবাই যেন এখন অ্যালিয়েন বা বহিরাগত, পরস্পরের অচেনা; ফলে প্রত্যেকেই শত্রু-পরিবৃত।

অজ্ঞতার অভিযোগ যতটা, তার চেয়ে বেশি অভিযোগ আসে পক্ষপাতিত্বের। আমরা সবাই প্রতিমুহূর্তে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি সেখানে ভালো-মন্দের বিচার, সত্য ও অসত্যের যাচাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এত যে অব্যবস্থা-বিশৃঙ্খলা, দুর্যোগ তা কি এ জন্য যে সমাজবদ্ধ মানুষ কী চায়, কোন সিদ্ধান্তটি সমাজ ও দেশের জন্য মঙ্গলকর তা যথার্থ তথ্যের অভাবে নির্ধারণ করা অসাধ্য? ভুল তথ্য, বা তথ্য বিশ্লেষণের অক্ষমতার কারণেই কি মতপার্থক্য ও বিভেদের সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে? প্রকৃতিবিজ্ঞানেও গবেষক ও তাত্ত্বিকদের মধ্যে প্রচুর মতপার্থক্য হয়ে থাকে; বিকল্প নানা তত্ত্বও দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু এ মতপার্থক্যকে ভিত্তি করে পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠার কোনো দৃষ্টান্ত নেই। বরং সূক্ষ্মতর পর্যবেক্ষণ, অধিকতর তথ্য সংগ্রহ ও গভীরতর বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিজ্ঞানের সব বিতর্কই অধিবিদ্যক বা একাডেমিক হয়ে ওঠে। যুক্তি প্রয়োগ, পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য তুলে ধরা ও একাডেমিক বিতর্ক শুধু মতপার্থক্যের অবসান ঘটায় না, সঠিকতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সত্য উদ্‌ঘাটনের অপরিহার্য পন্থা বলেও গণ্য।

সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যেসব ভিন্ন মত ও বিতর্কের উদ্ভব ঘটে তার মীমাংসা যদি ঘটে তথ্য সংগ্রহ, যুক্তিপ্রয়োগ ও বিশ্লেষণ দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে, তা হলে পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর ও হিংসাত্মক হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, বুদ্ধিগত সততা ও সত্যানুসন্ধানের মনোভাব যেখানে উপস্থিত, সেখানে মতপার্থক্য ও বিতর্ক পরস্পরের মধ্যে দূরত্বকে বৃদ্ধি করে না, বরং বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা এবং নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাকে দেখার মধ্যে পথ ও পদ্ধতির ভিন্নতা থাকলেও লক্ষ্যের কোনো ভিন্নতা নেই। বিজ্ঞানী-দার্শনিক ফায়ারাব্যান্ড বলেছেন, একটি তত্ত্ব, তা আপাতদৃষ্টিতে যতই সঠিক মনে হোক, বিকল্প তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে যাচাইকৃত না হলে, কোনো তত্ত্বের নির্ভুলতা বা শ্রেয়ত্ব প্রমাণিত হয় না।

পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ী ফাইনম্যান বলেছিলেন, আলো যে সরল রেখায় চলে সেই পথ আলোর কণিকা কেমন করে নির্ধারণ করে? নিশ্চয়ই আলোর কণিকাকে উঁকি দিয়ে দেখতে হয় আশপাশের পথ এবং আলোর তরঙ্গরূপ সেটি নিশ্চিত করে। বস্তুত পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তত্ত্ব সৃষ্টি ও যাচাই-প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে প্রকৃতির রহস্যোদ্‌ঘাটন ও সত্য আবিষ্কারের যে পথ বিজ্ঞানের, তা শুধু প্রকৃতিবিজ্ঞানেই কার্যকর নয়, এ পদ্ধতির সাফল্য এবং সর্বজনীনতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজ এবং রাষ্ট্রের সমস্যার সমাধানেও সাফল্য লাভ সম্ভব। বস্তুত, গণতন্ত্রের পথে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিকল্প নানা দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের আলোকে ক্রমাগতভাবে শুদ্ধতর ধারণা এবং উপলব্ধিতে উপনীত হওয়ার আদর্শকেই মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করার কথা। এ জন্য প্রয়োজন মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজ সম্পর্কে

সঠিক তথ্য গ্রহণ; বুদ্ধিগত সততা নিয়ে বিভিন্ন মতামত উপস্থাপিত, বিশ্লেষিত এমনকি সমালোচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে সঠিক পথ নির্ধারণ।

সব তথ্যকে যথাসম্ভব নির্ভুল ও সততার সঙ্গে সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ আমাদের একধরনের নিরপেক্ষতা দেয়। এই নিরপেক্ষতা তথ্যভিত্তিক। একজন প্রাজ্ঞ ও সৎ বিচারক বা প্রশাসক, একজন তদ্‌গত বিজ্ঞানী একই অর্থে নিরপেক্ষ। কিন্তু যেখানে পরিচয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক বা দলগত আনুগত্য সত্য যাচাই ও সুবিচারের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে সেখানে আমরা অন্ধত্ব কামনা করি নিরপেক্ষতার জন্য। এই নিরপেক্ষতা হলো তথ্যহীনতা ও অজ্ঞতাভিত্তিক। এটি দুর্ভাগ্যের যে, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সঠিক রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা তথ্যভিত্তিক নিরপেক্ষতা, অর্থাৎ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও আলোর পথ ধরে নিরপেক্ষতা অর্জন প্রত্যাশা করতে পারছি না। বরং পরস্পর সম্পর্ক জানাটাই পক্ষপাতিত্বের কারণ হয়ে উঠছে আত্মীয়করণ, দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির নামে। এই অভিশাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই আমরা অজ্ঞতা ও অন্ধত্বের নিরপেক্ষতা কামনা করছি।

এর একটি দৃষ্টান্ত হলো বিচার বিভাগ ও পুলিশের পরিবর্তে আর্মির সাহায্যে সন্ত্রাস দমনের প্রচেষ্টা। প্রচলিত বিচারব্যবস্থায় পুলিশ যেখানে সমাজে বাস করে দীর্ঘ সময় ধরে স্থানীয় জনগণের অভিযোগ, তথ্য প্রদান ও সাক্ষীর ভিত্তিতে অপরাধীকে বন্দী করে এবং বিচারক যেখানে আইনজীবীদের যুক্তি ও বিতর্ক এবং সাক্ষীদের প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে অপরাধীকে শাস্তি দেয় তা তথ্যভিত্তিক। কিন্তু সুবিচারের জন্য যে নিরপেক্ষতা প্রয়োজন সেখানে তথ্য সহায়ক হলেও সমগ্র বিচারব্যবস্থাই ভেঙে পড়ে, তথ্য যেখানে পক্ষপাতিত্বমূলক হয়ে ওঠে। একজন সেনা অফিসার সেই অর্থে বেশি নিরপেক্ষ যে অর্থে সে সামাজিক দূরত্ব ও অপরিচয়ের কল্যাণে স্বজনপ্রীতি ও দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে। এ ধরনের অজ্ঞতাভিত্তিক নিরপেক্ষতা দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার পরও জন্মান্ধের চোখ বুজে পথ চলার মতো।

ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভিতর দিয়ে বিপুল তথ্য আমাদের কাছে পৌঁছে। এই বিপুল পরিমাণ তথ্যের আরোকে পথ চলতে হলে দীর্ঘ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। একজন অন্ধ ব্যক্তিকে হঠাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলে সে বিভ্রান্ত হয় বিপুল তথ্যকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে ব্যবহার করতে পারার অক্ষমতায়। এ জন্যেই সে চোখ ফিরে পেয়েও চোখ বন্ধ করে চলতে স্বস্তি বোধ করে। গণতন্ত্র হচ্ছে তথ্যের আলোকে পথ চলার শিক্ষা।

নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারে স্বরূপ
সর্বদলীয় বনাম নির্দলীয় সরকার

নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য করতে নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা কী হবে? এই প্রশ্ন বাংলাদেশের জন্য বড় বিতণ্ডা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু কেন? পৃথিবীতে যেসব দেশে গণতন্ত্রের চর্চা চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে, সেখানে এ প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে রাজনৈতিক দল নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে, তার দেশ পরিচালনার অন্য সব দায়িত্বের সঙ্গে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে একটি সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান সেই সরকার পরিচালনা করবে। গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতি বিশ্বাস থাকলে এটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নির্বাচনে কারচুপি কখনোই কোনো যথার্থ রাজনৈতিক দলের দ্বারা ঘটতে পারে না। কারণ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নিজস্ব পন্থা ও কর্মসূচি থাকবে, যা সেই দলের গঠনতন্ত্রে প্রতিফলিত থাকে। এক্ষেত্রে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত গতিশীলতা, নমনীয়তা ও পরিবর্তনীয়তা দেয়। কিন্তু রাজনৈতিক সব দলেরই কিছু অভিন্ন লক্ষ্য থাকতে হবে, যেখানে দেশের অগ্রগতি, নিরাপত্তা, মূলনীতি ও আদর্শ নিহিত এবং যেখানে রাষ্ট্রবদ্ধ মানুষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য আবাসন, খাদ্য, যোগাযোগ, বিশ্বাস, সংস্কৃতি, বাকস্বাধীনতা, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা সব মিলিয়ে সার্বিক কল্যাণ অন্তর্ভুক্ত। দলীয় ম্যানিফেস্টোতে যে ভিন্নতা ও অভিনবত্ব থাকে তা একটি প্রস্তাবরূপে জনগণের সামনে উপস্থাপিত হয়। এই ভিন্নতা বিভিন্ন দলের মধ্যে পার্থক্যযোগ্যতা দেয়। কিন্তু যেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য অভিন্ন তার ভিত্তি দেশপ্রেম, মানবতাবোধ ও কল্যাণবোধ। আদর্শ রাজনীতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতাবোধের অভিন্ন আদর্শ এবং মানবকল্যাণের অভিন্ন লক্ষ্য যে বন্ধন সৃষ্টি করার কথা তার শক্তি অনেক বেশি প্রবল হওয়ার কথা, এদের মধ্যে পথ নির্বাচনের ভিন্নতার দ্বন্দ্ব থেকে সৃষ্ট বিরোধের শক্তির চেয়ে।

একটি উপমা টেনে বলতে পারি, একটি জমাটবাধা পদার্থে যে অনুগুলো সমষ্টিবদ্ধ হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে একটি বিকর্ষণ বলজনিত শক্তি থাকে এবং আকর্ষণ বলজনিত একটি শক্তি থাকে। কিন্তু যতক্ষণ আকর্ষণজনিত বলের জন্য

উৎপন্ন শক্তি বিকর্ষণজনিত বলের জন্য উৎপন্ন শক্তির চেয়ে বেশি থাকে, ততক্ষণ পদার্থটি জমাটবদ্ধ থাকে। তাপ বা আঘাতে যখন বিকর্ষণ শক্তি আকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করে, তখনই অণুগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একটি দেশ বা জাতির জনগণ যদি দেশপ্রেম, অভিন্ন মূল্যবোধ, পারস্পরিক ভালোবাসা ও পারস্পরিক কল্যাণবোধে ঐক্যের শক্তিকে সব বিতর্ক মতের ভিন্নতা ও পথের পার্থক্যজনিত বিকর্ষণ শক্তির চেয়ে প্রবলতর রাখতে পারে, তাহলেই মাত্র সে জাতি ঐক্যবদ্ধ থাকতে সক্ষম।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটি যৌগিক ও জটিল দশা, যেখানে একটি জনগোষ্ঠী একত্রে বাস করে গতিশীল ভারসাম্য রক্ষা করে। চরম বিশৃঙ্খলা ও পরম শৃঙ্খলার মাঝামাঝি অবস্থান করে গণতন্ত্র। চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় যখন যথেচ্ছাচার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রাধান্য পায়, কিন্তু অভিন্ন মূল্যবোধ ও নীতিমালা এই ভিন্নতার মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করতে পারে না।

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহত হতে পারেনি। তার কারণ হত্যা, ক্যু, ষড়যন্ত্র, সেনানায়কদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল এবং তা দীর্ঘস্থায়ী করার কৌশলরূপে রাজনৈতিক দল গঠন, পেশিশক্তির প্রভাবে এবং সর্বোপরি সংবিধানের মূলনীতিগুলো বদলে ফেলার অপচেষ্টা। এর ফলে স্বাধীনতাবিরোধীরা দেশে-বিদেশে শক্তি সঞ্চয় করেছে দীর্ঘ সময় ধরে এবং এমন সব রাজনৈতিক দল সৃষ্টি হচ্ছে, যারা বাংলাদেশের মূল আদর্শ, এমনকি বাংলাদেশের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। স্বভাবতই বাংলাদেশের সংবিধানের মূল কাঠামোর মধ্যে থেকেই শুধু রাজনৈতিক বিতর্ক চলতে পারে, অন্য কোনো লুকানো অভিসন্ধি বা কূটকৌশল পোষণ করে নয়।

সর্বদলীয় সরকার নিয়ে আলোচনার শুরুতেই রাজনৈতিক দল বলতে শুধু সেসব দলকেই বোঝাচ্ছি, যাদের দলীয় গঠনতন্ত্র বাংলাদেশের সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় এবং সেই কারণে নির্বাচন কমিশন ও বিচার বিভাগ থেকে বৈধতাপ্রাপ্ত। অনেক বিশেষণযুক্ত সরকার ব্যবস্থার কথা উচ্চারিত হলেও যে বিষয়টি মৌলিক তা হলো নির্বাচন-পূর্ব ও নির্বাচন-উত্তর সরকারের কার্যপরিচালনা থেকে নির্বাচনকালীন সরকারের কার্যক্রম ভিন্ন। এর কারণ হলো, দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির পক্ষে জনগণের সমর্থন নিয়ে যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় যায়, বাস্তবে তার সাফল্য ও ব্যর্থতা থেকে সেই দলের দক্ষতা ও যোগ্যতা এবং সেই সঙ্গে প্রস্তাবিত নীতিমালার যথার্থতা যাচাই করা হয়। কিন্তু নির্বাচনকালীন সরকারের কাছে দীর্ঘমেয়াদি কোনো কর্মপরিকল্পনা থাকে না, যা জনসমর্থিত। ফলে এই ক্রান্তিকালে শুধু দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড এবং সেসব কর্মসূচি পালিত হওয়ার কথা, যা স্বল্পমেয়াদি অত্যাবশ্যক এবং যা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক নেই। এই অর্থে নির্বাচনকালীন সরকারকে যে নামেই অভিহিত করা হোক, তা মূলত তত্ত্বাবধায়ক

সরকারের বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত। কারণ একটি রাজনৈতিক দলের অন্যান্য সাফল্যের সঙ্গে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন সম্পন্ন করাও একটি দায়িত্ব। একটি নির্বাচিত সরকারকে এই দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখা তা যে কারণে বা অজুহাতেই হোক, সেই দলকে একটি পরীক্ষা থেকে বিরত রাখা।

গণতন্ত্রের ট্রেন কেন বাংলাদেশে লাইনচ্যুত হলো তার ইতিহাস সবারই জানা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা, জেলখানায় হত্যা, ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে স্বাধীনতাবিরোধীদের ক্ষমতা দখল, সামরিক শাসন, মুক্তিযুদ্ধ ও বিপুল আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতার মূল প্রেরণা ও মূল্যবোধের বার্তা বহনকারী সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করার চেষ্টা, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ করা ও তাদের পুরস্কৃত করা, বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে মদদদাতা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে যুক্ত হওয়া–সবই সুস্থ গণতন্ত্রের পথে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছে দীর্ঘ দিন ধরে। এর বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামও চলেছে এবং বারবার গণতন্ত্রের ট্রেনকে পতিত দশা থেকে স্বাভাবিক লাইনে স্থাপনের চেষ্টা চলছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার-ব্যবস্থার আন্দোলন হচ্ছে ক্রেন দিয়ে সেই কাজটি সম্পন্ন করার একটি পথ। এটি একটি স্থায়ী ব্যবস্থা হতে পারে না যদিও।

গণতন্ত্রের ট্রেন বাংলাদেশে লাইনচ্যুত হওয়ার অনেক কারণের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো, ১৯৯৪-এর মাগুরা উপনির্বাচনে ভোটকেন্দ্রগুলো দখল করে ভয়াবহ ভোট কারচুপি। এ ঘটনায় নির্বাচন পরিদর্শনে আসা প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফ রাতে চুপিসারে মাগুরা ছেড়ে আসেন। যার পটভূমিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন শুরু হয়। এরই ফলে সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাস হয়। যদিও এই বিল পাস করা হয় মূল প্রস্তাবকে পাস কাটিয়ে।

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় ১৯৯৬ সালে বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে। এরপর আরও দুটি নির্বাচন হয়েছে। দ্বিতীয়টির প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন অবসর গ্রহণকারী প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান। এবং তৃতীয়টির প্রধান উপদেষ্টা হন দলীয় রাষ্ট্রপতি ইয়াজিউদ্দিন নিজেই অনেক কলাকৌশল করে। এর মধ্যে একমাত্র বিচারপতি হাবিবুর রহমানের দক্ষ নিয়ন্ত্রণে অনুষ্ঠিত প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচন সুষ্ঠু হতে পেরেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় যে নির্বাচন, তা নানা ষড়যন্ত্র ও দলীয়করণ চেষ্টায় হয়েছে।

কিছু কিছু ব্যবস্থা আছে, যা ব্যবহারের ভেতর দিয়ে অর্থাৎ অভিজ্ঞতার আলোকে ক্রমাগত সংশোধিত হয়ে শুদ্ধতর রূপ নেয় ভুল-ত্রুটি অতিক্রম করে। কিন্তু এমন কিছু ব্যবস্থা আছে, যা আকস্মিকভাবে সূচনা করলে যতটা সাফল্য দেখায়, বারবার ব্যবহারের ভেতর দিয়ে তা ক্রমাগত বেশি করে ত্রুটিপূর্ণ হয়ে ওঠে

ধাপে ধাপে অসাধু কৌশল এতে অনুপ্রবেশের ফলে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা এর দৃষ্টান্ত। এর কারণ, কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা বা কৌশল উদ্ভাবন করে যখন কোনো কারচুপি বন্ধের চেষ্টা চলে, অপ্রস্তুতির কারণে প্রথম দিকে সেটা যেমন সাফল্য পায়, পরে সময় পেয়ে দুষ্টচক্র দক্ষতর পথ উদ্ভাবন করতে পারে কারচুপির। কম্পিউটারে যারা ভাইরাস ঢোকায় তাদের অপচেষ্টা বন্ধ করতে অ্যান্টি ভাইরাস প্রোগ্রাম করে দেখা গেছে, কিছুদিনের মধ্যেই উন্নততর কৌশল উদ্ভাবন করে ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টি ভাইরাস প্রোগ্রামকে অকেজো করে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটনা আমরা দেখতে পাই তৃতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রস্তুতি নিয়ে। নিজেদের পছন্দমতো ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা করার অভিপ্রায় বিচারপতিদের চাকরির মেয়াদ কৌশলে বৃদ্ধি করা হয়। আন্দোলনের মাধ্যমে এই চেষ্টা বন্ধ করা হলে দলীয় রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার দয়িত্ব নিজেই গ্রহণ করলেন। শেষ পর্যন্ত অবৈধভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়দা তিন মাস থেকে দুই বছরে বৃদ্ধি করা হলো। এ ছাড়া নানা অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে শেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে। যার ফলে হাইকোর্ট থেকে এই সরকারব্যবস্থাকে সংবিধানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ও অবৈধ বলা হয়। এসব দুঃখজনক অভিজ্ঞতার পটভূমিতে বর্তমানের মূল সমস্যা যথা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও সর্বদলীয় সরকারব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যাক।

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন যা অনেকটা যান্ত্রিক, যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিবিদ, নির্বাচন কমিশন ও জনগণের সততা, প্রজ্ঞা, বিচারশক্তি, ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি। নির্বাচন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের একটি ধাপ মাত্র এবং গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য ও কর্মসূচির তুলনায় অনেক কম গুরুত্বের হয়ে ওঠে যখন গভীরভাবে গণতন্ত্রের অর্থ আমরা উপলব্ধি করি। নির্বাচনকালীন সরকার কালিক মাত্রায় অতি অল্প পরিসরের যেমন ঘরের জানালার কাচ স্থানিক মাত্রায় স্বল্প পরিসরের। জানালার কাচ স্বচ্ছ হলে যেমন এটি গুরুত্বহীন মনে হয়, নির্বাচন স্বচ্ছ হলেও নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। লক্ষণীয়, জানালার ভেতর দিয়ে যেমন তথ্য পাই বাইরের এলাকা থেকে, নির্বাচনের ভেতর দিয়ে জনমতের তথ্য পাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে। নির্দলীয় ও সর্বদলীয় সরকারের মধ্যে তুলনা টানতে গিয়ে প্রথমেই যেটা স্মর্তব্য, তা হলো, দুটো ব্যবস্থাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে এই অর্থে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার শুধু নির্বাচন সুষ্ঠু করার ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করবে এবং দৈনন্দিন স্বল্পমেয়াদি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করবে। পার্থক্য হলো, নির্দলীয় সরকারব্যবস্থায় রাজনীতিবিদদের অনির্ভরযোগ্য, পক্ষপাতদুষ্ট, অসৎ

ব্যক্তিরূপে বিবেচনা করে নির্বাচনের সব আয়োজন থেকে তাদের বাইরে রাখার চেষ্টা চলে এবং কাল্পনিক কিছু সৎ, নিরপেক্ষ, নির্লোভ, অরাজনৈতিক মানুষকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। অন্যদিকে সর্বদলীয় সরকারব্যবস্থায় রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের প্রতি আস্থা এবং সম্মান দেখিয়ে রাজনীতিবিদদের সক্রিয়তা, অভিজ্ঞতা, একত্রে কাজ করা ও সমস্যা সমাধানের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি এবং স্বচ্ছ নির্বাচন সম্পন্ন করা কথা।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ ও পরিকল্পনা নিয়ে কীভাবে একত্রে কাজ করবে? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, প্রকৃত রাজনৈতিক দল যেগুলো, তাদের একটি অভিন্ন লক্ষ্য থাকতেই হবে দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোবাসা এবং দায়িত্ববোধে, যা বিধৃত দেশের সংবিধানে। নির্বাচন-পূর্ব ও নির্বাচন-উত্তর সরকারের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের নিজস্ব কর্মপন্থা ও কর্মসূচি জনসমক্ষে তুলে ধরবে। এই ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য গণতন্ত্রের সহজাত বৈশিষ্ট্য, কিন্তু দেশকে কেন্দ্র করে যে ঐক্য অপরিহার্য উন্নয়নে অভিন্ন লক্ষ্যে পৌঁছায় তা নির্বাচনকালে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আদর্শ গণতন্ত্রে নির্বাচন একটি বিশুদ্ধ পরীক্ষা পর্ব জনমত যাচাইয়ের; যেখানে অবহিত, সচেতন নাগরিকগণ সন্ত্রাস, ভীতি ও প্রলোভনমুক্ত পরিবেশে সুস্থ বিচারশক্তি প্রয়োগ করে তাদের অভিমত প্রকাশ করবে। এটি একটি বিশুদ্ধ পরীক্ষার ফল, যা দলনিরপেক্ষভাবে জানা সবার জন্যই কাম্য। এই সত্য উদ্ঘাটনে বিভিন্ন দল একত্রে কাজ করতে পারে। একত্রে কাজ করা ও সমস্যা সমাধানের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব।

গণতন্ত্রের পথ হতে হবে উন্মুক্ত ও যোগাযোগভিত্তিক। আড়ালে রাজনীতিবিদদের ঠেলে দিয়ে নিষ্ক্রিয়-নির্লিপ্ত, রাজনীতিতে অনাগ্রহী, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিরপেক্ষতার অজুহাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের অভিজ্ঞতা আমরা পেয়েছি তিন-তিনটি নির্বাচনে। রাজনৈতিক সংকট ও সমস্যা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ; চাপ ও প্রলোভনের বিরুদ্ধে দৃঢ় ও সৎ থাকার পরীক্ষা যারা দেননি, তারা যে নির্ভরযোগ্য নন–তা প্রমাণিত। এ ছাড়া অরাজনৈতিক ব্যক্তির দায়বদ্ধতা থাকে না এবং ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকা জীবনধারায় অভ্যস্ত একজন সুধীজন সেই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দায়িত্ববোধ লাভ করেন না, যা একজন প্রকৃত রাজনীতিবিদ তার দীর্ঘ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে অর্জন করেন। আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যার একটি বড় কারণ ভুঁইফোড় রাজনীতিবিদদের আবির্ভাব, যা ঘটেছে নানা রাজনৈতিক দুর্ঘটনার ভেতর দিয়ে।

রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের প্রতি অবিশ্বাস এবং অনাস্থা দূর করা প্রয়োজন। এজন্য রাজনীতির সংস্কৃতি চাই। রাজনীতিবিদদের আস্থাবান হতে হবে জনগণের কাছে তাদের বিচারমূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে। এজন্য তাদের প্রয়োজনীয়

স্বাধীনতা দিতে হবে দক্ষতা প্রমাণের। এই ক্রান্তিলগ্নে সেটা ঘটতে পারে একটি ভারসাম্য সৃষ্টি করে এবং সেটা নিষ্ক্রিয়তা নয়, সক্রিয়তায়। এক্ষেত্রে সর্বদলীয় সরকার নির্বাচনকালে কার্যকর করাই সবচেয়ে বাস্তবভিত্তিক একটি প্রস্তাব। সবচেয়ে বড় কথা, সর্বদলীয় সরকার সংবিধানের মধ্যে থেকেই গঠন করা সম্ভব, যা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল উদ্দেশ্যকে রক্ষা করেও রাজনীতিবিদদের প্রতি সৃষ্ট অবিশ্বাস ও অনাস্থা দূর করতে পারে।

রাজনীতিবিদদের সরকারের বাইরে রাখলে তারা আড়াল থেকে কূটকৌশল প্রয়োগ করে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, যা দৃশ্যমান নয় বলে মানুষ তাদের আচরণের পরিচয় পাবে না। নির্বাচিত পতিনিধি থেকে নির্বাচনকালীন সরকার পরিচালনার দায়িত্ব দিলে তারা দায়ী থাকবেন এবং তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাবে। শুধু তারা ব্যক্তিগতভাবেই দায়ী থাকবেন না, যে রাজনৈতিক দলে তার অবস্থান সেই দলেরও দায়বদ্ধতা থাকবে; নির্দলীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে যা সম্ভব নয়। অসদাচরণ করে দেশের বাইরে চলে গেলেও কিছু করার থাকে না। একটি যান্ত্রিক তুলনা টেনে বলতে পারি, একটি গাড়িকে স্থির রাখা যায় ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে অথবা ইঞ্জিন সচল রেখে গাড়ির গিয়ার নিউট্রাল অবস্থানে রেখে। আকস্মিক বিপদ থেকে গাড়িকে রক্ষা করতে দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি শ্রেয়, যেমন শ্রেয় সর্বদলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

পূর্বে উল্লিখিত যে দুঃখজনক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করার দাবি উত্থাপিত হয়েছিল, তারপর অনেক অভিজ্ঞতা জমা হয়েছে এবং নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ভোট কারচুপি বন্ধ করার ক্ষেত্রে। নির্বাচন কমিশন প্রমাণ রেখেছে স্বচ্ছতায় পরিচালিত তার সব নির্বাচনে। ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা তৈরি এবং স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স মানুষের মন থেকে ভোট কারচুপি ঘটার সন্দেহ দূর করবে। নিছক জেদের বশবর্তী না হয়ে সংবিধানের মধ্যে থেকেই একটি সর্বদলীয় নির্বাচনকালীন সরকার সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে, যদি কোনো গোপন অভিসন্ধি থেকে বিরোধী দল নির্দলীয় সরকারের দাবিকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করতে না চায়।

অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রস্তাবনা অসাংবিধানিক হতে পারে, কিন্তু তা কি অগণতান্ত্রিকও?

তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ও এর অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি তুলেছে বিরোধী দলগুলো। সরকারি দল এই দাবিকে প্রত্যাখ্যান করছে অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক বলে। বিরোধী ও সরকারি দলের এই বিতর্ক, বাগ্‌বিতণ্ডার স্তর পার হয়ে প্রচণ্ড উত্তেজনা ও সংঘর্ষের রূপ নিয়েছে। এমনকি ভয়াবহ এক বিপর্যয়ের দিকে দেশ অগ্রসর হচ্ছে বলে সবাই আশঙ্কিত। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশ্নটি তাই নিছক রাজনৈতিক দলগুলোর দর-কষাকষির ব্যাপার বলে বিবেচিত হবার নয়। গভীরতর ও ব্যাপকতর দৃষ্টিতে বিষয়টি বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে রাজনৈতিক দুই পক্ষ যে এদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে একটুও নড়তে রাজি হচ্ছে না, তার সবটাই এদের জেদ, একগুঁয়েমি ও সমস্যার অনবধানতার কারণে নয়, বরং দলগত রাজনৈতিক স্বার্থ লঙ্ঘিত হবার ঝুঁকি রয়েছে আপস-মীমাংসা বা নমনীয়তা প্রদর্শনে, এমন একটি ভয় উভয় পক্ষের মধ্যে কাজ করছে। শেষে জনগণ নমনীয়তাকে দুর্বলতা বলে মনে করে ও নির্বাচনে এর প্রতিফলন ঘটে, সেই আশঙ্কা এখানে বিশেষভাবে কার্যকর। আসলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশ্নটি যথাযথভাবে আলোচিত হতে হলে একটি নৈর্ব্যক্তিক, নিরপেক্ষ ও নিঃস্বার্থ দৃষ্টি চাই। এই মুহূর্তে যা আসতে পারে শুধু জনগণের কাছ থেকে। কারণ, জনগণই মাত্র ক্ষমতা হারাবার আশঙ্কা বা ক্ষমতা লাভের মোহ থেকে মুক্ত, ফলে নির্লোভ ও নিরপেক্ষ হয়ে লাভ করতে পারে সাহসিক আচরণ।

কোনো সমস্যাকে যথার্থভাবে বোঝার ক্ষেত্রে এবং অন্যের বক্তব্য অনুধাবনে পরস্পরের অবস্থান যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করতে বার্ট্রান্ড রাসেল একটি ঘটনার অবতারণা করেন : দুজন মহিলা ভিন্ন দুই আঙিনায় দাঁড়িয়ে বাগ্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ দেখে, রাসেল অভিমত প্রকাশ করেন যে, এঁরা কখনোই মীমাংসায় পৌঁছতে পারবেন না, কারণ এরা দুই প্রিমিসে দাঁড়িয়ে তর্ক করছেন। রাসেল অবশ্য প্রিমিস শব্দের অর্থের দ্বিত্ব ব্যবহার করেন। অর্থাৎ প্রিমিস শুধু চারদিকে ঘেরা আঙিনা বোঝায় না, যুক্তি প্রয়োগের প্রাথমিক স্বীকার্য বা প্রতীজ্ঞাও বোঝায়। আমাদের বর্তমান সমস্যা হলো, একটি অভিন্ন প্রিমিস থেকে (প্রিমিসের উভয়

অর্থেই) রাজনৈতিক দলগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশ্নটি বিচার করতে পারছে না। যেহেতু এটি দাবি হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে বিরোধী দলগুলো থেকে এবং তা প্রতিহত করছে সরকারি দল, ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে যাঁরা বলছেন তাঁরা চিহ্নিত হচ্ছেন বিরোধী ও সরকারি দলের সমর্থকরূপে।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে একটি কাল্পনিক মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায় সাময়িকভাবে অবতীর্ণ হতে অনুরোধ জানাতে পারি। পরীক্ষাটি হলো, সরকারি দলের লোকেরা নিজেদের বিরোধী দলের বলে ভাববেন এবং বিরোধী দলের লোকেরা নিজেদের সরকারি দলের বলে কল্পনা করবেন। সরকারি দলের কথাই এবার ধরা যাক। এই দল যদি এই উপলব্ধিতে উপস্থিত হয় যে, কোনো একটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আছে এবং সেই দলের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে বলে বিশ্বাস স্থাপন করা যাচ্ছে না, তখন কি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের প্রস্তাবনা অতটা অযৌক্তিক মনে হবে তাদের কাছে, যেমনটি এখন মনে হচ্ছে? স্মর্তব্য যে আওয়ামী লীগ একসময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রস্তাবনা অযৌক্তিক মনে করেছিল এবং নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে সেই প্রস্তাবই এই দল এখন উত্থাপন করছে। রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে এই কাল্পনিক অবস্থান বিনিময়ের পরীক্ষাটি যদি সম্ভব না হয়, তাহলে এ প্রবন্ধের বক্তব্য হয়তো তাদের বুঝতে মনস্তাত্ত্বিক বাধা সৃষ্টি হবে। সে ক্ষেত্রে আমার প্রত্যাশা শুধু সেই সব পাঠকের কাছে যারা নির্বিচারে কোনো দলের অন্ধ সমর্থক নন, অন্তত যাঁদের কাছে দলীয় নীতির চেয়ে গণতন্ত্রের আদর্শ ও জনগণের কল্যাণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

শুরুতেই বলে রাখা প্রয়োজন, বক্ষ্যমাণ নিবন্ধের লক্ষ্য খুব সীমিত। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রস্তাবনা অসাংবিধানিক কি না, সে প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান এখানে থাকবে না, সংবিধান লঙ্ঘন না করে কোনো মীমাংসা সম্ভব কি না সে আলোচনাও নয়। রাজনীতিবিদদের প্রতি কোনো পরামর্শ বা উপদেশ প্রদানও এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়। শুধু একটি প্রশ্নের ওপর আলোকপাতের চেষ্টা চলবে এখানে, এবং তা হলো : অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রস্তাব গণতান্ত্রিক মূলধারা ও চেতনার পরিপন্থী কি না?

আলোচনার সুবিধার জন্য কয়েকটি স্বীকার্য প্রথমেই ধরে নেওয়া যাক। প্রথম স্বীকার্য হলো, সংবিধান ও গণতন্ত্র সমার্থক নয়, যদিও এরা পরস্পরের সহায়ক হতে পারে। দ্বিতীয় স্বীকার্য হলো, গণতন্ত্রের কোনো পূর্বনির্ধারিত ও অপরিবর্তী সংজ্ঞার্থ নেই। এটি তৈরি পোশাকের মতন বিদেশ থেকে আমদানিযোগ্য কোনো সামগ্রী নয়, যা দেশের আর্থসামাজিক, নৈতিক ও মানসিক অবস্থা নির্বিশেষে ব্যবহৃত হতে পারে, নিজেদের কোনো মৌলিক অবদান ও উদ্ভাবন ছাড়াই। তৃতীয় স্বীকার্য, গণতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা অর্থাৎ নির্বাচিত সরকারের স্থিতিকাল এবং গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ নির্বাচনের ভেতর দিয়ে সরকার পরিবর্তনের যে

প্রক্রিয়া, তা অবিচ্ছিন্ন ও অনবচ্ছেদ ব্যাপার নয়। অর্থাৎ নির্বাচিত দুটি গণতান্ত্রিক সরকারের স্থিতিকালের মধ্যবর্তী যে পর্যায়কাল তা সরকার পরিবর্তন বা রূপান্তরের সময় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে। দুই বড় সংঘাত উন্মুখ রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষুদ্র ও নিরপেক্ষ বাফার (Buffer) রাষ্ট্রের মতন এটি কাজ করতে পারে। বাফার রাষ্ট্র দুই ভিন্ন ভৌগোলিক এলাকার মধ্যেকার পরিবর্তনকে যেমন ধারণ করে, স্বল্পমেয়াদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার তেমনি পর্যায়ক্রমে দুই নির্বাচিত সরকারের দীর্ঘতর স্থিতিকালের মধ্যে রূপান্তরের সংক্ষিপ্ত কাল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

শেষ স্বীকার্যটি হলো, জনসাধারণ সমস্ত ভুলত্রুটি ও দুর্বলতা নিয়েও শেষ পর্যন্ত ভালো-মন্দের বিচার করার যোগ্যতা রাখে। এবং এ জন্যই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব। কিন্তু গণতন্ত্র যে অপরিহার্য তার কারণ, মানুষ মাত্রেরই লোভ, স্বার্থ ও পক্ষপাতিত্বের প্রতি প্রবণতা রয়েছে। গণতন্ত্র তাই অরক্ষিতভাবে কোনো ব্যক্তি বা দলের হাতে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

প্রস্তাবিত স্বীকার্যগুলো এবার একটু বিশ্লেষণ করা যাক। সংবিধান স্বভাবতই কোনো দেশের পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল, যেখানে সরকার গঠন ও পরিচালনা এবং মানুষের অধিকার রক্ষার মূল নীতিমালাবিধৃত। সংবিধানকে গণতন্ত্রের রক্ষাতাবিজ বলে অনেকে আখ্যায়িত করেও থাকেন। তবু সংবিধান ও গণতন্ত্র সমার্থক নয়। সংবিধান একটি লিপিবদ্ধ গ্রন্থ, যা মলাটের মধ্যে আবদ্ধ, সংজ্ঞায়িত ও সীমিত। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, চেতনা, মানবিক মূল্যবোধ ও সৃজনশীলতায় সংবিধান রচিত হতে পারে, তবু এর নিজস্ব কোনো চেতনা ও সৃজনশীলতা নেই। যতই উজ্জ্বল হোক তথ্য ও অভিজ্ঞতার ছাপ বহন করে, সংবিধান শেষ পর্যন্ত একটি মৃত গ্রন্থ। এর অতীত আছে এবং সদ্যরচিত হলে বর্তমানের ছাপও এতে থাকতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যৎকে দেখার ক্ষমতা পূর্ণাঙ্গভাবে কোনো লিখিত গ্রন্থে থাকে না। সময় একটি নিরপেক্ষ মাত্রা, যেখানে আগামীকালের সামগ্রিক অবস্থা জানতে হলে অপেক্ষা করতে হবে আগামীকাল পর্যন্ত।

সংবিধান মাত্রেই বিশেষ একদল বিশেষজ্ঞের দ্বারা রচিত সরকার পরিচালনার নীতিমালা, যা স্থান-কাল ও নির্দিষ্টসংখ্যক মানুষের প্রজ্ঞায় সীমাবদ্ধ। সংবিধান নিজে কথা বলে না বলে এর প্রয়োগ ও ব্যাখ্যায় এর মূল আদর্শ ও নীতি বিকৃত হতে পারে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাষ্ট্রনায়কের হাতে। এর একটি বড় দৃষ্টান্ত হলো অত্যন্ত আধুনিক, গণতান্ত্রিক ও মানবিক একটি সংবিধান স্বাধীন বাংলাদেশে রচিত হবার পরও জাতির জনক এবং সংবিধানের রূপকার বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যাকারীদের বিচার বন্ধ রাখা সম্ভব হয়েছে, সেই সংবিধানের দোহাই দিয়েই। বিচারের বাণী কি এখানে নীরবে-নিভৃতে কাঁদছে না সংবিধানে চাপা পড়ে? আধুনিক গণতন্ত্রের যে আদর্শ তার মূলে আছে ব্যক্তিমানুষের সৃজনশীলতা ও প্রতিভার ওপর

অন্তহীন বিশ্বাস। এই ব্যবস্থায় মানুষ তার বুদ্ধি, শ্রম ও দক্ষতাকে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারবে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে। প্রতিটি মানুষ লাভ করবে চিন্তার স্বাধীনতা, শিক্ষার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, যাতে সে পারস্পরিক যোগাযোগের ভেতর দিয়ে পরিবেশকে বদলাতে পারে। কর্মের স্বাধীনতা নিয়ে সে নিজের ভাগ্যকে গড়তে পারবে, থাকবে আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা, যাতে কেউ তার ওপর আধিপত্য বিস্তার না করতে পারে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যৌথ জীবন ও পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে প্রত্যেকেরই দায়িত্ব পালন আছে। কিন্তু ব্যক্তিমানুষের ওপর রাষ্ট্র বা সমষ্টির যে কর্তৃত্ব তা নির্ধারণ করবে জনগণ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার নির্বাচন আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নয় মাত্র। জনগণ যে সমস্ত ক্ষমতার উৎস এই সত্য বাস্তবে রূপায়িত হওয়া চাই, ভয়, লোভ ও প্রভাবমুক্ত স্বাধীন পরিবেশে, পরম সততার সঙ্গে ভোট গ্রহণের মাধ্যমে। এই নির্বাচন-প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধতা অপরিহার্য এই জন্যে যে, রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মপরিকল্পনা, রাজনৈতিক আদর্শ ও দক্ষতা যাচাই করে তার ভিত্তিতে জনগণ তাদের সমর্থন বা অসমর্থন জানাবে। এই বাছাই ও নির্বাচনের দায়িত্ব জনগণের এবং তাদের যৌথ সিদ্ধান্তের ফলাফল, ভালো হোক অথবা মন্দ হোক, জনগণই ভোগ করবে। এখানে ভুল করার ঝুঁকি গ্রহণ ও পরবর্তী নির্বাচনে সে ভুল সংশোধনের স্বাধীনতাও জনগণের।

বহুদলীয় গণতন্ত্রের মূল কথাই হলো জনগণের সামনে সরকার নির্বাচনের বিকল্প পথ উন্মুক্ত থাকবে এবং সরকারকে প্রতি মুহূর্তে যাচাই ও সমালোচনার জন্য বিরোধী দল সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। বস্তুত সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনপ্রাপ্ত সরকার মাত্রেই গণতান্ত্রিক সরকার, এ কথা সত্য নয়। কারণ নেপোলিয়ন, হিটলার, মুসোলিনি সবাই জনসমর্থন নিয়েই একনায়কত্ব চালিয়েছে। গণতন্ত্রের সমস্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও দুটো রক্ষাকবজ এখানে তাই থাকার কথা। এর একটি হলো, সার্বক্ষণিকভাবে এর কার্যক্রম সমালোচনার দৃষ্টিতে যাচাই করা এবং অন্যটি হলো নির্বাচনের ভেতর দিয়ে সরকার বদল ও বর্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা জনগণের জন্য নিশ্চিত করা। গণতন্ত্র যে তৈরি পোশাকের মতন অন্যদেশ থেকে আমদানি করা সম্ভব নয়, দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নির্মাণ করতে হয় সৃজনশীলতায় ও জাতীয় অবদানের ভেতর দিয়ে, এই সত্য গণতন্ত্রে মুক্ত সংজ্ঞার্থের মধ্যেই নিহিত। রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি ও পরিকল্পনা নির্ধারণে জনগণ যেখানে তাঁদের স্বাধীনতা, রুচি ও দক্ষতা প্রয়োগ করবে, সেখানে সেই জনগণের শিক্ষা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ ও বিশ্বাস নির্বাচনের ভেতর দিয়ে প্রতিফলিত হবার কথা, সেই সঙ্গে দেশের সম্পদ, জনগণের সমস্যা ও সামর্থ্যের দিকটাও। গণতন্ত্র নিজস্ব গতিশীলতায় সব মানুষের ভাবনা ও অবদানকে লালন করতে গিয়ে রূপ বদলাবেই, স্থান ও কালের পরিধিতে। যদিও মূল ধারা ও আদর্শ বদলে যাবে না।

সংবিধান তাই চিরন্তন ও ওপর থেকে অবতীর্ণ নয় ধর্মগ্রন্থের মতন। অবশ্য সংবিধানকে খাটো করে দেখারও অবকাশ নেই। প্রতি মুহূর্তে গণতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করছে সংবিধান। কিন্তু স্থিতির জড়তায় নয়, গতির জড়তায়; যেমন করে আমরা পথ চলি। পথ চলার সময় আমাদের শরীর ঝুঁকে যায় সামনে, ফলে দেহের ভরকেন্দ্র থাকে পায়ের বাইরে। পতন থেকে রক্ষা পেতে পা-টাকে এগিয়ে দেই সামনে, কারণ পা-ই তো বহন করবে দেহের ওজন। পর্যায়ক্রমে চলে এই প্রক্রিয়া। অর্থাৎ দেহটাকে সামনের দিকে এগিয়ে দেওয়া এবং পর মুহূর্তেই পা-কে এগিয়ে পতন থেকে রক্ষা পাওয়াই হচ্ছে চলা। সংবিধানও গণতন্ত্রের পথ চলাকে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়মের শৃঙ্খলায়, রক্ষা করে পতন ও বিচ্যুতি থেকে ঐতিহ্যের ধারায়। কিন্তু যেখানে অগ্রগতি আছে, নতুন উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতা— সেখানে নিয়ম ও শৃঙ্খলার যান্ত্রিক বাড়াবাড়ি বা অসৎ প্রয়োগ অন্তরায় সৃষ্টি করে গণতন্ত্রের পথে।

গণতন্ত্র এই আপাত-পরস্পরবিরোধী লক্ষ্য, অর্থাৎ শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা, ঐতিহ্য ও উদ্ভাবনকে ধারণ করে। গণতান্ত্রিক জীবনধারায় অসংখ্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা, অভিমত, স্বাধীন চিন্তা ও অবদানকে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে একটি ব্যবস্থার মধ্যে ধারণ করতে হলে একটি গতিশীল ভারসাম্য রক্ষা করেই মাত্র তা সম্ভব। প্রত্যেক জাতিকেই নিজস্ব উদ্ভাবন ও অবদানের ভেতর দিয়ে গণতন্ত্রকে সচল ও সজীব রাখতে হয়। এখানে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ আছে, অনিশ্চয়তার ঝুঁকি আছে, সেই সঙ্গে আত্মবিশ্বাস ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ। গণতন্ত্রের সহনশীলতা নিছক ভদ্রতা নয়। কারণ, অন্যের ভুল-ত্রুটির যথার্থ বিশ্লেষণ বা গুণাবধারণ ও অবদানের উপলব্ধি বুদ্ধিগত কর্ম, কৃত্রিম আচরণ নয়। অন্যের সৃজনশীলতাকে আবিষ্কার করতেও সৃজনশীলতার প্রয়োজন। গণতন্ত্রে অন্ধ অনুকরণ ও যান্ত্রিকতার তাই অবকাশ নেই, ব্যক্তির আধিপত্য বিস্তার অথবা ব্যক্তিমানুষের ওপর দলগত শক্তির কর্তৃত্ব গণতন্ত্রের পথে বড় অন্তরায়। কারণ সৃজনশীলতা সেখানে বাধাপ্রাপ্ত।

তৃতীয় স্বীকার্যে এবার আসা যাক। আমরা বলেছি, গণতন্ত্রের কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ নির্ধারণ সম্ভব নয়, গণতন্ত্র এক বিকাশমান ধারা, যা দেশ, কাল ও চেতনার স্তরনিরপেক্ষও নয়। গণতন্ত্র কোনো পরিশুদ্ধ, নির্ভুল, পরিপক্ব ও পরিণত রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয়, যা চরম লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। গণতন্ত্র হচ্ছে পরীক্ষা ও নব নব অভিজ্ঞতার আলোকে ও সম্মিলিত স্বাধীনতায় ক্রমাগত শুদ্ধতর রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়া। গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার যৌথ প্রকাশ। এই স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় দিক হচ্ছে মানুষের মনের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, ব্যক্তিজীবনের সাফল্য ও শান্তি অর্জনের লক্ষে কাজ করার স্বাধীনতা। সত্যিকার গণতন্ত্রে চাপিয়ে দেওয়া আদর্শ, দলগত স্বার্থ বা ব্যক্তিমানুষের আধিপত্য বা কর্তৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণের কোনো অবকাশ নেই।

একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অন্তর্গত সমগ্র জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণ

ও প্রয়োগের যে প্রকৌশল তাই বাস্তবে রূপ লাভ করে নির্বাচনব্যবস্থায়, সংসদ পরিচালনায়, সরকার গঠন ও সরকারি কর্মকাণ্ডে। মনে রাখতে হবে, এ সবই কৌশলগত ব্যবস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ গণতন্ত্রের। কিন্তু গণতন্ত্রের আত্মা, এর মূল আদর্শ ও রাজনৈতিক সমস্ত শক্তির উৎসের মূলে রয়েছে জনগণ। শুধু দলবদ্ধ জনগণ নয়, প্রত্যেকটি ব্যক্তিমানুষের স্বাধীন অস্তিত্ব। ব্যক্তিমানুষের ওপর যে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ এবং আরোপিত যে দায়িত্ব তা সরকারি প্রশাসনব্যবস্থার হাতে থাকলেও জনগণের কল্যাণের জন্যই তা নিয়োজিত হতে হবে, এমন একটি প্রচ্ছন্ন অঙ্গীকার ও শর্ত থাকে গণতন্ত্রে।

এই নীতির স্পষ্টতম প্রকাশ আমরা দেখতে পাই আব্রাহাম লিংকনের উক্তিতে, যেখানে তিনি বলেছেন, গণতন্ত্রে সরকার হচ্ছে জনগণের, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত এবং জনগণের জন্য। এখানে লক্ষণীয় যে জনগণ শব্দটি একই বাক্যে তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এরা কি একই জনসমষ্টি? আমার মতে 'জনগণ' কথাটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এখানে ব্যবহৃত। গণতন্ত্রে যারা ভোট দেয়, তারা তো দেশের সমগ্র জনগণ নয়। কিন্তু সরকার অবশ্যই সমগ্র জনগণের। একটি যথার্থ সরকার ভবিষ্যতের কথা ভেবেও পরিকল্পনা করে, সেখানে অনাগত মানুষগুলোর জন্যও সরকার কাজ করে। আসলে জনগণ বলতে যে অনির্দিষ্ট ও অসংজ্ঞায়িত জনসমষ্টির প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে, সেখানেই গণতন্ত্রের সীমানা উন্মুক্ত। এখানে লক্ষণীয় যে সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হবে, এটি গণতন্ত্রের একটি শর্ত। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো যে দুটো শর্ত তা হলো, সরকার জনগণের ও জনগণের জন্য। এই যে জনগণ, যাদের জন্য সরকার ও যাদের সরকার তারা শুধু ভোটদাতা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ নয়; এদের মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ ও ব্যক্তিমানুষ, এমনকি যারা ভোট দেয়নি তারাও অন্তর্ভুক্ত।

আগেই উল্লেখ করেছি যে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভকে যদি গণতন্ত্রের একমাত্র শর্ত ধরা হয়, তাহলে পৃথিবীর সব সরকারই প্রায় গণতান্ত্রিক বলে দাবি করতে পারে। কারণ শুধু জনগণ দ্বারা সংগঠিত বিপ্লব ও বিদ্রোহ ছাড়া অন্য সব সময়ই জনগণ প্রত্যক্ষভাবে না হোক, পরোক্ষভাবে সরকারকে মেনেই নেয়। সেই সমর্থন ভয়ে, অজ্ঞতায়, আত্মবিশ্বাসের অভাবে বা সংস্কারের প্রভাবে হতে পারে। সুতরাং যে সংখ্যাধিক্যের সমর্থনে গণতান্ত্রিক সরকার নির্বাচিত হবে সেই জনগণ হতে হবে মুক্ত ও অবহিত, যারা তাদের স্বাধীন ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে প্রভাবমুক্ত হয়ে এবং অনুষ্ঠিত নির্বাচন সমস্ত রাজনৈতিক দল ও জনগণের বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করবে।

গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার যে জনগণের সরকার হবে (of the people) ও জনগণের জন্য হবে (for the people) এটা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া বেশ জটিল। রাজনৈতিক যে আদর্শ, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির ভিত্তিতে কোনো দল

নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করে সেগুলো যদি পালিত হয়, সে ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে জনগণের দ্বারাই দেশ পরিচালিত হলো বলে ধরে নেয়া হয়। এবং সেটাই মূল যুক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সরকার গঠন করতে দেওয়ার। এই ব্যবস্থার একটি বাড়তি সুবিধা হলো, জনগণের সমর্থিত ধারায় দেশ পরিচালিত বলে কাজের দক্ষতাও বৃদ্ধি পাবার কথা। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মসূচি ও পরিকল্পনা যেখানে ব্যাখ্যাত নয় এবং জনগণ অবহিত হয়ে ও সমগ্র স্বাধীনতা নিয়ে সরকার নির্বাচন করতে ব্যর্থ, সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে যান্ত্রিকভাবে সরকার নির্বাচিত হলেও গণতন্ত্রের মূল আদর্শ ও লক্ষ্য সেখানে অনুপস্থিত। এ জন্যই নির্বাচন কোনো অন্তঃসারশূন্য লটারি খেলা নয়, এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া জনমত যাচাই ও এর ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র পরিচালনার। এই প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপের গভীর গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা আছে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও লক্ষ্যকে সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতির একটি অপরিহার্য রক্ষাকবজ হলো সরকারকে এর কাজের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য করা। ভোটদানের স্বাধীনতা ছাড়াও সরকারের কাজের বিচার-বিশ্লেষণ, সমালোচনা ও যাচাইক্রিয়া পরিচালনা জনগণের একটি বড় অধিকার এবং দায়িত্বও। এই বিচার-বিবেচনা ও সমালোচনা সংঘটিত হয় আনুষ্ঠানিকভাবে বিরোধী দলের প্রশ্ন উত্থাপন ও বিতর্কের ভেতর দিয়ে। এ ছাড়া পত্র-পত্রিকা, নানা সংবাদ মাধ্যম, সভা-সমিতি, নানা প্রতিষ্ঠান, বিচার বিভাগ জনসাধারণ সবাই সরকারের কাজের সমালোচনা ও মূল্যায়নের ভেতর সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেখানে যথার্থ বিরোধী দল নেই এবং সমালোচ ভেতর দিয়ে চাপ সৃষ্টি করে সরকারকে ভুলভ্রান্তি ও বিচ্যুতি থেকে রক্ষা কর স্বাধীনতা, সেখানে গণতন্ত্র অনুপস্থিত। অবশ্য বিরোধী দলের দায়িত্ব গঠনমূলক সমালোচনার ভেতর দিয়ে সরকারকে সব রকম বিচ্যুতি, অসাধুতা ও অপশাসন থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা। সরকারি দল ও বিরোধী দল পরস্পরের বিরোধিতায় যখন অবতীর্ণ হয়, তখন যদি উভয়েই জনগণের চাইতে তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে, গণতন্ত্র সেখানে লজ্জিত হয় এবং জনগণ হয় লাঞ্ছিত।

বিরোধী দল যে গণতন্ত্রের অপরিহার্য অংশ এই উপলব্ধি শুধু বাংলাদেশে নয়, প্রাচ্যের সব দেশেই প্রায় অনুপস্থিত। আসলে আমরা ভুলে যাই যে, পথের অমসৃণতার জন্য যে ঘর্ষণ সৃষ্টি হয় আমাদের পায়ের তলায় বা গাড়ির চাকায়, তা পথ চলার জন্য অপরিহার্য। যেখানে বরফঢাকা মসৃণ রাস্তায় গাড়ির চাকা শুধু ঘুরতে থাকে কিন্তু সামনে এগোতে পারে না, সেখানে চাকায় শিকল জড়ানো হয় কৃত্রিমভাবে ঘর্ষণ সৃষ্টি করতে। ভারসাম্য হারিয়ে চিৎপটাং হবার ঘটনা ঘটে পিচ্ছিল পথেই। স্তাবক ও চাটুকার-পরিবৃত রাজার রাজ্য শাসন হলো রাজতন্ত্রের ধারা। সেখানে রাজা জনপ্রিয়ও হতে পারেন, জনসমর্থিতও, যেমনটি ঘটতে পারে

যেকোনো একনায়কের ক্ষেত্রেও। কিন্তু গণতন্ত্রে প্রতিপক্ষ থাকবেই, সমালোচনা, প্রতিযোগিতা ও বিরোধিতা নিয়ে। গণতন্ত্র তাই পথ চলার মতন। অতিমসৃণতা অর্থাৎ দালাল ও স্তাবকের উপস্থিতি এখানে বিপজ্জনক।

গণতন্ত্রে নির্বাচনের ভেতর দিয়ে আসলে জয়-পরাজয় শুধু নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় সরকারি ও বিপক্ষ দল, যারা পরস্পরের পরিপূরকরূপে কাজ করার কথা। বস্তুগত কায়ামাত্রেরই যেমন ছায়া আছে, তেমনি গণতান্ত্রিক সরকার মাত্রেরই বিরোধী দল থাকবেই, যারা আসলে ছায়া সরকার গঠন করে থাকে। প্রবাদে আছে, একমাত্র ভূতেরই ছায়া থাকে না। তাহলে বিরোধী দলহীন সংসদও কি ভুতুড়ে সংসদ? বিপ্লব বা যুদ্ধে যে বিপক্ষতা বা বিরোধিতা সেটা সাময়িক, শুধু যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের জন্য। কিন্তু গণতন্ত্রে বিরোধী দলের উপস্থিতি হতে হয় সার্বক্ষণিক, জীবন্ত মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের মতন যা বেদনাবোধের সংকেত ক্রমাগত মস্তিষ্কে পৌঁছে দিয়ে বিপদ থেকে রক্ষা করে মানবদেহকে। যুদ্ধ বা বিপ্লবে সাহসিকতা হলো মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে আত্মদানের সাহসিকতা, গণতন্ত্রে সাহসিকতা হলো আপাত ব্যক্তিগত ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে সত্য বলার সাহসিকতা। যুদ্ধে বড় শত্রু বিশ্বাসঘাতক, গণতন্ত্রের বড় শত্রু চাটুকার।

নির্বাচন কোনো লটারি খেলা নয় এবং ভোট প্রদান নয় কোনো সম্প্রদান ক্রিয়া, যার ভেতর দিয়ে নিঃশর্ত ভিক্ষাপ্রাপ্তির মতন আকস্মিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রাপ্তি ঘটবে কোনো রাজনৈতিক দলের। ফলে, দুই নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য জনগণ নিশ্চুপ ও নির্বিকার বসে থাকবে নিষ্ক্রিয়ভাবে, এমনটি প্রত্যাশিত নয়। আসলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের সমস্ত কাজের বিশ্লেষণ, বিচার ও মূল্যায়ন ঘটার কথা জনসাধারণের দ্বারা বিভিন্ন পর্যায়ে এবং সমালোচনার দৃষ্টিতে।

এই প্রক্রিয়াটি ঘটে দীর্ঘ সময় ধরে, যদিও নির্বাচনের ভেতর দিয়ে স্বল্প সময়ের পরিসরে জনমত যাচাইয়ের ব্যাপারটি সংঘটিত হয়। সুতরাং গণতান্ত্রিক সরকার যদি জনগণের হয় এবং জনগণের দ্বারা ও জনগণের জন্য, তাহলে সচেতন, অবহিত ও সরকার পরিবর্তনের সাধ্যতা প্রাপ্ত জনগণের জনসমর্থন নিশ্চিত করতে হবে সর্বক্ষণের জন্য। আদর্শ এই ব্যবস্থা অর্জন দুঃসাধ্য হলেও, বাস্তব ব্যবস্থারূপে বিরোধী দল জনগণের প্রতিনিধিরূপে সরকারের কাজের পর্যালোচনা ও সমালোচনা করার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে। বিরোধী দলের বাইরেও নানা প্রতিষ্ঠান আছে সরকারের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ ও যাচাই করার। বিচার বিভাগ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংবাদমাধ্যম ও নানা সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে জনগণ এ দায়িত্ব পালন করার কথা, এমনকি নিজ দলের সাংসদদেরও

সরকারের সঙ্গে জনগণের এই মিথস্ক্রিয়ার পূর্বশর্ত হলো জনগণের সঙ্গে সরকারের যোগাযোগসাধ্যতা ও সরকারের জনমতগ্রাহ্যতা। গণতন্ত্রে জনসমর্থন কোনো দলা পাকানো সামগ্রী নয়, যা মুহূর্তের মধ্যে কোনো দলের প্রতি জনগণ

নিক্ষেপ করে দেয়। জনমত একটি অব্যাহত সচেতন প্রভাববলয় যা প্রতিনিয়ত সঞ্জায়িত, পরিবর্তিত ও বিস্তারমান। একটি অসামঞ্জস্য এখানে লক্ষণীয়। জনমত যেখানে ক্রমপরিবর্তিত অনবচ্ছেদ একটি প্রভাবক্ষেত্র, সেই জনমতের ভিত্তিতে সরকার পরিবর্তনের যে অনুসৃত পদ্ধতি নির্বাচনের ভেতর দিয়ে তা ঘটে আকস্মিকভাবে। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে রাষ্ট্র পরিচালনা, অর্থাৎ দুই নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ের যে সরকার, এবং নির্বাচনের ভেতর দিয়ে সরকার পরিবর্তনের যে সন্ধিক্ষণ, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের।

নির্বাচনে আসলে একপর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে, এক দশা থেকে অন্য দশায় যাবার ঘটনা। দেয়াল যেমন একটি ঘরকে অন্য ঘর বা বাহির থেকে পৃথক করে, নির্বাচন তেমনি পর্যায়ক্রমে নির্বাচিত দুই সরকারের মধ্যবর্তী একটি ব্যবস্থা। দেয়াল দিয়েই ঘর সংজ্ঞায়িত হয়। দেয়ালই সীমানা নির্ধারণ করে ঘরের। দেয়াল ঘরের অপরিহার্য অংশ। কিন্তু দেয়াল ঘর নয়। ঘরের মধ্যে আমরা নির্বিচারে চলাচল করতে পারি, কিন্তু দেয়ালের মধ্যে প্রবেশ করতে গেলেই আহত হতে হবে। এই অর্থে দেয়াল পাশাপাশি দুই ঘরেরই অংশ, কিন্তু দুই ঘরের অধিবাসীর জন্যই অপ্রবেশ্য। একইভাবে নির্বাচনসংক্রান্ত যে ঘটনামালা তার মধ্যে নির্বাচিত বা নির্বাচিতব্য কোনো সরকারের অনুপ্রবেশ আদর্শগতভাবে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

নির্বাচন আসলে সম্পূর্ণ জনগণের ব্যাপার। স্বাধীন, প্রভাবমুক্ত ও অধিকারপ্রাপ্ত হয়ে জনগণ রায় প্রদানের পরই মাত্র তাদের ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় সরকার ও সংসদের কাছে। গণতান্ত্রিক ধারাকে তাই দুটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি। একটি হলো নির্বাচন-পূর্ব ও নির্বাচন-উত্তর সরকার, দুই-ই জনগণ দ্বারা নির্বাচিত। আর একটি হলো অন্তর্বর্তীকালীন ধাপ, যেখানে সরকারের দক্ষতা, সাফল্য ও ব্যর্থতা, অঙ্গীকার পূরণ ইত্যাদি যাচাই করে জনগণ তাদের মত প্রকাশ করবে ভোটদানের ভেতর দিয়ে।

এ ক্ষেত্রে সরকারি দলসহ সমস্ত রাজনৈতিক দল আসলে পরিক্ষার্থী এবং জনগণ পরীক্ষক। যদিও প্রচলন আছে যে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারই নির্বাচন সম্পন্ন করে যাবে নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে, আসলে গণতন্ত্রের মূলধারায় এটি অপরিহার্য অংশ নয়, বরং গণতন্ত্রের পরিপন্থী। যদি জনগণ ক্ষমতাসীন দলের ওপর এই আস্থা পোষণ করে যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব তারা পালন করতে পারে সেখানে এই বিতর্কের অবশ্য প্রয়োজন হয় না—কে এই দায়িত্ব পালন করবে? কিন্তু বিশ্বাসযোগ্যতা জোর করে দাবি করা যায় না। এটি অর্জিত হবার এবং সে রায় দেবার দায়িত্ব জনগণের। এটা খুবই লজ্জার কথা যে নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা এখন প্রশ্নের সম্মুখীন, কোনো দেশেই যা নেই এবং গণতন্ত্রে কোথাও এটি আমাদের দেশের মতন বড় সমস্যারূপে আত্মপ্রকাশ করেনি।

যদি আমরা স্বীকার করি যে নির্বাচন হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনের

সন্ধিক্ষণ এবং এই পর্বের দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য নির্বাচিত সরকারের কার্যকাল থেকে ভিন্ন, তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা অগণতান্ত্রিক মনে হবার কোনো কারণ থাকে না। একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার কারা গঠন করবে? তারা যদি নির্বাচিত না হয়, তাহলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতের ভিত্তিতে গঠিত হবে এই নীতির কি লঙ্ঘন ঘটল না? এর জবাব হচ্ছে, কোনো নির্বাচিত সরকার যখন পরবর্তী নির্বাচনে হেরে যায় তার অর্থ কি এই নয় যে, তারা নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনেক আগেই সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন হারিয়েছিল? কারণ জনমত তো একদিনে বদলে যায় না। আগেই বলেছি, জনমত একটি অনবচ্ছেদ ব্যাপার। ফলে সরকার সব সময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে হতে হবে, এই আদর্শ থেকে কিছুটা বিচ্যুতি গ্রহণ করতেই হচ্ছে বাস্তব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। আমাদের বর্তমান সরকারও প্রকৃত অর্থে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট পায়নি, তবু একে আমরা গণতান্ত্রিক সরকারই বলি যথার্থ অর্থেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারও নির্বাচিত না হয়েও গণতন্ত্রের বাস্তবতাকে সার্থক করার জন্যই গ্রহণীয় হতে পারে। জনসমর্থন নিয়ে গণতান্ত্রিক সরকারের যে কার্যকাল সেটি অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু এর বিশুদ্ধতা ও প্রশ্নাতীত বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্যই নির্বাচন সংঘটিত হতে পারে নিরপেক্ষ এক সরকার দ্বারা যাকে মানুষ গ্রহণ করবে রাজনৈতিক আদর্শ ও উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য নয়, সততা, নিরপেক্ষতা ও দক্ষতা নিয়ে নির্বাচন সংঘটনের ভেতর দিয়ে যথার্থ গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য। আমরা যখন কাচের দামি আসবাব বাক্সে প্যাক করে পাঠাই তখন প্রত্যেকটি কাচপাত্রকে মুড়িয়ে দেই নমনীয় প্যাক করার বস্তু দিয়ে। প্যাকিংয়ের বস্তু কাচের বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত নয়, এগুলো হতে পারে কাগজ বা খড়কুটো। এর মূল্য কম কিন্তু গুরুত্ব অপার। কারণ এর অনুপস্থিতিতে কাচপাত্রগুলো ঠোকাঠুকি করে ভেঙে যাবে।

পদার্থবিদ্যার জগৎ থেকে আর একটি উপমা এখানে টানতে চাই। আমরা যখন চৌম্বক পদার্থ, যেমন লোহা, নিকেল, কোবাল্ট ইত্যাদির চৌম্বক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করি, দেখা যায়, এর মধ্যে বিভিন্ন এলাকা আছে যা পৃথকভাবে চুম্বকিত এবং বিভিন্ন দিকে এদের অবস্থান, যেমন রাজনৈতিক দলগুলো এদের সমর্থক নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শে ভিন্ন দিকে মুখ করে আছে। চৌম্বক বস্তুর মধ্যে এই পৃথক পৃথক চুম্বকিত এলাকাকে বলা হয় ডমেইন। কিন্তু পাশাপাশি দুই ডমেইনের মধ্যে একটি দেয়াল থাকে। প্রতিটি চুম্বকিত ডমেইন যদিও সুষমভাবে চুম্বকিত এবং এর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুম্বকগুলো একই দিকে মুখ করে থাকে বিন্যস্তভাবে, চুম্বক দেয়ালের মধ্যে কিন্তু ক্ষুদ্র চুম্বকগুলো থাকে অবিন্যস্ত। এখানে এরা ধীরে ধীরে দিক বদলিয়ে পার্শ্ববর্তী ভিন্ন দিকবিশিষ্ট ডমেইনের সঙ্গে মিশে যায়। হিসাব কষে দেখা গেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুম্বকগুলোর মধ্যে চৌম্বক মিথস্ক্রিয়া যত শক্তিশালী, ডমেইন দেয়াল তত প্রশস্ত। কারণ, এভাবেই এদের বিরোধিতার শক্তি-খরচ কমে যায়।

রাজনৈতিক দলগুলোকে যদি একেকটি ডমেইনের সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে দেখানো সম্ভব যে, এদের একদলকে সমর্থন দেওয়া থেকে অন্য দলকে সমর্থন দেবার যে প্রক্রিয়া, নির্বাচনের ভেতর দিয়ে যা সংঘটিত হয়, তা আকস্মিকভাবে না ঘটে একটু প্রলম্বিত সময়ের মধ্যে ঘটলে রাজনৈতিক সংঘর্ষ কম হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই চৌম্বক দেয়ালের মতন কাজ করতে পারে। এর অবস্থান ও বিস্তার অবশ্য কালের মধ্যে, স্থানের মধ্যে নয়।

রাজনৈতিক রূপান্তর যেখানে আকস্মিকভাবে ঘটে সেটা হলো বিপ্লব, সেখানে অনেক অপচয় আছে। গণতন্ত্রে এই রূপান্তর ঘটে ধীরে ধীরে একটি কালের ব্যাপ্তির মধ্যে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা তাই গণতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে অত্যন্ত সংগতিপূর্ণ। আরো একটি বিষয় আমরা লক্ষ করতে পারি, নির্বাচনের ভেতর দিয়ে জনগণ কোনো এক রাজনৈতিক দলকে সরকার গঠন করতে দেয়। ব্যাপারটি অনেকটা এই রকম যে, কয়েকজনের ভেতর থেকে একজনকে আমাদের ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে। যদি সবাই ঘরের বাইরে অপেক্ষা করেন এবং সেখান থেকে একজনকে আমরা গ্রহণ করি তাহলে যিনি নির্বাচিত হলেন না তার জন্য অবমাননা অতটা প্রবল হবে না, যেমনটা ঘটবে যদি একজন ঘরের মধ্যে আগেই অবস্থান করতেন এবং তাঁকে বের করে দিয়ে আর কাউকে আহ্বান জানানো হতো ঘরে প্রবেশের। কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে ক্ষমতায় থেকে নির্বাচনে হেরে যাওয়া অনেকটা এই পরবর্তী পরিস্থিতির মতোই। যে-কোনো রাজনৈতিক দল যখন ক্ষমতায় থাকে, সেই দলের বিরুদ্ধে অনেক অপবাদ থাকে যার অনেকগুলো হয়তো সত্য নয়, নির্বাচনের ঠিক আগে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে এসব অভিযোগের একটি বিশ্বাসযোগ্য নিষ্পত্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ পরিপেক্ষিতে বর্তমান সময়

মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, 'My life is my message'—আমার জীবনই আমার বারতা। কথাটি বিস্ময়কররূপে সত্য বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে।

বঙ্গবন্ধু কী ভেবেছেন এই দেশ ও দেশের মানুষকে নিয়ে? কী স্বপ্ন তিনি দেখেছেন? কী ছিল তাঁর বার্তা? এসব প্রশ্নের জবাব আমরা পেতে পারি তাঁর যাপিত জীবন থেকে। তাঁর জীবন ও তাঁর জীবনের বার্তা অবিচ্ছিন্ন ধারায় রূপায়িত। এটি খুব বিরল ঘটনা। কারণ, এমনটি ঘটে শুধু অনন্যসাধারণ সেই ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যাঁদের বুদ্ধিগত সততা ও নীতিসংহতি অপরিসীম।

বঙ্গবন্ধু কোনো রাজপরিবার, কোনো শক্তিধর শাসক, কোনো ধর্মগুরু বা পূর্বপ্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক আদর্শের ছত্রচ্ছায়ায় অথবা পুঁথিগত মতবাদের প্রবক্তা সেজে নেতৃত্ব লাভ করেননি। তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ তাঁর নিজেরই সৃষ্টি এবং তা দীর্ঘ ঘটনাপ্রবাহের অভিঘাতে, অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে ও অভিজ্ঞতা লাভের ভেতর

দিয়ে। অন্যায়, অবিচার, দুঃশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে এবং প্রতিকার সন্ধানে আজীবন অংশ নিয়ে অবর্ণনীয় নির্যাতন ও বারবার কারাবরণ এবং মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছেন ইস্পাতকঠিন ব্যক্তিত্বে। সুদীর্ঘকালের মধ্যে ব্যাপক স্থানিক বিস্তার ও বিপুলসংখ্যক ঘটনার অভিঘাত ও অসংখ্য মানুষের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় সৃষ্ট তাঁর ব্যক্তিত্ব ও নীতিসংহতি। সমুদ্রসৈকতে আশ্চর্য ও অপরূপ কোনো নুড়িপাথর যদি খুঁজে পাই, যা পাহাড় থেকে নেমে এসেছে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে, বুঝতে হবে এর বিশেষ রূপ সৃষ্টি হয়েছে নানা সংঘর্ষে, আঘাতে আঘাতে, তাপে ও পীড়নে ক্রমাগত ক্ষয়ে ক্ষয়ে রূপান্তরিত হয়ে। এর অনন্যবৈশিষ্ট্য ও অন্যসব পাথর থেকে ভিন্ন হয়ে ওঠার আড়ালে কাজ করেছে এর উৎসবিন্দু নয়, কারণ সেখানে এটি অন্যসব পাথর থেকে অভিন্ন। বিশেষ পাথরের অপরূপ বৈশিষ্ট্য এ ক্ষেত্রে এর দীর্ঘ পথের ইতিহাস ধারণ করে আছে এর দীর্ঘকালের ছাপ বহন করে। ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া পৃষ্ঠদেশের চিহ্নে বঙ্গবন্ধু সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নিয়েও অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছেন ইতিহাসের ঘটনাবলির ভেতর দিয়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে। ইতিহাস তাঁকে নির্মাণ করেছে, যেমন তিনি নির্মাণ করেছেন ইতিহাস। আভিজাত্য ও নেতৃত্ব যখন সৃষ্টি হয় সাধারণ পটভূমি থেকে আপন প্রতিভার গুণে, অভিজ্ঞতা লাভ ও আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে ক্রমাগত উদ্ভাবনের পথ অবলম্বন করে তার আদর্শ হলো, গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত।

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও তাঁর বার্তাকে নিছক অতীতের ঘটনারূপে এখানে তুলে ধরতে চাই না। পুরোনো ঘটনা মানে ইতিহাসের ঘটনা নয়। আমাদের জীবনে অনেক তীব্র আনন্দ ও গভীর দুঃখের ঘটনাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্ব হারায় এবং এসবের স্মৃতি ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসে। কিন্তু ইতিহাসের ঘটনা সময়ের সঙ্গে উজ্জ্বলতর হয়। এর একটি কারণ, যাঁরা ইতিহাস-স্রষ্টা তাঁরা আসলে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা। ফলে যা তাঁরা ভবিষ্যৎ রূপে দেখেছিল তাই সাধারণ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে বর্তমানের ঘটনারূপে। ইতিহাস সৃষ্টিকারী ঘটনা সমুজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হয় উপলব্ধির আলোকে এবং সেই আলো এসে পৌঁছতে অনেক সময় লেগে যায় অনেক ক্ষেত্রেই। বঙ্গবন্ধুর উদ্ভব সেই অর্থেই ইতিহাসের ঘটনা। আমরা লক্ষ করব বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি মুছে ফেলার যত অপচেষ্টাই চলুক, কালের প্রবাহে তাঁর বাণী স্পষ্টতর রূপে ঝংকৃত হবে বিপুলতর জনগণের চেতনার শ্রবণেন্দ্রে এবং তাঁর মুক্তির বার্তা গভীরতর রূপে উপলব্ধ হবে সাধারণ্যে। স্থানিক দূরত্বে রাখা কোনো বস্তুকে দেখতে হলে স্পষ্ট দৃশ্যমানতার জন্য ন্যূনতম দূরত্ব থাকতে হবে দর্শক ও দৃশ্যমান বস্তুর মধ্যে। ইতিহাসের ঘটনাকে যথার্থভাবে অবধারণ করতে ন্যূনতম কালিক দূরত্ব চাই।

পৃথিবীর বয়স সাড়ে চারশ কোটি বছর আমরা এখন জানি। একজন প্রশ্ন করেছিল, পৃথিবীর বয়স সাড়ে চারশ কোটি বছর কেন? এমন প্রশ্ন কি একান্তই

অর্থহীন? আসলে অর্থহীন নয়। কারণ এর একটি যথার্থ উত্তর আছে এবং তা হলো—পৃথিবীর বয়স সাড়ে চারশো কোটি বছর কারণ, পৃথিবীর বয়স জানতে অতটা সময়ই লেগেছে।

অন্ধকার রাতে আকাশের দিকে তাকালে এমন নক্ষত্র দেখা যায় যার দূরত্ব বহু শত কোটি আলোকবর্ষ। এই নক্ষত্র অনেক আগেই মরে গেছে। যখন নক্ষত্রটি বেঁচে ছিল এর আলো সৃষ্টির ইন্ধন নিয়ে, তখন সে আলো পৌঁছেনি আমাদের কাছে। অথবা আকাশের দিকে মানুষের দৃষ্টি তখনো প্রসারিত ছিল না। খাবারের সন্ধানে সে তাকিয়ে ছিল মাটির দিকে সরীসৃপের মতন। যখন নক্ষত্রটি আবিষ্কৃত হলো তার অনেক আগেই নক্ষত্রটি মরে গেছে। আজকের প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুকে দেখতে গিয়ে আমরা হয়তো আবিষ্কার করব জীবিত বঙ্গবন্ধুর চেয়ে বেশি সমুজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়বে ইতিহাসের বঙ্গবন্ধু।

ইতিহাস আসলে পুরোনো ঘটনার সংরক্ষিত দলিল নয়, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সংলাপ। প্রাণিজগতে একমাত্র মানুষেরই কালিক চেতনা আছে। মানুষ ভিন্ন অন্যসব প্রাণী বন্দী হয়ে থাকে দ্রুত অপস্রিয়মাণ বর্তমানে। কিন্তু অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একই সঙ্গে আমাদের কাছে অর্থবহ হয়ে ওঠে তখনই যখন অতীতকে আমরা ইতিহাসের দৃষ্টিতে, অর্থাৎ বর্তমানের আলোকে বিশ্লেষণ করতে পারি। অতীত তখন সজীব হয়ে ওঠে আমাদের বর্তমানের চেতনায়। অতীতের কাছে বর্তমানের সংলাপ ঘটাবার দক্ষতা অর্জনের ভেতর দিয়েই অনাগত ভবিষ্যতের ভাবনাকে ভাবতে পারি আগামী দিনের বর্তমান বিষয়রূপে। বঙ্গবন্ধুকে অতীতের ঘটনার সংঘটকরূপে শুধু নয়, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে তাকে আবিষ্কার করতে পারলেই মাত্র আমাদের উপলব্ধিতে তিনি ভাস্বর হয়ে উঠবেন ভবিষ্যৎ স্বপ্নদ্রষ্টারূপে।

যারা ইতিহাসকে অবজ্ঞা করতে চায় তাদের বুঝতে হবে ইতিহাস পাঠ ও বিশ্লেষণ অতীতের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকা নয়। যথার্থ ইতিহাসচর্চা হলো সজীবতায়, সচলতায়, সচেতনতায়, কৃতজ্ঞতায়, উদ্ভাবনী দৃষ্টিতে সভ্যতায় প্রবহমানতা ও অবিচ্ছিন্নতাকে আবিষ্কার করা সৃষ্টিশীলতায়। আর এ জন্যই আজকের দিনের সমস্যার আলোকে বঙ্গবন্ধুর বার্তাকে দেখতে চাই।

প্রতিভাবান ব্যক্তিদের গভীরতম বৈশিষ্ট্য হলো এঁদের অনন্য ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত এঁদের কর্মে ও মানসিকতায়, মূল্যবোধে, বিশ্বাসে, প্রেরণায়, সাহসিকতায়, উদ্ভাবনী সৃষ্টিতে এবং সর্বোপরি পরিবর্তন সাধনের সাফল্যে। এই ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিতে তাঁর সময়, তাঁর পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও শিক্ষার পরিবেশ, সেই সঙ্গে সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ অবশ্যই প্রভাব ফেলবে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট কার্যকারণ সম্পর্ক বা সমীকরণ উদ্‌ঘাটন সম্ভব নয় একজন অসাধারণ মানুষের উদ্ভবের সঙ্গে। তাঁর সার্বিক প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ পরিবেশে।

বস্তুত তাঁকেই আমরা প্রতিভা বলি যিনি সার্বিকভাবে পরিবেশ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত না হয়ে পরিবেশকেই বদলে দেন আপন অনন্যব্যক্তিত্বে। এখানে অলৌকিক কোনো প্রভাবের অবতারণার কথা উঠছে না। কিন্তু একটি অতিদূর সম্ভাবনার কথা আমরা বলতে পারি, যা সম্ভাবনার তত্ত্বে ও আলোকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কোনো জটিল ঘটনা, যা ভিন্ন ভিন্ন অনেকগুলো ঘটনার একই সঙ্গে সংঘটিত হবার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, তা ঘটবে কি ঘটবে না তার একটি সম্ভাবনার হিসাব আমরা করতে পারি। আমরা জানি, এ ক্ষেত্রে প্রতিটি পৃথক ঘটনার সম্ভাবনার গুণফল থেকে জটিল ঘটনার সম্ভাবনা হিসাব করা হয়। পৃথক ঘটনাগুলোর সম্ভাবনা যেখানে বিরল সে ক্ষেত্রে জটিল ঘটনাটির সম্ভাবনা অনেক বেশি বিরল। এমন বিরল ঘটনা যা অসম্ভব নয়। কিন্তু যা অতিদূর সম্ভাবনার তা যদি ঘটে যায়, তাকে আমরা অনন্য বলি। বঙ্গবন্ধুর উদ্ভব সে অর্থে একটি পরম সৌভাগ্যের বিষয় বাঙালি জাতির জন্য ও তাঁর নিজের জন্যও। তাঁর নিজের জন্য কারণ, তাকে অসংখ্য বাধা অতিক্রম করে বহুবার প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে এগোতে হয়েছে পথ এবং শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছেন তাঁর দেশের মানুষকে মুক্ত করতে ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে সফল করতে, যা ছিল তাঁর স্বপ্ন ও অঙ্গীকার।

একজন ফরাসি গণিতবেত্তা বলেছিলেন, 'নিটউন শুধু শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী নন, পরম সৌভাগ্যবানও বটে। কারণ, বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ম একবারই শুধু আবিষ্কার করা যায় এবং নিউটন সেই সৌভাগ্য লাভ করেছেন।' আমি আমার এক প্রবন্ধে এই উক্তিকে ব্যবহার করেছি বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গে এবং তা গভীরতর অর্থে সত্য বলে আমি মনে করি। কারণ, প্রকৃতির নিয়ম একবারই আবিষ্কার করা যায় কি না তা আমরা নিশ্চিত করে জানি না, কিন্তু একটি দেশ যথার্থ অর্থে একবারই শুধু স্বাধীন হতে পারে। বাংলাদেশের জন্য সেই নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। তিনি তাই শুধু শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ নন, শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যেরও অধিকারী।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা একটি ব্যাপক, যৌক্তিক ও আধুনিক ধারণা। এর কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ নেই, যা সব দেশের জন্য নির্বিচারে প্রযোজ্য। প্রতিটি স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশকেই সে দেশের প্রেক্ষাপটে সংগ্রামের পথ উদ্ভাবন করতে হয়েছে বাইরের আধিপত্য, শোষণ ও শাসনমুক্ত হতে। এ জন্য সবার প্রত্যাশা ও লক্ষ্যের সমন্বয় চাই এবং রাজনৈতিক প্রেরণা ও আদর্শ, যা আসতে পারে যথার্থ নেতৃত্বের অধীনে। শুধু যুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না। কারণ, সবচেয়ে কঠিন সংগ্রামের পরিণতিকে সুসম্পন্ন করা চাই সৃষ্টিশীলতায়।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণা মূল্যবোধ ও চেতনা সৃষ্টি; এর জন্য ধাপে ধাপে নানা সংগ্রাম ও প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিকে প্রস্তুত করা এবং শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ, সংগঠিত ও ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। তিনি সেই অর্থে বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা, স্বাধীন

বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ও স্থপতি। এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্মাতা। অমি এই উক্তিগুলো গতানুগতিকতায় উচ্চারণ করছি না। এর সমর্থনে আমার ব্যাখ্যা দেব পরে। কিন্তু তার আগে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করে নিতে চাই।

মানুষ যখন থেকেই সমষ্টিবদ্ধ হয়ে একত্রে বাস করতে গিয়েছে তখনই নানাভাবে তাদের মধ্যে ভিন্নতা ও সাদৃশ্য খুঁজেছে। কখনো পেশার ভিত্তিতে, কখনো ধর্মের ভিত্তিতে, কখনো ভাষার ভিত্তিতে, কখনো ভৌগোলিক এলাকা, কখনো গায়ের রং, কখনো নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে মানুষের মধ্যে বিভাজন ঘটেছে। এই ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যেও পরিপূরকতার ভিত্তিতে ঐক্য সম্ভব, যেখানে সম্মিলিত অগ্রগতি ও সার্বিক স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নতুন এক সাংস্কৃতিক বন্ধনে সবাইকে সমন্বিত করে, যার নাম রাজনৈতিক সংস্কৃতি। এটি একটি নতুন সামাজিক ব্যবস্থা যাকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমুক্ত করে সবার জন্য সুচরম স্বাধীনতা ও সুবিচার অর্জন করার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে পারে।

বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও সুবিচার পাবার লক্ষ্যে আমরা বাংলাদেশেও সংগ্রাম করেছি দীর্ঘদিন ধরে। ভাষার ক্ষেত্রে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে, প্রশাসনের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে। স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই সচেতনতা বৃদ্ধি ও ঐক্য সৃষ্টি হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও নিজেদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুত উৎপাদনশীলতা, স্বাধীনতা ও সুবিচার লাভের যৌথ কোনো আয়োজন তখনই মাত্র সফল হতে পারে, যখন সভ্যতার প্রয়োজনে উদ্ভাবিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় বজায় রেখে পূর্ণাঙ্গ ও সার্বিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়। একেই আমি বলতে চাই আদর্শ রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

একটি জাতি যখন এই স্বাধীনতা অর্জন করে তখন একটি সার্বিক পুনর্বিন্যাস ঘটে সমস্ত ব্যবস্থার। এটি একটি দশা পরিবর্তন। এই স্বাধীনতা অর্জনের প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ প্রস্তুতির, ব্যাপক আয়োজনের, ব্যাপক কর্মকাণ্ডের এবং সমন্বয় সাধনের। এখানে একটি কালিক অনবচ্ছেদ, একটি স্থানিক ব্যাপ্তি এবং জনগণের প্রত্যাশা ও উপলব্ধির সমন্বয় অপরিহার্য, যা ঘটতে পারে যথার্থ নেতৃত্বের শৈল্পিক সৃজনশীলতায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা একটি পর্যায়ক্রমিক ঘটনাপ্রবাহের সার্বিক প্রতিভাস, কোনো আকস্মিক বিচ্ছিন্ন যান্ত্রিক ঘটনা নয়।

আমাদের লক্ষ্য বঙ্গবন্ধুকে আলাদা করে প্রতিষ্ঠিত করা নয়, তাঁর কৃতিত্ব ও গৌরব উজ্জ্বল অবদানকে তুলে ধরে। তাঁকে আবিষ্কার করতে চাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের স্বপ্ন দেখার পটভূমিতে। বাংলাদেশ আমাদের আশ্রয়, স্বাধীনতা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন, মুক্তিযুদ্ধ সবচেয়ে গৌরবের ঘটনা, ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা আমাদের কর্মপ্রেরণার উৎস। এর সবকিছুর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পৃক্ততা অবদান ও তাঁর বিশ্লেষণের ভেতর

দিয়ে আমরা শুধু তাঁকে আবিষ্কার করছি না, আমরা আমাদেরকেও আবিষ্কার করতে প্রয়াস পাচ্ছি। যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবকে খাটো করে দেখতে চায়, তারা কৌশলরূপে শুধু বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বকেই অবজ্ঞা করে না, রাজনৈতিক নেতৃত্বের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করে। এটি অবশ্য এদের উদ্ভাবন নয়, একটি পুরোনো দার্শনিক বিতর্কের বিষয়। রাজনৈতিক নেতৃত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছুটা একাডেমিক বিশ্লেষণ এখানে উপস্থিত করতে চাই।

নেতৃত্ব হচ্ছে জনগণকে অনুপ্রাণিত ও সংগঠিত করার ক্ষমতা। নেতৃত্ব বলে ইতিহাসে প্রভাববিস্তারী কোনো কিছু মেনে নিলে, ব্যক্তিমানুষ যে ইতিহাস সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ তা স্বীকার করতে হয়। অনেকে মনে করেন ব্যক্তিমানুষ নেহাত পুতুল বাইরের শক্তির কাছে। সেই শক্তির উৎস মানুষ আদিকাল থেকে খুঁজেছে দেব-দেবী বা মহা কোনো ঐশ্বরিক শক্তির মধ্যে। কখনো প্রকৃতির বস্তু, যেমন পাহাড় বা সূর্যের মধ্যে, জাতি বা জনতার মধ্যে, সাধারণ্যের ইচ্ছার মধ্যে, কখনো সময়ের দাবিরূপে। কখনো বলেছে ইতিহাস নিজেই নিয়ন্তা সমস্ত ঘটনার। একেই বলা হয়েছে ইতিহাসের অনিবার্যতা।

তলস্তয় তাঁর বিখ্যাত বই War and peace-এ সন্ধান করতে চেয়েছেন মানুষ কেন প্রলয়ংকর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে? বিবেক, মানবিক সহানুভূতি, নীতিবোধ হারিয়ে হিংস্র হয়েছে? নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত হয়েছে? শেষে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, যুদ্ধ ঘটেছে, কারণ যুদ্ধ অনিবার্য ছিল ইতিহাসের ঘটনারূপে। এই মতে, নেতৃত্ব আসলে একটি প্রতীকমাত্র। আমরা নিজেরা আসলে ইতিহাসের দাস। ইতিহাসের নিশ্চয়তাবাদ অর্থাৎ অনিবার্যতায় যারা আস্থাশীল তাদের মধ্যে নানা ধরন আছে। কেউ বলছে এটি শ্রেণীসংগ্রাম, কেউ বলছে Growth and decay অর্থাৎ বৃদ্ধি ও অবক্ষয়ের পর্যায়ক্রম। কেউ বলছে মুক্তবাজার।

ঘটনার অনিবার্যতা সম্পর্কে যত মতপার্থক্যই থাকুক, একটি ব্যাপারে এদের সবার একটি মিল দেখা যায় যে, এরা সবাই ব্যক্তিমানুষের গুরুত্বকে নগণ্যরূপে বিচার করেন। ইতিহাসের ঘটনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিমানুষ অপ্রাসঙ্গিক মনে করেন।

ইতিহাসের অনিবার্যতা সাঠিক হোক অথবা ভ্রান্ত, এই দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি বিষয় অবহেলিত এবং তা হলো মানুষের মুক্তচিন্তা, তাঁর স্বাধীনতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তাঁর গভীর মানবিক সহজাত প্রবৃত্তি ও বিবেচনাবোধ। মানুষের দায়িত্ববোধ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিজের কাজের জন্য দায়ী থাকা ও কৈফিয়ত দেওয়া সবই কি অবান্তর?

যদি রাজনীতির ক্ষেত্রে হিটলার, রুজভেল্ট, লেলিন, চার্চিল না জন্মাত; সাহিত্যে যদি শেক্সপিয়র, তলস্তয়, রবীন্দ্রনাথ না থাকত। বিজ্ঞানের জগতে গ্যালিলিও, নিউটন, ডারউইন, আইনস্টাইন না আসত, তাহলে কি এই শতাব্দীর চেহারা এমন হতো?

নেতৃত্ব ইতিহাসকে বদলে দিতে পারে, তা ভালোর জন্য হোক অথবা মন্দের জন্য। নেতৃত্ব দায়ী মানুষের দুর্ভোগ, দারিদ্র্য, অবিচার ও দুর্যোগের জন্য। আবার নেতৃত্বই জন্ম দিয়েছে মানবতাবোধ, স্বাধীনতার চেতনা, সৃষ্টির প্রেরণা, ঐক্যবদ্ধভাবে দুর্যোগ ও দুঃসময়ের মুখোমুখি হবার মানসিকতার।

ব্যক্তিমানুষ নামহীন অপার্থক্যযোগ্য, অবান্তর ইতিহাস সৃষ্টিতে—এমন ধারণাকে নিছক অবিমৃশ্যকারিতা ও ভ্রান্তরূপে উল্লেখ করেছেন উইলিয়াম জেমস। তার মতে, মানুষ যা কিছু করে তার মূলে থাকে একজন উদ্ভাবকের অবদান।

আমি বিষয়টিকে এভাবে দেখি :

একজন মহান মানুষ সৃষ্টি হয় অনেক ঘটনার অভিঘাতে, অনেক অনিশ্চয়তার ভেতর দিয়ে, অনেক বিকল্প পথের ভেতর থেকে পথ বেছে নেবার প্রক্রিয়ায়। কিন্তু একবার যখন একটি কেন্দ্রীয় ঘটনার বিন্যাস সৃষ্টি হয় জীবনধারায়, মূল্যবোধে, বিশ্বাসে, আদর্শে, নৈতিকতায়, যা অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য, তখন সেই উদ্ভাবক বা আবিষ্কারক নেতা বা আদর্শ হয়ে ওঠে। উদ্ভাবন ও উদ্ভাবক, নেতৃত্ব সৃষ্টি ও নেতৃত্ব প্রদান হচ্ছে সমাজ পরিচালনা ও সমাজ রূপান্তরের মূল কথা।

কোনো নেতাই স্বয়ংক্রিয় বা স্বয়ম্ভু নয়। নেতা হয়ে ওঠার সঙ্গে সমকালিকতা অর্থাৎ সেই সময়ে উপলব্ধ ঘটনাপ্রবাহের প্রভাবমুক্ত পরিবেশ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রক্রিয়ায় একটি সমীকরণ রয়েছে তা যতই অনির্বচনীয় হোক, বিশেষ করে প্রতিভাধরদের বেলায়। সব প্রতিভাই সব সময় সফল হতে পারছে না। কোনো প্রতিভার জন্ম হয় সময়ের আগে আবার কোনো প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে সময়ের পরে। সেই প্রতিভাধর সফল নেতা যিনি তাঁর সময়ের ঘটনাপ্রবাহ সেই সঙ্গে অতীতের ঘটনার প্রভাব এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যতের স্বপ্নের বাস্তবতা উপলব্ধি করে কৌশলগত অবস্থান নির্ধারণ করতে পারেন।

বিপুলসংখ্যক ঘটনা ও প্রভাব উৎসের সম্মিলিত যে সম্ভাব্য ফল কার্যকারণের নিয়ম ও অনিশ্চয়তার বিধি মেনে তা নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব। কিন্তু ঘটনা ঘটে যাবার পর তা ব্যাখ্যা করা অনেকটা সহজসাধ্য। এ জন্যই বলা হয়— প্রতিভা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার ক্ষেত্রে সাফল্যের চেয়ে নিশ্চিততর কোনো প্রমাণ নেই।

একজন যথার্থ ও সফল নেতাকে অবশ্যই তাঁর সময়ের বারতাকে বুঝতে হবে। গণতন্ত্রের নেতৃত্ব কীভাবে কাজ করে জানতে হলে বুঝতে হবে যে, এখানে একটি চিরন্তন সংঘাত কাজ করে। অতীতের মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও জীবনধারার যে জড়তা তা ক্রমাগত পরিবর্তনীয় সমকালীন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ, একদিকে কাজ করে পুরোনো ঐতিহ্য, সহজাত বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠিত ধারণার জড়তা, অন্যদিকে সময়ের দ্রুতগামী রথ চলছে ছুটন্ত গতিতে পরিবর্তনীয়তার বার্তা নিয়ে।

ভবিষ্যতের দৃষ্টি, অনাগত দিনে অঘটিত ঘটনাপ্রবাহের দ্বারা সৃষ্ট সম্ভাব্য ভবিষ্যতের ছবিকে দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা এক দুর্লভ গুণ। এখানে কোনো প্রমাণ

হাতে থাকে না, এর সাফল্য প্রদর্শিত নয়। এখানে সফলতা নির্ভর করে স্বজ্ঞার ওপর, সেই ভবিষ্যৎ দৃষ্টির ওপর, যার সাফল্য এখনো অপ্রদর্শনযোগ্য। শুধু ভবিষ্যতেই জানা যাবে এর ফল। এই আশাবাদ ও কল্পনাকে মূলধন করে প্রতিষ্ঠিত, প্রচলিত ও অভ্যস্ত পুরোনো ধারার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এক দুঃসাধ্য ও দুঃসাহসী কাজ। কিন্তু গণতান্ত্রিক ধারায় শুধু স্বপ্ন দেখলেই হবে না, অন্যদের বোঝাতে হবে, বদলাতে হবে, সবাইকে সঙ্গী করতে হবে। সেখানেই নেতৃত্বের গুরুত্ব এবং এর অপরিহার্যতা। এ জন্য মূল উপাদানগুলো বেছে ও নির্বাচিত করে অপ্রয়োজনীয় ঘটনাগুলো পাশ কাটিয়ে এগোতে হয়।

সামাজিক পরিবর্তন ও উদ্ভাবন সামাজিকভাবেই বাধাপ্রাপ্ত হয়। কারণ, পুরোনো যে ব্যবস্থা ও ক্ষমতার বিন্যাস তা থেকে যারা সুবিধা ভোগ করছে তারা পরিবর্তনকে ভয় পায়। কায়েমি স্বার্থভোগীদের বাধা অতিক্রম করে নতুন ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে নতুন ব্যবস্থায় যারা লাভবান হবে তাদেরকে বোঝাতে হবে যে নতুন ব্যবস্থার প্রতি আস্থা সৃষ্টি অত্যন্ত কঠিন। কারণ, অপরিবর্তী ও অপ্রদর্শিত সাফল্যের প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টি তখনই সম্ভব যখন এই ভবিষ্যৎ ভাবনা, এই অনুমিত ও স্বজ্ঞামূলক মডেল যুক্তিপূর্ণ মনে হয়। এ জন্য প্রয়োজন নতুন মূল্যবোধ, বিচার ক্ষমতা ও সংস্কৃতি।

এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং রুচি সৃষ্টি করেন রাজনৈতিক নেতা। তার সৃষ্ট সেই রুচিতেই সে মূল্যায়িত হয়ে লাভ করেন নেতৃত্বের সম্মান। শেখ মুজিব এই দীর্ঘমেয়াদি কঠিন কর্মধারার ভেতর দিয়েই হয়ে উঠেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

গণতন্ত্র হচ্ছে সম্ভাব্যতার শিল্প

গণতন্ত্রকে নানাজন নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস পেয়েছে, কিন্তু গণতন্ত্র আসলে সংজ্ঞায়ন-অসাধ্য একটি প্রক্রিয়া— জনমতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার। এই শর্ত পূরণ করতে হলে গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত, বহুতাপ্রাপ্ত, জটিল ও পরিবর্তী হতে বাধ্য। গণতন্ত্রকে যখন বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, তখন গণতন্ত্রের সেই সব নানা বৈশিষ্ট্যই শুধু প্রমাণিত হয় যা একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির শক্তির উৎস এবং দুর্বলতাও। গণতন্ত্র কী তা সঠিকভাবে সংজ্ঞায়ন সম্ভব না হলেও গণতন্ত্র কী নয়, তা অন্তত নির্ধারণ করা সম্ভব। সেই আদি যুগ থেকে মানুষ যখনই দলবদ্ধ হয়ে একত্রে বাস করতে শুরু করেছে, তখন থেকেই একধরনের শাসনব্যবস্থা চলে আসছে। সমাজবদ্ধ মানুষকে একত্রে ধরে রাখা তাদের যৌথ উৎপাদনশীলতা, উৎপাদিত সামগ্রীর বণ্টন, সমষ্টিগতভাবে আত্মরক্ষা, অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিরসন এবং প্রকৃতি ও যৌথ জীবনের নানা সমস্যার সমাধান ঘটানোর অপরিহার্য শর্তরূপে কোনো না কোনো শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রশাসনও প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে সমাজবদ্ধ মানুষের দুর্বলতাগুলোকেই প্রথম দিকে ব্যবহার করত—যথা ভয়, লোভ, নিরাপত্তাহীনতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কারপ্রবণতা, আদর্শের প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি।

যত দিন মানুষ খাদ্যাভাব, রোগ-ব্যাধির প্রতাপ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অবাস্তব ভাবনা, অধ্যাত্মবাদ ইত্যাদির প্রভাব দ্বারা সদা আতঙ্কিত ছিল, তত দিন দলীয় নেতা, ধর্মযাজক, রাজন্যবর্গ, সেনাপতি অথবা কোনো একনায়ক শক্তি প্রয়োগ, অলৌকিক ভয় প্রদর্শন, আদর্শের বুলিবর্ষণ বা অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির ভেতর দিয়ে সমাজকে পরিচালনা করে এসেছে। গণতন্ত্র বস্তুত এসব দুর্বলতা, নেতিবাচক প্রভাব, বংশগত আভিজাত্য, অধ্যাত্মবাদ ও পেশিশক্তির বিপরীতে মানুষের ইতিবাচক ভাবনা, উৎপাদনক্ষমতা, চিন্তার স্বাধীনতা, ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে যোগ্যতা ও মুক্তবুদ্ধির ভিত্তিতে সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়ার প্রক্রিয়া। গণতন্ত্রের উত্তরণ যেহেতু ক্রমাগতভাবে ঋণাত্মক শক্তিগুলোর প্রভাব অতিক্রম করে ব্যক্তিমানুষের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য ও ধনাত্মক গুণগুলোকে সমাজনিয়ন্ত্রণের উপাদানরূপে গ্রহণ করার প্রক্রিয়া, ফলে এর বিকাশের পথ অন্তহীন ও উন্মুক্ত।

ক্রমাগত অভিজ্ঞতা অর্জনের, পরীক্ষা-নিরীক্ষার, স্বাধীনভাবে নানা মানুষের মতপ্রকাশ, বিশেষজ্ঞের পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিজ্ঞান—সবকিছুর সমন্বিত প্রভাবে প্রতিযোগিতা ও পর্যালোচনার ভেতর দিয়ে গণতন্ত্রের যে অভিযাত্রা সেখানে বিশুদ্ধতা, পরম সত্য বা অন্ধবিশ্বাসের কোনো অবকাশ নেই। গণতন্ত্র একটি অবিচ্ছিন্ন, বিকাশমান সভ্যতার অসম্পন্ন ফসল বলে, এখানে নতুন ভাবনা, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের প্রভাব যেমন আছে, তেমনি পুরোনো জীবনধারা, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের প্রভাবও এখানে বিদ্যমান। সবার মতই মূল্যপ্রাপ্ত এবং কোনো অভিমতই নির্বিচারে আপন বৈশিষ্ট্যে গ্রহণীয় নয়। বড়জোর গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনাপ্রাপ্ত জনমতের আলোকে। এই শর্ত মানতে গিয়ে গণতন্ত্রে আকস্মিক পরিবর্তন ও বিশুদ্ধতাপ্রাপ্তি সম্ভব নয়; শুধু সম্ভব নয় তা-ই নয়, এ ধরনের চিন্তাও গণতন্ত্রের মূলনীতিবিরুদ্ধ।

গণতন্ত্রকে তাই The Art of possibility বা সম্ভাবনার শিল্প বলা হয়। সমাজ পরিবর্তনে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও আদর্শগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে নতুন উদ্ভাবন, সৃজনশীল চিন্তা ও পরিকল্পনা তা গণতন্ত্রকে শুদ্ধতর ও সমৃদ্ধতর করার তত্ত্বগত উপাদান। কিন্তু গণতন্ত্রের সামগ্রিক অগ্রযাত্রায় তাত্ত্বিক এই উপাদানের উপস্থিতি প্রয়োজনীয় শর্ত হলেও গণতন্ত্রকে সম্ভব করার ক্ষেত্রে এটি যথেষ্ট নয়। কোনো উদ্ভাবন ও উপলব্ধি অর্জন এবং সেই উদ্ভাবন ও উপলব্ধিকে সবার কাছে বোধগম্য করে তোলা দুই ভিন্ন কাজ। যোগাযোগ সৃষ্টি এবং নতুন উপলব্ধি ও চেতনায় সবাইকে, অন্তত সংখ্যাগরিষ্ঠকে, উদ্দীপিত করতে না পারলে অনেক ভালো ধারণা বা আদর্শই নিছক কেতাবি বক্তব্য বা সংখ্যালঘুর অভিমতরূপে অবাস্তবায়িত থেকে যাবে।

যদিও অত্যন্ত সরল ও সংক্ষিপ্তভাবে গণতন্ত্রকে বলা হয় সংখ্যারিষ্ঠের মতে পরিচালিত সরকার, বাস্তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের যে অভিমত তা সৃষ্টি করার যে প্রক্রিয়া সেটাই নির্ধারণ করে গণতন্ত্রের গুণগত উৎকর্ষ। মানুষের দুর্বলতা, লোভ, ভয়, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে পুঁজি করে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন আদায়ের যে প্রক্রিয়া প্রায়শ অনুসৃত হয় তার মূলে কাজ করে গণতন্ত্রপূর্ব সামন্ততান্ত্রিক, ধর্মতান্ত্রিক, রাজতান্ত্রিক, সামরিকবাদ বা আধিপত্যবাদের পুরোনো কৌশল বা ভূতকে গণতন্ত্রের নামে টিকিয়ে রাখা—জনসাধারণের অশিক্ষা, অসচেতনতা, সামাজিক দারিদ্র্য এবং নেতৃত্বের অযোগ্যতা, অসততার আবহে।

অশিক্ষা, অজ্ঞতা, আলস্য ও অসৃজনশীলতা একটি অচলায়তন জড়তা নিয়ে সমাজকে ধরে রাখতে চায় সব ধরনের পরিবর্তন ও অগ্রগতির বিরুদ্ধে। অন্যদিকে অসংখ্য মতবাদ, প্রলোভন ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রক্রিয়া বলপ্রয়োগে বন্ধ করারও

কোনো সুযোগ নেই গণতন্ত্রে। একই সঙ্গে নতুন রুচি সৃষ্টি, নতুন উপলব্ধি ও জ্ঞানের অবতারণা বিকল্পপথে শ্রেয়ত্ব প্রমাণ, সেই সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন এক দুঃসাধ্য কাজ। একজন সৃজনশীল উদ্ভাবক নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করতে পারেন নিঃসঙ্গতায়, নির্বাচিত ও বিশুদ্ধ পরিবেশে; একজন বাক্যবাগীশ মানুষের আবেগ, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িক চিন্তা ও বিভ্রান্ত হওয়ার প্রবণতাকে সুকৌশলে ব্যবহার করে অন্তত কিছু সময়ের জন্য মানুষকে উত্তেজিত ও দলবদ্ধ করতে পারে; কিন্তু একই সঙ্গে মানুষের স্বচ্ছ স্বাধীনচিন্তা, সৃজনশীলতা ও যাচাই করার শক্তিকে মূল্য দিয়েও নতুন উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ করা, সেই সঙ্গে ইতিবাচকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন দুটি দুঃসাধ্য কাজের যুগপৎভাবে সংঘটিত করার যে সৃজনশীল দক্ষতা, তাকেই বলছি গণতন্ত্রের সম্ভাব্যতার শিল্প।

গণতন্ত্রের পথ ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভুল-সংশোধনের

গণতন্ত্র একটি বিকাশমান ধারা যৌথ জীবনের, মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার, মুক্তচিন্তা ও সৃজনশীলতার, নানা মত, ভাবনা ও মূল্যবোধ নিয়ে অসংখ্য মানুষের একত্রে বসবাসের, ব্যক্তিজীবন ও সমষ্টিবদ্ধ সমাজের মধ্যে যে বৈপরীত্য ও পার্থক্য, তাকে সামঞ্জস্য ও পরিপূরকতায় গ্রহণ করার এক ব্যবস্থা। গণতন্ত্র এক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার। পূর্বনির্ধারিত কোনো মূল্যবোধ, কোনো অপরিবর্তী আদর্শ, ব্যক্তিগত পাণ্ডিত্য, অহংবোধ বা আধিপত্যের প্রভাব গণতন্ত্রের পথে অন্তরায়। জাত্যভিমান, ধর্মান্ধতা, বর্ণবাদ, পেশাগত স্বার্থ, ভৌগোলিক বা এলাকাগত পরিচয় ব্যক্তিমানুষের স্বাধীন চিন্তা ও বিচারক্ষমতা যদি গ্রাস করে, সে ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ধারা শুধু ব্যাহত হয় না, গণতন্ত্র সম্পর্কে বিভ্রান্তি, হতাশা ও বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। গণতন্ত্র যেহেতু কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ ও বিধিবদ্ধ নিয়ম দ্বারা বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত নয়; তাই এর স্বরূপ অনেকটা অনির্বচনীয়, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে প্রতিটি ব্যক্তিমানুষ ও সামাজিক সংগঠন তাদের আচরণ ও অবদানের দ্বারা ক্রমাগতভাবে নির্মাণ ও উদ্‌ঘাটন করে।

গণতন্ত্রের মূলভিত্তি ব্যক্তিমানুষ, অথচ এর অভিব্যক্তি ও শক্তির প্রকাশ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে। স্বভাবতই ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সমষ্টিগত অস্তিত্বের একটি পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্য গণতন্ত্রে একই সঙ্গে অবস্থান করে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা ও সৃজনশীলতা সমষ্টি ও সংখ্যাগরিষ্ঠের চাপে কীভাবে সংরক্ষিত হতে পারে, সেই বিশ্লেষণ স্বভাবতই সূক্ষ্ম ও গভীর। গণতন্ত্র যেহেতু অসংখ্যের মতকে ধারণ করে, সেখানে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কী করে সম্ভব— সেটি একটি জটিল প্রশ্ন। গণতন্ত্রে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে গৃহীত হলে তা একই সঙ্গে যাথার্থ ও দক্ষতার বিচারে সঠিক হবে কি না সে-প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের বস্তুগত যে নানা চাহিদা— খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা, যোগাযোগ ও নিরাপত্তার, তা পূরণে উৎপাদন ব্যবস্থা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান, গবেষণালব্ধ নতুন তথ্য ও গভীর উপলব্ধি যেখানে প্রয়োজন, সেখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা সবচেয়ে জ্ঞানসম্পন্ন, দক্ষ ও সৃজনশীল ব্যক্তির হাতে অর্পিত হওয়া উচিত, অথবা নিছক গণভোটের ভিত্তিতে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বিজ্ঞানী-

অবিজ্ঞানী, দক্ষ-অদক্ষ, বিশেষজ্ঞ-অবিশেষজ্ঞ-নির্বিশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন দ্বারা নির্ধারিত হবে?

গণতন্ত্রে যে জনমত যাচাই-প্রক্রিয়া তা বস্তুত জনগণের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করার কথা। নির্দিষ্টসংখ্যক বছরের জন্য একটি মুহূর্তের মধ্যে ভোটদাতা যখন ব্যালটের মাধ্যমে তার সমর্থন জানায় তার এলাকার প্রতিনিধি নির্বাচনে, সেখানে তার অভিমত কতটা প্রতিফলিত হয়? দেশ পরিচালনা সম্পর্কে প্রতিটি নাগরিকের যে ধারণা ও অভিমত তা শুধু একটি টিকচিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা কি সম্ভব? দেশ পরিচালনা একটি জটিল প্রক্রিয়া। সেখানে অসংখ্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে হয় বিচিত্র সব বিষয়ে। ফলে এ সম্পর্কে প্রতিটি নাগরিকের যে ভাবনা তা অসংখ্য তথ্যেই শুধু অভিব্যক্ত হতে পারে। প্রতিটি নাগরিক তার শিক্ষা, সামাজিক অবস্থান ও পেশায় ভিন্ন বলে, সর্বোপরি সে একজন স্বাধীন চিন্তার অধিকারীরূপে স্বীকৃত বলে তার অভিমতের স্বরূপ ব্যাপক ও বিচিত্র হওয়ার কথা।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে : ভোটদাতারূপে প্রতিটি বয়ঃপ্রাপ্ত নাগরিকই যেখানে সমান ক্ষমতাপ্রাপ্ত; সেখানে তার ব্যক্তিগত প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, পাণ্ডিত্য ও দক্ষতার প্রতিফলন কোথায়? জ্ঞান, সৃজনশীলতা ও দক্ষতার কোনো প্রভাব কি তাহলে গণতন্ত্রে নেই? ভোট গ্রহণের প্রক্রিয়ায় যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতাই রাজনৈতিক শক্তি ও প্রশাসনিক ক্ষমতা লাভের একমাত্র ভিত্তি হয়, তাহলে শিক্ষিত, শুভবুদ্ধিসম্প উদ্ভাবনী বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা কী গণতন্ত্রে, যদি তারা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ হয়, অ কোনো রাজনৈতিক দল যদি শুদ্ধতর ও দক্ষতর পরিকল্পনা নিয়েও জনসমর্থন ল ব্যর্থ হয়? সে ক্ষেত্রে গণতন্ত্র কি অদক্ষতা ও ব্যর্থতার গ্লানি বহন করতে থাক জনগণের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে? গণতন্ত্রের প্রক্রিয়া সমুন্নত রেখে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজটি কীভাবে তাহলে সঠিক ও দক্ষভাবে করা সম্ভব সমাজে জ্ঞানী, প্রাজ্ঞ, সৃজনশীল ও দক্ষ মানুষদের যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে? বস্তুত, গণতন্ত্রের পদ্ধতি যেখানে যান্ত্রিকতা, নিছক আনুষ্ঠানিকতা, কৌশল ও শঠতা দ্বারা পরিচালিত এর সূক্ষ্ম-সজীব-সৃজনশীল বৈশিষ্ট্যকে অবজ্ঞা ও অনবধানতায় পাশ কাটিয়ে, সেখানেই গণতন্ত্রের মৃত খোলস শুধু আমরা দেখতে পাই এর অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনাকে হারিয়ে।

গণতন্ত্রের মূল চালিকাশক্তি বা উপাদান আমরা বলেছি ব্যক্তিমানুষ। সে মানুষ মুক্ত, সচেতন, অবহিত, বিচারশক্তিসম্পন্ন, পরিবর্তী, অন্যের অধিকার ও অভিমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সে হতে পারে অল্প শিক্ষিত; পেশা, সামাজিক অবস্থান, ধর্মীয় বিশ্বাস, বর্ণ বা গোত্র বা রাজনৈতিক মতবাদের ভিত্তিতে সংখ্যালঘু। কিন্তু শুধু গণতন্ত্রের একটি শর্ত তাকে সমান অধিকার দেয় অন্য যে-কোনো নাগরিকের সঙ্গে এবং তা হলো একটি বুদ্ধিগত সততা, রাষ্ট্রীয় নাগরিক হিসেবে তার অধিকার সচেতনতা ও অধিকারের অনুষঙ্গরূপে যে দায়িত্ব তার ওপরে ন্যস্ত সে-সম্পর্কে অবহিতি।

গণতন্ত্রের প্রক্রিয়ায় অসংখ্য মানুষের বিভিন্ন অবস্থান থেকে বিচিত্র সব মত সংগৃহীত, সমন্বিত ও প্রতিফলিত করার যে কাজ নির্বাচনের ভেতর দিয়ে, একই সঙ্গে তা জটিল, গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক অবস্থান, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং ধর্ম-বর্ণ-মতনির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিক যে সম-অধিকারপ্রাপ্ত তার মূলে গণতন্ত্রের দর্শন হলো, যেসব বৈশিষ্ট্যে ও গুণাগুণে একজন ভোটদাতা অন্য ভোটদাতা থেকে ভিন্ন, তা বিবেচ্য নয় নির্বাচনের প্রক্রিয়ায়। বরং যেসব অধিকার ও দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি ভোটদাতা অপার্থক্যযোগ্য সেটাই শুধু গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য একজন নাগরিক তার নিজস্ব অবস্থান থেকে সামগ্রিক রাজনৈতিক আবহাওয়া ও দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টিতে প্রভাব রাখতে পারে তার লেখায়, বক্তব্যে, আলোচনায় অংশগ্রহণে, পর্যালোচনা ও প্রতিবাদে। এখানে তার স্বাধীনতা শুধু একটি শর্ত দ্বারা সীমিত এবং তা হলো, যে স্বাধীনতা তার উপভোগ করার তা অন্যের জন্যও প্রযোজ্য হতে হবে। সেই সঙ্গে দেশ ও সমাজের জন্য অকল্যাণকর এবং ব্যাপকার্থে মানবতাবিরোধী কোনো অপপ্রচার গ্রহণীয় হবে না।

গণতন্ত্রের মূল্যবোধ, আদর্শ ও লক্ষ্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতাপ, আধিপত্য, শক্তি প্রয়োগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না নির্বিচারে, বরং নানা মত, ভিন্ন সব ভাবনা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার মধ্যে যে মিথষ্ক্রিয়া ও টানাপড়েন, যাচাই ও বিশ্লেষণ; তার ভেতর দিয়ে একটি যৌথ অভিমত প্রতিফলিত হবে। গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন মতের মধ্যে পারস্পরিক যে সম্পর্ক তা বিচ্ছিন্নতার ও একান্তই বিরোধিতার নয়, বরং মিথষ্ক্রিয়ার। বস্তুত, যে-কোনো মতের সমর্থন তখনই মাত্র প্রত্যাশা করতে পারে অন্য মতাবলম্বীর ওপর প্রভাব বিস্তারের, যখন সে এ সম্ভাবনাকেও মেনে নেয় যে, সে নিজেও ভিন্নমত দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। বস্তুত, আমাদের জীবনধারা ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অসংখ্য যেসব পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করি রাষ্ট্রীয়ভাবে, তার কোনোটিই নির্ভুল, অপরিবর্তী বা শ্রেষ্ঠ বলে আমরা নিশ্চিত নই।

বিকল্প নানা পথের যে প্রস্তাবনা নানা ব্যক্তি ও দল উপস্থিত করে, তার ভেতর থেকেই সম্ভাব্য সঠিকতর পথ আমরা নির্ধারণ করতে চাই। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজটি ঘটতে পারে শুধু ক্রমাগত যাচাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে। যেহেতু ভিন্ন নানা মত ও পথের মধ্যে কোনটি শ্রেয় তা পরমভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, তাই সব সিদ্ধান্তই সাময়িক এবং ক্রমাগত পুনর্যাচাই ও বিশ্লেষণের পথ ধরেই গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা।

কোনো রাজনৈতিক দল যখন সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পেয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করে, তার অর্থ এই নয় যে বাস্তবে প্রস্তাবিত ও সমর্থিত রাজনৈতিক পরিকল্পনা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমর্থিত ধারণাগুলো বাস্তব পরীক্ষার ভেতর দিয়ে ক্রমাগত যাচাই হয়েই মাত্র উত্তীর্ণ হতে হয়। উপরন্তু

বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার এই পর্যায়ে বিকল্প ও বিরুদ্ধ মতামতগুলো ক্রমাগত সমালোচনা ও বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে ক্ষমতাসীন দলকে সতর্ক ও সংশোধিত করে। সেই সঙ্গে সংবাদমাধ্যম, সামাজিক নানা সংগঠন এবং সমগ্র জনসাধারণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে সরকারের প্রতিটি কর্মসূচি ও পদক্ষেপের ওপর। এটিই গণতন্ত্রের ধারা। জনগণ ও বিরোধী দলের ক্রমাগত সমালোচনা ও অসংখ্য নিষেধাজ্ঞার ভেতর দিয়েই রাজনৈতিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত দল মারাত্মক কোনো ভুল পথ থেকে রক্ষা পায়।

গণতন্ত্র একটি সজীব, সংবেদী, বহুমাত্রিক ব্যবস্থা, যা ক্রমাগত তথ্য সংগ্রহ, তথ্য যাচাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধরে অগ্রসর হয়। আমাদের দৃষ্টি যেমন দুর্যোগ থেকে আমাদের রক্ষা করে, ঘ্রাণশক্তি যেমন দুর্গন্ধ থেকে আমাদের দূরে রাখে, শ্রবণ ইন্দ্রিয় যেমন বিপদ-সংকেত শুনতে পায়, স্পর্শানুভূতি যেভাবে প্রচণ্ড তাপ ও শীতলতা থেকে দেহকে রক্ষা করে; গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও তেমনি সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা নিয়ে বাহ্যিক রাজনৈতিক পরিবেশকে যদি উপলব্ধি ও যাচাই করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তা বিপর্যয় নিয়ে আসে শুধু রাজনৈতিক দলের জন্য নয়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্যও। আমরা যে অগ্নিদগ্ধ হয়ে, দুর্গন্ধযুক্ত পচা খাবার খেয়ে, বিষপান করে বা বোমার আঘাতে মৃত্যুবরণ করি না, তার কারণ আমাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ক্রমাগত তথ্য প্রেরণ করে বিপদ ও দুর্যোগ থেকে আমাদের রক্ষা করে। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অসংখ্য যোগাযোগ মাধ্যমে জনগণের প্রতিক্রিয়া সংকেতরূপে এসে পৌঁছে সরকারের কাছে। এই সংকেত অনুভবের স্নায়বিক সজীবতা এবং তা বিশ্লেষণের ও সংশোধিত পথ নির্বাচনের মেধা যদি না থাকে, তাহলে অন্ধ দৈত্যের মতো বিপজ্জনক গহ্বরে পতিত হবে জাতি অথবা বিপ্লবের পথ ধরে বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে প্রয়াস পাবে জনগণ। কিন্তু সেটি গণতন্ত্রের পথ নয়।

গণতন্ত্রে বিরোধী দলের অপরিহার্যতা

গণতন্ত্রের একটি বাহ্যিক রূপ আছে, গণতন্ত্রের প্রক্রিয়ায় কিছু নিয়ম পালন আছে এবং আছে একটি লক্ষ্য ও আদর্শ। গণতন্ত্রের লক্ষ্য ও আদর্শকে যারা অনুধাবন বা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ, তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কিছু আচার-আচরণ ও নিয়মকানুন পালনকেই গণতন্ত্র বলে জানে। তারা গণতন্ত্রের প্রথাগত নিয়মকানুনগুলোকেও নিছক আনুষ্ঠানিকতা বলে গণ্য করে। ফলে, কলাকৌশলে গণতন্ত্রের বাহ্যিক রূপ কৃত্রিমভাবে প্রদর্শন করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভকে একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে জানে, গণতন্ত্র তাদের হাতেই সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত।

নির্বাচন, সংসদ, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল, মন্ত্রিপরিষদ, রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন— এসবই একগুচ্ছ শব্দমালা, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। গণতান্ত্রিক আচরণ সম্পর্কেও কতগুলো পারিভাষিক শব্দ যুক্ত হয়ে আছে; যথা— জনসমর্থন, বাকস্বাধীনতা, রাজনৈতিক বিতর্ক, সহনশীলতা, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের আধিপত্য ইত্যাদি। যে দেশে গণতন্ত্রের এই কাঠামোগুলো ও ব্যবস্থাদি প্রচলিত আছে, সেই সঙ্গে গণতান্ত্রিক আচরণের কৃত্রিম অভিনয়, অথচ গণতন্ত্রের মূল চেতনা ও উপলব্ধি অনুপস্থিত, সে দেশ উইয়ে খাওয়া জ্ঞান গ্রন্থের মতো, যার বাইরের মলাটটি রেখে ভেতরের তথ্য পোকা গ্রাস করেছে। উই পোকার বৈশিষ্ট্য হলো, এরা অন্ধকারের প্রাণী, আলো সইতে পারে না বলেই বইয়ের যে দিকটা অদৃশ্য, সেদিক থেকে প্রবেশ করে সব সারবস্তুকে ধ্বংস করলেও এর বাহ্যিক আবরণটাকে রেখে দেয়। কারণ আলোকপাতের জন্য বাইরের দিকটা দৃশ্যমান।

আমরা আপাতদৃষ্টিতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানগুলোই দেখতে পাই, এমনকি বাইরের লোকদের কাছেও গণতন্ত্রের উপরিগত কাঠামোকে প্রদর্শন করা সহজ। কিন্তু গণতন্ত্রের যে ভিত্তি দীর্ঘদিন ধরে সৃষ্টি হয় অসংখ্য মানুষের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে, আত্মত্যাগ ও সাহসিকতায়, উদ্ভাবন ও উপলব্ধিতে, তা বাহ্যিকভাবে প্রদর্শনযোগ্য নয় কোনো কৃত্রিমতায়। বইয়ের তথ্যগুলো যেমন সংগৃহীত ও সংকলিত দীর্ঘ সময় ধরে কঠোর শ্রম ও সাধনায়, এর পাঠ ও উপলব্ধিও তেমনি শ্রম ও বুদ্ধিনির্ভর কাজ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমত যাচাইয়ের জন্য যে নির্বাচন এবং সংসদে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের যে অবস্থান এবং কোনো

সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পথে যে বিতর্ক, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা, বিকল্প নানা প্রস্তাবনা, তা কোনো আনুষ্ঠানিকতা নয়— একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া সম্ভাব্য সঠিক পথ নির্ধারণের। সংসদে বিরোধী দলের উপস্থিতি, তাদের উত্থাপিত প্রশ্ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে বাধা প্রদান, সমালোচনা ও ত্রুটি অন্বেষণ যতই অবাঞ্ছিত ও অপ্রীতিকর মনে হোক, এ কথা উপলব্ধি করতে হবে যে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সরকারি ও বিরোধী দল শুধু পরস্পরের পরিপূরক নয়, একের অস্তিত্বের জন্য অন্যের অবস্থিতি অপরিহার্য।

আলোর উপস্থিতিতে বস্তুমাত্রেরই ছায়া আছে, একমাত্র ছায়া নেই ভূতের যা কল্পনার বস্তু। এ জন্যই একমাত্র কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভিতু মানুষই ভূতের অস্তিত্বকে স্বীকার করে এবং সেটাও অন্ধকারে। প্রতিটি পথচলার ক্ষেত্রে আমরা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া একই সঙ্গে লক্ষ করি। যদি কেউ তার চলার পথকে অপ্রতিরোধ্য ও সুগম করার লক্ষ্যে ঘর্ষণমুক্ত অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াহীন করতে চায়, তার জন্য পিচ্ছিল পথে পতন অনিবার্য। অবশ্য যে ক্রমাগত নতুন পদক্ষেপে পথ চলতে চায় না, নিক্ষিপ্ত হতে চায় জড়বস্তুর মতো পূর্বনির্ধারিত গন্তব্যে, সেখানে ঘর্ষণমুক্ত মসৃণ পথ সহায়ক। এখানে একটি একক একমুহূর্তের অভিঘাত ক্রিয়ারূপে উপস্থিত এবং নিষ্ক্রিয় জড়বস্তুর গতিলাভ হচ্ছে এর প্রতিক্রিয়া। কিন্তু গণতন্ত্র হচ্ছে প্রতিনিয়ত সচেতন পদক্ষেপের ভেতর দিয়ে প্রতি মুহূর্তের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় পথচলা।

যত দিন মানুষ আপন বুদ্ধি, বিচারশক্তি, সত্যোদ্‌ঘাটন এবং ক্রমাগতভাবে শুদ্ধতররূপে লক্ষ্য নির্ধারণ করার শক্তি অর্জন করেনি, বরং ভয়, অজ্ঞতা, অন্ধবিশ্বাস ও আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়েছে, তত দিন মানুষের এই দুর্বলতাকে মূলধন করে রাজতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র, একনায়কত্ব ও আধিপত্যবাদ সমগ্র জনগোষ্ঠীকে একটি ভীতি, লোভ, অন্ধবিশ্বাস, অলৌকিক ভাবনা, সাম্প্রদায়িক আবেগ বা অবাস্তব ও অপরিবর্তী নীতিমালার মোড়কে আবদ্ধ করে নিক্ষেপ করেছে অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে। সেই অন্ধকার অতীতকে অতিক্রম করে গণতন্ত্রের আলোকিত পথে সভ্যতার যে অগ্রযাত্রা, সেখানে প্রতিটি মানুষের মুক্তবুদ্ধি, তার সৃজনশীলতা, আত্মপ্রত্যয়, স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মূল্যপ্রাপ্ত। সজীব, সক্রিয়, উদ্ভাবনী ব্যক্তিমানুষের সমন্বয়ে যে সমাজ, তার অগ্রযাত্রা প্রতিজনের প্রতি মুহূর্তের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও অবদানের ভেতর দিয়ে প্রতিনিয়ত নির্মিত হওয়ার। মানুষ এখানে নিজেই তার ভাগ্যনিয়ন্তা যৌথভাবে, তাদের সৃষ্টিশীলতায়, অভিজ্ঞানে, কর্মতৎপরতায় ও দায়িত্ববোধে; কোনো অন্ধবিশ্বাস, ভীতি, লোভ বা আবেগের অভিঘাতে তারা নিক্ষিপ্ত হওয়ার নয় জড়বস্তুর মতো।

গণতন্ত্র হচ্ছে সেই পথ নির্মাণের, পথচলার ও লক্ষ্য নির্ধারণের, যা প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রবদ্ধ মানুষের একত্রে অংশগ্রহণের ভেতর দিয়ে। গণতন্ত্রের এই পথ নির্ধারণ যেহেতু সংঘটিত হয় অসংখ্য মানুষের অবদান ও অংশগ্রহণের ভেতর দিয়ে,

অভিজ্ঞতার ক্রমসঞ্চয়, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই প্রক্রিয়ায়, তাই গণতন্ত্রের পথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার। পরীক্ষিত হওয়ার আগে আপাতসম্ভাব্য সব তত্ত্বই যেমন সমান গুরুত্বের, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক বিকল্প মতবাদ, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রস্তাবিত নীতিমালাও সমান গুরুত্বে বিবেচ্য রাজনৈতিক অঙ্গনে। সংখ্যাধিক্যের সমর্থনে যে রাজনৈতিক দলের মেনিফেস্টো উত্তীর্ণ, তার ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সুযোগ লাভ করে বাস্তবে তাদের পরিকল্পনা ও মেনিফেস্টো যাচাইয়ের।

স্বভাবতই গণতন্ত্রের এই প্রাথমিক স্তরে অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতার অপচ্ছায়া ব্যবহার করে কোনো রাজনৈতিক দল যদি জনগণকে বিভ্রান্ত করে এবং সাময়িকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভে সমর্থ হয়, বাস্তবে দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার ভেতর দিয়ে সেই বিভ্রান্তি ধরা পড়ে। গণতন্ত্রের এই ঝুঁকি সেই অনুপাতেই থেকে যায়, যে অনুপাতে জনগণ শিক্ষা ও সচেতনতায়, বিচার-বুদ্ধি ও বস্তুনিষ্ঠতায় পশ্চাৎপদ এবং বিরোধী দল বিশ্লেষণ ও ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থ বা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বিরোধী দলের মতামতের প্রতি সহনশীলতা, বিকল্প মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, বিপক্ষের স্বাধীনতা ও অধিকার সমুন্নত রাখা শুধু সৌজন্য বা উদারতা নয়, নয় কোনো অনুকম্পা। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে সত্যোদ্‌ঘাটনের ও ভুল সংশোধনের যে পথ গণতন্ত্রের, সেখানে বিরোধী দল অপরিহার্য তাদের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা, গুরুত্ব, অধিকার ও দায়িত্ব নিয়ে।

গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও বিরোধী দলের কৃত্য

গণতন্ত্রে বাকস্বাধীনতা থাকতে হবে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সরকার গঠিত হবে, সংসদে আইন প্রণীত হবে ও দেশ পরিচালনার নীতিমালা গৃহীত হবে—এসবই সংবিধানের কথা এবং গণতন্ত্রের প্রথা বলে সর্বজনবিদিত। কিন্তু গণতন্ত্র বলতে কি শুধু এই নিয়ম পালন বোঝায়? গণতন্ত্র যদি সভ্যতার একটি অভিযাত্রা হয় সমাজবদ্ধ ও রাষ্ট্রবদ্ধ মানুষের, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের স্বাধীন চিন্তা, সৃজনশীলতা, কর্মতৎপরতা সমন্বিত হবে সার্বিক কল্যাণে, তাহলে এই অভিযাত্রার লক্ষ্য কী? তা জানতে হবে। শুধু পথচলার নিয়ম মেনেই গন্তব্যে পৌঁছা যায় না, পথ চলার লক্ষ্যটাও উপলব্ধি করতে হবে। বস্তুত লক্ষ্য যেখানে স্পষ্ট নয়, সেখানে পথচলার নিয়ম মেনে চলার আন্তরিকতা ও সততা বিঘ্নিত হয়। গণতন্ত্রের মূল স্বতঃসিদ্ধ বা প্রতিজ্ঞা হলো প্রতিটি মানুষ মুক্ত ও স্বাধীনতাপ্রাপ্ত অভিমত প্রকাশে, আত্মরক্ষা ও আত্মকল্যাণে। কিন্তু একই সঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সমষ্টিগত কল্যাণ সাধন কেমন করে সম্ভব? এটি একটি মৌলিক সমস্যা।

সমস্যাটি গভীর এই জন্য যে, মানুষের জন্য কোনটি কল্যাণকর, কোনটি সঠিক পথ তা এককভাবে বা পরমভাবে পূর্বনির্ধারিত নয়। প্রতিটি মানুষের অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞান, উপলব্ধি ও আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন, যা আবার দেশ, কাল ও পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। বিচিত্র ও বহুমুখী ভাবনা ও অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ যেখানে চলছে একটি রাষ্ট্রবদ্ধ জনগণের মধ্যে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে, সেখানে সবার মতামতকে সমন্বিত করে সঠিক পথ নির্ধারণ করতে গিয়েই গণতন্ত্রের উদ্ভাবন ঘটেছে।

কোনো পণ্ডিত, কোনো দার্শনিক, কোনো ধর্মযাজক বা কোনো রাষ্ট্রনায়ক যদি তার নির্বাচিত জীবনধারা সৎ উদ্দেশ্য নিয়েও চাপিয়ে দিতে চায় জনগণের ওপর, এমনকি সফলও হয় জনগণকে সন্তুষ্ট রাখতে এবং তাদের ইচ্ছা ও ভাবনাকে আপন ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রণ করতে, তাহলেও তা গ্রহণীয় নয়। মানবসভ্যতার জন্য তা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনগণ যে বিক্ষুব্ধ হয় আন্দোলন ও বিপ্লব করে একনায়কত্ব ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে তা তাদের দুঃশাসন, শোষণ ও নির্যাতনের জন্য। রাজতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণপ্রজাতন্ত্রের যে উদ্ভব তা যদি শুধু জনগণেব অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন, সুবিচার প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তা ও শান্তি

রক্ষার লক্ষ্যে হয় তাহলে গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য এতে প্রতিফলিত নয়। বস্তুত প্রতিটি মানুষের প্রত্যাশা ও সম্ভাবনা কী? কোনটি তার জন্য সঠিক পথ ও কল্যাণকর তা কোনো বিশেষজ্ঞ বা রাষ্ট্রনায়ক এককভাবে ও সর্বকালের জন্য নির্ধারণ করতে পারে না।

সঠিক পথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার, অসংখ্যের অংশগ্রহণের মতবিনিময় ও মত যাচাইয়ের, ক্রমাগত গ্রহণ ও বর্জনের, সংশোধনের ও পরিমার্জনার। গণতন্ত্রে মূলত দুটি কাজ একই সঙ্গে সংঘটিত করে। একটি হলো প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতা, সৃষ্টিশীলতা ও আত্মবিকাশের অধিকারকে পরম মূল্যের বলে গ্রহণ। অন্যটি হলো প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকারকে সমুন্নত রেখেও বিচিত্র ও বহুমুখী ভাবনার সমন্বয় সাধন। রাজনৈতিক দল গঠন, গণভোট গ্রহণ, গণমাধ্যমগুলোর মাধ্যমে অবাধ তথ্য আদান-প্রদান, সংসদে বিতর্ক, সভা-সমিতির মাধ্যমে বিকল্প নানা মতামতের প্রকাশ, এমনকি প্রতিবাদ মিছিল— সবই অভিব্যক্তি ব্যক্তি ও দলগত চিন্তা-ভাবনা ও অভিমতের। কখনো নির্বাচন, কখনো জনমত গ্রহণ, কখনো সংসদে আলোচনা, বিতর্ক ও ভোট গ্রহণের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ— তা জটিল এক প্রক্রিয়া সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার। কোনো রাজনৈতিক দল যখন কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করার সময় বিশেষ সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে এবং বিপক্ষ দল যখন তার বিরোধিতা করে, তখন দুই পক্ষই পরস্পরের যুক্তিকে গভীর বিবেচনা ও গুরুত্বের সঙ্গে যাচাই করবে, এটাই প্রত্যাশিত। কারণ, সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার এটাই একমাত্র পথ। সংখ্যাধিক্যের সমর্থনে যে মতটি গৃহীত হলো, তা যে সঠিক না-ও হতে পারে, এই দ্বিধা নিয়েই অগ্রসর হতে হবে সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে। সব সিদ্ধান্তই সে অর্থে সাময়িক। কার্যকর করার পথে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে জনগণের প্রতিক্রিয়া ও বিরোধী দলের সমালোচনা যাচাই করে ক্রমাগত সংশোধন এনে, সঠিকতর পথ নির্ধারণ করতে হবে। অনেক সিদ্ধান্তই অপ্রত্যাবর্তী অর্থাৎ একবার গৃহীত হলে তার পরিবর্তন ঘটানো দুঃসাধ্য। সে ক্ষেত্রে অনেক বেশি সাবধানতা ও বিশ্লেষণী দৃষ্টি প্রয়োজন। যে অভিমত বা সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পেল তা পরবর্তী সময়ে সংখ্যালঘুর মত হয়ে দাঁড়াতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রেই জনগণের অসাবধানতা, গোঁড়ামি, অজ্ঞতা, রক্ষণশীলতা বা অপপ্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হবার কারণে ভুল সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন আসতে পারে জনগণের পক্ষ থেকে। এই ঝুঁকি গণতন্ত্রের প্রক্রিয়ায় ততটাই বৃদ্ধি পায়, শিক্ষার হার, রাজনৈতিক সচেতনতা, বিশ্লেষণী ও যাচাই ক্ষমতা এবং অপপ্রচার দ্বারা বিভ্রান্ত না হবার শক্তি জনগণের মধ্যে যত কম। কিন্তু আশার কথা, কিছু মানুষকে সব সময়ের জন্য এবং সব মানুষকে কিছু সময়ের জন্য বিভ্রান্ত করা গেলেও সব

মানুষকে সব সময়ের জন্য বিভ্রান্ত করা যায় না। জনগণ, সেই অর্থে বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতেরাও ভুল করে বলেই গণতন্ত্রের প্রয়োজন। কিন্তু গণতন্ত্র যে শেষ পর্যন্ত কার্যকর হতে পারে তার কারণ, জনগণ বিচার করতে সক্ষম ভুলভ্রান্তি ও অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে।

গণতন্ত্রের পথ স্বভাবতই দুর্গম ও ঝুঁকিপূর্ণ, কিন্তু এর বিকল্প কোনো পথ নেই একই সঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সৃজনশীলতাকে সংরক্ষণ করে যৌথ সাফল্য ও কল্যাণ সাধনের। বিচিত্র ও বিভিন্ন মতের মধ্যে কোনটি সঠিক, তা যাচাই করার জন্যেই বিতর্ক ও বিশ্লেষণ চাই। আমাদের দেহের অসুস্থতা, রোগ ও দৈহিক অক্ষমতা নির্ধারণের জন্য আমরা আপন ইচ্ছায় চিকিৎসককে ফি প্রদান করে চিকিৎসাপত্র পেতে ও চিকিৎসালাভে সচেষ্ট হই। চিকিৎসক যদি রোগ নির্ধারণ, অসুস্থতার কারণ উল্লেখ এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণে বিরত থাকে সাময়িকভাবে রোগীকে মিথ্যা প্রশান্তি দেওয়ার লক্ষে; অথবা কোনো বদমেজাজি, অসহিষ্ণু ও অপরিণামদর্শী একনায়ক যদি চিকিৎসককে ভীতি প্রদর্শন করে তার দেহের অসুস্থতা উল্লেখ করার দুঃসাহসে, অথবা যেখানে কঠিন ব্যাধির জন্য অস্ত্রোপচার অত্যাবশ্যক সেখানে ডাক্তারকে ভীতি প্রদর্শন করে তাকে বিরত রাখে তার কর্তব্য পালনে, তাহলে তা রোগীর জন্য ভয়াবহ।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারি দল হলো সেই স্নায়ু কেন্দ্র যা প্রশাসনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পরিচালনা করে এবং বিরোধী দল হলো সেই সব স্নায়ুতন্ত্র যা প্রতিকূল পরিবেশ ও রোগযন্ত্রণার সংকেত প্রদান করে। রাষ্ট্রবদ্ধ মানুষগুলোর সমন্বয়ই হলো দেশ। দেহের সুস্থতার জন্য যেমন বেদনাবোধের ও প্রতিকূল পরিবেশের সংকেত অপরিহার্য, অন্যথায় দুর্গন্ধময় খাবার খেয়ে, অগ্নিকাণ্ডে, প্রচণ্ড শীতে, ভয়াবহ বোমার আঘাতে বা রোগের আক্রমণে মানুষের মৃত্যু ঘটত। বিরোধী দল তাদের বিতর্ক, ভুল সংশোধন ও বিশ্লেষণ ছাড়া একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাজনৈতিক ভুল সিদ্ধান্ত ও বিপর্যয়ের শিকার হতে বাধ্য। প্রাচীন রাজাগণ তাদের মনোতুষ্টির জন্য ভাঁড় পুষত, যারা রাজার মনোরঞ্জনের জন্য স্তুতিবাক্য বর্ষণ ও ভাঁড়ামির কাজেই সর্বদা নিয়োজিত থাকত। রাজা নিজেও এ কথা জানত যে, শুধু ভাঁড় দিয়ে রাষ্ট্রের খবর পাওয়া সম্ভব নয়; বরং তার পরামর্শদাতারূপে যেসব মন্ত্রী ও গোয়েন্দা কাজ করত তাদের কাছ থেকে অপ্রীতিকর সত্য তথ্য সে জানতে চাইত।

রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য অবশ্য অপার। এখানে বিরোধী দল এবং সরকারি দল উভয়ই জনগণের দ্বারা নির্বাচিত। এরা পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিতর্ক ও বিরোধিতা করলেও এই বিরোধকে ছাপিয়ে একটি বৃহত্তর ঐক্য কাজ করার কথা এবং তা হলো জনগণের কল্যাণ এবং সেই কল্যাণার্জনের লক্ষ্যে সঠিক

পথ নির্ধারণ। যেমন করে কর্মকার আগুনে পুড়িয়ে, হাতুড়ির আঘাত হেনে হাতিয়ার নির্মাণ করে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সরকারি ও বিরোধী দলের বিতর্ক, বিশ্লেষণ, যুক্তির ঘাত-প্রতিঘাত সবকিছু মিলে সৃষ্টি করার কথা কর্মকারের উত্তাপ ও আঘাতের সেই আবহ, যেখানে যুক্তি ও তথ্যের আলোকে উদ্ভাবনী ভাবনা, দেশপ্রেম ও দক্ষতার সমন্বিত প্রভাবে নির্মিত হবে সুষ্ঠু পরিকল্পনা, ত্রুটিমুক্ত নীতিমালা ও শুদ্ধতর পরিবেশ।

আমরা যে ব্যর্থ হচ্ছি গণতন্ত্রের সেই পরিবেশে স্বাধীনতার সুফলকে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে তার কারণ প্রাচীন রাজতন্ত্র, স্বৈরশাসন ও একনায়কত্বের ভূত এখনো চেপে বসে আছে নানা ছদ্মবেশে—কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, আত্মমর্যাদাহীনতা ও সাম্প্রদায়িকতার অপচ্ছায়াকে বহন করে। এখান থেকে উত্তরণের পথ স্বভাবতই যথার্থ শিক্ষা ও আচরণ প্রকৃত গণতান্ত্রিক আবহে।

গণতন্ত্রের বিস্তারণ : স্থান, কাল ও সংগঠনের বহুতায়

গণতন্ত্রের একটি বিশুদ্ধ আদর্শগত দিক আছে, যা সৃষ্টি করে দার্শনিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও বিদ্বজ্জন। এটি রাজনীতির তাত্ত্বিক দিক। একই সঙ্গে রাজনীতির একটি প্রায়োগিক ও কৌশলগত দিক রয়েছে, যেখানে কাজ করে রাজনীতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, ক্ষমতা প্রয়োগ, ভোগ এবং শক্তি প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গ। রাজনীতির এই আদর্শগত ও তাত্ত্বিক জগতের সঙ্গে বাস্তব রাজনীতির পার্থক্য অপার। একমাত্র প্রাচীন গ্রিসে রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে প্লেটোর Republic ক্ষণস্থায়ী দৃষ্টান্তরূপে দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে রাজনীতির দার্শনিক প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ নেয়। এরপর নানা দেশে, নানা কালে রাষ্ট্র পরিচালনায় রাজনৈতিক-দার্শনিকের উপস্থিতি ও প্রভাব যেখানেই পড়ছে তা হয়েছে পরোক্ষ ও অস্পষ্ট। অবশ্য কখনো কখনো বিশেষ তন্ত্রের প্রবক্তারূপে একটি আদর্শকে ভিত্তি করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল, জনসমর্থন লাভ ও রাষ্ট্র পরিচালনার দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই হিটলারের জার্মানি, পোপের ভ্যাটিকান সিটি, কমিউনিস্ট রাশিয়া এবং অন্যান্য দেশে। কিন্তু যাকে আমরা গণতন্ত্র বলি, যেখানে জনগণের মতামতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়ার কথা, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ রাষ্ট্রনায়কেরা করলেও তাদের কর্মকাণ্ডের ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালার নিয়ন্ত্রক জনগণ, সেখানে রাজনৈতিক দর্শন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ও প্রয়োগের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত প্রকট।

আধুনিক সভ্যতায় দুটি আপাত-পরস্পরবিরোধী উপলব্ধি ও প্রক্রিয়া আমরা লক্ষ করি। এর একটি হলো ব্যক্তিস্বাধীনতা, অন্যটি হলো যূথবদ্ধতা। মানুষের জ্ঞানের বিকাশ, ব্যক্তিমানুষের সৃজনশীলতা, মুক্তচিন্তা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা প্রতিটি মানুষকে ভিন্ন ও অনন্য করেছে; ফলে তার কর্মদক্ষতার বিকাশ, তার মত প্রকাশের অধিকার, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারে তার অংশগ্রহণ—সবকিছুর জন্যই ব্যক্তিমানুষের মৌলিক যে অধিকার তা হলো আপন প্রতিভার স্ফুরণ ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ, যার প্রতিফলন ঘটতে পারে ব্যক্তিমানুষের বুদ্ধিগত মুক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতায়। কিন্তু এই ব্যক্তিস্বাধীনতা মানুষকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না করে বরং এক যৌথ জীবনের অনিবার্যতা সৃষ্টি করেছে। এর কারণ প্রতিটি মানুষ তার গভীরতর উপলব্ধি,

ব্যাপকতর দৃষ্টি, বর্ধিত জ্ঞান ও দক্ষতা নিয়ে একদিকে যেমন অনেক বেশি প্রভাব বিস্তারী, অন্যদিকে প্রভাবিত হওয়ার দক্ষতা ও সংবেদিতাপ্রাপ্তও।

জ্ঞানচর্চার প্রতিটি ক্ষেত্রে, উপলব্ধির জগতে, উৎপাদনশীলতায়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় প্রয়োজন। পুরোনো দিনের যূথবদ্ধ জীবনের তুলনায় আধুনিক সমাজবদ্ধ জীবন মৌলিকভাবে ভিন্ন। অতীতে মানুষ যখন অসহায় ছিল তখন মানুষের জোটবদ্ধতা ছিল নিয়ন্ত্রণ-অসাধ্য। আধুনিক সভ্যতা, জ্ঞানের অগ্রগতি ও মানুষের যোগাযোগসাধ্যতা বৃদ্ধির কারণে যে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করেছে তার ভিত্তি হলো ব্যক্তিমানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি, তার অনুসন্ধিৎসা, বর্ধিত উপলব্ধি, সংযোগসাধ্যতা ও প্রত্যভিজ্ঞা। জ্ঞানের সাধনা, গবেষণা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও শিল্পায়ন, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ, আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও বুদ্ধির স্ফুরণের জন্য নানা বিশেষজ্ঞ, কৃৎকৌশলী, বিজ্ঞানী ও কর্মী পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনে একধরনের পেশাগত বন্ধন সৃষ্টি করে। একটি আধুনিক রাষ্ট্রে এই সামাজিক সম্পর্ককে অনিবার্য ও পারস্পরিকভাবে নির্মাণ করা হয়।

একটি জটিল ও সূক্ষ্ম সম্পর্কের জাল রাষ্ট্রবদ্ধ নাগরিকদের সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত করে জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, উন্নয়ন, জীবনধারা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চায়। একজন সচেতন, স্বাধীন ও সক্রিয় নাগরিক হিসেবে একই ব্যক্তি নানাভাবে যুক্ত হতে পারে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক বা সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গে। এই গোষ্ঠীগুলো আবার পারস্পরিক সম্পর্কে ব্যাপকতর জাতীয় সমর্থন সৃষ্টি করে। বিভিন্ন স্তরের এই সম্পর্ক সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় বন্ধন সৃষ্টি করে। অতীতের রাষ্ট্রগুলোতে ব্যক্তিমানুষের পেশাগত বৈশিষ্ট্য ও জ্ঞানের জগৎ অতটা ভিন্ন ছিল না পরস্পর থেকে। ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ অতটা গভীর ও সূক্ষ্ম ছিল না। গভীর বিশ্লেষণে দেখা যায়, একটি দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি এবং কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান ও চেতনার স্তর নির্ধারিত হয় প্রতিটি নাগরিকের শিক্ষা, কর্মদক্ষতা ও পেশাগত সাফল্যের ওপর। আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালকদের প্রধান দায়িত্ব তাই বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মানুষ, বিচ্ছিন্ন নানা উৎপাদন ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং একটি গতিশীল ভারসাম্য রক্ষা করা ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্গে নাগরিক দায়িত্ববোধের। কোনো পূর্বনির্ধারিত ছকে বা বাহ্যিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া কোনো যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় এই সমন্বয় সাধন বা রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব নয়।

সভ্যতার এই অগ্রযাত্রা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান বিকাশ ও প্রভাব, তথ্যের দ্রুত ও ব্যাপক আদান-প্রদান একদিকে যেমন শিক্ষার বিস্তার, গবেষণা ও নতুন উদ্ভাবনের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে, অন্যদিকে ব্যক্তিস্বাধীনতা, সামাজিক সচেতনতা, উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষা, মানুষের রাজনৈতিক ভাবনা ও সরকারের কাছে তাদের প্রত্যাশাকে ব্যাপক ও বহুমুখী করেছে। প্রতিটি কর্মক্ষেত্র মানুষকে

তার কর্মদক্ষতায়, মূল্যবোধে ও চেতনায় একেকটি পৃথক ও ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। অন্যদিকে আধুনিক রাষ্ট্রের ব্যাপক প্রভাববলয় ও জঙ্গমতা একটি সর্বগ্রাসী আধিপত্য নিয়ে মানুষের সব কর্মকাণ্ড, ভাবনা ও চেতনাকে আত্মস্থ করার প্রয়াস পাচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে যে আচরণ অননুমোদিত ও নিন্দনীয়, রাষ্ট্রীয়ভাবে সেই কাজগুলোই রাজনৈতিক আদর্শ, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন ও জাতীয় স্বার্থের নামে অনুমোদিত ও সমর্থিত হতে পারে। যেমন, যুদ্ধে যে ধরনের শক্তি প্রয়োগ, নিষ্ঠুরতা, বিনিয়োগ ও অপচয় আইনশৃঙ্খলা ও দেশ রক্ষার নামে ঘটে থাকে, সেই একই যুক্তিতে কোনো ব্যক্তি বা দল এই কাজগুলো করতে পারে না। এমনকি করার অবকাশও নেই।

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তাই এর সমস্ত ক্ষমতা, আধিপত্য ও সমর্থন নিয়েও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা ও দলগত কর্মদক্ষতার বিরুদ্ধে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্যাটি ব্যাপক সমষ্টিকরণের। সমাজের সূক্ষ্ম গুণ, ব্যক্তিমানুষের মুক্ত ও বিকল্প ভাবনা, তার সৃজনশীলতা ও অভিনবত্ব রাষ্ট্রের যান্ত্রিক জাঁতাকলে নিষ্পেষিত ও নিগৃহীত হওয়ার ঘটনা শুধু ইতিহাসেই ছড়িয়ে নেই, বর্তমানেও পরিলক্ষিত। দক্ষতর যোগাযোগব্যবস্থা, উন্নত সব প্রচারযন্ত্র, অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র শুধু ব্যক্তিস্বাধীনতাকেই গ্রাস করছে না; পেশাগত স্বাধীনতা, সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বৈচিত্র্যকেও মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। এই পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের যে মূল দর্শন জনমতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার তা এক জটিল রূপ ধারণ করেছে। প্রতিটি মানুষের অভিমত তার কর্মক্ষেত্র, পেশা, সামাজিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক জগতের ভিত্তিতে ভিন্ন। ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত ও পেশাগত এসব চিন্তার স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ না করলে সমাজের সূক্ষ্ম গুণ, এর বৈচিত্র্য ও ক্রমবিকাশের কেন্দ্রিকগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। ফলে, আধুনিক সমাজের ভিত্তিও। অন্যদিকে পারস্পরিক সহযোগিতা, ঐক্য ও সমন্বয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য ও টানাপড়েনের পরিবেশে একটিমাত্র সমাধান হলো গণতন্ত্রের ভিত্তিকে বহুকেন্দ্রিক, বহুমুখী ও বিস্তৃত স্থান ও কালে, পেশা ও কর্মকাণ্ডের নানা ক্ষেত্রে। স্পষ্ট করে বলতে গেলে শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, পরিবেশ, সামাজিক সম্পর্ক, জীবনবোধ—প্রতিটি ক্ষেত্রে জ্ঞানের বিস্তার, উপলব্ধির বিকাশ ও বিশেষজ্ঞের দৃষ্টির সূক্ষ্মতা সমগ্র মানবসভ্যতাকে এমন জটিলতা ও গভীরতা দিয়েছে যে কোনো রাজনৈতিক মতবাদ, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও যান্ত্রিক প্রশাসন দ্বারা একে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

গণতান্ত্রিক সরকার যেখানে ভিন্ন তত্ত্বাবধায়ক সরকার থেকে

একটি রাজনৈতিক দলের নিজস্ব কর্মসূচির প্রস্তাবিত অঙ্গীকার, পরিকল্পিত লক্ষ্যার্জন, জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা, অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা করা—এসব কিছু পূরণ করতে হয়। ফলে এর ভারসাম্য রক্ষার কাজটি গতির। সমাজের ও দেশের অনেক রুটিন কাজ আছে যেগুলো রাজনৈতিক দলকে করতে হয় রাষ্ট্র পরিচালনার দৈনন্দিন প্রয়োজনে। কিন্তু এগুলো সব দলের জন্য সাধারণ বলে এর ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলোর পার্থক্যযোগ্যতা নির্ধারিত নয়, অথচ এগুলো দেশের স্থিতিশীলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বলতে পারি, রাজনৈতিক দলের যে সার্বিক কর্মসূচি—সেখানে একটি অংশ হলো স্থিতিশীলতার এবং অন্যটি হলো পরিবর্তনের। ফলে এর চলার পথে যে ভারসাম্য রক্ষার অপরিহার্যতা তা একই সঙ্গে গতির ও স্থিতির। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেহেতু কোনো রাজনৈতিক দলের সরকার নয়, এর কোনো লক্ষ্য ও কর্মপরিকল্পনা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সংজ্ঞায়িত নয়; ফলে এর একমাত্র কাজ স্থিতির ভারসাম্য রক্ষা করা। যে কাজগুলো গতিশীলতার মধ্যে সম্পন্ন করা কঠিন, তা অনেক সময় স্থিতি অবস্থায় সহজেই সম্পন্ন করা যায়। চলন্ত গাড়ির লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রয়োজনে ক্রমাগত সুনির্দিষ্ট পথ নির্বাচন করতে হয় অন্য বিকল্প অনেক পথকে বর্জন করে এবং তা করতে হয় জনগণের সমর্থন নিয়ে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে এই দায়িত্বটি পালন করতে হয় না বলে তার সমগ্র শক্তি ও সময় নিয়োজিত হতে পারে দৈনন্দিন গতানুগতিক অথচ গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পন্ন করায়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি বাংলাদেশের একটি উদ্ভাবন, যা গণতন্ত্রের পথে চলতে গিয়ে একটি দুর্যোগের সমাধানরূপে উদ্ভাবিত হয়েছে। সুতরাং দুর্যোগ এড়িয়ে নির্বাচন সুসম্পন্ন করাই যে প্রধান এবং প্রায় একমাত্র কাজ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এটি বিস্মৃত হওয়ার নয়। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য সেটি গভীরভাবে শুধু অবধারণ করাই যথেষ্ট নয়, এর সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করাও প্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছে। একটি নির্বাচিত সরকার তার ভিত্তি ও স্থিতিশীলতা লাভ করে তিনটি উৎস

থেকে। একটি হলো সাংবিধানিকভাবে তার ওপর ন্যস্ত ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার, দ্বিতীয়টি হলো গণতান্ত্রিক ধারার যে ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ, জনগণের মতামত, আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামের ফসলরূপে প্রতিষ্ঠিত ও জাতীয়ভাবে পরিব্যাপ্ত তা হলো, জনগণের অভিমতের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দেশ শাসন করবে একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত। সংবিধানের প্রদত্ত ক্ষমতার তুলনায় এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা অনেক বেশি স্থায়ী ও গভীর। জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে অভিযোজিত ক্ষমতা লাভের ফলে নির্বাচিত সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও কর্মপরিধি স্বভাবতই ব্যাপক ও অগতানুগতিক হওয়ার স্বাধীনতা রাখে। তৃতীয়টি হলো, প্রতিটি রাজনৈতিক দলের একটি নির্দিষ্ট মেনিফেস্টো ও সমর্থন থাকার ফলে এর একটি স্থিতিস্থাপকতা আছে, যার ফলে কোনো বিরূপ পরিস্থিতিকে অতিক্রম করার একটি অন্তর্নিহিত শক্তি দলের কাছ থেকে এই সরকার পেয়ে যায়। সরকারকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করার ক্ষেত্রে দলীয় সরকারের এই স্থিতিস্থাপকতা প্রত্যাশিত না হতে পারে; কিন্তু যেকোনো ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য এটি অপরিহার্য। বস্তুত একটি গতিশীল পরিবর্তনীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আপাত-পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন। একটি হলো চালিকা শক্তি যার উৎস—নতুন ধ্যান-ধারণা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ও রূপান্তরের স্বাধীনতা; অন্যটি হলো স্থিতিস্থাপকতার উৎস—ঐতিহ্য ও জড়তা।

গণতন্ত্র এর জটিল ব্যবস্থার পরিবর্তনশীলতা ও রক্ষণশীলতাকে একই সঙ্গে সমন্বিত করে পারস্পরিক ভারসাম্য রক্ষা করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর ক্ষমতা প্রয়োগের ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি লাভ করে শুধু সংবিধানের আইনগত সমর্থন থেকে, যা নিতান্তই সাময়িকভাবে গৃহীত সংসদে। কিন্তু আরো অতিরিক্ত যে দুটি ব্যাপকতর দীর্ঘস্থায়ী ভিত্তি ও শক্তির উৎস কাজ করে গণতান্ত্রিক সরকারের ক্ষেত্রে তা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। আরো একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য যে, একটি নির্বাচিত সরকারের আয়ুষ্কালে সবটা সময়ই সমান গুরত্বের, ফলে এ কথা মনে করার অবকাশ নেই যে, সেই সরকারের গৃহীত শেষ দিকের সিদ্ধান্ত কোনো দিক থেকে কম গুরুত্বের। যখন কোনো রাজতন্ত্র, একনায়কত্ব, সেনাশাসন বা স্বৈরাচারী সরকার গণ-আন্দোলনের মুখে অপসারিত হয়, সেখানে এ কথা বলা চলে যে, সেই সরকারের শেষ দিকটা অস্থিতিশীলতা ও অসমর্থনের প্রভাবে ক্ষমতা হারায় অনেকটা পচে যাওয়া ফলের বৃক্ষের শাখা থেকে পতনের মতো।

এ ক্ষেত্রে পতনের আগের সময়টা অসুস্থতার ও পচনক্রিয়ার প্রভাব বহন করে বলে এর গুরুত্ব সেভাবেই যাচাই করা হয়। যে গণতান্ত্রিক সরকার কোনো আন্দোলনের চাপে নয় নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করে তার শাসনকালের শেষ দিনগুলো কোনোভাবেই পৃথক করে যাচাই হওয়ার নয় এবং সে কারণে সেই সময়ে গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত অর্থাৎ শেষ সময়ে গৃহীত এই যুক্তিতে গণতান্ত্রিক

সরকারের কোনো সিদ্ধান্তকে অবমূল্যায়নের কোনো অবকাশ নেই। পাঁচ বছরের শাসনকালের একটি পর্যায়কে একটি সমন্বিত, সুপরিকল্পিত ও সম্পন্ন কর্মসূচিরূপে একটি সরকার সম্পাদন করবে এটাই প্রত্যাশিত, যেমন করে একজন শিল্পী একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্রাঙ্কন শেষ করে অথবা একজন ভাস্কর তার ভাস্কর্যকে। এখানে শিল্পী বা ভাস্করকে মূল্যায়ন করা হয় তার পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পাদিত কাজ যাচাই করে। শেষ মুহূর্তের কাজ বরং এ ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে শিল্পীর জন্য। আমরা আশা করব, গণতন্ত্রের আদর্শ রূপ অর্জনের পথে আমাদের যে অভিযাত্রা ক্রমাগত ভুল সংশোধন ও শুদ্ধতার পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটিয়ে সেখানে রাজনীতিবিদদের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা ও সম্মান যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে তাদের নিয়ন্ত্রিত করার শক্তি বা স্বাধীনতা এবং তাদের কাছে প্রত্যাশা পূরণের দাবি ও অধিকার।

দলবদ্ধতা যেখানে গণতন্ত্রের নীতিবিরুদ্ধ

রাজনৈতিক দল গঠন ও দলবদ্ধতা এক ব্যাপার নয়। গণতন্ত্রে একটি পদ্ধতিগত দিক আছে। নির্বাচনের ভেতর দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্ধারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সরকার গঠন, প্রধানমন্ত্রীর হাতে বিপুল ক্ষমতা প্রদান, সংসদে আইন প্রণয়ন, স্পিকারের নিয়ন্ত্রণে সংসদে বিতর্ক, প্রশ্ন উত্থাপন ও সমালোচনার বিপুল স্বাধীনতা সংসদ সদস্যদের—এসব কিছুই গণতন্ত্রের প্রক্রিয়া, বাহ্যিক আচরণবিধি ও নিয়মকানুন। জনপ্রতিনিধি এবং গণতান্ত্রিক সরকারের অপার স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতালাভকে অনেক পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞের কাছে অযৌক্তিক মনে হতে পারে। কারণ, সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীর বিশেষ যোগ্যতা, দক্ষতা, শিক্ষা বা সামাজিক অবদান রাখার পূর্বশর্ত আরোপিত হয় যেমনটি হয় চাকরি বা অন্যান্য পেশার ক্ষেত্রে। উন্মাদ নয়, শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধী শুধু বয়ঃপ্রাপ্ত এই ন্যূনতম শর্ত নিয়ে দেশের যেকোনো নাগরিক তার সমস্ত অজ্ঞতা, অদক্ষতা নিয়েও নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারে। যারা তাকে নির্বাচিত করে সেসব অসংখ্য নাগরিক তাদের মুক্তবুদ্ধি, স্বাধীনতা ও যাচাই-দক্ষতা নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে যাকে নির্বাচিত করবে সেই হবে সাংসদ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সমর্থন পেলেই কি একজন মানুষ তার অন্তর্নিহিত জ্ঞান ও যোগ্যতায় বদলে যায়? তাহলে শুধু গণভোটের ভিত্তিতে এত ক্ষমতা কেন প্রদান করা হয় সাংসদদের? আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনায় সব কাজই মূলত টেকনিক্যাল বা বিশেষজ্ঞের। শিক্ষা, খাদ্যোৎপাদন, গৃহনির্মাণ, পথঘাট ও যোগাযোগ সৃষ্টি, শিল্পায়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, চিকিৎসা, বিচারকার্য প্রশাসন— সবকিছুর জন্যই চাই বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ ব্যক্তি। সে ক্ষেত্রে শিক্ষা ও যোগ্যতার কোনো মাপকাঠি ছাড়াই শুধু জনগণের মতামতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা প্রদানের যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি তা কি যথার্থ?

বস্তুত আমেরিকায় টেকনোক্র্যাসি নামে একটি দর্শনের সূচনা করে হাওয়ার্ড স্কুথ, যার মূল কথা ছিল— শিল্পোৎপাদন ও বণ্টন এবং সমাজ পরিচালনা দক্ষতার সঙ্গে চলতে পারে কৃৎকৌশলী ও বিশেষজ্ঞের দ্বারা। দক্ষ প্রশাসন সব অগ্রগতির

মূলভিত্তি—এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি আমেরিকার প্রেসিডেন্টও প্রচার করেন চল্লিশের দশকে। আসলে টেকনোক্র্যাসির ধারণা যে সঠিক নয় এবং জনগণের সমর্থন ও অংশগ্রহণ ছাড়া উন্নয়নের লক্ষ্য নির্ধারণ ও অগ্রগতি সাধন শেষ পর্যন্ত সম্ভব নয়, তা অবধারণ না করলে গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত মূল্য ও অপরিহার্যতা পণ্ডিত লোকেরাও উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন।

গণতন্ত্র আসলে শুধু সংখ্যাধিক্যের জনসমর্থনে গঠিত সরকার নয়, জনমতের ভিত্তিতে সমর্থিত সরকার। জনমত অনেক বেশি জটিল অভিব্যক্তি জনসমর্থনের। জনসমর্থনকে শুধু 'হ্যাঁ' অথবা 'না' এই দুই সংকেত বা স্কেলার রাশি দ্বারা প্রকাশ পায় যা মূলত মাত্রাহীন। কিন্তু জনমত বহুমাত্রিক ও জটিল। কারণ রাজনীতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় যথা—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও অর্থনীতি, সংস্কৃতি মানবিক মূল্যবোধ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে অসংখ্য জনগণের বিভিন্ন যে মতামত তার লব্ধি নির্ধারণই হচ্ছে গণতন্ত্রের বড় চ্যালেঞ্জ। সাধারণভাবে ভোট গণনার মাধ্যমে যদিও এই মতামত সংগ্রহ, সমন্বয় ও লব্ধি নির্ধারণ করা হয়, এর আড়ালে একটি জটিল প্রক্রিয়া চলতে থাকে প্রতিটি ভোটদাতার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মনস্তত্ত্বের ভেতর দিয়ে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল—তাদের লক্ষ্য, রাজনৈতিক আদর্শ, পরিকল্পনা ও নীতি সুস্পষ্ট, সৎ ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশের মাধ্যমেই শুধু নৈর্ব্যক্তিকভাবে দলের মেনিফেস্টো উপস্থাপন করতে পারে। স্বভাবতই এ ধরনের নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপনে রাজনৈতিক দলের আদর্শ, পরিকল্পনা এবং অঙ্গীকার ও নেতৃত্বদানের যোগ্যতা ও সততা ইতিবাচকরূপে দেখাতে হয়। মোট কথা, যত সুস্পষ্টভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষিত হয় জনসম্মুখে, ততই সহজ ও সার্থক হয়ে ওঠে জনমত গ্রহণের প্রক্রিয়া। অন্যথায় অনবহিত ও বিভ্রান্ত হয়ে বা মিথ্যা প্রচারণায় বা চাতুর্যে যদি জনগণ যান্ত্রিকভাবে শুধু ভোট প্রদান করে তাহলে গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য ও আদর্শ বিনষ্ট হয়।

সম্প্রতি চার দল, এগারো দল ইত্যাদি বিমূর্ত, শুধু সংখ্যায় পরিচিত যেসব রাজনৈতিক দল ও সমষ্টিগত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে, তা আমার মতে গণতন্ত্রের মূল চেতনার পরিপন্থী। একমাত্র ডাস্টবিনে আমরা নানা বস্তুর অবশেষ ও বর্জ্য অপার্থক্যযোগ্য অবস্থায় ও অসংজ্ঞায়িতরূপে একত্রে জমা হতে দেখি। এসবের একটি মাত্র পরিচয়, তা হলো নেতিবাচক মনোভাব কারো বিরুদ্ধে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল স্বভাবতই সংজ্ঞায়িত ও অস্তিত্বপ্রাপ্ত হওয়ার কথা সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও আদর্শের ভিত্তিতে যা শুধু সেই রাজনৈতিক দলের পরিচয়ই তুলে ধরবে না, কোন বৈশিষ্ট্য ও আদর্শে তারা অন্য রাজনৈতিক দল থেকে ভিন্ন সেটাও নির্ধারণ করবে।

একমাত্র ধ্বংসাত্মক কাজে, যুদ্ধ বা বিপ্লবে একধরনের ঐক্য আমরা দেখতে পাই, সেটা নির্মাণের পূর্বাবস্থা। কোনো অট্টালিকা নির্মাণের আগে ইট-পাথর ভেঙে যে স্তূপীকৃত করা হয় সেটা নির্মাণপ্রক্রিয়ার একটি ধাপ কিন্তু অট্টালিকা নির্মাণের ভেতর দিয়ে আমরা এর প্রতিটি কক্ষ বা অংশের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যযোগ্যতা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করি। গণতন্ত্রও একটি নির্মাণ-প্রক্রিয়া—আদর্শের, পরিকল্পনা গ্রহণের, আকাঙ্ক্ষা ও কর্মতৎপরতার। নির্বাচনের মতো জনমত যাচাই ও সরকার গঠনের ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন ঘটানোর কাজে তাই মতামতের জট পাকিয়ে লক্ষ্যহীনতার ও বিভ্রান্তির আবর্জনা সৃষ্টি নয়; প্রয়োজন স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন ও বিশ্লেষণী পরিচয়, প্রতিটি রাজনৈতিক দলের।

গণতন্ত্রের লক্ষ্য যেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক সমতা

কেউ না কেউ শাসন করবে; প্রশ্ন শুধু কে শাসন করবে— হাম্পটি ডাম্পটির এ প্রবচনটির একটি গভীর তাৎপর্য আছে। যখনই মানুষ একত্রে বাস করেছে তখনই কিছু নিয়মের অবতারণা ঘটেছে এবং এই নিয়মকে কার্যকর করার জন্য উদ্ভব ঘটেছে প্রশাসনিক ব্যবস্থার। সেই সঙ্গে শাসনকর্তার। সমাজ যত বড় হয়েছে জনসংখ্যার ভিত্তিতে, প্রশাসনভুক্ত এলাকার বিস্তারে, সমাজবদ্ধ মানুষের যৌথ কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতায় এবং পারস্পরিক নির্ভরতা ও সম্পর্কের জটিলতায়— প্রশাসনিক নিয়মও ততই বিস্তৃতি ও জটিলতা লাভ করেছে। এখন থেকে দশ লাখ বছর আগে মানুষরূপে চেনা যায় এমন যে প্রাণী হাতিয়ার নির্মাণ ও সংঘবদ্ধ জীবনের সূচনা ঘটিয়েছিল, সেখানেও নিশ্চয়ই সামাজিক নিয়ম ও একধরনের নেতৃত্ব ছিল। অবশ্য মানুষের উদ্ভবের অনেক আগে থেকেই সামাজিক প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল। এটা শুধু সমাজবিজ্ঞানের নিয়ম নয়, জীববিজ্ঞানীদের তত্ত্ব যে, সবচেয়ে প্রাথমিক ও নিম্নস্তরের যে প্রাণী তারাও দলবদ্ধভাবে একটি ব্যবস্থা বা সিস্টেম গড়ে তোলে এবং পরিবেশের সঙ্গে আদান-প্রদান ও মিথস্ক্রিয়া ঘটিয়ে একটি স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছে।

এখানে কাজ করে আত্মনিয়ন্ত্রণ, তথ্য আদান-প্রদান, আত্মরক্ষা ও আপন প্রজাতির বিকাশের প্রক্রিয়া। জৈব বিবর্তন, মস্তিষ্কের ক্রমবিকাশ ও সামাজিক অভিব্যক্তির দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আজকের যে বুদ্ধিমান মানুষ, তার সামাজিক গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও বিকাশ নানা দিক থেকেই অনন্য। প্রাণিজগতের অন্য কোনো প্রজাতির সঙ্গে মানুষের মিল নেই। কারণ তার মস্তিষ্কের বিশেষ গঠনের জন্যই এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে তার সামাজিক জীবনের অভিব্যক্তির ফলেই, সে লাভ করেছে ভাষা, কালিক চেতনা, উদ্ভাবনী শক্তি এবং হাতিয়ার নির্মাণের ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের অপরিসীম দক্ষতা। মানুষের এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে অন্য সব প্রাণীর তুলনায় তাদের সমাজবদ্ধতার স্বরূপ ভিন্ন। সব প্রাণীর পরিবেশের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করে টিকে থাকে ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখে এবং ব্যর্থ হলে অবলুপ্ত হয়। মানুষের সমাজ পরিবেশের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে শুধু গতিশীল ও জটিল এক প্রক্রিয়ায়।

সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনধারা ও পারস্পরিক সম্পর্ক পরিবর্তনের ধারায় যে গতিশীল ভারসাম্য রক্ষা করে চলে তার নিয়ম স্বভাবতই জটিল। গত দশ হাজার বছরের যে মানবসভ্যতা, যার সূচনা ঘটেছিল কৃষিকাজ, পশুপালন ও গৃহনির্মাণের ভেতর দিয়ে, স্থায়ী বসবাস তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে বস্তুগত প্রয়োজনবোধ, প্রাকৃতিক পরিবেশ, হাতিয়ার উদ্ভাবন ও নির্মাণ, ভাষার ক্রমবিকাশ, তথ্য আদান-প্রদানের অভিজ্ঞতার ক্রমবর্ধমান সঞ্চয় ও সঞ্চারণ এবং সবকিছুর প্রভাবে সমাজ পরিচালনা ও প্রশাসনিক পদ্ধতির রূপান্তরে। সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্র, একনায়কত্ব, যাজকতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র, নানা আদর্শের সমাজতন্ত্র প্রত্যেকটি হচ্ছে একেকটি সামাজিক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সমাজ পরিচালিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে। সমাজ পরিচালনা ও প্রশাসনের এই ব্যবস্থাগুলো টিকে আছে, বিকাশ লাভ করেছে অথবা অবলুপ্ত হয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীবনধারা, উৎপাদনব্যবস্থা, জ্ঞানের স্তর এবং সামাজিক চেতনা ও আকাঙ্ক্ষার দ্বারা। সবচেয়ে পরিবর্তনশীল ও জঠিল যে উপাদান সামাজিক ব্যবস্থাকে বদলে দেওয়ার ক্ষেত্রে তা হলো মানুষ। কারণ, বাহ্যিকভাবে মানুষের দৈহিক গঠন না বদলালেও তার জ্ঞানের জগৎ, ক্রমসঞ্চিত, অভিজ্ঞতার জগৎ এবং তার উদ্ভাবন ও আবিষ্কার, তথ্য সংগ্রহ, প্রত্যাশা, অধিকার সচেতনতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভৌত ও মানসিক দুই বিকাশমান জগতের জটিল প্রবাহে প্রতিটি ব্যক্তিমানুষ এক ধরনের ভিন্নতা ও একাকিত্ব লাভ করেছে অনন্য বিশ্বাসে, উপলব্ধিতে, দক্ষতায়, প্রত্যাশায় ও মূল্যবোধে। ব্যক্তিমানুষের এই ভিন্ন ও অনন্য বৈশিষ্ট্য একদিকে যেমন তার সৃজনশীলতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সহায়ক, তেমনি আবার বিপজ্জনক— সমাজের সাধারণ, সর্বজনগ্রাহ্য, অভিন্ন ও সর্বজনীন নিয়মের মধ্যে তাকে ধারণ করা। আধুনিক সমাজের তাই দুটি মৌলিক উপাদান একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে; একটি হচ্ছে ব্যক্তিস্বাধীনতা, যা মানুষের অনন্য প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের কারণে অপরিহার্য। মানুষের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ও অনির্বচনীয়। কারণ, সে নিজেই নির্মাতা তার ভবিষ্যতের। অনেকগুলো সম্ভাবনার পথ বাহ্যিক ভৌত পরিবেশ ও তার জৈব গঠন নির্ধারণ করে দিলেও নানা সম্ভাবনার ভেতর থেকে কোনগুলো যে বাস্তবে রূপ নেবে তা অনিশ্চিত। ব্যক্তিমানুষের প্রতিভা ও সৃজনশীলতা নানা সম্ভাবনার ভেতর থেকে কোনোটিকে বাস্তবে রূপ দেয় অনির্বচনীয়ভাবে, যাকে আমরা বলতে পারি প্রতিভা।

মানুষের এই ব্যক্তিস্বাধীনতা সভ্যতার বিকাশের ভেতর দিয়ে শুধু সূচক হারে বৃদ্ধি পায়নি, এর গুরুত্বও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক উন্নতি, সমৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক আধিপত্য বিস্তারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে প্রভাব তার মূলে কাজ করে ব্যক্তিমানুষের নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন। যে সমাজে যত বেশিসংখ্যক সৃজনশীল ও উদ্ভাবক ব্যক্তি রয়েছে এবং যে সমাজ এদের লালন ও এদের বিকাশের অনুকূল

পরিবেশ সৃষ্টি করেছে সে সমাজ তত বেশি সফল হয়েছে। উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিনিয়োগ, পরিকল্পনা গ্রহণ, প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সৃষ্টি—এসবই হচ্ছে ব্যক্তিমানুষের মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তা ও সৃজনশীলতাকে বিকশিত করার সামাজিক আয়োজন।

এই ব্যক্তিস্বাধীনতার মতোই আধুনিক সমাজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সামাজিক সমতা ও সুবিচার। এর উৎস বৃহত্তর সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। ব্যক্তিস্বাধীনতা যেখানে প্রতিটি মানুষের একক অস্তিত্বকে মূল্য দেয়, সামাজিক সমতা ও ন্যায়বিচার তেমনি সমগ্র সমাজকে ও এর সমন্বিত ও যৌথ গঠনকে গুরুত্ব প্রদান করে। এই দুটি ধারণাকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী মনে হয়। কারণ, স্বাধীনতাকে যদি অপ্রতিহতভাবে ইচ্ছাপূরণের সুযোগ বলে ধরা যায়; তাহলে সমাজবদ্ধ প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়মগুলো এই স্বাধীনতাকে খর্ব করে। অন্যদিকে ব্যক্তিমানুষের ইচ্ছা ও ক্ষমতার প্রয়োগ যেখানে সামাজিক কল্যাণ ও অগ্রগতির পথে অন্তরায়, সেখানে তা সমাজবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

সামাজিক মূল্যবোধে ও রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিতে এই ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক সমতা ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্ব পেয়েছে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়। মোটা দাগে বলা যায়, গণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বেশি মূল্য দেওয়া হয়। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে, সমাজ ব্যক্তির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ রাজনৈতিক মূল্যবোধে ব্যক্তি হলো মৌলিক একক গণতন্ত্রে এবং সমাজতন্ত্রে সমাজ হলো মৌলিক একক, যেখানে ব্যক্তিমানুষ সমাজ গঠনকারী উপাদান। এই দুটি পরম বা প্রান্তিক ধারণার সমন্বয় ঘটতে পারে যথার্থ গণতন্ত্রে।

পদার্থবিজ্ঞানে আলোর বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিতর্ক ছিল আলো কণিকা নাকি তরঙ্গ এই প্রশ্নে। রাজনীতিতে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ধারণার মধ্যেও তেমনি একটি অমীমাংসিত বিতর্ক দীর্ঘদিন চলে এসেছে। অবশ্য ধনতান্ত্রিক সমাজে গণতন্ত্র বলতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং ব্যক্তিগত সম্পদ অর্জন ও সংরক্ষণের স্বাধীনতাকেই বোঝায়। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিকেরা সমাজতন্ত্রের নীতিকে যথার্থ গণতন্ত্র বলে প্রচার করছে। প্রচলিত ও প্রচারিত শব্দার্থে না গিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক সমতার মৌলিক গুরুত্বকে যদি অবধারণ করি, এবং এদের আপাত-পরস্পরবিরোধিতা অতিক্রম করে এদের পারস্পরিক পরিপূরকতার বৈশিষ্ট্যকে যদি উদ্‌ঘাটন করতে পারি, তাহলে তাকেই গণতন্ত্রের তত্ত্ব বলতে চাই। সে ক্ষেত্রে নীলস বোর যেমন আলোর দ্বৈতচরিত্র যথা কণাবাদ ও তরঙ্গবাদকে পরস্পরের পরিপূরকরূপে ব্যাখ্যা করেছেন, আধুনিক গণতন্ত্রের তত্ত্বও তেমনি একটি সমন্বয় ঘটাতে পারে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক সমতার আদর্শকে সমন্বিত করে।

প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সামাজিক সমতা ও ন্যায়বিচার যে পরস্পরের পরিপূরক তা আধুনিক সমাজ এবং সৃজনশীল মানুষের বৈশিষ্ট্য ও বিকাশের শর্ত বিশ্লেষণ করলেই আমরা বুঝতে পারি। ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা বলতে যদি তার প্রতিভার বিকাশ, তার সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তির অবাধ অভিব্যক্তিকে বুঝি, তাহলে আমরা লক্ষ করব, এ জন্য শিক্ষার আয়োজন চাই, চাই শিক্ষক, উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ, গণতন্ত্রের জন্য অর্থ ও প্রতিষ্ঠান।

ব্যক্তিস্বাধীনতার মূল উৎসরূপে আমরা দেখতে পারি একটি গতিশীল বিকাশমান সমাজকে, যেখানে ব্যক্তিমানুষ তার প্রতিভা বিকাশের স্বাধীনতায় ও শুভবুদ্ধি লাভের সম্ভাবনায় সমাজের আনুকূল্যপ্রাপ্ত। সমাজ এখানে শুধু একটি আয়োজন, একটি ব্যবস্থা, যার মূল উপাদান সম্ভাবনাময় বিভব শক্তিতে উদ্ভাসিত প্রতিটি ব্যক্তিমানুষ। রাজনীতি যেখানে এই ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সামাজিক সমতা ও ন্যায়বিচারকে সমন্বিত করতে পারে, এই দুই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যকে পরস্পরের পরিপূরকরূপে, সেখানেই প্রয়োজন গণতন্ত্রের, যার পথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার, পরিবর্তনের ও অন্তহীন বিকাশের।

জোটবদ্ধতা ও গণতন্ত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব

গণতন্ত্রে সমস্ত শক্তির উৎসরূপে জনগণ সক্রিয় অংশ নেবে সরকার গঠনে—এই মূলনীতিকে ভিত্তি করে জনপ্রতিনিধিরা রাষ্ট্র পরিচালনায় আইন প্রণয়নের অধিকার লাভ করেন। অনেকের কাছেই এটি বিস্ময়ের ব্যাপার যে, যোগ্যতার কোনো পূর্বশর্ত, বিশেষজ্ঞরূপে স্বীকৃতি, শিক্ষাগত যোগ্যতার ন্যূনতম মান ইত্যাদি গুণাগুণ যেখানে অপরিহার্য কোনো দায়িত্ব পালন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনে, সেখানে রাষ্ট্র পরিচালনার উচ্চতম ক্ষমতা কীভাবে অর্পিত হতে পারে শিক্ষা, জ্ঞান ও কর্মদক্ষতার মাননির্বিশেষে শুধু জনসমর্থনের ভিত্তিতে। দেশের অসংখ্য সাধারণ মানুষ সারি বেঁধে কোনো প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলকে ৫ বছর পর পর একটি দিনে সমর্থন জানানোর মধ্যে কি জাদু আছে? যা এক মুহূর্তে একজন সাধারণ নাগরিককে এত বিপুল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে?

নির্বাচনে জয়ী হওয়া অবশ্যই লটারিতে পুরস্কারপ্রাপ্তির মতো ভাগ্যের খেলা নয়। রাজনৈতিক দল গঠন, দলীয় নীতিমালা, কর্মসূচি যথা মেনিফেস্টো জনসম্মুখে উপস্থাপন, মুক্ত ও নিরপেক্ষ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠান, সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে দলগতভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া সংসদে সব নির্বাচিত প্রতিনিধির অভিমত ব্যক্ত করার স্বাধীনতা, রাজনৈতিক সমস্ত সিদ্ধান্তে স্বচ্ছতা; গণমাধ্যম, সাংস্কৃতিক সংগঠন, বিদগ্ধ ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা-ভাবনা, অভিমত ও বিশ্লেষণী বক্তব্য এবং এসব কিছুর জন্য সংবিধানের নীতিমালা অনুসরণ— একত্রে এমন একটি ব্যাপক আয়োজন, যার মূল্যায়ন হতে হবে সামগ্রিক দৃষ্টিতে।

দেশের জন্য কোনটি মঙ্গলকর, কোন ধরনের নৈতিকতা, শিক্ষা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় অনুশাসন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সম্পদের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ যথার্থ তা কোনো আদর্শ দ্বারা পূর্বনির্ধারিত নয়। অবশ্য দেশ ও দেশের মানুষের জন্য যা কিছু কল্যাণকর তা নিয়ে ভাববার ও সেই মত প্রকাশের স্বাধীনতা সবারই থাকবে ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে। মানবজাতির যা কিছু অর্জন জ্ঞানের ক্ষেত্রে, অভিজ্ঞতার জগতে তা উপলব্ধি করে বর্তমানের ঘটনাপ্রবাহ ও বাস্তবতাকে হিসেবে এনে, সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে লালন করে দেশ পরিচালনার যে প্রক্রিয়া ও নীতিমালা তা সবাই মিলে নির্ধারণ করবে, সেটাই গণতন্ত্রের লক্ষ্য। যত গভীর ও সূক্ষ্মভাবে প্রতিটি নাগরিক দেশের বহুমাত্রিক সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে

উপলব্ধি অর্জন করবে, যতটা স্বাধীন ও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্তিমানুষের রাষ্ট্রীয় ভাবনা ও যৌথ জীবন সম্পর্কে তার উপলব্ধি অভিব্যক্ত হবে এবং যতটা সার্থকভাবে নানা মানুষের বিচিত্র ভাবনার সমন্বয় ও প্রতিফলন ঘটবে রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় ও রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতিতে, ততটা গণতন্ত্র সেই জাতি অর্জন করবে।

মানুষ একসময় ভাবত ব্যক্তিমানুষ বা জাতির জন্য যা শ্রেয় ও আদর্শ, যা সবচেয়ে কল্যাণকর ও সঠিক তা অতীতের অভিজ্ঞতায় পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের প্রদত্ত তত্ত্ব ও প্রচারিত আদর্শে অথবা ধর্মগ্রন্থ ও প্রচারিত রাজনৈতিক মতবাদে বিধৃত হয়ে আছে। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দিকনির্দেশনা লাভ করে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত পুরোনো একেকটি আদর্শকে ভিত্তি করে। বিভিন্ন দলের মধ্যে যে পার্থক্য, তার ভিত্তি এখানে তাদের অনুসৃত আদর্শ যা কালনিরপেক্ষ। কিন্তু গণতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বৈশিষ্ট্য তা হলো যা সত্য, সঠিক ও জাতির জন্য কল্যাণকর তা ব্যক্তিগতভাবে কেউ নির্ধারণ করতে পারে না, রাজা, একনায়ক এমনকি পণ্ডিত সেজেও। কারণ, জ্ঞানের প্রকৃতিই এমন যা কালনিরপেক্ষ নয় এবং এককভাবে তা জানা এবং সবার ওপরে চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। প্রতিটি মানুষের যে অন্তর্নিহিত স্বাধীনতা চিন্তা করার, জ্ঞানার্জনের, মত প্রকাশের ও শিক্ষাদানের তা কোনো অনুগ্রহের প্রাপ্তি নয়, যৌথ জীবনের জন্য এবং জ্ঞানের বিকাশমানতা ও বৈচিত্র্যের জন্যই এটি অপরিহার্য।

রক্ষণশীলতা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে ছোট-বড় সব মানুষের ভাবনাকে মূল্য দিয়ে অতীতের ঐতিহ্য বর্তমানের বাস্তবতা ও ভবিষ্যতের স্বপ্নকে সমন্বিত করে গতিশীল পথে গণতন্ত্রের যাত্রা।

গণতন্ত্রে সময় একটি স্বাধীনমাত্রা; কালনিরপেক্ষ চিরন্তন কোনো সত্য, ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা দার্শনিক কোনো অপরিবর্তী সত্য গণতন্ত্রে গৃহীত নয়। সময়ের এই উন্মুক্ততা প্রতিটি মানুষের অভিজ্ঞতা ও ভাবনার অনন্যতা, বৈচিত্র্য ও গুরুত্ব অসংখ্য বিচিত্র ভাবনাকে সমন্বিত ও প্রতিফলিত করার সমস্যা গণতন্ত্রের পথকে করেছে দুর্গম ও অনিশ্চিত। গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত স্বাধীনতা ও বিকাশমানতার মূল রূপেই নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় পাণ্ডিত্য ও সামাজিক অবস্থাননির্বিশেষে সবাই সমান গুরুত্বপ্রাপ্ত ভোট গণনার হিসাবে।

এর অর্থ এই নয় যে, ব্যক্তিমানুষের প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা গণতন্ত্রে অবমূল্যায়িত। সমাজকে কে কতটা প্রভাবিত করবে তা স্বভাবতই নির্ভর করে জ্ঞান, উপলব্ধি, দক্ষতা ও প্রকাশসাধ্যতার ভিত্তিতে কে কতটা যোগাযোগ সাধন ও প্রভাব বিস্তারে সফল হলো তার ওপর। গণতন্ত্রের সমষ্টিগত ও চিন্তার বহুতানির্ভর জীবনধারা সংঘাত এড়িয়ে একটি মসৃণ ও সমন্বিত জীবন সম্ভব করতে পারে, যখন প্রতিটি মানুষের সঙ্গে ভাবনা বিমূর্ত প্রভাবরূপে পরস্পরের যুক্ত হয়ে একটি সমন্বিত

প্রভাববলয় সৃষ্টি করে। সৌরজগতের গ্রহদের গতিপথ বা একেকটি গ্যালাক্সিতে অসংখ্য নক্ষত্রের গতিময় অবস্থান পরিচালিত হয় মহাকর্ষ ক্ষেত্রের প্রভাবে। প্রতিটি নক্ষত্র বা গ্রহ এদের অস্তিত্বকে প্রকাশ করে এদের দ্বারা সৃষ্ট প্রভাবক্ষেত্র বা মহাকর্ষজনিত বিভব দ্বারা। এখানে কোনো ক্ষুদ্রতম বস্তুকণিকাও এর মহাকর্ষজনিত প্রভাব থেকে বঞ্চিত নয়। অথচ এদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের প্রয়োজন হয় না।

বিভব শক্তির উৎসরূপে কোনো বস্তু বা চার্জ যেখানে অভিব্যক্ত, সেখানে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের অশ্লীলতা নেই। বস্তুজগতে বিভিন্ন ধরনের চার্জ যথা মহাকর্ষ চার্জরূপে ভর, তাড়িৎচৌম্বক চার্জরূপে বিদ্যুৎ, নিউক্লীয় চার্জরূপে প্রোটন ও নিউট্রন এদের প্রভাববিস্তার করে। মহাকর্ষ বল গ্র্যাভিটন কণিকার বিনিময়ে, তাড়িৎচৌম্বক বল কাজ করে। ফোটনের বিনিময়ে এবং নিউক্লীয় বল মেজন কণিকার বিনিময়ের মাধ্যমে।

গণতন্ত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য অবশ্য অভিব্যক্ত হতে হবে তাদের আদর্শ, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির ভেতর দিয়ে এবং এর মাধ্যম হবে অবশ্যই ভাষা। যত স্বচ্ছ, স্পষ্ট, গভীর ও দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যক্তি ও দলের রাজনৈতিক ভাবনার প্রকাশ, গণতন্ত্রের প্রভাববলয় ততই মসৃণ ও সংঘাতমুক্ত হবে।

গণতন্ত্রে দুটো আপাত-পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত হতে হয়। একটি হলো ব্যক্তি বা দলের স্বাতন্ত্র্য, অন্যটি হলো ব্যক্তি বা দলের অনন্য ও ভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলোর সমষ্টিকরণ ও সমন্বয়। আমরা যখন কোনো কনসার্ট শুনি সেখানে নানা সংগীতযন্ত্র ও কণ্ঠস্বর থেকে বিচিত্র সব সুর ভেসে আসে; কিন্তু এদের প্রবারণ বা উপরিপাতন ততক্ষণই সংগীতের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে, যতক্ষণ একটি হারমোনি বা সুরের সংগতি বজায় থাকে।

আমাদের শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের এটি একটি অদ্ভুত গুণ যে, একই সঙ্গে অনেকগুলো ভিন্ন সুরকে আমরা উপভোগ করতে পারি এদের পার্থক্যযোগ্যতাকে বিলুপ্ত না করে। একটি যথার্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে সামাজিক সেই যৌথ শ্রবণ-ইন্দ্রিয় যা একই সঙ্গে নানা ভিন্নমতকে উপলব্ধি ও যাচাই করতে পারে বিভ্রান্ত ও ক্ষুব্ধ না হয়েও, যেমনটি ঘটে সংগীতের পরিবর্তে হট্টগোলরূপে বিশৃঙ্খল ও অপার্থক্যযোগ্য শব্দ যখন আমাদের শ্রবণ-ইন্দ্রিয়কে পীড়িত করে। আর এ জন্যই প্রতিটি ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দল নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও বক্তব্যকে যখন সুস্পষ্টভাবে ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশে ব্যর্থ তখন ব্যক্তি ও দল ডাস্টবিনে জমে ওঠা আবর্জনার মতো শুধু একত্র হয় কিন্তু সমন্বিত হয় না।

যা সজীব, জীবন্ত ও বিকাশমান তা-ই শুধু আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনন্য ও পার্থক্যযোগ্য, সেই সঙ্গে যোগাযোগসাধ্যতা ও ইতিবাচক অবদান রাখার বৈশিষ্ট্যে

ঐক্য সৃষ্টি করে। ঐক্য ও জোটের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রথমটির উদ্ভব ইতিবাচক ভাবনা, ধনাত্মক মূল্যবোধ ও গুণাবধাবনের ভিত্তিতে, যা পারস্পরিক সম্পর্ক ও পরিপূরকতার ভেতর দিয়ে একটি ব্যবস্থারূপে আত্মপ্রকাশ করে, যেমন একটি জীবন্ত প্রাণী বা দক্ষ প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে জোট সৃষ্টি হতে পারে লক্ষ্যহীনতার পরিবেশে, নিষ্ক্রিয়তা ও শক্তিহীনতার অবসাদে, বিদ্বেষ, হিংসা ও শঙ্কার সংকোচনী প্রভাবে। ফুলের বাগান তাই সমন্বয় ও ঐক্যের প্রতীক, অন্যদিকে ডাস্টবিন হলো আবর্জনার জোটবদ্ধতা। একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য অবশ্য কাজ করে ডাস্টবিনের সব আবর্জনার ক্ষেত্রে। এরা সবাই পরিত্যক্ত ও বর্জিত। এদের দেহ আছে জীবন নেই। এদের অতীত ছিল ভবিষ্যৎ নেই, দুর্গন্ধ ও অনুকারই শুধু এদের পরিচয়।

এই নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ কেন?

প্রগতি ও পশ্চাৎপদতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কুসংস্কার, বস্তুনিষ্ঠতা ও ধর্মান্ধতা, গণতন্ত্র ও একনায়কত্ব, মানবিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা, শান্তি ও সন্ত্রাস, সততা ও শঠতা সব সময়ই দুই পরস্পরবিরুদ্ধ স্রোতরূপে মানবজাতিকে বিভক্ত করে এসেছে। সাধারণ মানুষের কাছে ওই পার্থক্য ভালো ও মন্দরূপে কখনোই সুস্পষ্ট নয়। কারণ এই পার্থক্যকে আড়াল করার জন্য নানা ভণ্ডামি ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস চালায় শাসক ও শোষকের দল। এই ভণ্ডামি ও প্রতারণার আড়াল থেকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকে উন্মোচিত করতে প্রয়োজন দীর্ঘ অন্দোলন, বাহ্যিক ও মানসিক সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও সাহসিকতা, যার বিকাশ ঘটে যথার্থ শিক্ষা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সাংস্কৃতিক নানা কর্মসূচির ভেতর দিয়ে। বাংলাদেশে সৌভাগ্যক্রমে এই প্রক্রিয়াটি চলছে দীর্ঘদিন ধরে নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে। বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি, স্বাধিকার, গণতন্ত্র, শিক্ষা, অর্থনৈতিক মুক্তি, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল আধুনিক সমাজ গড়ার দীর্ঘ সংগ্রাম এবং বিপুল আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে যে প্রস্তুতি তারই চরম পরাকাষ্ঠা ঘটেছে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে।

বাঙালি জাতির জন্য এটাও একটা দুর্লভ সৌভাগ্য যে বঙ্গবন্ধুর মতো উদার, আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন, গণতন্ত্রমনা, দক্ষ, ত্যাগী ও সাহসী রাজনীতিবিদের আবির্ভাব ঘটেছিল—যার বিস্ময়কর নেতৃত্ব বাঙালি জাতিকে প্রস্তুত করেছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সাহসিকতায়। হাজার বছরের বাঙালি জাতির আত্মত্যাগ, চেতনা লাভ ও সাহসিকতার সফল অভিব্যক্তি সম্ভব হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে আমাদের বিজয় অর্জন ও স্বাধীনতা লাভে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জাতির সমস্ত অর্জনকে গ্রাস করার জন্য বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা, জাতীয় চার নেতার জেলখানায় প্রাণনাশ, ইনডেমনিটি বিল পাস করে এসব জঘন্যতম হত্যার বিচার বন্ধ করে, খুনিদের পুরস্কৃত করে, সেই সঙ্গে ছড়িয়ে দেয় সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প।

শান্তি, প্রগতি, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র ও মানবিক মূল্যবোধ— দীর্ঘ সংগ্রাম, শিক্ষা, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভেতর দিয়ে সমাজের মধ্যে সঞ্চারিত করার কাজটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, গভীর ও দীর্ঘমেয়াদি প্রচেষ্টার ফসল। দীর্ঘদিন ধরে শ্রম ও সৃজনশীলতায় নির্মিত একটি শিল্পকর্ম যেমন নির্বোধ ও নিষ্ঠুর অগ্নিসংযোগে

ভস্মীভূত হতে পারে, তেমনি বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ভেতর দিয়ে একটি আধুনিক, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক এবং বিশ্বের প্রায় শ্রেষ্ঠ সংবিধান যা আমরা রচনা করেছিলাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়, তা অকার্যকর করে বাঙালি জাতির সমস্ত অর্জন ও অগ্রগতির ধারাকে প্রায় স্তব্ধ করে দেওয়া হয়।

সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে বাঙালি জাতি আবার হারানো গৌরব অনেকখানি পুনরুদ্ধার করেছে, যার বাস্তব দৃষ্টান্ত গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি, ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল ও হত্যাকাণ্ডের বিচার সম্পাদন, সাম্প্রদায়িকতা ও তালেবানি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা, মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ ও সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা, একুশে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষারূপে স্বীকৃতি অর্জন, শিক্ষার হার ৬৫ শতাংশে উন্নীত করা, শিক্ষানীতি প্রণয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণায় বর্ধিত বিনিয়োগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, যোগাযোগ ও তথ্য বিনিময় ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি সাধন—সর্বোপরি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মধ্যে আমরা লক্ষ করি।

এ সমস্ত অর্জন আমাদের চাহিদা ও প্রত্যাশার তুলনায় যথেষ্ট তা বলা যাবে না হয়তো; কিন্তু এটি উপলব্ধি করার যে, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে যে স্বপ্ন নিয়ে সমগ্র জাতি যাত্রা শুরু করেছিল; হত্যা, সন্ত্রাস, অবৈধ ক্ষমতা দখল, অগণতান্ত্রিক, অনৈতিক ও প্রগতিবিরুদ্ধ আচরণ যদি এই জাতির জীবন থেকে এতগুলো বছর কেড়ে না নিত, তাহলে আমরা কোথায় পৌঁছে যেতাম! নির্বাচন '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মতোই তাই গুরুত্বপূর্ণ। পার্থক্য শুধু এই যুদ্ধ পাক হানাদার, রাজাকার, আলবদর ও স্বাধীনতাবিরোধীদের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র হাতে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ নয়; বরং স্বাধীনতার চেতনাবিরুদ্ধ শক্তির বিপক্ষে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষশক্তির মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার—যেখানে অংশ নিতে হবে সবাইকে গভীর দায়িত্ব, বিশ্লেষণী দৃষ্টি ও বুদ্ধিগত সততা নিয়ে। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের বিজয় বিলম্বিত হলেও তার অনিবার্যতা সুনিশ্চিত ছিল। কারণ, সেখানে আমরা সংগ্রাম করেছিলাম আমাদের স্বাধীনতা নামক পর্বতচূড়ায় আরোহণের জন্য। কিন্তু বহু আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে ভবিষ্যৎ অগ্রগতির সম্ভাবনাময় যে চূড়ায় আমরা আরোহণ করেছি, সেখান থেকে যদি আমাদের পতন ঘটে রাজনৈতিক মত প্রকাশের ক্ষেত্রে, আমাদের গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তে, তাহলে সে ক্ষতি হবে অপূরণীয় এবং সেই ক্ষতি হবে আমাদের সবার।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কৃত্য

১৯৯৫ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রস্তাব নিয়ে যখন প্রচণ্ড বিতর্ক-বিতণ্ডার রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তখন আমার একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণার বিরুদ্ধে যারা ছিলেন, তাদের জোরালো যুক্তি ছিল, অনির্বাচিত সরকারের কাছে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক। আমার প্রবন্ধের মূল বক্তব্য ছিল, আমদানিকৃত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নয়; অভিজ্ঞতার আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে যে নীতিমালা জনগণের স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে গৃহীত হয়, এমনকি রূপান্তরিত হয় বিবর্তনের ধারায়, সেটাই গণতন্ত্রের পথ। যদিও অন্য কোনো গণতান্ত্রিক দেশে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা নেই; তবু বিশেষ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার আলোকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা একটি নতুন সংযোজনরূপে গৃহীত হতে পারে উদ্ভূত অবাঞ্ছিত এক সমস্যার সমাধান হিসেবে। সমস্যাটি হলো নির্বাচন প্রক্রিয়ার নির্ভরযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে সন্দেহ এবং আস্থাহীনতা। যেহেতু গণতন্ত্রের কোনো পূর্বনির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই, আছে শুধু এক মূলনীতি, তাই জনগণের স্বাধীনতা ও সুবিচারের অধিকার নিশ্চিত করার ফলে দেশ কীভাবে চলবে তা নির্ধারণের স্বাধীনতা, অধিকার ও দায়িত্ব জনগণের।

কোনো কারণে, সে কারণ যতই অবাঞ্ছিত ও আকস্মিক হোক, গণতন্ত্রের প্রচলিত ধারা যদি বিঘ্নিত হয়, যদি কোনো দেশে দুর্যোগ নেমে আসে সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে, সেই পরিস্থিতিতে জনগণকেই উদ্ভাবন করতে হবে উত্তরণের পথ। নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ নিয়ে যে আস্থাহীনতা ও অবিশ্বাস অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছিল, সেই সঙ্গে দুঃসহ যোগাযোগহীনতা, বিরোধ ও অসহযোগিতা, সরকারি ও বিরোধী দলের মধ্যে, তারই একটি সমাধানরূপে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণার উদ্ভব। যেকোনো ব্যবস্থা, সেটা ভৌত, সামাজিক বা রাজনৈতিক হোক, যেখানে বিচিত্র এবং বিভিন্ন উপাদান ও কর্মকাণ্ডের সমন্বয় অপরিহার্য, সেখানে দুর্যোগ দেখা দিলে সহজাতভাবেই একটি সমাধান বা একটি নতুন নিয়মের উদ্ভব ঘটে। যেসব দেশ গণতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রথম পথযাত্রী, সেখানে দেখা গেছে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংঘাত ও অসহযোগিতার সুযোগ নিয়ে অথবা

আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র বা বাহ্যিক প্রভাবের কারণে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিকল্পরূপে।

বাংলাদেশের মতো দরিদ্র এবং দীর্ঘদিন ধরে শোষিত ও বঞ্চিত দেশে দীর্ঘ সংগ্রাম ও গভীর আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে নানা চড়াই-উতরাই পার হয়ে যে সম্মুখযাত্রা গণতন্ত্রের পথে, সেখানে গণতন্ত্রের একটি মূল চাকা নির্বাচনপ্রক্রিয়া যখন ভেঙে পড়ে মাগুরার দুর্ঘটনায়, তখনই একটি অভিনব সমাধানরূপে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণার উদ্ভব। এটি যতই অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রচলিত হোক, একটি অপরিহার্য সমাধানরূপে প্রস্তাবিত হয় গণতন্ত্রের ধারাকে অব্যাহত রাখার বিকল্প পথ হিসেবে। এর পেছনে একটিই যুক্তি তা হলো, একনায়কত্ব ও সেনাশাসনের অগণতান্ত্রিক ও পশ্চাৎমুখী ব্যবস্থা থেকে রক্ষা পেতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি সাময়িক সমাধান গণতন্ত্রের উত্তরণে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার কখনোই গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের প্রতিকল্প নয়। একটি সচল গাড়ির কোনো চাকা বিকল হলে তাকে বদলাবার জন্য যে জ্যাক ব্যবহার করা হয় তা যেমন চাকার বিকল্প নয় বরং একটি বিকল চাকার পরিবর্তে একটি সচল চাকা প্রতিস্থাপনের মধ্যবর্তী সময়ে গাড়িকে পতন থেকে রক্ষা করা এর উচ্চতায় ও স্থিতাবস্থায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারও তেমনি একটি গণতান্ত্রিক সরকার থেকে অন্য একটি গণতান্ত্রিক সরকারে উত্তরণের মধ্যবর্তী দশা পরিবর্তনের কালে একটি অবলম্বন মাত্র।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে নির্বাচিত নয় এই আপত্তির বিরুদ্ধে জবাব হলো, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হলো যথাসাধ্য সর্বাধিক জনমতের ভিত্তিতে তাদের প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষা, মঙ্গলচিন্তা ও ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে দেশ শাসনকে পরিচালনা করা। লক্ষ্যে পৌঁছার পথে একটি সচল গাড়ির বিকল চাকাকে বদলাবার জন্য যে থেমে থাকা সেটা পথ চলারই অপরিহার্য অংশ। আবার সচল হওয়ার লক্ষ্যেই সাময়িক এই অচল অবস্থা। গাড়ির অচলাবস্থা বা চাকা বদলাবার বিরতিকাল অভিন্ন বা পরস্পরের বিকল্প নয়। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছাবার লক্ষ্যের অভিন্নতায় এই আপাত ভিন্ন দুই ব্যবস্থা পরস্পরের পরিপূরক ও সহায়ক হতে পারে।

নির্বাচিত সরকারের স্থিতিকাল এবং গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ, নির্বাচনের ভেতর দিয়ে সরকার পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া, তা অবিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। অর্থাৎ, নির্বাচিত দুটি গণতান্ত্রিক সরকারের স্থিতিকালের মধ্যবর্তী যে পর্যায় তা সরকার পরিবর্তন বা রূপান্তরের সময় হিসেবে বিবেচিত হওয়ার, সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে। প্রকৃতির বিভিন্ন ব্যবস্থার যে দশা পরিবর্তন সেই ক্রান্তিক পর্যায়ে প্রকৃতির নিয়মগুলো এদের অবিচ্ছিন্নতা হারায়; যেমন পানিকে তাপ দিলে এর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে—এটাই নিয়ম। কিন্তু যে ক্রান্তিক তাপমাত্রায় পানি বাষ্প হয় অথবা যে

তাপমাত্রায় বরফ রূপান্তরিত হয় পানিতে সেই সব দশা পরিবর্তনের ক্রান্তিবিন্দুতে প্রদত্ত তাপ তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে না, শুধু ব্যবহৃত হয় দশা পরিবর্তনে। সমগ্র তাপ তখন নিয়োজিত অণুগুলোর বিন্যাসকে এক দশা থেকে অন্য দশায় নিয়ে যাওয়ার কাজে। নির্বাচনের কালটিও তেমনি একটি রাজনৈতিক দশা পরিবর্তনের ক্রান্তিকাল, যখন তাদের মতামতকে বিন্যস্ত করে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলকে নির্বাচিত করে তাদের প্রতিনিধিরূপে দেশ পরিচালনার কাজে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি এই দশা পরিবর্তনের কাজটি সুসম্পন্ন করতে পারে তার গুরুত্ব কম নয়।

এই সরকারের প্রধান ও প্রায় একমাত্র কাজ নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা। যেমন একটি জ্যাকের প্রধান কাজ চাকা বদলাবার কাজটিকে সুসম্পন্ন করা। অবশ্য চাকা বদলাবার তুলনাটি যান্ত্রিকার্থে গ্রহণীয় নয়। কারণ একটি নির্বাচিত সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যে নির্বাচন সেটা শুধু গণতন্ত্রের চাকাকে নতুন করে পরীক্ষা করার জন্যই নিযুক্ত করা, সেটি বিকল হয়েছে বলে নয়। পুরোনো চাকাই পুনঃসংযোজিত হতে পারে, কিন্তু একে বিযুক্ত করা প্রয়োজন এর গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষা করার জন্য। তত্ত্বাবধায়ক সরকার স্বভাবতই সেই গতি দিতে পারে না দেশকে, যেমন জ্যাক পারে না চাকার স্থান দখল করে গাড়িকে গতি দিতে। বস্তুত, চাকা পরীক্ষা ও পুনরায় যুক্ত করার এই সময়ে কেউ যদি এক্সিলেটর চাপে তাহলে দুর্ঘটনাই ঘটবে। কিন্তু অনেকগুলো কাজও আবার এই দশা পরিবর্তনের সময় সুসম্পন্ন করা যেতে পারে, যা গতির দশায় সম্পন্ন করা কষ্টকর। থেমে থাকা গাড়ির যাত্রী যেমন খাবার গ্রহণ, চুল আঁচড়ানো, পোশাক বদলানো, গাড়িকে ধোয়া-মোছা করা ইত্যাদি অ-যাত্রীসুলভ কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারে, একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারও তেমনি অনেকগুলো কাজ করতে পারে, যা নির্বাচিত সরকার করতে বাধাগ্রস্ত হয়।

গণতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতা

বলা হয়ে থাকে, গণতন্ত্র পাশ্চাত্যের একটি উদ্ভাবন। তাদেরই লালিত ও রূপান্তরিত একটি রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা, একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতি। গণতন্ত্রের সঙ্গে শিল্পায়ন, শিক্ষা, যোগাযোগব্যবস্থা, তথ্য আদান-প্রদানের স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, ব্যক্তিগত মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি শর্ত কখনো কখনো জুড়ে দেওয়া হয়। গণতন্ত্রের সঙ্গে মানুষের সামাজিক আচরণ, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সম্পর্কিত করার ক্ষেত্রে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে। একটি হলো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো সমাজের অগ্রগতি একটি ন্যূনতম স্তরে পৌঁছতে হবে—যেখানে ব্যক্তিমানুষের স্বনির্ভরতা, আত্মমর্যাদাবোধ, যোগাযোগসাধ্যতা ও বিচারক্ষমতা থাকবে— মত প্রকাশের এবং তা আসবে প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক উন্নতি ও সর্বজনীন শিক্ষার ভেতর দিয়ে। গণতন্ত্রের জন্য এই পূর্বশর্ত আরোপের বি[illegible] অন্য একটি ধারণা কাজ করতে পারে। তা হলো, যৌথ জীবন এবং ব্যক্তি[illegible] অন্তর্নিহিত অধিকার, স্বাধীনতা ও সম্ভাবনাকে মেনে নিয়ে গণতন্ত্রই হচ্ছে পরিচালনার একমাত্র পথ, যার ভেতর দিয়ে মানবজাতির জন্য প্রত্যাশিত যে লক্ষ্য তা নিশ্চিত হতে পারে।

প্রথম ধারণাটির বিপদ হলো অনেক পশ্চাৎপদ দেশেই স্বৈরশাসকেরা মৌখিকভাবে গণতন্ত্রের প্রশংসা ও স্তুতি গেয়েও দেশ এখনো গণতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত হয়নি, এই অজুহাতে গণতন্ত্রের সঙ্গে নানা বিশেষণ যুক্ত করতে প্রয়াস পেয়েছে এবং নিজেদের ইচ্ছেমতো একনায়কত্ব ও স্বৈরশাসন চাপিয়ে দিয়েছে গণতন্ত্রের প্রস্তুতিপর্বরূপে। মৌলিক গণতন্ত্র, হ্যাঁ-না-এর গণতন্ত্র, শোষিতের গণতন্ত্র একদলীয় গণতন্ত্র—এসবই যার দৃষ্টান্ত।

বস্তুত গণতন্ত্র কোনো নির্ভুল, বিশুদ্ধ, সুনির্দিষ্ট ও পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থা নয় রাষ্ট্র পরিচালনার, বরং পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অভিজ্ঞতা অর্জন, সংশোধন ও পরিবর্তনের ধারায় ক্রমাগত শুদ্ধতর ও ত্রুটিমুক্ত রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থার উদ্ভাবন—যেখানে সব মানুষের মতামত, উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা, কল্যাণচিন্তা ও সৃজনশীলতা ক্রিয়াশীল। ফলে গণতন্ত্র একটি বিকাশমান, পরিবর্তনশীল ধারা, যৌথ জীবনযাত্রা—যার লক্ষ্য সর্বজনীনতা ও শুদ্ধতা অর্জন হলেও গণতন্ত্র অর্জনের যে পথ তা অনেক মতানৈক্য, ভুলভ্রান্তি ও বৈচিত্র্যকে ধারণ করেই প্রকাশিত। অনাগত ভবিষ্যতের পথযাত্রায় এই

অনিশ্চয়তা ও ক্রমসংশোধনের প্রক্রিয়া পরীক্ষানির্ভর পথ অনুসন্ধানের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। গণতন্ত্রের পথ তাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরই অনুরূপ, যেখানে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ভেতর দিয়ে ক্রমাগত শুদ্ধতরভাবে প্রকৃতির নিয়মগুলো বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন।

গণতন্ত্রকে পাশ্চাত্যের বা শিল্পোন্নত দেশগুলোর ঐতিহ্য ও অনুসৃত জীবনধারারূপে প্রায়শ প্রচার করা হলেও গণতন্ত্রের সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ পাশ্চাত্যেও সর্বজনীন ও দীর্ঘদিনের নয়। ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র ইংল্যান্ডই শিল্পবিপ্লবের আগে থেকে শুরু করে সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রেখেছে। গ্রিসে এক অর্থে প্রাচীনতম সংসদীয় গণতন্ত্র সূচিত হলেও সেই ধারা অব্যাহত থাকেনি। ফরাসি দেশেও গণতন্ত্র স্বাভাবিকভাবে বিকাশ লাভ করেনি। একমাত্র চতুর্থ রিপাবলিকে জেনারেল দ্য গল নির্বাচিত হওয়ার পর আফ্রিকার উপনিবেশগুলো স্বাধীনতা পেল এবং ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রও মুক্তি লাভ করল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত, বিশেষ করে দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে, গণতন্ত্র ভীষণভাবে অবমূল্যায়িত হয়েছে। একমাত্র স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলোতে গণতন্ত্র এবং সংসদীয় প্রতিষ্ঠান টিকে থেকেছে। জার্মানিতে উইমার রিপাবলিক (১৯১৮-৩৩) একদলীয় সরকারে চলে যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পূর্ব জার্মানি কমিউনিস্ট সরকারের অধীনে এবং ১৯১৭ সালে রাশিয়া বলশেভিক দলের অধীনে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে গণতন্ত্রের বিকল্প পথ বেছে নেয়। পাশ্চাত্যের দেশগুলোর অগণতান্ত্রিক আচরণের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হলো অনুন্নত দেশগুলোর প্রতি তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য ও বৈষম্যমূলক আচরণ। গণতান্ত্রিক আদর্শ পাশ্চাত্যের একচেটিয়া ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি—এ কথা তাই বলা যাবে না।

গণতান্ত্রিক ধারা প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও সাধারণ মানুষের সার্বিক সচেতনতা যেমন প্রয়োজন যথার্থ নেতৃত্বের প্রভাবে, তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের অনুকূল একটি পরিব্যাপ্ত পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যুক্তরাজ্য যত দিন প্রচণ্ড দাপটে বিশ্বের প্রায় এক-চতুর্থাংশ তাদের অধীনস্থ করে রেখেছিল এবং আপন রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের চর্চা করলেও উপনিবেশগুলোকে রাজতন্ত্রের আধিপত্য ও অনুশাসনে পরাধীন করে রেখেছিল, তাকে কোনোমতেই গণতন্ত্র বলা চলে না—উপনিবেশগুলোর জন্য তো নয়ই, যুক্তরাজ্যের জন্যও নয়। গণতন্ত্র নিছক যান্ত্রিক নিয়ম পালন নয়, আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন এবং সংসদে বিতর্ক সম্পাদনের ভেতর দিয়ে। বরং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের মতামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে সেই মতামতের সংগ্রহ ও সমন্বয় ঘটিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করা হলো গণতন্ত্র।

যেকোনো মানুষের জন্য তার কর্মক্ষেত্র, অর্থনৈতিক আদান-প্রদান, তথ্যের

বিনিময়, শিক্ষার উৎস ও সাংস্কৃতিক প্রভাব যত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তার গণতান্ত্রিক চেতনাও তত দূর প্রসারিত। সভ্যতার অগ্রগতির ভেতর দিয়ে প্রতিটি মানুষের প্রভাবিত হওয়ার ও প্রভাব সৃষ্টির যে এলাকা তা প্রশস্ততর ও তীব্রতর হচ্ছে। মানুষ পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে দেশ এবং দেশ থেকে আন্তর্জাতিক পরিসরে উত্তীর্ণ হচ্ছে। প্রতিটি মানুষের জীবনযাত্রার জন্য যে সামগ্রীগুলো সে ব্যবহার করে এবং তার সব উৎপাদিত দ্রব্য যেখানে পৌঁছে, সবই তার প্রভাববলয়ের মধ্যে। যে হাতিয়ার ও উৎপাদনযন্ত্র সে ব্যবহার করে, যে ওষুধ সে সেবন করে, যে তথ্য ও উৎপাদন কৌশল তার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে, যে আদর্শ ও দর্শন তার আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণাকে উদ্দীপিত করে—সব মিলেই একজন সচেতন সজীব মানুষের জগৎ। একত্রে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে গিয়ে মানুষ পরিবার, সমাজ ও পরবর্তীকালে রাষ্ট্র জন্ম দিয়েছে, যেখানে পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরামর্শের অনিবার্য প্রয়োজনেই একধরনের গণতান্ত্রিক ধারা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করেছে।

মানুষের কর্মক্ষেত্র যত দিন সরল ও বিচ্ছিন্ন ছিল, জীবনযাত্রা ছিল স্থিতিশীল, জ্ঞানের জগৎও ছিল সীমিত ও অপরিবর্তী। ফলে, মানুষের সমাজও ছিল বিচ্ছিন্ন। আধুনিক সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে ও বিভিন্ন দেশকে পরস্পরের কাছাকাছি ও ঘনিষ্ঠতর করেছে একাধিক অর্থে। যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি, তথ্যের দ্রুত আদান-প্রদান, শিক্ষার বিস্তার, উৎপাদনব্যবস্থা, উৎপাদিত সামগ্রী ও উৎপাদন কৌশল দ্রুত স্থানান্তরের ভেতর দিয়ে সর্বজনীনতা লাভ, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে অনেক বেশি অনিবার্য ও অপরিহার্য করেছে। এথেন্সের ছোট শহরে গ্রিকদের সরল জীবনযাত্রায় গণতন্ত্রের যে দর্শন সৃষ্টি হয়েছিল, এমনকি শিল্প বিপ্লবোত্তর অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতাব্দীতেও ইউরোপে যে গণতন্ত্র বিচ্ছিন্নভাবে চর্চিত হয়েছে, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে অধীনস্থ, অসচেতন রেখে, সেই কাল এখন অতিক্রান্ত।

বিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। শুধু ভৌত যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটেনি, তথ্যের আদান-প্রদান, নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে অংশগ্রহণে, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারে অবদান রাখার দৃষ্টান্তে এই সত্যটি এখন প্রমাণিত যে, মানবজাতির সমৃদ্ধি ও সাফল্য, যা আসতে পারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগে, অথবা ব্যর্থতা এবং বিলুপ্তি যা আসতে পারে সার্বিক পরিবেশদূষণ বা পারমাণবিক, জীবাণুযুদ্ধের ভয়াবহতায়—তা এক অভিন্ন ভাগ্যে পৃথিবীর সব মানুষকে একত্র ও ঘনিষ্ঠ করেছে। গণতন্ত্র যদি সব মানুষের মতামতের ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা হয়, গণতন্ত্রের সেই ধারা এখন রাষ্ট্রের সীমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক সীমানায় বিস্তৃত। যথার্থ অর্থে গণতন্ত্র তাই বিশ্বজনীন হতে প্রয়াস পাবে আগামী দিনগুলোতে, যদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে।

গণতন্ত্র : একটি বিশ্বজনীন চেতনার নাম

প্রকৃতি ও সমাজ সম্পর্কে উদ্‌ঘাটিত সব তথ্য ও উদ্ভাবিত সব তত্ত্বের সঠিকতা যাচাইয়ের জন্যই শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন তা-ই নয়; বরং যা সত্য, তা সবার কাছে গ্রহণীয় ও বোধগম্য করে তোলার জন্য সত্যতার প্রদর্শনী চাই। জনসাধারণের অবগতি, উপলব্ধি ও স্বীকৃতির জন্য সামাজিক রাষ্ট্রীয় নীতিমালা, তত্ত্বের যাচাই এবং প্রয়োগে জনসাধারণের অংশগ্রহণ চাই। অর্থাৎ, কোনো সামাজিক সত্য উদ্‌ঘাটনই যথেষ্ট নয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সেই সত্যের প্রকাশযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়। গণতন্ত্র তাই সম্পর্কিত জনগণের সাথে এক গভীরতর অর্থে। কোনো নির্ভুল তথ্য বা জ্ঞান জনগণের কাছে পৌঁছে দিয়ে তাদেরকে শিক্ষিত ও নীতিবান করে একটি সমৃদ্ধ এবং আদর্শ রাষ্ট্র গঠন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার লক্ষ্য নয়। কারণ বাইরে থেকে গৃহীত কোনো আদর্শ ও সত্য মানুষের প্রাপ্যনীয় নয়। এমনকি নির্বাচিত বিজ্ঞ ও বিদগ্ধ কোনো ব্যক্তিও এককভাবে গণতান্ত্রিক কোনো নীতিমালা নির্ধারণ করতে পারে না।

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য গৃহীত নীতিমালা, এর আদর্শ ও লক্ষ্য, প্রত্যাশা ও পদ্ধতি শেষ বিশ্লেষণে, জনগণেরই সম্মিলিত অবদান। কখনো এই অবদান পরোক্ষ, কখনো বা প্রত্যক্ষ। জনগণের ভেতর থেকে কোনো নেতৃত্ব যখন বেরিয়ে আসে, কোনো অভিনব ধারণা নিয়ে এবং প্রভাবিত করে বিপুল জনসংখ্যাকে, তখনো বুঝতে হবে সেই অভিনব ও অসাধারণ প্রজ্ঞা এবং উপলব্ধি অর্জনের উৎস সে দেশের জনগণ। কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণাগারে নতুন জ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশ যেখানে ঘটে সেখানেও জ্ঞানী ব্যক্তি-গবেষকদের লালনে-সমর্থনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায়তন ও গবেষণাগার গড়ে তুলতেও অর্থ জোগান দিতে জনগণের সমর্থন চাই। অর্থাৎ যে জ্ঞান বা আদর্শ দ্বারা কোনো গণতান্ত্রিক সমাজ পরিচালিত তার উদ্ভাবন ও বিকাশের ক্ষেত্রে জনগণের অন্তত পরোক্ষ অংশগ্রহণ আছে।

এই উন্নততর জ্ঞান, শুদ্ধতর উপলব্ধি বা নতুন সব উৎপাদনব্যবস্থা ও প্রযুক্তি কতটা গৃহীত হবে বা সমর্থিত তা নির্ভর করে জনগণ কতটা সংবেদী, গ্রাহী এবং অগ্রসর। এ ক্ষেত্রে জনগণ উদ্ভাবিত জ্ঞান ও প্রচারিত নীতিমালার গ্রহণযোগ্যতা দিয়ে আরও এক স্তরে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র পরিচালনায়। গণতান্ত্রিক কোনো নীতি কার্যকর করতে হলে তাই দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হয়। প্রথমত সত্য উদ্‌ঘাটনের অন্তহীন ও অনিশ্চিত পথে চলতে গিয়ে সমগ্র সমাজকে সম্পৃক্ত করতে হয় সবার কাছে গ্রহণীয়, অন্তত সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থিত অভিমতের ভিত্তিতে। প্রতিটি মানুষের

মতামতকে মূল্য দিতে গিয়ে একধরনের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীলতা তাই অপরিহার্য, যা শুধু একটি অভিন্ন সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়েই সম্ভব।

কর্মক্ষেত্রে, উৎপাদনশীলতায়, বিশ্বাস, রুচি ও প্রত্যাশায় একটি অবিচ্ছিন্ন প্রভাববলয়ের মধ্যে বাস করাই হলো একটি সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হওয়া। গণতন্ত্র তাই দাবি করে প্রতিটি মানুষের বিচারশক্তি, বুদ্ধিগত সততা, সামাজিক দায়বদ্ধতা, উৎপাদনশীলতা ও দায়িত্ববোধ। গণতন্ত্রের স্বাধীনতা তাই প্রতিটি মানুষের মূল্য পরিশোধের ভেতর দিয়ে অর্জিত। গণতান্ত্রিক সমাজে জনগণকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা, তাদের রুচি সৃষ্টি করা এবং সেই অর্জিত জ্ঞান নতুন উপলব্ধি ও রুচি নিয়ে জনগণ যখন নেতৃত্ব নির্বাচন করে সেখানে উপলব্ধি এবং যোগাযোগসাধ্যতার এক অবিচ্ছিন্ন জাল সৃষ্টি হয় সমগ্র সমাজজুড়ে। এই সংযোগ ও সমন্বয় আবেগ, অন্ধবিশ্বাস, গোঁড়ামি বা সাম্প্রদায়িক অনুভূতি থেকে নয়; সচেতন বিচার-বিবেচনা ও রুচির ভিত্তিতে— যা সৃষ্টি করে যথার্থ রাজনৈতিক নেতৃত্ব। স্বভাবতই এই প্রক্রিয়া দীর্ঘ শ্রমসাধ্য, বিকাশমান ও অসম্পন্ন, গণতন্ত্রের পথ সেই কারণে অন্তহীন।

মানুষের প্রতি গভীর বিশ্বাস, জ্ঞানার্জনের সাধ্যতা, বিচারক্ষমতা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, বিকাশমানতা ও ইহলৌকিকতা হচ্ছে গণতন্ত্রের মূল স্বীকার্য। গণতন্ত্রের যোগ্য হয়ে উঠতে প্রতিটি মানুষের জন্য শিক্ষা চাই, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা চাই; মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সাহস ও সততা চাই— যার সবই অর্জনসাধ্য। ব্যাপক শিক্ষা, সংস্কৃতির বিকাশ ও কর্মতৎপরতার ভেতর দিয়ে সার্বিকভাবে প্রস্তুত হয়েই একটি জাতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রবেশ করবে এ কথা সত্য নয়; বরং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই সেই সর্বজনীন শিক্ষা ও প্রস্তুতি ধাপে ধাপে সৃষ্টি হওয়ার।

গণতন্ত্রের তীর্থশালা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় পথের শেষে অবস্থিত নয়, পথের দু'পাশে এর দেবালয়। একটি জাতি যখন দীর্ঘ সংগ্রামের পথ বেয়ে অগ্রসর হয় ক্ষুধা, আশ্রয়হীনতা, দৈহিক ও মানসিক রুগ্‌ণতা, অশিক্ষা এবং অবচেতনার স্তর অতিক্রম করে অর্থনৈতিক মুক্তি, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনিয়ন্ত্রণে লক্ষ্যে—তা মানবসভ্যতার এক চমৎকার বিস্ময়। অবচেতনা থেকে চেতনার জগতে প্রবেশ, অন্ধকার থেকে আলোর উদ্ভাস অঙ্কুরোদ্‌গম ও প্রদীপ জ্বালাবার মতোই আকর্ষণীয় ঘটনা। উত্তরণের পথে সমগ্র মানবজাতির সহযোগিতা ও সহায়তা প্রদান শুধু দায়িত্ববোধের নয়, তাদের নিজস্ব গণতান্ত্রিক চেতনা এবং মানবিক উপলব্ধির উপস্থিতির নির্ধারক।

একটি বিশেষ সমাজের বা জাতির একটি অংশকে বঞ্চিত করে ও পশ্চাৎপদ রেখে সেই সমাজ বা জাতির অগ্রযাত্রা যেমন সম্ভব নয় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে, মানবজাতির কোনো অংশকে পশ্চাৎপদ রেখে কোনো জাতির পক্ষেই যথার্থ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাও সম্ভব নয়। কারণ, মানুষের জন্য যে সহানুভূতি ও চেতনাবোধ তা কখনোই সীমিত রাখা সম্ভব নয় একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা বা মানবগোষ্ঠীর মধ্যে। আলো মানেই যেমন সুদূরের যাত্রী, মানবিক চেতনার বিস্তারও তেমনি সর্বজনীন ও সর্বত্রগামী। গণতন্ত্রের চেতনা তাই বিশ্বজনীন, অশেষ এর উত্তরণের পথ।

একবিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্র

নতুন শতাব্দী স্বভাবতই নতুন সমস্যা ও নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের ব্যক্তিজীবন ও যৌথ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকেই প্রভাবিত করবে। আমাদের জীবনধারা, প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি সবই পরিবর্তিত হয়েছে কালের প্রবাহে। কিন্তু এই পরিবর্তন সময়ের সঙ্গে আনুপাতিকভাবে ঘটেনি, ঘটেছে সূচকহারে, অনেকটা জনসংখ্যা বৃদ্ধির মতোই। বস্তুত সভ্যতা যেহেতু বহুমাত্রিক এক প্রতিভাস, যেখানে মানুষের কর্মতৎপরতা, পরিকল্পিত ধারণা, কর্মক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বা বিরোধ বিচিত্রভাবে সংগঠিত হয় কখনো আনুকূল্য পেয়ে কখনো বাধা লাভ করে; ফলে অগ্রগতির স্থানিক ও কালিক ধাপগুলো অসম ও বিক্ষিপ্ত।

গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি যেহেতু যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমগ্র রাষ্ট্রকে অন্তর্ভুক্ত করে ব্যক্তিস্বাধীনতার আবহে; ফলে ব্যাপ্তি ও গভীরতা, স্বরূপ ও সূক্ষ্মতা রাষ্ট্রবদ্ধ প্রতিটি মানুষের সার্বিক অগ্রগতি ও চেতনা বৃদ্ধি সেই সঙ্গে যৌথ জীবনের নানা ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের গুরুত্ব ও প্রকৃতির পরিবর্তন গণতন্ত্রের চেহারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি প্রত্যেকটি মানুষ আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আত্মকেন্দ্রিক ও বিচ্ছিন্ন ছিল। সে বন্দী ছিল অব্যবহিত স্থান, কাল ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মধ্যে। মানুষের পারিবারিক ও যৌথ জীবন যেখানে সংঘবদ্ধ ছিল, সেখানে তা পরিচালিত হতো অবচেতন এক প্রবৃত্তির দ্বারা, যেমনটি পরিলক্ষিত হয় অন্য সব প্রাণীর মধ্যেও।

এর সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত পিঁপড়া। এরা গভীরভাবে সংঘবদ্ধ, সঞ্চয়ী ও সুশৃঙ্খল এমনকি ঐক্যবদ্ধভাবে সুসংগঠিত যুদ্ধে প্রাণবিসর্জন দিয়ে থাকে। কিন্তু এর পেছনে কোনো সচেতন সহানুভূতি নেই অথবা কালিক চেতনা। জড়বস্তুর ক্ষেত্রে অণু-পরমাণুর মধ্যে অনুবন্ধনের যে সম্পর্ক তার তুলনায় জীবজগৎ নিঃসন্দেহে উত্তরিত উন্নততর এক জৈবিক চেতনায়। কিন্তু মানুষের উপলব্ধি ও চেতনার যে স্তর এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ এর যে বিকশিত হবার অশেষ, অন্তহীন, মুক্তপথ, তা তাকে অন্য সমস্ত প্রাণিজগৎ থেকে ভিন্ন ও অনন্য করেছে। এর মূল ভিত্তি অবশ্য ১৫ বিলিয়ন নিউরন নিয়ে গঠিত মানুষের মস্তিষ্ক। যার প্রতিটি নিউরন আবার অসংখ্য সিনেপ্টিক সংযোগে পরিবর্তনীয় একেকটি গুচ্ছ সৃষ্টি করতে পারে বাহ্যিক

উদ্দীপকের প্রভাবে। মানুষের কল্পনাশক্তি নানা তত্ত্বের মিশ্রণে সৃজনশীল ধারণা সৃষ্টি ও উদ্ভাবন যে সম্ভব, তার মূলে কাজ করে মস্তিষ্কের এই জটিল ও নমনীয় গঠন।

বিমূর্ত ভাবনা, কালিক চেতনা ও ভাষা লাভের ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই আছে যা মানুষকে শুধু অনন্য করেনি তাকে বিচ্ছিন্নতা ও সুদূরতা দিয়েছে প্রাণিজগতের অন্য সব প্রজাতি থেকে। মানুষ অবশ্য তার জৈবিক উৎসের ঠিকানা ধারণ করে রেখেছে যেখানে তার মস্তিষ্ককাণ্ড (Brain stem) অন্য প্রাণীদের মতোই আবেগ, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিগুলো ধারণ করে আছে। কিন্তু যে বৈশিষ্ট্য তাকে বুদ্ধিমান, সৃজনশীল, কালিক চেতনা ও ভাষালাভের যোগ্য করে অপার ব্যবধান তাকে দিয়েছে, তার ভিত্তি হলো মস্তিষ্ক বলকল (Cerebral Cortex)। মানুষের এই গুরু মস্তিষ্কের উদ্ভব ঘটেছে অবশ্য মস্তিষ্ককাণ্ড উদ্ভবের অনেক পরে। সভ্যতার অগ্রগতির ভেতর দিয়ে যে পরিবর্তনটি সবচাইতে বেশি প্রত্যাশিত তা হলো মস্তিষ্ক বলকলের প্রভাব বৃদ্ধি মস্তিষ্ককাণ্ডে প্রভাবকে অতিক্রম করে।

মানবসভ্যতা প্রবৃত্তিতাড়িত প্রাণিসুলভ জীবনের প্রভাব কাটিয়ে বুদ্ধি ও চেতনা পরিচালিত মানবিক জীবনের উত্তরণের এক প্রান্তিলগ্নের ভেতর দিয়ে এখন পার হচ্ছে। একবিংশ শতাব্দী সেই দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত কয়েক সহস্র বছর ধরে সভ্যতার যে ক্রমবিকাশ সেখানে অগ্রগতির অসংখ্য ধাপ মানুষ অতিক্রম করেছে। খাদ্য উৎপাদন, হাতিয়ার নির্মাণ, যোগাযোগ বৃদ্ধি, তথ্য সংগ্রহ, গৃহ নির্মাণ ও চিকিৎসার নানা কৌশল উদ্ভাবন, সমাজগঠন ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ সবকিছুই মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ক্ষুধা, ব্যাধি ও পরিবেশের প্রতিকূলতা থেকে। এটা তার বাহ্যিক ভৌত স্বাধীনতা লাভ। কিন্তু মানুষ একই সঙ্গে মুক্তি লাভের প্রয়াস পেয়েছে অন্তর্গতভাবে যেখানে তার ভাষা শিক্ষা, তথ্য বিনিময়, শিল্পসাধনা, তথ্য সংগ্রহ, প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার সৃষ্টি করেছে এক সাংস্কৃতিক জগৎ—চেতনা ও মূল্যবোধের, উপলব্ধির ও মানবিকতার।

মানুষের মস্তিষ্ককাণ্ড ও মস্তিষ্ক বলকল একই সঙ্গে পাশাপাশি যেমন অবস্থিত, তেমনি এদের প্রভাব যথা লোভ, ভয়, হিংস্রতা, ক্রোধ প্রভৃতি পশুজাত প্রবৃত্তি এবং সৌন্দর্যবুদ্ধি, নান্দনিক ভাবনা, প্রজ্ঞা, মানবিক চেতনা, সৃষ্টিশীল প্রেরণা পাশাপাশি অবস্থান করছে মানুষের মধ্যে। বস্তু মানুষের এই ভিন্ন দুই প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও শক্তি শুধু একত্রে অবস্থান করে না, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মিশ্রণ ও মিথস্ক্রিয়ায় এমন এক জটিল ব্যবস্থারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে যা মানবজাতির অস্তিত্বের জন্যই হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়েক সহস্র বছরের যে স্মৃতি, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, আস্থাহীনতা, প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতিকূলতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা, রোগ ও মৃত্যুভয়ের ভূত মানুষকে এখনো তাড়িত করছে। যদিও প্রকৃতির নিয়মগুলোকে ক্রমাগত জানা, বিশ্বজগৎ সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি, নিজেকে আবিষ্কার, পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা মানুষকে নতুন এক সম্ভাবনায় নিয়ে গেছে যেখানে অতীতের

নিরাপত্তাহীনতা, সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও সংকট এখন কাটিয়ে ওঠা সম্ভব সমগ্র মানবজাতির জন্য। কিন্তু তা যে সম্ভব হচ্ছে না তার কারণ সভ্যতার ক্রমবিকাশের যে পথ সেখানে মানুষের সৌন্দর্যবুদ্ধি, সৃষ্টিশীলতা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, যোগাযোগসাধ্যতা কখনো বিশুদ্ধ কল্যাণময় হয়ে অগ্রগতি লাভ করেনি।

মানুষ যখনই হাতিয়ার নির্মাণ করেছে শত্রুর বিরুদ্ধে নিরাপত্তার জন্য, সেই দক্ষতর যুদ্ধযন্ত্র প্রতিযোগিতার সূচনা করে যুদ্ধকে করেছে প্রাতিষ্ঠানিক ও ভয়াবহ, যা তার আপন অস্তিত্বের বিরুদ্ধে হুমকি হয়ে উঠেছে। মানুষের বর্ধিত খাদ্য উৎপাদনক্ষমতা মানুষকে নিরাপত্তা দিয়েছে ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে, কিন্তু একই সঙ্গে পুরোনো ক্ষুধার স্মৃতি ও দুর্ভিক্ষের ভীতি তাকে লোভী করেছে খাদ্য মজুত করে রাখার প্রবণতায় ও খাদ্যকে আধিপত্যবিস্তার ও শক্তি প্রয়োগের কৌশলরূপে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে মানুষের যে অগ্রগতি নানা যানবাহন ও ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে তা মানুষের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও জাতিগত বিভেদকে অতিক্রম করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে যেমন, তেমনি অন্য রাষ্ট্রকে দখল করার ও অন্য জাতির ওপর প্রভাব বিস্তারের প্রবণতা বাড়িয়েছে।

বঙ্গবন্ধু : একজন রাজনীতির কবি

কবিতার অনেক বৈশিষ্ট্য আছে; এটি সাহিত্যের আদিমতম রূপ। এখানে সৌন্দর্যবুদ্ধি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এবং প্রতিফলিত এর শব্দচয়নে, ছন্দে, অন্ত্যমিলে, সামঞ্জস্যে, অনুভূতির গভীরতায়। কবিতা যেখানে প্রচলিত ছন্দকে অতিক্রম করে গদ্যের দৃঢ়তা, গাম্ভীর্য ও বাস্তবতাপ্রাপ্ত সেখানেও একটি সাযুজ্য এর গন্ধময় শরীরেও অন্তর্নিহিত। কবিতার আবেদন সর্বজনীন ও সর্বকালীন; কারণ এর উৎস ও সৃষ্টির প্রেরণা ভালোবাসায়। কবি যতই জনপ্রিয়তা ও ব্যাপকতা লাভ করুক, তার ব্যক্তিগত ছাপ তার কবিতায় থাকবে। এ জন্যই সত্যিকারের কবি সমগ্র জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও অনিবার্যভাবে নিঃসঙ্গ ও একাকিত্বপ্রাপ্ত। এটার কারণ, ভাবনার জগতে তার দূরত্ব।

একজন পর্বতারোহী যখন সব দুর্গমতা অতিক্রম করে পর্বতের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছে, তখন তার দিগন্ত অন্য সবার তুলনায় বৃহত্তর পরিধি লাভ করে। পর্বতারোহীর চূড়ায় অবস্থান সবার কাছে তাকে দৃশ্যমান ও পরিচিত করে তোলে; কিন্তু এই উচ্চতা তাকে একই সঙ্গে করে নিঃসঙ্গ, অন্য সবার সঙ্গে তার ব্যবধানকে করে দুস্তর। শুধু পর্বতারোহীর ক্ষেত্রে নয়, যে মহাকাশের অভিযাত্রী, যে শিল্পী, গবেষক বা উদ্ভাবকরূপে নতুন জ্ঞানের উপলব্ধি বা সৌন্দর্যের স্রষ্টা—সবাই একধরনের দূরত্ব এবং দুর্বোধ্যতাপ্রাপ্ত। বস্তুত একধরনের বৈপরীত্য আমরা লক্ষ করি, এদের ঘিরে আমাদের উপলব্ধি ও প্রতিক্রিয়ায়। প্রতিভাবান, সৃজনশীল কোনো ব্যক্তি যখন গতানুগতিকতা, প্রচলিত ধারা, সংস্কার ও মূল্যবোধকে অতিক্রম করে অনন্যসাধারণ কোনো দৃষ্টি ও উপলব্ধি লাভ করে, তা আবিষ্কারের মুহূর্ত একান্তভাবেই তার নিজস্ব। তার এই নতুন দৃষ্টি, উপলব্ধি ও সৃষ্টি যত বেশি অনন্য ও ভিন্ন গতানুগতিকতা থেকে, তত বেশি দূরত্বপ্রাপ্ত সেই সৃজনশীল ব্যক্তি। অন্যদিকে নতুন দৃষ্টি ও উপলব্ধির অভিঘাত এবং প্রভাব যত বেশি তীব্র তত ব্যাপকতাপ্রাপ্ত সেই নতুন সৃষ্টি।

কোনো ব্যক্তি ও তার কর্মের জনপ্রিয়তা এককভাবে নির্ধারণ করে না, কতটা শক্তি নিহিত সেই ব্যক্তি বা তার কর্মের মধ্যে। মানুষের প্রচলিত আবেগ, তাদের বিশ্বাস, সংস্কার ও দুর্বলতাকে ব্যবহার করে, এদের সহজাত প্রবৃত্তিকে উসকিয়ে দিয়ে দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ কখনো কখনো সম্ভব। কিন্তু প্রতিভা ও শক্তির পরিচয়

তখনই আমরা পাই, যখন একজন সৃষ্টিশীল মানুষ নতুন মূল্যবোধ ও রুচি সৃষ্টি করেন অন্যদের মধ্যে। উৎসারিত ও সঞ্চারিত সেই নতুন রুচি প্রজ্বলিত প্রেরণার আলোতে দৃষ্টিলাভ করে যখন কোনো শিল্পীর সৃষ্টিকে জনগণ সমর্থন জানায়, সেটাই প্রমাণ করে শিল্পীর শক্তিকে।

কবিতা এবং কবি— এই শব্দ প্রতীকী অর্থে আমরা গ্রহণ করতে পারি এখানে। যে সৃষ্টিকর্মে অভিনবত্ব, ছন্দ, উত্তাপ ও আলো, নতুন দৃষ্টি, শক্তি ও প্রেরণা আছে, যা উত্তরণ ঘটায়, দেয় মানসিক উচ্চতা এবং উপলব্ধির দিগন্তকে প্রসারিত করে, তাকেই বলতে চাই কবিতা। এর উপাদান শব্দ বা ধ্বনি হতে হবে, এমন কথা নেই। কবি তো অভিধান থেকেই শব্দ চয়ন করে, কিন্তু কবির রুচি ও সৃষ্টিশীলতা তার নির্বাচিত শব্দগুলোর বিন্যাসে নতুন অর্থ ও বোধ সঞ্চারিত করে শব্দের মধ্যে। শব্দগুলো এদের পরস্পরের সান্নিধ্যে, অর্থের পরিপূরকতায় সৃষ্টি করে গভীরতর ভাবনা, গতি ও উপলব্ধি। একজন যন্ত্রবিজ্ঞানী ভিন্ন ও বিচিত্র, অবিচল যন্ত্রাংশকে রূপান্তরিত, নির্মাণ ও বিন্যস্ত করে উদ্ভাবন করতে পারে দ্রুতগতির যানবাহন বা উড্ডয়নসাধ্য প্লেন। যন্ত্রাংশগুলো এদের এলোমেলো ও অসংযোজিত অবস্থায় অথবা যন্ত্রাংশগুলোর নির্মাণবস্তু যথার্থরূপে রূপান্তরিত ও নির্মিত হওয়ার আগে বিচিত্র জড়বস্তুরূপেই অবিচল থাকে। এদের একত্র করে সেখানে তেল বা পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া সম্ভব; কিন্তু ইঞ্জিনের দক্ষতা নিয়ে পেট্রল তেল বা গ্যাসের শক্তিকে গতির উৎসরূপে ব্যবহার করতে সৃষ্টিশীলতা চাই। কবিতার পুরোনো ও মৃত শব্দগুলো পরস্পরকে প্রভাবিত করে, অর্থের মিথস্ক্রিয়া ঘটিয়ে যে নতুন উপলব্ধি ও চেতনা সৃষ্টি করে, সেখানে কবির সৃষ্টিশীলতা জোগায় সেই গতিশক্তি, যেমনটি ঘটায় যন্ত্রবিজ্ঞানী ও উদ্ভাবক তার নির্মিত ইঞ্জিনে।

বঙ্গবন্ধু, তাঁর রাজনীতিতে আমাদের সহস্র বছর ধরে লালিত যেসব বিক্ষিপ্ত প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষা, দাবি, প্রয়োজনবোধ, প্রতিবাদ, তা রূপান্তরিত ও বিন্যস্ত করে এমন এক ছন্দে সাজিয়েছেন দীর্ঘ, সময় ধরে, যেমন করে একজন কবি শব্দকে সাজায় ছন্দে। শব্দচয়ন ও বিন্যাসের গুণেই নতুন অর্থ সংযোজিত হয় প্রতিটি শব্দের মধ্যে। পুরোনো শব্দগুলো লাভ করে নতুন অর্থ পারস্পরিক সান্নিধ্যে ও সাযুজ্যে। সৃষ্টি করে নতুন প্রেরণা ও গতি পাঠকের ভাবনা ও চেতনায়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো চাওয়া, আমাদের সম্পদের ব্যবহার, কর্মদক্ষতা ও শ্রমের মূল্যায়ন, শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ, অর্থনৈতিক মুক্তির দাবি, কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতার অন্ধকার থেকে মুক্তি—এসবই নানা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের রূপ নিতে প্রয়াস পেয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু অসংলগ্ন, বিচ্ছিন্ন ও এলোমেলোভাবে আমাদের উপলব্ধি ও অভিযোগের উপাদানগুলো থেকেছে দুর্বল। ক্ষুদ্র স্বার্থ, সংকীর্ণ দৃষ্টি, অদূরদর্শিতা, লোভ, শঙ্কা ও ভয়, সর্বোপরি রাজনৈতিক স্বচ্ছ ও সৃষ্টিশীল

চিন্তার অনুপস্থিতি আমাদের রাজনীতির উপাদানগুলোকে প্রাণহীণ ও অবিচল করে রেখেছিল।

কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য হলো, অভিধানের মৃত শব্দগুলোকে ছাঁটাই-বাছাই ও রূপান্তরিত করে উচ্চারণ ও অর্থের সামঞ্জস্যে ও ছন্দে কবি যখন বিন্যস্ত করেন, তখন সব শব্দ যেন ডানা মেলে গতির ঐক্য সৃষ্টি করে, সেই সঙ্গে উপলব্ধিরও। বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন যেসব ভাবনা, অস্পষ্ট, অবজ্ঞাত ও আপাত-পরস্পরবিরোধী হয়ে জড়বস্তুর মতো অথবা অভিধানের অব্যবহৃত শব্দের মতো অবিচল হয়েছিল; বঙ্গবন্ধু তাকে সমন্বিত, ছন্দিত ও গতিশীল করেছেন। তাঁর সৃষ্ট যে ঐক্য রাজনৈতিক চেতনা ও উপলব্ধিতে, তা অভিনব ও অনন্য বলেই অনেকের উপলব্ধির অতীত। যারা এখনো নিমগ্ন সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণ দৃষ্টি, ক্ষুদ্র স্বার্থ ও পশ্চাৎমুখিনতায়, অধিকাংশ রাজনীতি যেখানে বন্দী ক্ষমতালাভের প্রলোভন, ক্ষমতা হারানোর শঙ্কা ও পারস্পরিক বিদ্বেষের বেড়াজালে; সেখানে বঙ্গবন্ধু, তাঁর সৃষ্টিশীলতায় দূরদৃষ্টি ও উদার মানসিকতায় এমন এক চেতনা ও উপলব্ধি সঞ্চার করেছিলেন রাজনীতিতে, যা অনেকেরই বোধের অতীত।

দূরনক্ষত্রের আলোর মতোই বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চেতনার আলো আমাদের সকলের হৃদয়ে পৌঁছাতে হয়তো আরো সময় লাগবে। নক্ষত্রের আলো দেখার একটি শর্ত হলো, দৃষ্টিকে আকাশের দিকে প্রসারিত করা। মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চলে যেসব প্রাণী ও সরীসৃপ তারা নক্ষত্রের আলো থেকে বঞ্চিত। যে আলো বেশি উচ্চতা থেকে বিকীর্ণ হয় এবং দূরত্বের কারণে বিলম্বিত দৃষ্টিগোচর হওয়ার ক্ষেত্রে, সেই আলোর অনিবার্যতা তত বেশি। যা নিত্যনৈমিত্তিক, প্রচলিত, ক্ষুদ্র ও সমতলে অবস্থিত, তা সহজলভ্য হতে পারে; কিন্তু উত্তরণ ঘটায় না আমাদের উপলব্ধির। বর্তমানের রাজনীতি নিম্নগামী জলপ্রবাহের মতোই সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিচের দিকে। অথচ কী অভূতপূর্ব প্রেরণা, শক্তি, ঐক্য ও মনোবল নিয়ে বাঙালি জাতির রাজনীতিকে ঊর্ধ্বগামী করেছিলেন বঙ্গবন্ধু উত্তরণের পথে!

বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি

বঙ্গবন্ধু দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় এবং নানা প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সংগ্রাম ও কারাবাসের ভেতর দিয়ে। সেই সঙ্গে সমগ্র জাতিকে তৈরি করেছেন ধাপে ধাপে আত্মমর্যাদাবোধ এবং জাতীয়তাবোধের চেতনা ও স্বাধীনতার প্রেরণায়। আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ, অর্থনৈতিক মুক্তি, গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় সবকিছুর জন্যই বাঙালি জাতির যে দীর্ঘদিনের সংগ্রাম—বিচ্ছিন্ন ও পর্যায়ক্রমিকভাবে, তাকে ঐক্যবদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ করার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অবদান অনন্য। তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক জীবন যে অসংখ্য ধাপ পেরিয়ে নানা প্রতিবন্ধকতা ও সংকট অতিক্রম করে ক্রমাগতভাবে স্পষ্টতা ও তীব্রতা লাভ করেছে তার মূলে দুটো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আমরা লক্ষ করি। একটি হলো বাঙালি জাতির জন্য তাঁর অপার ভালোবাসা; অন্যটি হলো অভিজ্ঞতা, সমস্যার বাস্তবতা ও সময়ের দাবিকে সততা, সাহসিকতা ও মৌলিক চিন্তার আলোকে যাচাই করা।

বঙ্গবন্ধু নিঃসন্দেহে সফল, সার্থক এবং শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ। তার প্রমাণ রাজনৈতিক জীবনে তাঁর সাফল্য। অপার সাহসিকতা, আত্মত্যাগ ও অভূতপূর্ব দেশপ্রেম ও ঐক্যবদ্ধতা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা করেছেন, বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির অনন্যসাফল্য সেখানে। একটি দরিদ্র, পশ্চাৎপদ, শিক্ষাবঞ্চিত জাতি দীর্ঘদিন ধরে শাসিত ও শোষিত হয়ে যেখানে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ হারিয়ে ফেলেছিল, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, সেই জাতিকে জাগ্রত করা ছিল এক দুঃসাধ্য কাজ।

রাজনীতি বলতে গতানুগতিক অর্থে যা বোঝায় সেখানে নানা কূটকৌশল, অনুকরণ, সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি প্রায়শ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কারণ, রাজনীতির মূল লক্ষ্যই থাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল। এই ক্ষমতাদখলের কৌশলরূপে কখনো শক্তি প্রয়োগ, কখনো বা মানুষের আবেগ, বিদ্বেষ বা লোভকে ব্যবহার করে লক্ষ্যার্জনের প্রচেষ্টা চলে।

কিন্তু মানুষের মধ্যে ইতিবাচক, বস্তুনিষ্ঠ ও প্রগতিশীল চিন্তা সঞ্চারিত করে তাদেরকে সৎভাবে প্রস্তুত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচলিত মতবাদ, একটি সংস্কার বা বিশ্বাসের প্রতি বিশেষ জনগোষ্ঠীর অন্ধবিশ্বাস, জাতিগত

বিভেদ বা বিদ্বেষকে ব্যবহার করে রাজনীতিবিদেরা জনপ্রিয়তা লাভ করতে প্রয়াস পায়। যেখানে কাজ করে আবেগ বা ঋণাত্মক বা নেতিবাচক ভাবনার অনুষঙ্গ, সেখানে রাজনীতিবিদ তার অনুসারীদের মধ্যে কোনো নতুন রুচি সৃষ্টি করে না; তাদের মানসিক উত্তরণ, আত্মবিশ্বাস ও উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত করে না। বরং মানুষের মধ্যে নেতিবাচক যে প্রবণতাগুলো উপস্থিত, যথা বিদ্বেষ, অন্ধবিশ্বাস, সম্পদের লোভ, আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতাকে উসকে দিয়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চলে। কিন্তু সৎ রাজনীতি বলতে জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণবোধ এবং তার অর্জনের জন্য সবার মধ্যে উন্নয়ন-আকাঙ্ক্ষা, আত্মমর্যাদাবোধ, স্বাধীনতার চেতনা ও আত্মত্যাগের প্রেরণা সৃষ্টি প্রয়োজন। আবেগ হতে পারে অন্ধবিশ্বাস, ঋণাত্মক ভাবনা, বিরোধ ও প্রতিহিংসার অনুষঙ্গ। কিন্তু প্রেরণা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন ধনাত্মক ভাবনা, সৃষ্টিশীলতা, ঐক্য এবং প্রগতিশীল চিন্তা।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন বিশ্লেষণ করলে আমরা লক্ষ করি যে, একটি মধ্যবিত্ত কৃষিনির্ভর মুসলিম পরিবারে তিনি বেড়ে উঠেছেন, গ্রামের পরিবেশে স্কুলশিক্ষা লাভ করেছেন, তারপর ভর্তি হয়েছেন কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে। তরুণ বয়সে মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনের রাজনীতির আবহাওয়াতেই রাজনীতির হাতেখড়ি নিয়েছেন। সেই সময়ে মুসলিম লীগের যে আন্দোলন তা ছিল শিক্ষা, সম্পদ ও চাকরির ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ মুসলমানদের ওপর হিন্দুদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ। সেই রাজনীতির মধ্যে যেটুকু জাতিগত ইতিবাচক দিক ছিল তা হলো, আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই ইতিবাচক দিনটা শেখ মুজিবকেও প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যে অন্যায় ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি ও আত্মবিকাশের সচেতন প্রচেষ্টার পরিবর্তে সংকীর্ণ বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার নেতিবাচক আবেগ বেশি ব্যবহৃত হয়েছে।

হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই নেতিবাচক বিদ্বেষ ছড়াবার মতো রাজনীতিবিদ ছিল। এর ফলে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার মুহূর্তটি যে স্বপ্ন, ঐক্য, মানসিক উত্তরণ ও উদার দৃষ্টি নিয়ে আনন্দমুখর হতে পারত তা কালিমালিপ্ত হলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং আনুষঙ্গিক হত্যাকাণ্ড ও অশ্রুপাতে। তরুণ শেখ মুজিব সেই মুহূর্ত থেকেই সংকীর্ণ রাজনীতির মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন। জাতি হিসেবে মুসলমানরা বঞ্চিত, উপেক্ষিত বা অবদমিত হোক তা তিনি চাননি, কিন্তু সেখানে কোনো সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাকে তিনি গ্রহণ করেননি তাঁর রাজনৈতিক আদর্শে। বস্তুত, দায়িত্বে, ব্যক্তিত্বে, স্বাধীন চিন্তা ও উদার দৃষ্টি নিয়ে ভেতরের তাগিদে এই মানসিক উত্তরণ অত্যন্ত দুর্লভ এক ঘটনা। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তায় এই রূপান্তর আরো সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্তি লাভ করে ১৯৪৭-১৯৫২ সালের মধ্যে, যখন তিনি লক্ষ করেন বাঙালি জাতির ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ওপর পশ্চিম

পাকিস্তানের আধিপত্য বিস্তারের নানা ঘটনা। এখান থেকে বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি লাভ করে গভীরতর ভিত্তি ও প্রশস্ত দিগন্ত।

বঙ্গবন্ধুকে অনেকেই জানেন একজন সংগ্রামী, আপসহীন, দুঃসাহসী ও বিপ্লবী নেতা হিসেবে, যিনি বাংলা ভাষার অধিকার, বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি, গণতান্ত্রিক অধিকার, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা— সবকিছুর জন্য সংগ্রাম করেছেন, নেতৃত্ব প্রদান করেছেন; এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার জন্য সমগ্র জাতিকে প্রস্তুত করা ও নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে অনন্য ও অসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু অনেকেই আবার বলে থাকেন, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় তিনি দক্ষ ছিলেন না। এই উক্তি যারা করেন তারা যুদ্ধের যে সামগ্রিক প্রভাব একটি দেশের ওপর পড়ে তার তীব্রতা, যুদ্ধোত্তর একটি দেশকে কীভাবে নানা সমস্যা গ্রাস করতে চায় সে সম্পর্কে অজ্ঞ। বিশেষ করে, বাংলাদেশের মতো একটি কৃষিভিত্তিক দরিদ্র দেশ যা শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ— যেখানে সাধারণ মানুষ অনন্যোপায় হয়ে শোষণ, বিশ্বাসঘাতকতা, সামরিক নির্যাতন, শিশু-নারী ও সাধারণের ওপর প্রচণ্ড নির্যাতন ও নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে জ্বলে ওঠে, এবং শুধু দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও সাহসিকতা দিয়ে অর্জন করে বিজয়, নিরস্ত্র ও সম্পদহীন হয়েও, তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসেও বেশি নেই।

তবু যারা যুদ্ধের ইতিহাস পড়েছেন, যুদ্ধের অব্যবহিত পরের ও যুদ্ধোত্তর দেশসমূহের দুরবস্থার কাহিনি জেনেছেন, তাদের উপলব্ধি করার কথা, কী প্রচণ্ড সংকটের মধ্যে বাংলাদেশ পতিত হয়েছিল '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পর। অর্থ নেই, খাদ্য নেই, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট বিধ্বস্ত। নগণ্যসংখ্যক যে কলকারখানা তা-ও বন্ধ। যানবাহন নেই। মাটির নিচে ও শহরে-বন্দরে বোমা-মাইন পোঁতা। যুদ্ধাপরাধীরূপে প্রায় এক লাখ পাকিস্তানি সৈনিক আবদ্ধ আছে, সেই সঙ্গে পাকিস্তানের অনুগত আটকে পড়া অবাঙালি, যাদের সঙ্গে মিশেছিল স্বাধীনতাবিরোধীরা— যারা রাজাকার আলবদর-আলশামসরূপে যুদ্ধশেষেও কাজ করছিল স্বাধীনতার বিরুদ্ধে।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ছিল অস্ত্র, সেই সঙ্গে ছদ্মবেশে অনেক স্বাধীনতাবিরোধীও অস্ত্র ধারণ করেছিল। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সীমিত। বঙ্গবন্ধুকে এসব বহুমুখী ও জটিল নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো বিশাল ও বন্ধুপ্রতিম দেশের অপার সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেও দ্রুত ভারতীয় সৈন্যদেব ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানানো, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষা করে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও বৈদেশিক সম্পর্ক গড়ে তোলা, বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় ইত্যাদি কাজ ছিল অত্যন্ত জটিল ও নাজুক এক চ্যালেঞ্জ। কিন্তু বঙ্গবন্ধু যে

দ্রুততার সঙ্গে একটি সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে অস্ত্র জমা নেওয়া, ভারতীয় সৈন্যদের ফেরত পাঠানো, পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালি নাগরিক ও সৈন্যদের ফিরিয়ে আনা এবং শুধু বৃহত্তর স্বার্থে নিজের সমস্ত ক্ষোভ ও যন্ত্রণা, মুক্তিযোদ্ধা ও নির্যাতিত অসংখ্য মানুষের ক্ষুব্ধতা ও অভিযোগকে অবধারণ করেও উদারভাবে ক্ষমা প্রদর্শন করলেন পাকিস্তানি সৈন্য এবং স্বাধীনতাবিরোধীদের, তা সত্যিই এক বিরল কৃতিত্ব।

তিনি অনুভব করেছিলেন, প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা, অত্যাচারিত হওয়ার কারণে সৃষ্ট বিদ্বেষ, সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের শক্তি ও চেতনাকে দগ্ধ করতে পারে প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের আগুনে। সমস্ত বিষ পান করে তিনি নীলকণ্ঠ হলেন শুধু একটি স্বপ্নকে লালন করে এবং তা হলো, একটি সমৃদ্ধ সুন্দর সোনার বাংলাদেশ। তাঁর ভবিষৎ দৃষ্টি, স্বপ্ন, ভালোবাসা ও উদারতা অতীতের দুঃখময় স্মৃতি, অত্যাচারিত হওয়ার যন্ত্রণা, পরিলক্ষিত নিষ্ঠুরতা ও প্রতিশোধ নেওয়ার আগুনকে অতিক্রম করে গেল। তিনি অনুভব করেছিলেন বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত, বিভ্রান্ত, ক্ষুব্ধ প্রতিশোধের আগুনে যন্ত্রণাকাতর বাংলাদেশ নয়; অনুপ্রাণিত সুসংগঠিত, শান্তিপ্রিয়, উদার ও মানবিক বাংলাদেশ। স্বাধীনতা-উত্তর মুহূর্তটি ছিল সন্ধিক্ষণ, ফেলে আসা অতীত ও অনাগত ভবিষ্যতের। প্রথমটি যন্ত্রণা, অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির; দ্বিতীয়টি সৃষ্টি, স্বপ্ন ও নির্মাণের। বাংলাদেশের জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন পেছনে তাকানো নয়, সম্মুখদৃষ্টি— এর অর্থ অবশ্য ইতিহাসকে ভুলে যাওয়া নয়; সমস্ত অভিজ্ঞতা ও যন্ত্রণার আগুনকে আত্মস্থ করে এর তাপকে ব্যবহার করা দহনের পরিবর্তে আলোক সৃষ্টির কাজে।

এর প্রতিফলন ঘটেছিল বাংলাদেশের সংবিধান নির্মাণে, উন্নয়ন পরিকল্পনায়, রাজনৈতিক নীতিমালায়— গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও বাঙালি জাতীয়তাবোধকে স্তম্ভরূপে গ্রহণ করার। চিরজীবনই তিনি ক্রমাগত অভিজ্ঞতার আলোকে গতিশীলতায় জনগণকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে অগ্রসর হয়েছিলেন। সাফল্যের ভেতর দিয়েই মাত্র রাজনৈতিক পরিকল্পনা ও মডেলের সাফল্য পরিমাপ্য। বাংলাদেশের যে ছবিকে রূপ দেওয়ার কাজে তিনি মগ্ন ছিলেন তখন তাঁকে হত্যা করা হয়, যেমনভাবে বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসকে খুন করেছিল তার গাণিতিক সমস্যা নিয়ে মগ্নদশায় নির্বোধ রোমান সৈনিক।

জাতীয় ঐক্য ও বঙ্গবন্ধু

রাজনৈতিক সংজ্ঞার্থ ও সীমানা সময়ের সঙ্গে এবং সভ্যতার অগ্রগতির ভেতর দিয়ে রূপান্তরিত ও বিবর্ধিত হয়েছে। রাজনীতির লক্ষ্য নির্ধারণ এবং রাজনীতিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার পেছনে একদিকে কাজ করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্ভাবনী শক্তি, ব্যক্তিত্ব ও দক্ষতা অন্যদিকে কাজ করে জনগণের যৌথ জীবনের আকাঙ্ক্ষা, উপলব্ধি, প্রয়োজনবোধ, কর্মক্ষেত্র ও জীবনযাত্রার ধারা। স্বভাবতই অভিজ্ঞতা, জ্ঞানের বিকাশ, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, বাস্তব ঘটনাপ্রবাহ আমাদের সংঘবদ্ধ জীবনকে প্রভাবিত করে। আমাদের একত্রে বসবাস, যৌথ স্বার্থ, নিরাপত্তা ও অধিকার যখন রাষ্ট্রীয় নীতিমালা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখানে কাজ করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও প্রভাব। আমরা ব্যক্তিজীবনে নানা সমস্যা সমাধানে, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে, সাফল্য অর্জনে, অন্যায়ের প্রতিবাদে ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকি। এ ক্ষেত্রে আমরা কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে দক্ষ, সফল, জ্ঞানী এবং প্রতিষ্ঠিত হতে পারি। অথবা হতে পারি অদক্ষ, ব্যর্থ, অজ্ঞ বা অপ্রতিষ্ঠিত।

এই সাফল্য ও ব্যর্থতার মূলে কাজ করে কতটা নৈপুণ্যের সঙ্গে আমরা প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত নিয়মগুলোকে ব্যবহার করে সুচরম ফসল সংগ্রহ করি নিজের জন্য। ব্যবসা, বাণিজ্য, শিক্ষা, যুদ্ধক্ষেত্র, খেলার মাঠ বা অন্য কোনো পেশার জগতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, দলগত এমনকি সম্প্রদায়গতভাবে সাফল্য অর্জনের যে প্রচেষ্টা তা যতই দক্ষ ও সৎ হোক, অনিবার্যভাবে সংকীর্ণ ও আত্মকেন্দ্রিক। একজন উদার সমাজকর্মীর ক্ষেত্রেও দেখা গেছে তার মমত্ববোধ ও মানবিকতা কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা দলের তাৎক্ষণিক বা অব্যবহিত সমস্যার সমাধানে উদ্দিষ্ট। এ ক্ষেত্রে অনেকগুলো সীমাবদ্ধতা কাজ করে। প্রথমত, এ ক্ষেত্রে সমস্ত কল্যাণচিন্তা ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়ে। সার্বিক ও সাধারণীকৃত সমস্যা নিয়ে কোনো সমাজকর্মীর ভাবার অবকাশ নেই। একজন সমাজকর্মী বা দলীয় নেতা যেহেতু তার নিজস্ব দল ও সমাজকে নিয়েই শুধু ভাবেন; ফলে রাষ্ট্রীয় প্রচলিত নিয়মের সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করে সেসব নিয়মের অনুগত থেকেই সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হন। একজন সমাজকর্মীর কল্যাণচিন্তা, অন্যের জন্য তার সহানুভূতি স্থান ও কালের

হিসাবেও সীমিত হতে বাধ্য। সেদিক থেকে যথার্থ অর্থে একজন রাজনীতিবিদ সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ার কথা। তার ভাবনা রাষ্ট্রবদ্ধ সব মানুষকে নিয়ে। প্রচলিত নিয়মের মধ্যে থেকে কলাকৌশলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল ও রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার লাভ রাজনৈতিক খেলা হতে পারে এবং অনেক ধূর্ত ব্যক্তি এই খেলায় বিজয়ীও হতে পারেন। কিন্তু তাকে যথার্থ রাজনীতিবিদ বলা চলে না।

রাষ্ট্রবদ্ধ সব মানুষের সমন্বিত কল্যাণ সাধনের রাজনৈতিক যে পথ সেখানে পণ্ডিত সেজে, কোনো মতবাদের প্রবক্তা হয়ে, কোনো আধ্যাত্মিক ভাবনা, অন্ধবিশ্বাস বা প্রশ্নাতীত নীতিমালা বা জীবনধারাকে চাপিয়ে দিয়ে নয়, সবাইকে নিয়ে অভিজ্ঞতার আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে ক্রমাগত শুদ্ধতর পথের যে বাস্তব সন্ধান সেটাই যথার্থ রাজনীতির পথ।

কোনো সমাজ, রাজ্য বা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত মানুষকে শোষণ, শাসন ও সুশৃঙ্খল রাখার নানা পদ্ধতি চলে এসেছে দীর্ঘদিন। এই অনুশাসন ও প্রভাব বিস্তারের নানা কৌশলের মধ্যে পেশিশক্তি বা অস্ত্রের ব্যবহার, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, অন্ধবিশ্বাস ও আবেগ, কোনো সংস্কার বা বদ্ধমূল ধারণা ও দলীয় বিদ্বেষের ব্যবহার কাজ করেছে দীর্ঘদিন। এর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ বাস্তববাদী হয়ে নানা শোষণ, বঞ্চনা ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়েছে। কিন্তু এই সংগ্রাম ও প্রতিবাদ সামগ্রিকভা পায়নি ও সুদূরপ্রসারী হয়নি। কারণ, বিক্ষিপ্ত, অসংলগ্ন ও তাৎক্ষণিক হ কারণে একটি সুদূরপ্রসারী দূরলক্ষ্য ও আদর্শ, সবার প্রতিবাদ ও আকাঙ্ক্ষ সুসংবদ্ধ করে একই লয়ে সঞ্চারিত হয়নি।

মানুষের বাস্তব প্রয়োজনবোধ, মৌলিক অধিকার, স্বাধীন চিন্তা, আত্মমর্যাদাবোধ, সাহসিকতা এবং সাংস্কৃতিক চেতনাকে ধাপে ধাপে জাগ্রত ও সঞ্চারিত করে ঐক্যবদ্ধ করার যে পথ তা অত্যন্ত দুর্গম। এখানে কর্মতৎপরতা, সৃষ্টিশীলতা, ত্যাগ, উদারতা ও দূরদৃষ্টি চাই রাজনৈতিক নেতার। নেতিবাচক প্রবণতা যথা সাম্প্রদায়িক ভাবনা, বিদ্বেষ, লোভ, ভীতি, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে মূলধন করে সাময়িকভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যেতে পারে এবং তারই সুযোগে একজন অসৎ, অজ্ঞ, অক্ষম ব্যক্তিও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু সবার মধ্যে ইতিবাচক ভাবনা ও চেতনার সঞ্চারণ একটি শ্রমসাধ্য দীর্ঘমেয়াদি কাজ। এখানে বস্তুনিষ্ঠ চিন্তা চাই; মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, উপলব্ধিগত ও সাংস্কৃতিক চেতনার ক্রমাগত উত্তরণ চাই। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অতিক্রম করে সমগ্র জনগোষ্ঠীর সাধারণ স্বার্থ, পারস্পরিক বিদ্বেষের পরিবর্তে সহানুভূতি ও সহযোগিতার ভেতর দিয়ে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা চাই। সব মানুষের মধ্যে এই রুচিবোধ, উদার ও সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি শুধু তখনই সৃষ্টি হতে পারে যখন তা প্রতিষ্ঠিত ধনাত্মক ভাবনা, বাস্তব অভিজ্ঞতা, প্রকৃত জীবনের উপাদান এবং মানবিক উদার মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত। সবার

অভিজ্ঞতা, প্রত্যাশা, প্রয়োজনবোধ, দক্ষতা ও অভিজ্ঞানকে মূল্য দিয়ে সমন্বিত রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি করতে হলে সেখানে পরিশীলতা চাই, ক্রমাগত উত্তরণ-রূপান্তর চাই, চাই সর্বজনীনতা, আন্তর্জাতিকতা ও সমকালীনতা; কারণ, মানুষের জ্ঞান, প্রয়োজনবোধ ও প্রত্যাশা বিকাশমান। এবং তা যখন সমগ্র জনগোষ্ঠীর জীবনধারাকে ধারণ করে, তখন তা আরো বেশি গতিশীল।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির এই যুগে জনসংখ্যা ও তাদের প্রত্যাশার বিস্ফোরণ যেখানে ঘটছে, তথ্য বিপ্লবের ও যোগাযোগসাধ্যতার এই কালে সমগ্র বিশ্ব যেখানে সংযুক্ত ও প্রভাবিত পারস্পরিকতায়, সেখানে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা ও পশ্চাদমুখিনতার কোনো অবকাশ নেই।

বঙ্গবন্ধু, তাঁর রাজনৈতিক জীবনে কখনোই কোনো মতবাদ বা আদর্শকে বাইরে থেকে আমদানি করে, ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া আদর্শ বা মতবাদকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে, অবাস্তব ভাবনাকে লালন করে অগ্রসর হননি। এসব কথা তথ্য ও যুক্তি দিয়ে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। বাঙালি জাতীয়তাবাদকে উদার, মানবিক, আধুনিক, গতিশীল ও সর্বজনীন এক রূপ দান করেছিলেন তিনি। এবং একটি দরিদ্র, শিক্ষায় পশ্চাৎপদ, নানা সংস্কারে আবদ্ধ, দীর্ঘ শোষণের শিকার হয়ে অবদমিত বাঙালি জাতিকে অসাম্প্রদায়িক, উদার, মানবিক ভাবনা ও গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্দীপিত করে এবং তাদের দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা ঘটিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছেন।

এই সাফল্যই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, এক অমোঘ দৃষ্টান্ত, যা শুধু বাঙালি জাতির জন্য স্মরণীয় নয়, মুক্তিকামী সব দেশের জন্য অনুসরণীয়। লক্ষণীয় যে, তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ক্রমাগতভাবে উত্তরণ লাভ করেছে ধাপে ধাপে। কারণ, সব সময়ই তিনি চলেছেন জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর রাজনৈতিক সম্মুখযাত্রায়। বাংলাদেশের সংবিধান, তাঁর অনুসৃত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, শান্তির পক্ষে, মানবতার কল্যাণে, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক মুক্তির পরিকল্পনায়। স্বাধীনতা-উত্তর তাঁর যে আয়োজন যা নিয়োজিত হয়েছিল তা সফল হতে পারেনি। এক নিষ্ঠুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ভেতর দিয়ে অবসান ঘটেছে তাঁর জীবনের। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত মৃত্যু ও পারিবারিক ট্র্যাজেডির চেয়েও গভীর ও দুর্বিষহ যে বিপর্যয় ঘটেছে বাঙালি জাতির জন্য তা হলো, একটি অপার সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক অভিযাত্রা বাঙালি জাতি শুরু করেছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে, তা মাঝপথে স্তব্ধ হয়ে গেল একটি অসম্পূর্ণ শিল্পকর্মের মতো। সেখানে চলছে কালিমালেপন বঙ্গবন্ধুর সৃষ্ট ভাস্কর্যের ওপর, যার নাম বাংলাদেশ।

নেতৃত্ব যেখানে আদর্শ সৃষ্টির, বল প্রয়োগের নয়

প্রবাদ আছে, কেউ-না-কেউ শাসন করবে। প্রশ্ন হলো, কে শাসন করবে? জড়বস্তু থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং শেষোক্ত শ্রেণীরই শ্রেষ্ঠতম রূপ মানুষ, প্রভাবিত ও পরিচালিত কোনো-না-কোনো শক্তির দ্বারা। জড়বস্তুর ক্ষেত্রে এই শক্তি যান্ত্রিক। এখানেও বৈচিত্র্য আছে; বস্তু তার ভরের জন্য নিজের চারপাশে মহাকর্ষজনিত প্রভাববলয় বা ক্ষেত্র সৃষ্টি করে এবং নিজেই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। মহাবিশ্বের সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র ও গ্যালাক্সি, এমনকি ক্ষুদ্র ধূলিকণা, সবই পারস্পরিক প্রভাবে নানা অবস্থান ও গতি লাভ করেছে মহাকর্ষবলের প্রভাবে। অন্যদিকে বৈদ্যুতিক চার্জ যেখানে উপস্থিত, তার চারপাশে সৃষ্টি হয় তড়িৎক্ষেত্র। বৈদ্যুতিক চার্জ যেমন বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে, তেমনি প্রভাবিত হয় এই ক্ষেত্রের দ্বারা। গতিশীল চার্জযুক্ত বস্তু সৃষ্টি করে চৌম্বকক্ষেত্র এবং একইভাবে প্রভাবিত হয় চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা। ম্যাক্সওয়েল অবশ্য তড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্রকে একীভূত করেছেন এবং এই ক্ষেত্রের বাহক, আমরা এখন জানি, আলোক কণিকা ফোটন। নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউক্লীয় চার্জযুক্ত কণিকা নিউট্রন ও প্রোটনের মধ্যে যে বল কাজ করে তার বাহক মেজন। প্রকৃতিতে প্রভাব সৃষ্টি ও প্রভাবিত হওয়ার যে প্রক্রিয়া, সেখানে অদ্ভুত একটি সাদৃশ্য আমরা লক্ষ করি। কোনো বস্তুর প্রভাব সৃষ্টির যেমন উৎস আছে বিশেষ ধরনের চার্জের কারণে, তেমনি সেই ক্ষেত্রের প্রভাবে তা নিজেও প্রভাবিত হওয়ার বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত। ভৌতজগতে নানাবস্তুর মধ্যে যে টানাপড়েন তা এদের মধ্যে এসব যান্ত্রিক বলের পারস্পরিক প্রভাবেই ঘটে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে এই বস্তুগত প্রভাব ছাড়াও জৈবিক নানা আবেদন ও প্রভাব কাজ করে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও অনন্য গুণ তাকে ভৌত ও জৈব প্রভাবের ঊর্ধ্বে মানবিক এক প্রভাব সৃষ্টির যোগ্যতা দিয়েছে, তা একই সঙ্গে তাকে সংবেদী করেছে মানবিক প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার বৈশিষ্ট্যে। মানবিক এই প্রভাব সৃষ্টির যোগ্যতা ও প্রভাবিত হওয়ার সংবেদিতা মানুষ অর্জন করেছে তার ভাষা, সংস্কৃতি, চেতনা, সৌন্দর্যবুদ্ধি, কল্পনাশক্তি ও যৌক্তিকতায়। এই প্রভাব সৃষ্টির ও প্রভাবিত হওয়ার যে মানবিক প্রভাবক্ষেত্র তা বহুমাত্রিক। শুধু ভরযুক্ত বস্তু কেবল এর ক্ষেত্র কণিকা গ্র্যাভিটন বিনিময় করে; বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত

বস্তু পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করে আনুষঙ্গিক ক্ষেত্র কণিকা ফোটন। কিন্তু একজন সভ্য মানুষ তার সভ্যতা, শিক্ষা ও রুচির বিকাশ লাভের ভেতর দিয়ে নানা উপলব্ধির উপাদান সৃষ্টি করে এবং তারই বিনিময়ে গড়ে ওঠে নানা ধরনের সম্পর্ক। মানুষের বুদ্ধি, চেতনা ও শ্রমের ফসলরূপে যা-কিছু সৃষ্টি হয় এবং যা মানুষ বিনিময় করে পরস্পরের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টিতে তাকে বলতে চাই মানবিক প্রভাবক্ষেত্র।

শ্রম ও নির্মাণকৌশল প্রয়োগে নানা সামগ্রী যে উৎপাদিত হয় এবং এদের বিকিকিনি ও বিনিময় ঘটে পরস্পরের মধ্যে, সেটাই ভিত্তি আমাদের অর্থনৈতিক সম্পর্কের। এটি মানবিক সম্পর্কের একটি বস্তুগত মাত্রা। কিন্তু শিল্পী যখন তার শিল্পকর্ম প্রদর্শন করেন এবং তা কোনো শিল্পানুরাগী অনুধাবন করেন, তখন একটি সৌন্দর্য চেতনার বিনিময় ঘটে। সাহিত্য, সংগীত, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, উদ্ভাবিত যন্ত্র, উত্থাপিত যুক্তি, স্নেহ, ভালোবাসা, প্রেরণা বা সহানুভূতি যা ভাষাকে অবলম্বন করে বা মানবিক কোনো আচরণরূপে অভিব্যক্ত তা সবই মানবিক প্রভাব সৃষ্টির উপাদান। আলোক কণিকা ফোটনের বিনিময় যেমন তড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টির জন্য দায়ী। আমরা ভাবতে পারি মানবিক সম্পর্কের বহুমাত্রিক যে প্রভাববলয় সেখানে বিনিময় ঘটছে মানুষের বুদ্ধি, শ্রম ও সৃষ্টিশীলতার নানা উৎপাদের (Product) পারস্পরিক আদান-প্রদান।

আমরা যাকে সভ্যতা বলি বা সংস্কৃতি, তা আসলে একটি প্রভাবক্ষেত্র যা মানুষ সৃষ্টি করেছে দীর্ঘ সময় ধরে অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে, বুদ্ধির বিকাশে, ভাষার উদ্ভাবনে, যোগাযোগসাধ্যতা অর্জনে ও উন্নত চেতনা লাভের ভেতর দিয়ে। কিন্তু প্রকৃতির অন্যান্য ভৌতবলের উৎস ও এই বল দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার যে ঘটনা আমরা উল্লেখ করেছি, তার সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি ও এর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ঘটনার একটি সাদৃশ্য আমরা টানতে পারি। একমাত্র বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত বস্তুই যেমন শুধু বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়, মানবিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি যারা অর্জন করেছে তারাই শুধু অন্যের মানবিক মূল্যবোধ ও আচরণকে অনুধাবন করতে সক্ষম। শিক্ষা ও সভ্যতার বিকাশ তাই একটি জটিল প্রক্রিয়া। ধাপে-ধাপে অভিজ্ঞতার আলোকে বুদ্ধি, চেতনা ও মূল্যবোধের বিকাশে, সমাজের মানুষগুলো যখন নানা মানবিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, তা একই সঙ্গে প্রভাবিত করার ও প্রভাবিত হওয়ার গুণপ্রাপ্ত হয়। সমাজ বিন্যাসের বিকাশ ও উত্তরণে যাঁরা নেতৃত্ব দেবেন, তাঁদের অবশ্যই মানবিক গুণাবলির ধারক হতে হবে, যা সমাজকে আবিষ্ট করবে সেইসব গুণে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে সৃজনশীল নেতৃত্ব তখনই কাজ করে যখন কোনো রাজনৈতিক নেতা আপন সৃষ্টিশীলতায় জনসাধারণের মধ্যে একটি মূল্যবোধ, চেতনা ও রুচি সৃষ্টি করে, এবং জনগণ অর্জিত সেই রুচি ও চেতনা নিয়ে

নেতৃত্বদানকারীকে সমর্থন করে। এই প্রক্রিয়া সৃষ্টিশীলতার, সামগ্রিক অগ্রগতি ও চেতনা লাভের। কিন্তু মানুষ যেহেতু প্রাণী থেকেই বিবর্তনের ধারায় অভিব্যক্তি লাভ করেছে, তাকে কখনো কখনো উত্তেজিত ও প্রলুব্ধ করা সম্ভব তার মধ্যে সুপ্ত পাশবিক প্রবণতা ও প্রবৃত্তিকে উসকে দিয়ে। বলাবাহুল্য, পাশবিকতা শুধু পাশবিকতাকে উসকে দিতে পারে যান্ত্রিকভাবে; এখানে কোনো সৃজনশীলতা নেই, নেই কোনো সৌন্দর্যবুদ্ধি অথবা দূরদৃষ্টি। যারা যান্ত্রিকতা ও অমানবিক শক্তির প্রভাব বিস্তার করে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় সমাজকে, তারা শুধু ধ্বংস, নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতাকেই প্রশ্রয় দেয় না, সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করে একে পশ্চাদ্‌গামীও করে। দুর্ভাগ্য, এদের নিজেদের মানবিক চেতনা ও মূল্যবোধ নেই বলে মানবিক প্রভাবক্ষেত্র এদের প্রভাবিত করে না, সভ্যতার পথে মানবজাতির অগ্রযাত্রার এটি সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের।

বলা চলে, মানবিক মূল্যবোধবর্জিত মানুষ চেতনাহীন বলেই চেতনাহীন; অর্থাৎ তারা যে মানবতার বহুমাত্রিক প্রভাবক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত নয়, তার কারণ, কোনো মানবিক গুণকে অনুধাবন করতে সেই গুণটির উপস্থিতি চাই। নেতৃত্বের সৃষ্টিশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা সেখানেই প্রভাব সৃষ্টিকারী, যেখানে কোনো নেতা সেই দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী, যার শক্তিতে সে নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে পারে।

বঙ্গবন্ধু : রাজনৈতিক প্রতিভা ও নেতৃত্বের সৌভাগ্যে অনন্য যিনি

আলেকজান্ডার পোপ নিউটন সম্পর্কে যে পঙ্‌ক্তিটি লিখেছিলেন তার অর্থ অনেকটা এমন—

প্রকৃতি ও এর নিয়মগুলো
রেখেছিল ঢেকে রাতের কালো।
বিধাতার ডাকে নিউটন এল
সেই সাথে সব হয়ে গেল আলো।

নিউটনকে শুধু তাঁর সময়ের নয়, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বলা হয়। এটা তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার স্বীকৃতি। তিনি বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার করে আমাদের উপলব্ধির জগৎকে আলোকিত করেছেন, যা নিমজ্জিত ছিল অনবধানতার অন্ধকারে। কিন্তু ল্যাপলেসের কথায় নিউটন শুধু অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না, লাভ করেছিলেন অনন্য সৌভাগ্যও। এর কারণ, বিশ্বজগতের নিয়ম একবারই শুধু আবিষ্কার করা যায়, যার দুর্লভ সৌভাগ্য নিউটন লাভ করেছিলেন।

প্রকৃতির নিয়ম একবারই শুধু আবিষ্কার করা যায় কি-না সে নিয়ে বিতর্ক উঠতে পারে। কিন্তু একটি জাতির সত্যিকার স্বাধীনতা নিঃসন্দেহে একবারই শুধু অর্জিত হয়। শেখ মুজিব আমাদের সেই স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা, স্থপতি ও রূপকার হিসেবে অনন্যসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব। তিনি তাই অনন্য শুধু রাজনৈতিক প্রতিভায় নয়, জাতির পিতারূপে সম্মান লাভের সৌভাগ্যেও। নিউটনের তত্ত্ব আবিষ্কৃত হবার আগে অনেক বিজ্ঞানী বিচ্ছিন্ন নানা উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করেছেন নানা ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে। কিন্তু নিউটনের তত্ত্ব প্রথমবারের মতন রূপবদ্ধ গাণিতিক সূত্ররূপে নানা ঘটনার ব্যাখ্যাকে একীভূত করে এমন এক সাধারণীকৃত সার্বিক উপলব্ধিতে নিয়ে গেল বিশ্বজগৎকে, যেখানে পৃথিবীর যেকোনো ধূলিকণা বা বস্তুখণ্ডের চলাচল আর আকাশের গ্রহদের গতি এক অভিন্ন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল।

প্রকৃতিবিজ্ঞানের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক পার্থক্য আছে যেমন, তেমন মিলও

রয়েছে অনেক। বস্তুত সব সৃজনশীল কাজের মধ্যেই অন্তর্নিহিত যে সাদৃশ্য তার মূলে রয়েছে প্রতিভাবান মানুষের সক্রিয় মন, মননশীলতা, স্বজ্ঞা, দূরদৃষ্টি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা, যা আপাতবিচ্ছিন্ন ঘটনামালার মধ্যে সাযুজ্য আবিষ্কার করে, উদ্ভাবন করে কার্যকারণের নিয়ম এবং তার শুদ্ধ প্রয়োগে উপনীত হয় দূরলক্ষ্যে।

এখানে অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয় অসাধারণ বৈশিষ্ট্যে, যাকে আমরা প্রতিভা বলি। সৃষ্টিশীলতার প্রথম প্রয়োজন হলো পর্যবেক্ষণক্ষমতা। ঘটনা যেমন ঠিক বুদ্ধির তেমন করেই তাকে জানতে হবে দৃষ্টির স্বচ্ছতা ও সততা নিয়ে। এরপর চাই চিন্তা বা মনন, যা আমাদের কাজের, চিত্রকল্পের, ভাবনার ও অনুভবের মূল্যায়ন করতে এবং এদের মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে সক্ষম। তৃতীয়ত সেই কল্পনাশক্তি যা দিয়ে সৃষ্টি করা যায়, রূপান্তর ঘটানো যায় ও উদ্‌ঘাটন করা যায় ঘটনামালার মধ্যে নতুন সম্পর্ক। চতুর্থত চাই উদ্ভাবন, যা উদ্ভাবককে দেয় সম্পূর্ণ অভিনব ও ভিন্ন উপলব্ধি, বিশ্লেষণী শক্তি ও সমস্যা সমাধানের নতুন দৃষ্টি। সবশেষে চাই বিচারক্ষমতা। অর্থাৎ কীভাবে, কখন ও কী পরিমাণে তার যোগ্যতা, দক্ষতা ও শক্তি প্রয়োগ করতে হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সমন্বিতভাবে তার হিসাব।

এই গুণগুলো যখন দক্ষতমভাবে সমন্বিত হয়, তখনই শুধু প্রতিভার প্রকাশ্য রূপ আমরা দেখতে পাই। সৃজনশীল কাজের প্রতিটি ধাপ যেহেতু অভিনব এবং সম্ভাবনার অনিশ্চিত পথ ধরে অগ্রসর হয়, ফলে পুরোনো অভিজ্ঞতার আলোকে অনেক ক্ষেত্রেই তা যাচাইযোগ্য নয়। একমাত্র সাফল্যই সমগ্র সৃজনশীল প্রক্রিয়ার মাপকাঠি। সৃজনশীলতাকে ধারণ করা যায় না একটি সীমিত ও পরিচিত সীমানার মধ্যে। কারণ, এর অভিব্যক্তি প্রবহমান কালের মধ্যে, যা উন্মুক্ত, অপ্রত্যাবর্তী ও সজীব।

সময়ের তীর সম্মুখদিকে ধাবমান। ঐতিহাসিক ঘটনাকে দেখে ও বিশ্লেষণ করে ঘটনা ঘটে যাবার পর। কিন্তু যিনি ইতিহাসের নায়ক, ঘটনার রূপকার, তাঁকে ঘটনার সম্ভাবনাকে উপলব্ধি ও অনুভব করতে হয় ঘটনা ঘটার আগে, অনিশ্চিত পথে। স্বজ্ঞা ও কল্পনাশক্তি তাই প্রতিভাবান নেতৃত্বকে স্বপ্নদ্রষ্টা করে, সাধারণ্যে যা দুর্লভ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতিভা উপলব্ধি করতে হলে একটি সহজ পথ হলো স্বাধীনতা অর্জনের অভিযাত্রায় তাঁর সামগ্রিক আয়োজন ও পরিচালনার সাফল্যকে প্রত্যক্ষ করা। অজ্ঞতা, অদক্ষতা ও অনবধানতা নিয়ে স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রপঞ্চ ঘটনাকে যারা বিকৃতভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস পাচ্ছে কপট পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ সেজে, তারা অনর্থক নিজেদের বঞ্চিত করছে। এর চেয়ে ভালো ছিল এদের জন্য, যদি এরা সহজ দৃষ্টিতে স্বাধীনতার উজ্জ্বল প্রতিভাসকে শুধু অবলোকন করত, অথবা উপভোগ করত স্বাধীনতার সুফলগুলো, যেমনটি এ দেশের বৃক্ষ ও প্রাণীরাও উপভোগ করছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভবের আগে নানা বিচ্ছিন্ন আন্দোলন হয়েছে অধিকার প্রতিষ্ঠার, মুক্তিলাভের ও স্বাধিকার অর্জনের। কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, সংবাদ প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলন, ছয় দফার আন্দোলন—এ সবই ছিল নানা ধাপ অধিকার প্রতিষ্ঠার। আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ নানা পর্যায়ের ভেতর দিয়ে আমরা অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু বাঙালি জাতির সমস্ত শোষণ, বঞ্চনা, পশ্চাৎপদতা ও পরাভব থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ যে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা অর্জন এই উপলব্ধি এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমস্ত আন্দোলনকে সমন্বিত করে সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতাযুদ্ধের আয়োজনে উদ্বুদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করা এক মহৎ কর্ম—শৈল্পিক ও সৃজনশীল, যার অপার মূল্য ও গুরুত্ব পরিমাপ্য শুধু স্বাধীনতাযুদ্ধের সাফল্যে, অর্জিত স্বাধীনতায়।

একটি শিল্পকর্মের সম্পাদনে তুলি, রং, ক্যানভাস সবই প্রয়োজন। সৃজনশীল মনই বিচিত্র সব রঙের বিন্দু ও রেখাকে সমন্বিত করে অর্থপূর্ণ দৃশ্যে। একটি প্রস্তরখণ্ড যে উদ্ভাসিত হয় অপরূপ ভাস্কর্যে, সেখানেও কাজ করে ভাস্করের সৃজনশীল প্রতিভা। একটি সার্থক উপন্যাসের ঘটনামালা যে অর্থপূর্ণ কাহিনির রূপ লাভ করে সেখানেও ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিশীল মন ক্রিয়াশীল। আমাদের স্বাধীনতা বিশাল ক্যানভাসে আঁকা অপরূপ এক শিল্পকর্ম— বিস্ময়কর ও বিপুল এক ভাস্কর। এক রোমাঞ্চকর দীর্ঘ উপন্যাস। লক্ষ প্রাণের মূল্যে, নিযুত মুক্তিযোদ্ধার আত্মোৎসর্গে, কোটি কোটি স্বাধীনতাকামী মানুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা বহুমাত্রিক এক প্রতিভাস। এ জন্য দেশপ্রেমের আলোকিত আভা, সাহসিকতা ও আত্মপ্রত্যয়ের উজ্জ্বল শিখা এবং প্রতিরোধ ও বিজয় অর্জনের উত্তপ্ত মশাল যিনি সমগ্র বাঙালি জাতির হৃদয়ে প্রজ্বলিত করেছিলেন, তাঁর নাম শেখ মুজিব।

বাঙালি জাতির হৃদয়ে যে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি আছে, তাদের উদ্দীপিত ও উদ্ভাসিত করা যে সম্ভব এই সত্য তিনি উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। এটা তাঁর আবিষ্কার। আমাদের সবার হৃদয়ে সুপ্ত সেই দেশপ্রেম ও আত্মমর্যদাবোধের আগুন তিনি প্রজ্বলিত করেছিলেন আপন হৃদয়ের উত্তাপ ও উজ্জ্বলতা দিয়ে।

বাঙালি জাতির জন্য বঙ্গবন্ধুর অবদান কত বড়, কতটা অপরিহার্য ছিলেন তিনি আমাদের জন্য, তার প্রমাণ পাই যখন দেখি, কত স্তিমিত ও অনুজ্জ্বল ছিল আমাদের বাঙালি চেতনা সহস্র বছর ধরে। কেমন করে তাঁর প্রেরণায় স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ভেতর দিয়ে উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হয়েছিল এই জাতি—দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে—অসাম্প্রদায়িক, উদার, মানবিক ও গণতান্ত্রিক চেতনায়। কিন্তু নেতৃত্ব যে কত দায়িত্বপূর্ণ এবং নেতৃত্বের সমগ্র কাজ প্রায় শেষ করার পরও তাঁর অনুপস্থিতি যে কত বড় ক্ষতি ডেকে আনতে পারে, তার প্রমাণ মেলে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর নেমে আসা অন্ধকার প্রত্যক্ষ করে।

মুক্তিযুদ্ধে সুন্দরবনের বাঘের তেজস্বিতা নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেছে, তারাই কেমন নর্দমার ইঁদুরের মতন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে অন্ধকারে। যে ভাষার জন্য, যে সত্য উচ্চারণের জন্য, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছে বুদ্ধিজীবী ও তরুণ ছাত্ররা, তাদের মুখে ও লেখনীতে কোনো প্রতিবাদ নেই। যেন ভাষাহীন একটি জাতি, যেন ভাষা শুধু দালালি ও মিথ্যাচারের জন্য। অসাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, অর্থনৈতিক বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রতিজ্ঞা মুদ্রিত করে যে অসাধারণ উজ্জ্বল এক সংবিধান রচনা করল স্বাধীন বাংলাদেশ, কী আশ্চর্য অন্ধকারে এর সমস্ত মূলনীতিই হারিয়ে গেল একটি মানুষের মৃত্যুতে। আকাশের কোনো নক্ষত্রই কি এত উজ্জ্বল, যা নিভে গেলে আকাশসুদ্ধ অন্ধকার হয়ে যায়? যে বাঙালি জাতির নাগরিকত্বের পরিচয় ঘটেছিল বাঙালিরূপে—তার ভাষা তার সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে তার জাতীয় চেতনায়, সেই মানুষগুলো তাদের বুদ্ধিগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয় হারিয়ে রাতারাতি বাংলাদেশী হয়ে গেল, যেমনটি ঘটে ব্যবহৃত সামগ্রী যেমন আসবাবপত্র, কাপড় বা জুতোর বেলায়—এদের উৎপাদন উৎসের পরিচয়ে।

এই শব্দ পরিবর্তন কোনো নিরীহ ব্যাকরণের ব্যাপার নয়। প্রতিটি শব্দ এর অর্থ অর্জন করে ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে, এক সজীব মিথস্ক্রিয়ায়। ভারী পরমাণুগুলো যেমন সৃষ্টি হয় অতিকায় নক্ষত্রের প্রচণ্ড উত্তপ্ত গহ্বরে, আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের দুর্বিষহ যন্ত্রণা ও তীব্র সব উপলব্ধির আবহে তেমনি সৃষ্টি হয়েছে নতুন কিছু শব্দ অথবা সংযোজিত হয়েছে গভীর কোনো অর্থ পুরোনো শব্দে। আমরা আগেও বাঙালি ছিলাম। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিদহন, জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের গভীর চেতনায় অবগাহন করে এই শব্দটি নতুন এক অর্থ পরিগ্রহ করেছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার সঙ্গে অবলুপ্তি ঘটাবার প্রয়াস চলেছে একগুচ্ছ উজ্জ্বল শব্দের, যেমন—জয় বাংলা, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ বেতার, জাতীয় মুক্তি, ঐতিহাসিক সংগ্রাম, ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি ইত্যাদি। অথচ এই শব্দগুলো উদ্ভাসিত হয়েছে স্বাধীনতাযুদ্ধের চেতনায় প্রদীপ্ত হয়ে।

বিমূর্ত শব্দের ওপর এই আগ্রাসন কোনো কাকতলীয় ঘটনা নয়, গভীর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। স্বাধীনতার চেতনার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর জীবন, এমনকি তাঁর স্মৃতির বিমূর্ত অস্তিত্ব কেমন গভীরভাবে যুক্ত, শুধু স্বাধীনতার সপক্ষের মানুষের হৃদয়েই নয়, স্বাধীনতাবিরোধীদের ভাবনায়ও, তার প্রমাণ মেলে বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতাবিরোধীদের আচরণে।

স্বাধীনতা অর্জনে শেখ মুজিবের নেতৃত্ব নিয়ে যারা প্রশ্ন উত্থাপন করে, তারা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং ষড়যন্ত্রমূলক রাজনৈতিক কুটিলতা থেকেই তা করে। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে এবং বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরবর্তী সময়ে এরা যে আচরণ করেছে এবং যেসব ঘটনা ঘটিয়েছে, তা বিশ্লেষণ করলেই

এই উক্তির সত্যতা সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে। কিন্তু সেই অপেক্ষাকৃত স্থূল ও সহজ প্রমাণটি উপস্থাপনের আগে একটি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়োজন।

শেখ মুজিব স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা, এর রূপকার ও প্রকৌশলী। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। জাতির পিতারূপে তাঁকে জাতি সম্ভাষণ ও সম্মান করেছে। আমাদের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাসের এই সরল সত্যকে যারা অস্বীকার করছে, তারা কেন তা করছে? তাদের দুরভিসন্ধিটা কী? তাদের উদ্দেশ্য অর্জনে কী কৌশল তারা অবলম্বন করছে? এসব প্রশ্নের বিশ্লেষণ ও জবাব খুঁজতে হবে।

প্রশ্ন উঠেছে যে, স্বাধীনতা কি শেখ মুজিব এনেছেন? তিনি কি একা স্বাধীনতা এনেছেন? স্বাধীনতার জন্য বাঙালি জাতির বিপুল আত্মত্যাগ, অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী মানুষের ভিড়ে বঙ্গবন্ধুকে পৃথক করে দেখার কি সুযোগ আছে? শেখ মুজিব কি বাঙালি জাতির স্বাধীনতার ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন? অথবা আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস তাঁকে সৃষ্টি করেছে? স্বভাবতই প্রশ্নগুলো একই দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই করছে না।

যারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকেছে মুক্তিযুদ্ধের সময়, হত্যা করেছে অসংখ্য বুদ্ধিজীবী ও নিরীহ মানুষকে, শুধু তারা স্বাধীনতার সপক্ষের লোক বলে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভবকে যারা তাদের পরম পরাজয় বলে জেনেছে, তারা চেতনায় বাঙালি না হোক, তাদের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য বাংলাদেশি হয়ে বাংলাদেশেই রয়ে গেছে। এটা তাদের জন্য দুর্ভাগ্য যে, গভীর মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে তাদেরকে এই বাংলাদেশেই থাকতে হচ্ছে। এটা আমাদেরও দুর্ভাগ্য যে, যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ তা দেড় হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। ফলে পাকিস্তানিরা যেখানে পরাজিত হয়ে বাংলাদেশ ছেড়েছে, পাকিস্তানিমনা স্বাধীনতাবিরোধীরা সে দেশে গৃহীত না হয়ে অথবা বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত না হয়ে বাংলাদেশেই রয়ে গেছে। ব্যাপারটা অনেকটা অস্ত্রোপচারের পর বিষাক্ত রক্তপুঁজ বের করে দেহের মধ্যেই রেখে দেওয়ার মতন। এমন সাধারণত হয় না। কারণ পরাজিত শত্রু সব সময়েই দেশ ছেড়ে চলে যায় এবং একই সঙ্গে বিজয়ী দেশ শত্রু ও শত্রুতামুক্ত হতে পারে, অন্তত আপন এলাকায়। বাংলাদেশে এটা ঘটেনি বলেই মায়ের কোলে চড়ে মায়ের মুখমণ্ডলে নখর বসাবার সুযোগ স্বাধীনতাবিরোধীদের রয়ে গেছে।

বাংলাদেশে থেকে যাওয়া স্বাধীনতাবিরোধীদের একমাত্র পথ হলো, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে অস্বীকার করা। যত তীব্র মনোযন্ত্রণা নিয়ে এরা বাংলাদেশের উদ্ভবকে অস্বীকার করতে চায়, ততটা তীব্রভাবেই এরা বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করতে প্রয়াস পাচ্ছে। বস্তুত, পক্ষান্তরে এরা বঙ্গবন্ধুকে জাতির

পিতারূপে অবচেতনায় গ্রহণ করছে এক গভীর অর্থে—একই সঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশের আদর্শ ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে সমান শত্রুতায় বিরোধিতা করার ভেতর দিয়ে।

প্রত্যক্ষভাবে বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার না করে, পরোক্ষভাবে কৌশলে বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা করে এমন আরেকটি শ্রেণী আছে। এদের কৌশলটি হলো, তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সেজে পণ্ডিতম্মন্যতায় বিতর্কের কুয়াশা সৃষ্টি করা এবং সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা। যা সহজ সত্যকে পাশ কাটিয়ে বঙ্কিম পথে দুরভিসন্ধিমূলকভাবে অভীষ্ট ভ্রান্ত ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চলে এ ক্ষেত্রে। যেমন, শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু বা জাতির পিতা বলা সঠিক কি না, তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি কি না, তিনি স্বাধীনতা অর্জনে মূল নেতৃত্ব দিয়েছেন কি না—এসব প্রশ্ন সরাসরি উত্থাপন না করে, যে প্রশ্ন এরা উত্থাপন করে তা হলো, স্বাধীনতা লাভের জন্য নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে কি? স্বাধীনতাযুদ্ধ করেছে সাধারণ মানুষ এবং সেটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটেছে। এর জন্য কাউকে বিশেষভাবে কৃতিত্ব দেয়া অর্থহীন। আসলে এটি একটি পুরোনো দার্শনিক বিতর্কের বিষয় যে, নেতৃত্বের কোনো মূল্য বা গুরুত্ব আছে কি নেই।

নেতৃত্বের মূল স্বীকার্য বা বিশ্বাস হলো বড় ধরনের সমষ্টিগত কাজে যথা—সামাজিক রূপান্তরে, রাজনৈতিক বিপ্লব সাধনে বা দেশের স্বাধীনতা অর্জনে নেতৃত্বের গুরুত্ব অপার। নেতৃত্ব হচ্ছে সেই নতুন ধারণা ও প্রেরণার উৎসদাতা, যিনি জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালনা করে নিয়ে যেতে পারেন সাফল্যের পরাকাষ্ঠায়, সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে। এই ধারণা অনুসারে নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস সৃষ্টিতে। বলা বাহুল্য, নেতৃত্বের এই ধারণা ও ব্যক্তিমানুষের গুরুত্ব সম্পর্কে সবাই একমত নন। সনাতন কাল থেকে এখন পর্যন্ত এই বিতর্কটি অমীমাংসিতভাবে চলে আসছে যে, ব্যক্তি কি ইতিহাসকে সৃষ্টি করে অথবা ইতিহাস ব্যক্তিকে?

অনেক বিখ্যাত চিন্তাবিদ ব্যক্তিমানুষকে বিবেচনা করেছেন নিছক দাবার গুটি হিসেবে, যাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে বৃহৎ কোনো শক্তি। এই শক্তির উৎসকে কখনো মনে করা হতো ঐশ্বরিক, যেমন প্রাচীন গ্রিকরা মনে করত দেবতাদের আশ্রয় অলিম্পাস পাহাড়কে। কখনো বা একটি জাতি বা শ্রেণী নিজেদের সৌভাগ্যবান ও শাসকরূপে ভাবত সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধিরূপে। রাজতন্ত্রের এই মূল দর্শন দুর্বল হয়ে যাবার পর বিমূর্ত নানা শক্তির ধারণা সৃষ্টি হয়েছে ব্যক্তিমানুষকে এসব শক্তির ক্রীড়নকরূপে ব্যাখ্যা করতে। প্রগতি, ডায়ালেকটিক, সাধারণের ইচ্ছা, সময়ের ডাক—এমনকি ইতিহাসকেও উপস্থাপন করা হয় সেই বিশাল শক্তিরূপে, যার প্রভাবে ব্যক্তিমানুষ পুতুল মাত্র।

ইতিহাসের অনিবার্যতার একজন বড় প্রবক্তা টলস্টয় তাঁর War and peace উপন্যাসে দেখিয়েছেন, সমস্ত ইউরোপে মানুষ কেমন পাগলের মতন ছোটাছুটি করছে, প্রাণ দিচ্ছে ও নিজেদের লোককে হত্যা করছে, সমস্ত মানবিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে। যুদ্ধ কেন হয়? এ প্রশ্নের উত্তরে টলস্টয় বলছেন, যুদ্ধ ঘটাটা অনিবার্য ছিল, কারণ তা অনিবার্য। তাঁর মতে, ইতিহাসেরই অনিবার্যতা হলো যুদ্ধ। মহৎ মানুষ হচ্ছে এক-একটি লেবেল মাত্র, যা একটি পরিণতির নামকরণরূপে এঁটে দেওয়া হয় ঘটনার পর। ব্যক্তিমানুষের অবদানকে অস্বীকার করে ইতিহাসের অনিবার্যতা যারা প্রচার করেন, তাঁরা নানাভাবে তা করেন।

মার্ক্সবাদে এই অনিবার্যতা হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রাম। অর্নোল্ড টয়েনবি অনিবার্যতা খুঁজেছেন সভ্যতার উত্থান ও পতনে। অধুনা মুক্তবাজার হয়ে উঠছে সেই অনিবার্যতা। অনিবার্যতার নীতি সঠিক না ভুল সে বিতর্কে না গিয়েও আমরা বুঝতে পারি, এটা মেনে নিলে মানুষের স্বাধীনতা বলে কিছু থাকে না। আমাদের উচ্চারিত প্রতিটি বাক্য, আমাদের প্রতিটি সিদ্ধান্ত আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অতীত হয়ে যায়। সেই কারণে আমাদের কোনো কাজের জন্য নিজস্ব কোনো দায়িত্বও থাকে না। উইলিয়াম জেমস প্রশ্ন রেখেছেন, শেক্সপিয়রের ১৫৬৪ সালের ২০ এপ্রিল স্ট্যাটফোর্ড আপন অ্যাভনে জন্মগ্রহণ কি সামাজিক ঘটনাপ্রবাহের চাপে এমনি অবশ্যম্ভাবী ছিল যে, যদি শিশুকালে তাঁর মৃত্যু ঘটত আর একজন শেক্সপিয়র সেই বিশেষ মানসিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনিবার্যভাবে জন্মগ্রহণ করত? আমরা কি একই কথা বলতে পারি আব্রাহাম লিঙ্কন, চার্চিল বা হিটলার সম্পর্কে? এরা সবাই কি ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহের সৃষ্টি? এঁদের আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে এদের মতন আর কেউ কি প্রতিস্থাপিত হতেন এঁদের স্থলে? নেতৃত্বের প্রভাব ছাড়া সমাজের মানুষ নিজে নিজেই অনিবার্যভাবে পূর্বনির্ধারিতভাবে আচরণ করে, এমন অদৃষ্টবাদে আমাদের মন কখনোই সাড়া দেয় না। নেতৃত্ব ভালো হোক বা মন্দ হোক, আমাদের সভ্যতার যাত্রা পথে গুরুত্বপূর্ণ বাঁকগুলো তাঁদের প্রভাবেই সৃষ্টি হয়েছে।

সভ্যতার অগ্রগতির মূলে যে প্রক্রিয়া কাজ করে তা হলো—সমাজের বৃহৎ অংশ শুধু অনুকরণ করে, ছোট-বড় কতকগুলো উদ্ভাবন, যা নির্বাচিত কয়েকজন প্রতিভাবান মানুষ প্রথমে ঘটায়। ঃ

অনেকে একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোকে গন্ডগোলের সময় বলে বর্ণনা করে। যেন নামহীন, উদ্দেশ্যহীন কিছু মানুষের এলোমেলো ভাবনা, উত্তেজনা, ক্ষুব্ধতা ও লক্ষ্যহীন মৃত্যুর ভেতর দিয়ে হঠাৎ করে দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। স্বাধীনতা যে সুদূরপ্রসারী, পরিব্যাপ্ত এক অনন্য প্রতিভাস, যেখানে, অসংখ্য চেতনাদগ্ধ মানুষের স্বপ্ন ও আত্মবিসর্জন এক অভিন্ন দূর লক্ষ্যে সমন্বিত হয়ে সৃষ্টি করেছে নতুন বিন্যাস এবং এই সামগ্রিক রূপান্তর ও দশা পরিবর্তনে যে উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতা কাজ করেছে, তার উপলব্ধিও একটি আবিষ্কার।

তৃণভোজী নির্বোধ পশুদের কাছে ফুলের বাগান আর আগাছার তৃণক্ষেত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, দুই-ই এদের উদরপূর্তির উৎসরূপে ব্যবহৃত চারণক্ষেত্র। স্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্নিহিত শৈল্পিক রূপকে অবধারণ করতে হলে, একে নির্মাণের আড়ালে যে স্বপ্ন ছিল, যে সৌন্দর্যবুদ্ধি, প্রতিজ্ঞা, প্রত্যয়, ত্যাগ, উদার মানবিকতা ও শিল্পীর নির্মাণকুশলতা, তা আবিষ্কার করতে হবে। এই উপাদানগুলো ধারণ করা আছে আমাদের জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করার ঘটনাপ্রবাহে, স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রস্তুতি ও বিজয় লাভের ইতিহাসে, স্বাধীন বাংলাদেশের বাণীবদ্ধ স্বপ্নের দলিলরূপে প্রথম রচিত আমাদের সংবিধানে।

জাতীয়তাবোধের জাগরণে, অন্যায়ের প্রতিরোধে, অধিকার অর্জনের সংগ্রামে, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার ও দেশকে ভালোবাসার প্রেরণা লাভে কোনো নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল না বলে যারা বলে, তারা আসলে স্বাধীন বাংলাদেশের শিল্পী বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করতেই শুধু তা করে না, তারা স্বাধীনতাসংগ্রামের ঐক্যবদ্ধ আয়োজনকে অস্বীকার করতে চায় এর নেতৃত্বকে অস্বীকার করে, সেই সঙ্গে বাংলাদেশকেও।

কোনো নেতা, কোনো প্রতিভাবান ব্যক্তিই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান নয়। বিশেষ করে রাজনীতির ক্ষেত্রে যারা প্রতিভাবান ও সৃষ্টিশীল ব্যক্তি, তাদের কাজ করতে হয় দ্রুত পরিবর্তনশীল বহুমাত্রিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে, অসংখ্য মানুষের ভাবনা, বিশ্বাস ও প্রত্যাশাকে উপলব্ধি করে। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হয়। ভীরুতা, কুসংস্কার পুরোনো বিশ্বাস, দারিদ্র্য ও অশিক্ষা একত্রে মিলে যখন একটি জাতিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে প্রচণ্ড জড়তায়, তখন সেই জাতিকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হওয়া এক দুঃসাধ্য কাজ।

অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ একটি দেশে একজন প্রতিভাবান শিল্পী, একজন বিখ্যাত কবি বা বিজ্ঞানীর উদ্ভব যত দুর্লভ, তার চেয়েও অনেক বেশি দুর্লভ হলো একজন প্রতিভাবান সম্মুখদৃষ্টিসম্পন্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতার উদ্ভব। এবং আরো বেশি দুর্লভ সম্ভাবনার হলো তাঁর পক্ষে সাফল্য অর্জন। গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব হচ্ছে গতিশীলভাবে স্বাধীনতার পরিবেশে সমগ্র জাতিকে উন্নততর রাজনৈতিক জীবনধারায় নিয়ে যাবার পথ উদ্ভাবন এবং সবাইকে নিয়ে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া। এটি একটি সৃজনশীল কাজ। কিন্তু এই রাজনৈতিক সৃজনশীলতা একজন বিজ্ঞানী বা শিল্পীর সৃজনশীলতা থেকে কিছুটা ভিন্ন।

একজন শিল্পী বা বিজ্ঞানী তাঁর উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের জন্য আপন গতিতে চলতে পারেন। এদের জন্য সময়ের তাড়াটা বাইরে থেকে নয়, নিজস্ব সৃষ্টি। ফলে, তাঁরা দীর্ঘ সময় নিয়ে সমস্ত আয়োজন শেষ করে তাঁদের কাজকে সম্পন্ন করতে পারেন। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে সময়ের তাড়া প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। অনেক

ক্ষেত্রেই অসম্পন্ন প্রস্তুতি ও অপর্যাপ্ত তথ্য নিয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় স্বজ্ঞা ও অনুমানের ভিত্তিতে, ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে। একজন বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদ কোনো তত্ত্বকে প্রয়োগ করেন, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ভেতর দিয়ে তত্ত্বটি প্রমাণিত হবার পর। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও অভিজ্ঞতাই হচ্ছে সমস্যাকে বিশ্লেষণ ও তার সমাধান অর্জনের দক্ষতা লাভের পথ। কিন্তু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সেই সময় না-ও মিলতে পারে।

রাজনীতিজ্ঞের এই স্থান-কালের সংকট ছাড়াও আরো একটি সমস্যা রয়েছে, এবং তা হলো—জনগণকে বুঝিয়ে তাদেরকে সমর্থনে এনে, তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এ জন্য সময়, শ্রম ও দক্ষতা চাই এবং জনগণের মন জয় করবার মতন ব্যক্তিত্ব।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো পুরোনো ঐতিহ্য, জড়তা, কুসংস্কার, গোঁড়ামি পশ্চাৎপদতা, সাম্প্রদায়িক ভাবনা ও সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি থেকে সমগ্র জাতিকে মুক্ত করে, তাঁদের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা এবং তাঁদের সমর্থন নিয়ে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করা। কিন্তু প্রায়শ যা ঘটে তা হলো, প্রগতির উজান পথে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হবার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করে রাজনৈতিক নেতারা পশ্চাৎপদতা, সাম্প্রদায়িকতা ও কুসংস্কারের অপশক্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে জনগণকে বিহ্বল, আবেগতাড়িত ও বিভ্রান্ত করে। এবং সেই ঘোলা জলের অধোগামী স্রোতে নির্বাচনের বৈতরণী পার হতে প্রয়াস পায়।

পুরোনো ধারাকে প্রশ্রয় দেয়া অনেক সহজ। সভ্যতার সিঁড়ি বেয়ে প্রতিটি মানুষ সম্মুখের উচ্চতর স্তরে পৌছাবার কথা। পশ্চাৎপদ জাতিকে বড় আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা, দেশপ্রেম, পারস্পরিক ভালোবাসা, উদার মানবিক চেতনা, আত্মত্যাগের স্পৃহা ও সাহসিকতায় অনুপ্রাণিত করার কাজটি ঘটতে পারে প্রগতিশীল আদর্শ রাজনীতিজ্ঞের নেতৃত্বে। একজন প্রতিভাবান প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতাকে তিনটি কাজ তাই সার্থকভাবে সম্পাদন করতে হয়। প্রথমত সৃজনশীলভাবে নতুন আদর্শ, নতুন জীবনধারা ও মূল্যবোধ উদ্ভাবন করতে হয়। এ জন্য মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি চাই। দ্বিতীয়ত জনগণকে এই নতুন আদর্শ ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হয়, রূপান্তরিত করতে হয়, দীক্ষিত করতে হয় এবং এদেরকে অন্তত সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নিয়ে যেতে হয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। এ জন্য মানুষের হৃদয় জয় করার মতন অন্তর্দৃষ্টি চাই, তাদের জন্য ভালোবাসা চাই এবং আত্মত্যাগ। তৃতীয়ত পুরোনো ধ্যান-ধারণা, প্রচলিত জীবনধারা, দীর্ঘদিন ধরে অনুশীলিত রীতিনীতি ও সুসংস্কারের জড়তা কাটিয়ে, কায়েমি স্বার্থান্বেষীদের ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে নতুন আদর্শ ও জীবনধারাকে প্রতিষ্ঠিত করা। এতগুলো কাজকে সার্থকভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ও স্থানিক সীমানায় সমন্বিত করতে হলে অনন্য ব্যক্তিত্ব চাই, যাকে আমি নেতৃত্ব বলছি।

এই নেতৃত্ব অপরিহার্য ও দুর্লভ এই জন্য যে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমগ্র সমাজ দীর্ঘদিনের জড়তা কাটিয়ে নতুন স্বপ্নে জেগে উঠবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে আত্মত্যাগের পথ ধরে একত্রে সম্মুখদিকে অগ্রসর হবে, এটা অসম্ভব। যারা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব অস্বীকার করে স্বাধীনতা অর্জনের সমগ্র আয়োজনকে স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার বলতে চায়, তারা হয় অজ্ঞতায় অথবা দুরভিসন্ধি থেকে তা করে।

গণতন্ত্রে যে উদ্ভাবন তা রাজনৈতিক নেতাকে সৃজনশীলতায় আবিষ্কার করলেই হবে না, তাকে তা অন্যদের বোঝাতে হবে। শিল্পী বা বিজ্ঞানী যখন কিছু উদ্ভাবন করেন, তখন তাঁর প্রধান ও প্রথম দায়িত্ব নিজে নিশ্চিত হওয়া এর সঠিকতা সম্পর্কে। জনসমর্থন নিয়ে শিল্প ও বিজ্ঞানের আবিষ্কার যাচাই হয় না বলে, শিল্পী ও বিজ্ঞানী অনেক বেশি স্বাধীনতা লাভ করেন তার সৃজনশীল কাজে। জনসমর্থন লাভের জন্য যারা পুরোনো ব্যবস্থা ও সংস্কারকে ধরে রাখে রক্ষণশীলতায়, ধর্মীয় মাদকতা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বা সহজ কোনো লোক-খ্যাপানো জিগির তুলে শুধু দল সৃষ্টি করে আপন স্বার্থে ব্যবহারের জন্য, তারা আসলে মানুষের দুর্বলতা, জড়তা ও সুপ্ত পাশবিক প্রবৃত্তিগুলো উসকে দিতে প্রয়াস পাচ্ছে। এরা গণতান্ত্রিক ধারার একটি শর্তকে হীনস্বার্থে অপব্যবহার করছে এবং তা হলো, ছলেবলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন। নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা এবং উদারনৈতিক মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করার চেয়ে কুসংস্কার, আবেগ, ভীতি, সন্দেহ ও বিদ্বেষকে প্রশ্রয় দেয়া যেহেতু সহজ, এই পথই তারা অবলম্বন করে।

নতুন ধারণা ও আদর্শের প্রবক্তা যাঁরা তাঁদের কাছে কোনো পুরোনো দৃষ্টান্ত থাকে না প্রমাণ হিসেবে। এখানে বিমূর্ত যুক্তি ও স্বজ্ঞা এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন শুধু কাজ করে। পুরোনো মূল্যবোধ ও অনুশীলিত জীবনধারা যেহেতু কায়েমি স্বার্থের অনুকূলে কাজ করে, এবং নতুনকে সবাই সন্দেহের চোখে দেখে। এ জন্যই একজন প্রগতিশীল, মানবিক, সৃজনশীল রাজনৈতিক নেতার সাফল্য অর্জন অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। যারা রুগ্‌ণদের নিয়ে দল সৃষ্টি করে, তারা সহজেই সংখ্যাধিক্যের সমর্থন পায় কিন্তু যারা উন্নততর, সুস্থতর মানসিক স্তরে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এগোতে চায়, তাঁদের পথ দুর্গম ও দুর্লভ। কারণ আমরা জানি ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।

সংখ্যাগরিষ্ঠকে বুঝিয়ে নতুন উদ্ভাবনকে তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করার যে দুঃসাধ্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, সেখানে পুরোনো ধারা ও পশ্চাৎমুখী চিন্তার পরাভব ঘটিয়ে পরিবর্তিত মূল্যবোধ ও জীবনধারায় উন্নত যে রুচি সৃষ্টি করে জনসাধারণ্যে, তার আলোকেই প্রগতিশীল নেতার মূল্য ও সাফল্য যাচাই হবার।

অনেক বিপ্লব-সমর্থক দার্শনিক, এমনকি গণতন্ত্রের প্রবক্তা, নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ছোট করে দেখতে প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন, জন লক বিপ্লব ঘটার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, কোনো সরকার বা রাষ্ট্রীয়

ব্যবস্থা যখন বৈপ্লবিক আন্দোলন দ্বারা ভেঙে পড়ে, সেই আন্দোলন হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমস্ত মানুষের জ্বলে ওঠার দ্বারা। সেখানে কোনো নেতৃত্ব প্রয়োজন নেই।

কিন্তু বিপ্লব ঘটে যাওয়াটাই কি রাজনৈতিক আন্দোলনের বড় কথা? একটি সার্থক উপন্যাসের বা নাটকের জন্য যেমন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এর পরিসমাপ্তি, ঠিক তেমনটি সত্যি বিপ্লবের ক্ষেত্রেও। বিপ্লবের বেলায় পরিসমাপ্তি তখনই সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ঘটতে পারে, যদি এর সূচনাতেই একটি পরিকল্পনা কাজ করে। একটি দূরলক্ষ্য, একটি সচেতন ভাবনা যদি সমস্ত ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ একটি সার্থক বিপ্লব আসলে ততটা বিশৃঙ্খল ব্যাপার নয়, যতটা আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। আর এ জন্যে বিপ্লবের জন্যও নেতৃত্ব চাই।

গণতন্ত্রের প্রবক্তারাও যে নেতৃত্বের গুরুত্বকে ছোট করে দেখতে চান, সেটাও গণতন্ত্র সম্পর্কে তাদের একটি বদ্ধমূল একপেশে ধারণা থেকে। এটা তাদের আদর্শ ও আবেগের পরিপন্থী যে, একজন নেতা অন্য সবার চেয়ে ভিন্ন বা বিশেষ হবেন। তাদের অনেকের ধারণা, নেতৃত্বের মহত্ত্ব গণতান্ত্রিক আদর্শ ও তত্ত্বকে দুর্বল করে দেয় এবং তা প্রতিক্রিয়াশীলদের একনায়কত্বকে সমর্থন করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে একনায়কত্ব নেই। কারণ, এখানে নেতা জনগণের ভেতর থেকেই উঠে আসে। এখানে যে আভিজাত্য তা বংশগত নয়, এর উৎস অস্ত্র বা পেশিশক্তি নয়, প্রতিভা ও নৈতিক উৎকর্ষ। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যে নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটে, সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভের ভেতর দিয়ে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা যেমন সংরক্ষিত হয়, তেমনি সমাজের সাংস্কৃতিক বুননও বজায় থাকে।

একমত হতে হলে একটি অভিমত ও আদর্শ চাই। লক্ষ্যহীনভাবে বিচার-বুদ্ধিহীন অভিন্নতা নিয়ে দল পাকানো নিশ্চয়ই ঐক্য সৃষ্টি নয়। এই অভিমত সৃষ্টি ও সবার সমর্থন নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাজনৈতিক নেতার। বঙ্গবন্ধু বংশগত পরিচয়ে বা সামরিক শক্তি বলে নেতা হননি। জাতীয়তাবোধের চেতনা, মানবিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং অসাম্প্রদায়িক উদার জীবনদর্শনকে লালন করে এবং তা সবার মধ্যে সঞ্চারিত করে নেতৃত্ব লাভ করেছেন।

ইতিহাস তাঁকে সৃষ্টি করেছে অথবা তিনি ইতিহাসকে—এ প্রশ্নের জবাবে শুধু বলতে পারি, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ও সময়ের বিশেষত্বের মধ্যে অবশ্যই একটি সমীকরণ আছে। সব প্রতিভাই সব সময় বিকাশ লাভ করে না, সাফল্যের পূর্ণতায়। এখানে একটি অনিশ্চিত সম্ভাবনার নিয়ম কাজ করে। এই অনিশ্চয়তাকেই ভাগ্য বলতে পারি, যে অর্থে বঙ্গবন্ধুকে ভাগ্যবান বলেছি, জাতির পিতা হবার অনন্য সৌভাগ্য লাভের জন্য। কারণ, তাঁর ভাবনা, চেতনা ও প্রতিভা পরিবেশকে তাঁর অনুকূলে আনা সম্ভব করেছে। স্বাধীনতা অর্জনের দুর্লভ ও অনন্য ঘটনাটি তিনি ঘটাতে

পেরেছেন। সেখানে অবশ্যই তিনি একা নন। প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা, দেশপ্রেমিক অবদান রেখেছেন স্বাধীনতা অর্জনে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কৃতিত্ব হলো এদেরকে ঐক্যবদ্ধ, সমন্বিত ও অনুপ্রাণিত করা।

স্বাধীনতার জন্য বাঙালি জাতির যে গভীর আত্মত্যাগ, যে সংঘবদ্ধ প্রতিজ্ঞা, যে অভূতপূর্ব দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ, তা বাঙালি জাতিকে আত্মমর্যাদাবোধ ও সাহসিকতার চরম পরাকাষ্ঠায় নিয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশকে যদি বঙ্গোপসাগর ভাবি, এবং এর জনগণকে বিপুল জলরাশি, স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রস্তুতি ছিল সেই প্রলংকরী উচ্চতম ঊর্মি, যা আমাদেরকে নিয়ে গিয়েছিল বাঙালি চেতনায় পরম উৎকর্ষে। এই ঢেউয়ের চূড়াকে আমরা অনুভব করেছি তার বজ্রকণ্ঠ বাণীতে—এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি হয় সমুদ্রপৃষ্ঠে আপতিত সূর্যরশ্মি ও বাতাসের গতিকে সঞ্চিত ও অভিসারী করে, যা পানিকে টেনে তোলে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে। আমাদের চেতনাও তেমনি বিশাল এক ঢেউয়ের রূপ পরিগ্রহ করেছিল, সমগ্র দেশজুড়ে দীর্ঘ সময় ধরে সংগ্রামরত মানুষের দেশপ্রেমের শক্তিকে সঞ্চিত ও অভিসারী করে। একাত্তরের সাতই মার্চের বক্তৃতা ছিল সেই উত্তাল তরঙ্গের বাণীরূপ প্রকাশ। একমাত্র আব্রাহাম লিঙ্কনের গেটিসবার্গ বক্তৃতার মতোই একটি দুর্লভ মুহূর্তের সমগ্র জরুরি আবেদনকে উপলব্ধি করে, গভীর এক দায়িত্ব ও আনুষ ঝুঁকি ও বিপদকে অনুধাবন করে সুদূরপ্রসারী এক সিদ্ধান্ত বঙ্গবন্ধু এখানে ধরেন। অতীত ঘটনাপ্রবাহ ও দীর্ঘদিনের প্রস্তুতির লব্ধি এখানে কাজ করে পূর্ববর্তী সমস্ত ইতিহাসের প্রভাব এতে অবশ্য ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছি নেতৃত্বে স্বজ্ঞা, সৃজনশীলতা ও প্রজ্ঞা। ইতিহাসে কার্যকারণ যেখানে ক্রিয়াশীল, সেখানে বর্তমান শুধু অতীত দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও লক্ষ্য অর্জনের প্রতিজ্ঞা, যার ঘটনামালার মধ্যে সজীব সংযোগ ঘটায় তার পরিণতির দিকে নিয়ে যায়, তার জন্য নেতৃত্ব চাই। ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহের প্রভাব অবশ্যই থাকে, কিন্তু নেতৃত্বের মানবিক উপাদান পরিকল্পনারূপে ঘটনামালাকে অভিসারী করে একটি স্বপ্নীল প্রতিভাসের দিকে। সব আত্মত্যাগ, সব প্রচেষ্টা, সব শহীদের রক্ত, সবার আকাঙ্ক্ষা এখানে সমন্বিত হয়ে স্বাধীনতার প্রতিভাসটি ঘটাতে পেরেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব—স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা ও অনন্য নেতারূপে।

স্বাধীনতা অর্জনের নেতৃত্বদানে বঙ্গবন্ধুর অনন্য প্রতিভা ও সৌভাগ্যের কথা বলতে গিয়ে নিউটনের প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করেছিলাম। নিউটনের জীবনের আরেক ঘটনা দিয়ে এ প্রবন্ধ শেষ করতে চাই। বিশ বছর ধরে গবেষণা করে নিউটন আলোক বিষয়ে বিশাল পাণ্ডুলিপি রচনা করেন। একদিন সন্ধ্যায় তার কুকুরটাকে ঘরে রেখে তিনি বাইরে হাঁটতে বের হন। এই সুযোগে কুকুরটি জ্বলন্ত মোমবাতি

ফেলে দিয়ে সেই পাণ্ডুলিপিটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। নিউটন ফিরে এসে দেখলেন, দাউদাউ করে তাঁর দীর্ঘ গবেষণার ফসলরূপ পাণ্ডুলিপিটি জ্বলছে, আর কুকুরটি আনন্দে নাচছে সেই জ্বলন্ত শিখার চারপাশে। নিউটন এই মর্মান্তিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বলেন, "আমার এত কষ্টের, এত দীর্ঘ সাধনার ফসল যে পুড়ে যাচ্ছে সেটাই আমার সবচেয়ে বড় দুঃখের নয়, এর চেয়েও বড় বেদনার হলো ঃ হে আমার প্রিয় কুকুর, তুমি আনন্দে নৃত্য করছ জ্বলন্ত পাণ্ডুলিপিকে ঘিরে। অথচ তুমি বুঝতে পারছ না তুমি কী করেছ?"

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বিপথগামী কয়েকজন সৈনিক ও বঙ্গবন্ধুর করুণাপুষ্ট বিশ্বাসঘাতক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে উল্লাস করেছে। তারা বাঙালি ছিল—যে বাঙালি জাতির জন্য অপার ভালোবাসায় সমগ্র জীবন বঙ্গবন্ধু মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন বারবার। বলতে ইচ্ছা করে নিউটনের মতন মর্মবেদনায়, নির্বোধ পশুরা, তোমরা জানো না তোমরা কী করেছ?

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি

বঙ্গবন্ধুর পরিচয় অবিসংবাদিত নেতা ও রাজনীতিজ্ঞরূপে। তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ ও সফল সংগঠক, অনলবর্ষী বক্তা, প্রতিবাদী কণ্ঠ, সংগ্রামী, আপসহীন ব্যক্তিত্ব। স্বাধীন বাংলাদেশের তিনি স্বপ্নদ্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর এই স্বীকৃতি আমরা দেখতে পাই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে স্বাধীনতাযুদ্ধে সমগ্র বাঙালি জাতির ঝাঁপিয়ে পড়ায়; এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অনন্যপরিচয় মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ ও ৩০ লাখ শহীদের আত্মোৎসর্গের ভেতর দিয়েই শুধু নয়, যারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে, সেই সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর, তাদের আচরণেও, যেমন বঙ্গবন্ধুর ছবি ও নাম মুছে ফেলার অপচেষ্টায়।

বাঙালি যে অর্থে বিভক্ত স্বাধীনতার পক্ষের ও বিপক্ষের শক্তিরূপে, সেখানে গভীর অর্থে এদের মধ্যে একটি মিল আমরা লক্ষ করি তা হলো, বাংলাদেশ নিয়ে এই দুই পক্ষের স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন, সমর্থন অথবা বিরোধিতা, ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক ভাবনা– সবই আবর্তিত বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করে। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি কারো জন্য আশাবাদ, আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যয় ও স্বপ্ন দেখার, এবং কারো জন্য ভীতি, আতঙ্ক ও দুর্ভাবনার। কিন্তু বঙ্গবন্ধু যেখানে প্রতীক বাঙালি জাতীয়তাবাদের, সাহসিকতা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, প্রগতি, সমৃদ্ধি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের, সেখানে প্রয়োজন বঙ্গবন্ধুকে যথার্থভাবে আবিষ্কার ও অবধারণের।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রতিভা, তাঁর দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও সাহসিকতার পরম ফসল আমরা দেখেছি মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে। কিন্তু বাঙালি জাতিকে নিয়ে তাঁর যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা, ভবিষ্যৎ স্বপ্ন ও ভাবনা; অর্থনৈতিক উন্নতি, বস্তুগত সমৃদ্ধি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, মানবিক মূল্যবোধ এবং আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির ভেতর দিয়ে বিশ্বদরবারে উচ্চাসন লাভ, তা থেকে গেছে অসম্পন্ন। ফলে একজন আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী আধুনিক রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে সাফল্য অর্জনের যে সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে ছিল, এবং তার ভেতর দিয়ে তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার, তা ব্যর্থ হয়ে গেছে ঘাতকদের সংঘটিত দুর্ঘটনায়। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ভাবনায় স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নির্মাণ ও বাংলাদেশকে বিকশিত করার কাজে তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিকল্পনাগুলো কিছুটা

অন্তর্দৃষ্টি ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ দ্বারাই শুধু আমরা বুঝতে পারি। কারণ, একজন শিল্পীর অসম্পন্ন ছবির প্রাথমিক রঙের আঁচড়গুলো থেকেই শিল্পীর পরিকল্পিত ছবিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু বিশ্লেষণী ও গভীর দৃষ্টি থাকলে অনেকটাই অনুমান করা যায়।

অন্য সব রাজনীতিবিদ থেকে বঙ্গবন্ধু ভিন্ন ও অনন্য এই কারণে যে তাঁর লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তি ও অব্যাহত সমৃদ্ধি। কোনো একটি বিশেষ মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে তাৎক্ষণিক সাফল্য লাভ বা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের লোভে তিনি তৎপর ছিলেন না। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা বিস্তৃত ছিল দীর্ঘ কাল, পরিব্যাপ্ত স্থান এবং সমগ্র বাঙালির মধ্যে। তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা ও স্বাধীনতাসংগ্রাম শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের সংকীর্ণ লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়নি। তিনি চেয়েছিলেন ভাষার অধিকার, সাংস্কৃতিক মুক্তি, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের যথার্থ ব্যবহার, সবার কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, শিক্ষা, সচেতনতা, কর্মদক্ষতা, মানবিক অধিকার ও গণতন্ত্র। দীর্ঘদিন ধরে খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত যে সংগ্রাম তিনি করেছেন বিভিন্ন স্তরে, দিয়েছেন নেতৃত্ব ও মেনে নিয়েছেন কারাবাস বারবার, তা একই সঙ্গে তাঁকে প্রস্তুত করেছে ধাপে ধাপে ভেতর থেকে— কখনো পার্লামেন্টে, কখনো মিছিলে, কখনো বা জনসভায়। তিনি তাঁর ভাবনা ও বক্তব্যকে শুধু পৌঁছে দেননি অন্যদের কাছে, সবার সঙ্গে মিশে সবার মতামতকে মূল্য দিয়ে ক্রমাগত অভিজ্ঞতার আলোকে পরিশীলিত ও সুসংবদ্ধ করেছেন তাঁর রাজনৈতিক আদর্শকে একটি গতিশীল ধারায়।

তাঁর বক্তৃতায় আমরা সব সময়ই লক্ষ করি, কী চমৎকারভাবে তিনি বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামের পর্যায়ক্রমিক ঘটনাগুলোকে আত্মস্থ করে সমকালীন পরিস্থিতিকে উপস্থাপন করেছেন। কোনো আন্দোলনকেই তিনি তাৎক্ষণিক ঘটনা বলে চিহ্নিত না করে তার পরবর্তী ধাপ ও লক্ষ্যকেও উপস্থাপন করতেন। এর চরম পরাকাষ্ঠা আমরা দেখতে পাই তাঁর শ্রেষ্ঠ বক্তৃতায়, যা তিনি দিয়েছিলেন সমগ্র বাঙালি জাতি ও বিশ্ববাসীর কাছে ১৯৭১-এর ৭ মার্চ। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ যেমন বিস্তৃত শুধু এর নিজস্ব অস্তিত্বে নয়, এর পেছনের ঢেউগুলোর শক্তিকে ধারণ করে ও সম্মুখে ঢেউ সৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে; বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি আন্দোলন তেমনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে সমন্বিত করেছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের শক্তি যেমন নিহিত সমুদ্রের সব জলকণার মধ্যে, বঙ্গবন্ধুও তেমনি তাঁর আন্দোলনের শক্তিকে সঞ্চারিত করেছিলেন প্রতিটি বাঙালির চেতনা ও প্রেরণায়।

মুক্তিযুদ্ধের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের উদ্‌গাতা বঙ্গবন্ধু যে উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন তার মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতাই একমাত্র উপাদান ছিল না। এর মধ্যে বাঙালি জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তির সব উপাদান মিশে ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে

তাই স্থান-কালের ব্যাপ্তিতে, এর বহুমাত্রিকতায় এবং প্রতিটি বাঙালির প্রত্যাশা ও স্বপ্নের স্ফুলিঙ্গে অবধারণ করতে হবে। তা না হলে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ভেতর দিয়ে কী ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে আমরা হারিয়েছি, তা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হব। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং বাঙালি জাতিকে নিয়ে তাঁর স্বপ্নের বহুমাত্রিকতার শুধু একটি দিক আমরা এখানে তুলে ধরব, যার বীজ তিনি রোপণ করেছিলেন; কিন্তু ঘাতকের কালো হাত যে অন্ধকার ছায়াপাত ঘটিয়েছে তা অঙ্কুরোদ্‌গমন, বিকাশ লাভ ও ফুলে-ফলে উদ্ভাসিত হওয়ার সুযোগ দেয়নি সেই সম্ভাবনার বৃক্ষকে। বিষয়টি হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বস্তুগত সমৃদ্ধি ও আধুনিক জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভের সম্ভাবনাকে ধারণ করে।

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু আসলে একটি ব্যক্তিমানুষের জীবনের অবসান ছিল না। তাঁকে হত্যার ভেতর দিয়ে একটি আদর্শ, একটি পরিব্যাপ্ত দীর্ঘকালীন উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং একটি স্বপ্ন রাহুগ্রস্ত হয়েছে দীর্ঘ কালো ছায়ায়। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীরা যে বহুমাত্রিক জগতের কথা বলেন একীভূত তত্ত্বে সেখানে অনেকগুলো মাত্রাই অপ্রকাশিত থাকে এবং অদৃশ্য আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে। যেমন, একটি দুই মাত্রিক পাটিকে যদি খুব শক্ত করে এঁটে জড়ানো যায়, তাকে একমাত্রিক মনে হতে পারে। এর ভাঁজ খুলে দিলেই তা আবার দুই প্রশস্ততা লাভ করে। আমাদের '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে জাতীয় সমস্ত শক্তি, প্রচেষ্টা ও ভাবনাকে যুদ্ধজয়ের একান্ত লক্ষ্যে নিয়োগ করতে হয়েছিল। কারণ সেটা ছিল আমাদের জীবন-মরণ সমস্যা। যুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশে আমাদের পূর্ণাঙ্গ মুক্তিলাভের অনুষঙ্গরূপে অন্য যেসব মাত্রা, যথা অর্থনৈতিক মুক্তি, সাংস্কৃতিক বিকাশ, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, আশ্রয়হীনতা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, বিজ্ঞান শিক্ষা ও চেতনায় পশ্চাৎপদতা থেকে মুক্তি গুরুত্ব পেতে শুরু করে। এর ভেতর দিয়েই বঙ্গবন্ধুর মুক্তিসংগ্রামে ও রাজনৈতিক লক্ষ্যে বহুমাত্রিকতা বিকশিত হওয়ার দশায় পৌঁছে গিয়েছিল।

যুদ্ধের ভয়াবহতা, মৃত্যু, আতঙ্ক, বেদনা, শোক ও নানা দুর্দশার গভীর যন্ত্রণা আমাদের পূর্ণাঙ্গ মুক্তিসংগ্রামের যে মাত্রাগুলোকে গ্রাস করে রেখেছিল তা উন্মোচিত হওয়ার ও আত্মপ্রকাশের অনুকূল পরিবেশ, প্রয়োজনীয় আলো ও উত্তাপের প্রত্যাশায় উন্মুখ হলো সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ। এ জন্য সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ যে উপাদান বা মাত্রা তা ছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। এ ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন ও স্বাধীনতা-উত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনা যে সম্ভাবনাকে ধারণ করেছিল তাকে দুই স্তরে আমরা এখানে উপস্থাপন করতে প্রয়াস পাব। এর একটি হলো প্রত্যক্ষ, অন্যটি পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ প্রভাবটি আমরা দেখতে পাই বঙ্গবন্ধুর গৃহীত সুনির্দিষ্ট কিছু সিদ্ধান্তে ও প্রণীত নীতিমালায়। পরোক্ষ প্রভাবটি আমরা লক্ষ করি তাঁর রাজনেতিক আদর্শের সার্বিকতায়, উন্নয়ন পরিকল্পনার বহুমাত্রিকতায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তৈরিতে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনুকূলে সার্বিক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টিতে।

বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি কীভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তা অনুধাবন করতে হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে আধুনিক দর্শন ও তত্ত্ব এবং জাতীয় উন্নয়নে এর যে প্রভাব তা বুঝতে হবে।

সংকীর্ণ রাজনৈতিক ধারায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষা ও সার্বিক জনকল্যাণ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয় রাজনীতির সঙ্গে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান লক্ষ্যও নয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি সাধন; বরং রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে মানুষের প্রচলিত বিশ্বাস, আবেগ, বিদ্বেষ, লোভ, প্রতিহিংসা, সেই সঙ্গে তাদের জাত্যভিমান ও আশা-প্রত্যাশাকে ব্যবহার করে যে-কোনো কৌশলে দলের পক্ষে সমর্থন আদায় করা। এটা হলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কলাকৌশল।

অন্য যে পথ তা হলো, শক্তি প্রয়োগ বা কারচুপির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল। উন্নত-অনুন্নত দেশনির্বিশেষে রাজনৈতিক দলগুলো বা স্বঘোষিত রাষ্ট্রনায়কেরা এই কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। এদের লক্ষ্য, জনগণের চিন্তা ও চেতনার উত্তরণ ঘটিয়ে তাদের মধ্যে সঞ্চারিত নতুন মূল্যবোধ, প্রত্যাশা ও রুচির আলোকে জনপ্রিয়তা যাচাই করা নয়, বরং যে বিশ্বাস, প্রচলিত নেতিবাচক ভাবনা ও কুসংস্কারের মধ্যেই জনগণ থাকুক, তাদের সেই প্রবণতাকে কখনো উসকে দিয়ে কলাকৌশলে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল। গড্ডলিকা প্রবাহে অবক্ষয়ের অনুকূল স্রোতে গা ভাসিয়ে সাম্প্রদায়িকতা ও বিদ্বেষকে মূলধন করে বিজয়লাভ যত সহজ; জনগণকে শিক্ষাদান করে, তাদের চিন্তা ও চেতনার উত্তরণ ঘটিয়ে, কুসংস্কারমুক্ত অসাম্প্রদায়িক প্রগতির পথে জনগণকে উদ্দীপিত করার যে পথ তা তত দুর্গম।

বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি ছিল স্রোতের বিপরীত দিকে ঊর্ধ্বমুখী যাত্রা। মানুষের জন্য তাঁর ভালোবাসা, আত্মত্যাগের অপার মহিমা, সমস্ত জটিলতা ও কুটিলতাহীন আলোকিত পথে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলার মানসিকতা তাঁকে দিয়েছিল অনন্যসাধারণ শক্তি মানুষকে প্রভাবিত করার। তাঁর শক্তির উৎস ছিল স্বচ্ছতা, সাহসিকতা, অকপটতা, প্রেরণা ও সততা এবং মানুষের জন্য অকৃত্রিম ও গভীর ভালোবাসা। তাঁর রাজনীতি তিনি নিজেই নির্মাণ করেছেন কোনো অনুকারবৃত্তি দিয়ে নয়, সৃষ্টিশীলতায়। তিনি আমাদের শত শত বছরের স্বপ্ন এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে সুসংহত ও সমন্বিত করে রূপদান করেছেন এবং সেই অর্থে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে মুক্ত করেছেন। স্পষ্টভাবে সাধারণের ভাষায় রূপদান করেছেন তাঁর রাজনৈতিক দর্শনকে। এই প্রকাশের ভাষা তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি।

বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পিত বাঙালি জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির এবং বস্তুগত সমৃদ্ধির যে ইতিবাচক ও প্রগতিশীল রাজনীতি তা একমাত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চার মধ্য দিয়েই অর্জন করা সম্ভব। এর ফলে বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির লক্ষ্যের সঙ্গে সংকীর্ণ রাজনৈতিক মতলবমুক্ত, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও

প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য অনেক দিক থেকে অভিন্ন। বস্তুত উন্নয়ন অর্থনীতি, উন্নয়ন রাজনীতি এবং উন্নয়নমূলক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দর্শন যেখানে বস্তুনিষ্ঠ, সৎ ও আধুনিক, সেখানে এরা অনেক ক্ষেত্রেই অভিন্নতাপ্রাপ্ত।

আমরা জানি যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে শক্তি ও উৎস তা প্রথম দিকে ভূমি থেকে মূলধন, তারপর শ্রমিক এবং সবশেষে নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কার, সেই অর্থে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদনির্ভর হয়ে পড়ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতি সামাজিক রূপান্তরকে ভৌগোলিক সীমানা, পুরোনো ঐতিহ্য, বংশপরিচয় বা আদর্শগত ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল না রেখে নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কারনির্ভর করেছে। অর্থনীতিবিদ গলব্রেথ ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত তার গ্রন্থে এই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে অর্থনৈতিক উন্নয়নতত্ত্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির আলোকে পরিবর্তনের দাবি রাখে। প্রতিটি করপোরেশন বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান তাদের মুনাফা ও উৎপাদনকে সর্বোচ্চ করার লক্ষ্যে কাজ করবে– এই ধারা এখন আর কার্যকর নয়। আগে যেমন বাধ্য করে বা উচ্চ বেতন দ্বারা আকৃষ্ট করে শিল্পমালিকেরা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুনাফার ভিত্তিতে শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করত, এখন দ্রুত পরিবর্তনশীল উৎপাদনব্যবস্থা ও উৎপাদনযন্ত্রের প্রভাবে সেই পুরোনো নীতি আর কার্যকর নয়।

টেকনোক্র্যাসি বা প্রযুক্তিবাদ এখন এমন গভীরভাবে নির্ভরশীল নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ওপর যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও এর উৎপাদনের সঙ্গে নিয়োজিত প্রযুক্তিবিদ, পরিকল্পনাবিদ ও গবেষকদের লক্ষ্যের মিল না থাকলে, এমনকি উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত সবার লক্ষ্য যদি একীভূত না হয়, তাহলে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারী তাদের নির্দেশে ও একান্তভাবে মুনাফার লক্ষ্যে উৎপাদনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে পারবে না। অর্থনৈতিক দর্শন বা মতবাদ নিয়ে যে দুই ধারা, যথা মুক্ত অর্থনীতি অর্থাৎ বাজারদর, চাহিদা, সরবরাহ ও মুনাফার দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তিমালিকানার উৎপাদনব্যবস্থা; এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি অর্থাৎ সরকার-নিয়ন্ত্রিত পূর্বপরিকল্পিত উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা, যেখানে ব্যক্তিমালিকানা নিষিদ্ধ—এদের মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য, তা নিয়ে যতই বিতর্ক ও প্রতিযোগিতা, বিতণ্ডা ও বিরোধ, এমনকি ঠান্ডা যুদ্ধ থাক এবং আমাদের বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা এই বিতর্ক ও বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড় ক। বাস্তবে আধুনিক প্রযুক্তি ও উৎপাদনব্যবস্থার নিজস্ব একটি ধারা আছে, যেখানে প্রযুক্তির অগ্রগতি ও বিকাশের পথ প্রায় অভিন্ন। যেমন স্বয়ংক্রিয়তা, আধুনিক ইলেকট্রনিকস, সাইবারনেটিকস, কম্পিউটারের ব্যবহার, তথ্য বিপ্লব, নিউক্লীয় টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, ন্যানোটেকনোলজি, শিল্পোট্রোনিকস, ফোটোনিকস– এ সবই একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত এবং তা হলো, ভৌগোলিক ঠিকানা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শনির্বিশেষে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণার ফসল।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই অগ্রগতির কারণে উন্নয়নকামী দেশগুলো আধুনিক চিকিৎসা, উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা, দ্রুত তথ্যের আদান-প্রদান ও উন্নত জীবনের প্রত্যাশী। ফলে সাধারণ মানুষকে ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, পশ্চাৎমুখিনতা এবং কুসংস্কারের মধ্যে বন্দী করে রাখতে না পারলে সহজাতভাবেই তারা রাষ্ট্র পরিচালকদের কাছে শিক্ষা, চিকিৎসা ও বস্তুগত সমৃদ্ধি চাইবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে।

আধুনিক যুগে জাতীয় স্বাধীনতা ব্যতিরেকে এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশে সবার অংশগ্রহণ ও সমন্বিত প্রচেষ্টা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। সব উন্নয়ন পরিকল্পনাই হতে হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক। সেই সঙ্গে সব মানুষের অংশগ্রহণ ও লক্ষ্যের সমন্বয় চাই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে মানবিক শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধের যে পার্থক্য ও পারস্পরিক নিরপেক্ষতা আগে ধরে নেওয়া হতো, তা এখন আর সত্য নয়। এরা পরস্পরের পরিপূরক। মানবিক শিক্ষার লক্ষ্য আমাদের মানসিক গঠন, আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশাকে বাস্তব জগৎ ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য মনকে প্রস্তুত করা। অন্যদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির লক্ষ্য প্রকৃতির নিয়মগুলো জেনে ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে ভৌত জগৎকে আমাদের প্রত্যাশার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে তোলা।

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন একটি যান্ত্রিক ও বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। প্রযুক্তি-সংক্রান্ত পুঁথিগত উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ অথবা আমদানিকৃত দু-চারটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার গতিশীল ধারা কোনো দেশ আত্মস্থ করতে পারে না। এ জন্য একটি সজীব ও সক্রিয় সামাজিক পরিবেশ চাই, যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিচর্চার অনুকূল। পুরুষানুক্রমিক প্রথা ও ঐতিহ্যের একটি জড়তা আছে, যা প্রযুক্তির অগ্রগতির অনুষঙ্গরূপে জীবনযাত্রা, দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক সম্পর্ক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের পথে বাধা সৃষ্টি করে। একমাত্র পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার বিস্তার, অনুসন্ধিৎসা, উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা, কর্মপ্রেরণা, জাতীয় ঐক্য ও উদ্দীপনা সৃষ্টির ভেতর দিয়ে এই জড়তা অতিক্রম করা সম্ভব। বস্তুত, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির তথ্য, এর উৎস ও প্রভাব সম্পর্কে জানা, এমনকি প্রযুক্তির গুরুত্ব অবধারণ করা যতটা কঠিন, তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল হলো প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন। সম্পর্কটি আসলে পারস্পরিক।

শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা, নতুন উৎপাদনব্যবস্থার প্রবর্তন স্বভাবতই পরিবর্তন আনে কর্মসংস্থানে, বসবাসে, যাতায়াতে, খাদ্যাভ্যাসে, ব্যবহার্য সামগ্রীতে, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কে; সর্বোপরি চাহিদা, দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিকতায়। মানুষকে সচেতন না করে, সামাজিক প্রস্তুতি না নিয়ে প্রযুক্তিগত উন্নতির চেষ্টা

যেখানে চলে বাইরে থেকে, সেখানে একটি সাংস্কৃতিক ব্যবধান থাকে অগ্রসর ও আধুনিকতর কর্মক্ষেত্র ও জীবনযাত্রার সঙ্গে সাধারণ্যের মানসিক চেতনার। মানুষ সেখানে পেছন থেকে অর্থাৎ মানসিক পশ্চাৎপদতা থেকে ধীরে ধীরে যান্ত্রিকভাবে নিজেদের সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নিতে প্রয়াস পায় প্রযুক্তিনির্ভর জীবনধারার সঙ্গে। এর বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হয়, যখন কোনো জাতি তার শিক্ষা, প্রত্যাশা ও উন্নয়ন-আকাঙ্ক্ষায় অগ্রসর হয়েও সম্পদ ও অনুকূল পরিবেশের অভাবে শিল্প ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পেছনে পড়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে অনেক বেশি সক্রিয়তা নিয়ে জ্ঞানের সাধনা, শ্রম, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ভেতর দিয়ে সেই জাতিকে অগ্রসর হতে হয়। বস্তুগত সমৃদ্ধি ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির তুলনায় চেতনার স্তর এ ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকে।

আমরা লক্ষ করব যে, ইউরোপে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ এসেছিল শিল্পবিপ্লবের আগে, যা প্রায় সবটাই ছিল মানবিক চেতনার অভিব্যক্তি—শিল্প-সাহিত্য ও সৃষ্টিশীলতার ভেতর দিয়ে। একটি জাতির সামগ্রিক জাগরণ ছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পূর্ণাঙ্গ অগ্রগতি যে সম্ভব নয় এ কথা আরো বিশেষভাবে সত্য হয়ে উঠছে সময়ের অগ্রগতির ভেতর দিয়ে। প্রকৃতির নিয়মগুলো শুদ্ধতর ও সূক্ষ্মতরভাবে জানা, নতুন বস্তু ও শক্তির উৎস আবিষ্কার, অভিনব সব যন্ত্রের উদ্ভাবন, পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের সাধ্যতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগ, ব্যাধি ও খাদ্যাভাবকে মানুষ আর দুর্ভাগ্য বলে মেনে নিতে রাজি নয়। বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা, শিক্ষা, গবেষণা ও জনগণের সম্মিলিত অংশগ্রহণ একটি জাতিকে দ্রুত নিয়ে যেতে পারে সমৃদ্ধির পথে। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে সেই চেতনা, ঐক্য, আশাবাদ, উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা, সংস্কার এবং জড়তা মুক্তি ও উন্নয়নের ধারায় নিয়ে যেতে প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন যে সেই ব্যাপক উন্নয়ন ভাবনার দ্বারা পরিচালিত ছিল তার প্রমাণ মেলে ধাপে ধাপে তাঁর রাজনীতির ধারার উত্তরণ এবং বস্তুনিষ্ঠতা লাভে।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতালাভের প্রপঞ্চ ঘটনা আমরা সবাই জানি। কিন্তু যে-বিষয়টি অনেকেরই উপলব্ধ নয় বলে মনে হয় তা হলো, এই মুক্তিযুদ্ধ ও অনন্য স্বাধীনতা অর্জনের আড়ালে কী চালিকা শক্তি, প্রেরণা ও দূরলক্ষ্য বঙ্গবন্ধুর মনে কাজ করেছে এবং কী স্বপ্ন লালন করেছেন তিনি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে নিয়ে; এই বিষয়টি সাধারণ্যে অবজ্ঞাত ও অনবধানিত। কারণ এটি রাজনীতির শিল্পী বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত ছবি, অসম্পন্ন ভাস্কর্য। তাঁর এই আরাধ্য কাজ তিনি সম্পন্ন করে যেতে পারেননি। কারণ তাঁকে মর্মান্তিকভাবে হত্যা করেছে এমন সব ঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারীরা যারা তাদের অন্ধত্ব নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রচেষ্টা ও স্বপ্নকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ ছিল।

বঙ্গবন্ধুর জীবননাশের ঘটনার করুণতম দিক, যা তাঁর ব্যক্তিগত মৃত্যুর শোককেও অতিক্রম করে যায় তা হলো, বাংলাদেশকে নিয়ে যে ছবি তিনি আঁকতে শুরু করেছিলেন, যে ভাস্কর্য নির্মাণে হাত দিয়েছিলেন অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা ও জড়তার পাথর কেটে কেটে, তা রূপলাভের সুযোগ পেল না। এটা ছিল এক সামাজিক শিল্প নির্মাণ, সবাইকে নিয়ে স্বপ্ন ও স্বজ্ঞায়, পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, প্রেরণা ও প্রতিজ্ঞায় দুর্গম পথ অতিক্রমণের। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী, আপসহীন, সাহসিক ও বৈপ্লবিক নেতৃত্বকে সবাই স্বীকার করেন, স্বীকার করতে বাধ্য হন, কারণ তাঁর এই রাজনীতির বাস্তব ফসল মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন।

বঙ্গবন্ধুর অসম্পন্ন কাজ বাংলাদেশকে নিয়ে তাঁর অপূর্ণ স্বপ্ন, কর্মপরিকল্পনা বুঝতে হলে স্বাধীনতা-উত্তর ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করতে হবে। প্রশাসনিক কাজে, ব্যবস্থাপনায় ও রাষ্ট্র পরিচালনায় বঙ্গবন্ধু দক্ষতার পরিচয় দেননি— এই উক্তি যাঁরা করেন, তাঁরা যুদ্ধের যে সামগ্রিক প্রভাব একটি দেশের ওপর পড়ে তার তীব্রতা, এবং যুদ্ধোত্তর একটি দেশকে কীভাবে নানা সমস্যা গ্রাস করতে চায় সে সম্পর্কে অজ্ঞ। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো একটি কৃষিভিত্তিক দরিদ্র দেশ, যা শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিয় ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ।

তাঁর স্বপ্নের প্রথম ধাপটি তিনি বাস্তবায়িত করেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা, এর স্বীকৃতি আদায় ও সংবিধান নির্মাণের ভেতর দিয়ে এর বিজ্ঞানভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক, মানবিক, উদার, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল, আধুনিক বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও পরিবেশগত সমস্যার সমাধানের যে বাস্তবভিত্তিক পথ বেছে নেন তা কোনো কেতাবি পথ নয়। বিধিবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির পদ্ধতিও নয়। কিন্তু তা ছিল একটি মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়ন-প্রক্রিয়া গম্ভীরভাবে মূল্যপ্রাপ্ত।

কোনো অন্ধ অনুকরণ নয়, বাংলাদেশের বাস্তবতা, সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও জনগণের প্রত্যাশাকে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সমন্বিত করার লক্ষ্যেই তিনি শিল্পকারখানা ও অর্থনৈতিক বড় সব প্রতিষ্ঠান, যথা ব্যাংক ও বিমা কোম্পানিগুলোকে জাতীয়করণ করেন। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়নব্যবস্থা গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তিনি গুরুত্ব দেন শিক্ষা, গবেষণা, পরিকল্পনা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ওপর। তিনি এ জন্য স্থাপন করেন শিক্ষা কমিশন, পরিকল্পনা কমিশন ইত্যাদির ওপর। কৃষি, শিল্প, শক্তি, গৃহনির্মাণ, আবহাওয়া, পরিবেশ, মৌলিক বিজ্ঞান সেই সঙ্গে ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য যতগুলো প্রতিষ্ঠান ছিল সেগুলোতে নতুন উদ্দীপনা ও কর্মতৎপরতা নিয়ে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করেন। প্রচণ্ড অর্থনৈতিক

টানাপড়েনের মধ্যেও উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তরুণ গবেষকদের জন্য। বিপুলসংখ্যক মেধাবী ছাত্রকে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

যেকথা আগেই উল্লেখ করেছি, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়নব্যবস্থায় ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে মূলত কোনো পার্থক্য থাকছে না। কারণ, পরিকল্পিত গবেষণার মাধ্যমে উৎপাদন সামগ্রী, শক্তির উৎস, উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদনব্যবস্থাকে দক্ষতর করার যে পন্থা, সেখানে মুনাফা প্রধান লক্ষ্য নয়। নির্ভরযোগ্য আয়, প্রবৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত শুদ্ধতা, সুচরম দক্ষতা, নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনকে আত্মস্থ করার গতিশীলতা ইত্যাদি প্রধান বিচার্য। ক্রেতাদের চাহিদা এখন আর পূর্বনির্ধারিত নয়; সামাজিক প্রচলন, শিক্ষা ও তথ্যের বিনিময়ে ও প্রচারমাধ্যমের প্রভাবে চাহিদা সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হয়, বিশেষ করে যেগুলো বিশেষ বিশেষ চাহিদা। একটি দেশের সমষ্টিগত ও সমন্বিত যে চাহিদা তা সরকারি ব্যয় ও আয়কর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ঘটে। অবাধ প্রতিযোগিতা ও মুক্ত অর্থনীতির কথা শুধু সীমিতভাবে কার্যকর, যেমন নির্দিষ্ট রিঙের মধ্যে, রেফারির তত্ত্বাবধানে নিয়ম লঙ্ঘন না করে কুস্তিগিররা মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

খোদ আমেরিকায় জন এফ কেনেডির সময় আমরা এর দৃষ্টান্ত পাই। যেখানে ফার্মগুলো বিশেষ চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করে দ্রব্যের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করে দিয়ে এবং সরকার সমষ্টির চাহিদা মোকাবিলা করে দ্রব্যমূল্যের ও বেতনের উচ্চতম সীমা নির্ধারণ করে। অন্যদিকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, গবেষণাভিত্তিক তথ্যনির্ভর উৎপাদনের ব্যবস্থা, রোবটিক্সের প্রবর্তন, অবিশেষজ্ঞ শ্রমিকের চাহিদা ও গুরুত্ব কমিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মূল যে লক্ষ্য শ্রমিকরাজ স্থাপন, তা ভিত্তিহীন করে ফেলেছে। বস্তুত বঙ্গবন্ধুর যে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মিশ্রণ, যেখানে মানবিক মূল্যবোধ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণায় পরিবর্তনশীল ফসল গ্রহণ করার যে নমনীয় ও উন্মুক্ত পথ, সেটাই যথার্থ মনে হয়।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল চালিকা শক্তি হলো শিক্ষা, গবেষণা এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক নিয়মের মানবকল্যাণমূলক ব্যবহার। এই লক্ষ্যে গঠিত শিক্ষা কমিশনকে বঙ্গবন্ধু পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন একটি আধুনিক, গতিশীল, উদার শিক্ষানীতি প্রণয়নের। বস্তুত স্বাধীনতার পর শিক্ষা কমিশন গঠন করা ছিল দেশের মঙ্গলচিন্তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ঘটনা।

শিক্ষার গুরুত্ব ও দায়িত্ব সম্পর্কে এই উপলব্ধি ছিল গভীর মূল্যের। প্রায় ৪০০ সদস্যের ৩০টি অনুধ্যান কমিটি ও বিশেষ কমিটিতে দেশের বহু শিক্ষাবিদ অংশ নেন। সুধীসমাজের উল্লেখযোগ্য অংশ কমিশনের সুপারিশ প্রণয়নের অন্তর্ভুক্ত

ছিলেন। ব্যাপকভিত্তিক তথ্য ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহের পটভূমিতে এখানেই প্রথমবারের মতো শিক্ষাকে গভীর গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়। অভিব্যক্ত হয় সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ এক কার্যধারা। শিক্ষাব্যয় মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা সাত ভাগে উন্নীত করার পরামর্শ দেওয়া হয়। শিক্ষার জন্য বিপুল অর্থ বিনিয়োগের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলা হয়, শিক্ষার জন্য ব্যয় সমাজসেবামূলক কাজ হিসেবে নয়, সম্পদ সৃষ্টির অবলম্বনরূপে বিবেচিত হতে হবে।

দরিদ্র দেশের শিক্ষা-পরিকল্পনাকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনারই অংশরূপে সাধারণত দেখা হয়ে থাকে। শিক্ষার সৃজনশীল দিকগুলো এ ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়, কিন্তু যারা পশ্চাৎপদ তাদের জন্যই সৃজনশীলতা ও অনুপ্রেরণার উৎসরূপে শিক্ষার গুরুত্ব অধিকতর। কারণ, আমাদের অতিক্রম করতে হবে দীর্ঘতর পথ। বঙ্গবন্ধু ডক্টর কুদরাত-এ-খুদাকে শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান করেছিলেন রাজনৈতিক দলের সমর্থকরূপে নয়, একজন বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ, গবেষক ও বাংলাদেশের শিল্প-সম্ভাবনা সম্পর্কে চিন্তাশীল ব্যক্তিরূপে। কুদরাত-এ-খুদা 'পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প সম্ভাবনা' এবং 'যুদ্ধোত্তর বাংলায় কৃষি ও শিল্প' গ্রন্থে বাংলাদেশের শিল্প সম্ভাবনা সম্পর্কে চমৎকার সব ধারণা উপস্থিত করেন। সম্ভবত বিজ্ঞানী ও শিল্পদ্রষ্টারূপে তাঁর মেধা ও মননকে বঙ্গবন্ধু ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য, যেমনটি তিনি করেছেন প্রতিটি ক্ষেত্রে যথার্থ মানুষ সন্ধান করে তাঁর স্বপ্নকে পূরণ করার সহযোগিতা পেতে।

বাংলাদেশের সে ছবিকে রূপ দেওয়ার কাজে যখন তিনি মগ্ন ছিলেন তখন তাঁকে হত্যা করা হয়, যেমনভাবে বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসকে খুন করেছিল তাঁর গাণিতিক সমস্যা নিয়ে মগ্ন দশায় নির্বোধ রোমান সৈন্যরা।

বঙ্গবন্ধুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভাবনা যে গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে আধুনিক, অভিনব ও অনন্যসাধারণ ছিল তার প্রমাণ পাই তাঁকে হত্যার পর যেসব একনায়ক ক্ষমতা দখল করেছে তাদের ব্যর্থতায়। বাংলাদেশের সব বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানই প্রায় এক এক করে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যেমন, মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি, স্টিল করপোরেশন, ট্রান্সফর্মার তৈরির জিএম প্লান্ট, শিক্ষা উপকরণ বোর্ড, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন, আদমজী জুট মিলস— অবশিষ্ট অনেক শিল্পই বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে। অনেকেই ব্যক্তিমালিকানা ও মুক্তবাজার অর্থনীতির অজুহাত দেখিয়ে বেসরকারি ব্যবস্থাপনাকে দক্ষতর বলে যুক্তি দিচ্ছে, যা চাহিদা ও সরবরাহ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করবে।

কিন্তু মুক্তবাজার অর্থনীতির তীর্থস্থান খোদ আমেরিকার অর্থনীতিবিদ গলব্রেইথ বলেছেন, চাহিদা কোনো স্বয়ংক্রিয় ঘটনা নয়, এটা আধুনিক টেলিভিশন ও অন্যান্য

প্রচারমাধ্যমের কল্যাণে কৃত্রিমভাবেও সৃষ্টি করা যায়, এবং কোন সামগ্রী বাজারে সরবরাহ করা হবে তা চাহিদা নির্ধারণ করে না। প্রযুক্তির উদ্ভাবন নতুন সামগ্রী উৎপাদন করার পর তার জন্য চাহিদা সৃষ্টি করা যে-কোনো প্রভাবশালী দেশের পক্ষে সম্ভব।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ফলে আমরা সবচেয়ে মূল্যবান যে সম্পদ হারিয়েছি তা হলো, একটি দুর্লভ সুযোগ ও সময়। এর কোনো প্রতিকার নেই। কোনোভাবেই এই ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব নয়। ইতিহাসের এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমার চোখে একটি দৃশ্যই শুধু ভেসে উঠছে তা হলো, ইটালির ফ্লোরেন্সে দেখা একটি অসম্পন্ন ভাস্কর্য। বিখ্যাত কোনো শিল্পী পাথর কেটে এই ভাস্কর্য নির্মাণ করছিলেন। যেন পাথরের ভেতর থেকে জীবন্ত এক মানুষ তার অপার কান্তি নিয়ে উদ্ভাসিত হতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ থেমে গেছে। শিল্পীর হাত থেকে কেউ কেড়ে নিয়েছে তার বাটালি। এই ভাস্কর্য কোনো দিন আর মুক্তি পাবে না পাথরের ভেতর থেকে। শুধু পাথরের বক্রতা থেকে অনুমান করতে পারি কী সৌন্দর্য ঐ ভাস্কর্যের শিল্পী নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভাবনা তেমনি অসম্পন্ন ভাস্কর্যরূপে বন্দী হয়ে পড়েছে কালের মধ্যে। আমরা শুধু অনুমান করতে পারি কী হতে পারত তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশ। কিন্তু কখনোই তা নির্মাণ করতে পারব না। কারণ, সবচেয়ে মূল্যবান ও অপ্রত্যাবর্তী যে উপাদানটি হারিয়ে গেছে চিরতরে, তা হচ্ছে সময়।

বিমূর্ত নাম যেখানে উৎস আনন্দ অথবা যন্ত্রণার

সম্প্রতি একটি সমালোচনা প্রায়শ পরিলক্ষিত হয় নানা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ নিয়ে। বিষয়টি বিশুদ্ধ সমালোচনার স্তর অতিক্রম করে বিতর্কের রূপ লাভ করেছে—যার উৎস সার্বিকভাবে মুক্তবুদ্ধি নয়, একটি অব্যক্ত মানসিক যন্ত্রণা কিছু মানুষের। নামে কী এসে যায়, এমন দর্শনে যারা বিশ্বাসী তারা সাধারণত নির্বিকার নামকরণ সম্পর্কে। আবার যারা নামকরণের ভেতর দিয়ে ইতিহাসকে সংরক্ষণ করতে চায়, নামকরণপ্রক্রিয়াকে তারা ইতিহাস রচনার মতোই গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে বিবেচনা করে। রাস্তা, ব্রিজ, প্রতিষ্ঠান, বন্দর, বাগান সবকিছুই নানা দেশে নানা কালে নামকরণ লাভ করেছে দাতা, সমাজকর্মী, কবি, শিল্পী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বকে স্মরণ রাখার লক্ষ্যে। এই নামকরণ কখনো একজন ইতিহাসবিদ, প্রতিষ্ঠান, কোনো বিদগ্ধ বিশেষজ্ঞের কমিটি, রাজনৈতিক দল অথবা জনসাধারণ দ্বারা হতে পারে। স্বভাবতই নামকরণের আড়ালে কাজ করতে পারে কৃতজ্ঞতাবোধ, শ্রদ্ধা বা প্রশংসা প্রকাশের ইচ্ছা অথবা কোনো পরিবার, গোষ্ঠী বা বিশেষ আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত দলের নাম প্রচারের প্রবণতা। পুরো ব্যাপারটিকে একটি সামাজিক আচরণরূপে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি।

যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সংকীর্ণ স্বার্থে, অজ্ঞতায় অথবা বালখিল্যতায় অযোগ্য মানুষকে মহিমান্বিত করার অপচেষ্টায় নামকরণে সচেষ্ট হয়, তখন কালের ধোপে সেই নাম আপনা থেকেই মুছে যায় অথবা কাকতালীয়ভাবে একটি নাম নিছক অর্থহীন শব্দরূপে থেকে যায় কোনো প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনার সঙ্গে। তাই, ভুল নামকরণের ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মানুষকে দীর্ঘদিন বিভ্রান্ত করতে পারে না, অথবা বিশেষ ব্যক্তি বা মতবাদকে অযথার্থরূপে প্রচার করতে। সবচেয়ে বড় কথা, মৃত ব্যক্তিকে যদি মিথ্যা করে মহিমান্বিত করার প্রচেষ্টাও চলে তাতে মৃতের কোনো আনন্দ, দুঃখ বা সম্পদপ্রাপ্তি ঘটে না। নামকরণের ব্যাপারটি তাই নিছক সামাজিক আচরণরূপে অগুরুত্বের সঙ্গে আমরা দেখতে পারি, যেখানে অনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীবদ্ধরূপে মানুষ তাদের আবেগ, কৃতজ্ঞতাবোধ, প্রশংসা, স্মৃতি, আদর্শের প্রতি আনুগত্য অথবা ইতিহাস চেতনাকে ধারণ করে রাখতে প্রয়াস পায় নামকরণের ভেতর দিয়ে।

দেখা গেছে, নামকরণ যেখানে এমন একটি নির্দোষ, নিরীহ এবং স্বতঃস্ফূর্ত

অভিব্যক্তি সমাজের; যেখানে নামকরণ ও স্মৃতিসৌধ নির্মাণে যারা ব্রতী, তারা যতই শ্রম, অর্থ ও মনোযোগ নিয়োগ করুক, সাধারণ মানুষ কিন্তু তাকে স্মরণ করে অথবা বিস্মৃত হয় কোনো উদ্দেশ্যকে সামনে না রেখে। সাধারণ মানুষের এই নিঃস্বার্থ আচরণ বা প্রতিক্রিয়া, নামকরণ প্রক্রিয়া এবং এর টিকে থাকা ও না-থাকার ঘটনাকে একটি কালিক পরীক্ষার রূপ দেয়। কিন্তু দেখা গেছে, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যখন সাধারণ নাগরিকের নিঃস্বার্থ, নিরীহ ও পরিসাংখ্যিক বৈশিষ্ট্য হারায়, তখন নামকরণের আড়ালে যে উদ্দেশ্যই থাকুক, বিশেষ নামকরণের বিরুদ্ধে বা পক্ষে তাদের প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে একটি চমৎকার সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে আমাদের সামনে, যখন বঙ্গবন্ধুর নাম নানা প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার সঙ্গে যুক্ত করা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া আমরা লক্ষ করছি।

কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধু নামকরণের জন্য যথার্থ কি না অথবা বঙ্গবন্ধুর নামটি কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত কি না তা নিয়ে যদি নিরীহ বিতর্ক চলে, সেখানে কিছু বলার নেই। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যে আদর্শ, মূল্যবোধের ও চেতনার উত্তরণকে ধারণ করে সংঘটিত হয়েছে এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অভিব্যক্তি ঘটেছে তা একটি প্রপঞ্চ ঘটনা, একটি প্রতিভাস, যার প্রেরণা ও শক্তি, প্রয়োজনীয় ঐক্য ও দূরদর্শিতা প্রদান করেছেন শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁকে বঙ্গবন্ধু উপাধি যে উদ্দীপিত বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় উদ্ভাসিত বিপুল জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আরোপ করেছে তার জীবিতাবস্থায়, সেটাই প্রমাণ কতটা তিনি অবদান রেখেছেন আমাদের স্বাধীনতায়। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় যে বিরুদ্ধতা ও প্রতিকূলতা দেশের ভেতর থেকে ও বাইরে থেকে এসেছে তার পেছনে একটি গভীর ষড়যন্ত্র, একটি পশ্চাৎমুখী দৃষ্টি ও প্রগতিবিরুদ্ধতা কাজ করেছে।

অগ্রগতি, মানবিক মূল্যবোধ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক চেতনা কোনো আকস্মিক অর্জন নয়। এর উদ্ভব ঘটানো, একে ধারণ করা এবং এর অভিব্যক্তিকে অব্যাহত রাখা একটি সার্বিক, সার্বক্ষণিক সচেতনার ফসল। অগ্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী যে জড়তা তা সব সময়ই উপস্থিত থাকে শত্রুরূপে। পরিবর্তন আনতে গেলেই প্রতিক্রিয়ারূপে এই জড়তা, রক্ষণশীলতা সক্রিয় হয়ে ওঠে। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় এবং স্বাধীনতা লাভের পরও বাঙালি জাতির অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনাকে যারা বাধা দিয়েছে এবং এই অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড এক বিদ্বেষ পোষণ করেছে, সেই সঙ্গে জেনেছে বাঙালি জাতির এই জাগরণ ও চেতনা লাভের আড়ালে বঙ্গবন্ধু অবস্থান করছেন শুধু একজন জীবন্ত মানুষরূপে নয়, লাভ করেছেন প্রতীকী রূপ সমস্ত বাঙালির মনে। বঙ্গবন্ধুর নামকে যারা সংযুক্ত দেখতে

চেয়েছে, তাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই মিশে আছে অনেক মুখোশপরা মানুষ যারা কুমিরের অশ্রুপাতের মতো কৃত্রিম ভক্তি প্রদর্শন করছে নানাভাবে আপন স্বার্থোদ্ধারের লক্ষ্যে। কেউ বা দীর্ঘদিন চেপে রাখা আবেগ প্রকাশ করতে আতিশয্য ঘটিয়েছে বঙ্গবন্ধুর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে। এসব কিছুকেই গণতান্ত্রিক সমাজের সহজাত আচরণরূপে দেখতে পারি আমরা, যেখানে হয়তো আধিক্য আছে আবেগের প্রকাশে, ভুল করা আছে নামকরণের সঙ্গে বিষয় নির্বাচনে, কিন্তু সেই সঙ্গে যথার্থ দায়িত্ববোধ ও সচেতনতা আছে ইতিহাস সংরক্ষণের। বঙ্গবন্ধুর নামে নানা কিছু নামকরণের প্রক্রিয়াকে অন্য নানাজনের নামে নামকরণের প্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করতে চাই না। কারণ কালের প্রবাহ নির্ধারণ করবে, কোন নামটি ইতিহাসের দাবিতে টিকে থাকার এবং কোনগুলোর ক্ষেত্রে তা ঘটবে না।

শুধু একটি বিষয় আমাকে খুব আকৃষ্ট করে এই ভেবে যে, বঙ্গবন্ধুর নামে নামকরণের প্রক্রিয়ায় যারা নানাভাবে কাজ করছে অথবা এই কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে আন্তরিকভাবে অথবা ভণ্ডামি করে, তাদের সবার জন্যই পুরস্কার অথবা শাস্তিপ্রাপ্তি ঘটছে এক সূক্ষ্ম হিসেবে। ভণ্ডামি ও প্রতারণার প্রকাশ্য আচরণ ও প্রচ্ছন্ন অনুভবের এই জটিল সমাজে আমরা জানি না কে কতটা দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতা ও প্রগতির পক্ষে এবং কে স্বাধীনতার বিপক্ষে ও বাঙালি চেতনার বিপরীতে অবস্থান করছে।

অনেকেই পোশাকের আড়ালে ও ভণ্ডামির মুখোশ পরে বাহ্যিকভাবে দেশপ্রেমের অভিনয় করে যাচ্ছে; আবার অনেক সত্যিকারের দেশপ্রেমিক ও সচেতন প্রগতিশীল মানুষ সবার দৃষ্টির আড়ালে কাজ করে যাচ্ছে নিভৃতে। আমরা যদি ইচ্ছা করি প্রত্যেক স্বাধীনতাপ্রিয় দেশপ্রেমিক সৎ বাঙালিকে তাদের দেশপ্রেমের গভীরতা ও চেতনার অনুপাতে পুরস্কৃত করব, এবং সেই সঙ্গে যারা স্বাধীনতাবিরোধী, হত্যা ও নৃশংসতার ভেতর দিয়ে গণতন্ত্র ধ্বংসের কাজে অংশগ্রহণ করছে বা সমর্থক তাদের শাস্তি দেব, তাদের কুকর্ম ও অপরাধের অনুপাতে—সেই ইচ্ছা পূরণ হওয়ার নয়। কারণ, নানা মুখোশের আড়ালে যারা লুকিয়ে আছে আসল পরিচয়কে গোপন করে অথবা আছে নিভৃতে সমাজে অবজ্ঞাত হয়ে। ফলে তাদের বাহ্যিকভাবে পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত করার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু এ কথা সত্য যে, বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার শত চেষ্টার পরও কোনো হাসপাতালের রোগী, ব্রিজ দিয়ে পার হওয়ার সময় কোনো যাত্রী অথবা কোনো শিক্ষায়তনের শিক্ষার্থী বঙ্গবন্ধুর নাম দেখতে পান, তখন একটি মানসিক প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে কাজ করে।

এই প্রতিক্রিয়া কতটা আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের তা নির্ভুল গাণিতিক হিসাবে তার দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার প্রতি ভালোবাসার অনুপাতে। একইভাবে যে স্বাধীনতাবিরোধী ও বাঙালি চেতনার পরিপন্থী সে যতই ভণ্ড দেশপ্রেমিক সাজুক

অথবা আড়ালে ষড়যন্ত্র করুক, বঙ্গবন্ধুর নামফলক তাকে তার দুষ্কর্মের সঠিক অনুপাতে শাস্তি ও দুঃখ দেবে। গোলাপের বাগান ধ্বংস করার পরও প্রতীকী গোলাপ শব্দটি আমাদের কাছে প্রিয় এর সৌন্দর্য ও সুগন্ধের স্মৃতি নিয়ে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নামকরণের হিড়িক পড়েছে, আতিশয্য ঘটছে, বাড়াবাড়ি চলছে—এসব অভিযোগ আমাকে মোটেই উদ্বিগ্ন করে না। কারণ আমি জানি, যারা এসব সূক্ষ্ম যুক্তি ও রুচির প্রশ্ন তুলে হইচই করছে তাদের বাহ্যিক উদ্বিগ্নতার আড়ালে বঙ্গবন্ধুবিদ্বেষ ও স্বাধীনতার চেতনা-বিরোধিতার আনুপাতিক। যারা যথার্থই আতিশয্যের বিরুদ্ধে তাদের কাছে প্রশ্ন—যখন জাতির পিতার নাম মুছে ফেলার অপচেষ্টায় চরম অসহিষ্ণুতা ও ষড়যন্ত্র চলছিল তখন বাড়াবাড়ি, আতিশয্য ও রুচিহীনতার প্রশ্ন ওঠেনি কেন? বাধাপ্রাপ্ত পানির যেটুকু উচ্ছ্বাস বাঁধ ভাঙার অব্যবহিত পরে তা কালের প্রবাহে পরিমিতি লাভ করবে। গণতন্ত্রে বিশ্বাস করলে গণতন্ত্রের উচ্ছ্বাসকে মেনে নিতে হবে। পরিসাংখ্যিক যোগ-বিয়োগের নিয়মে ইতিহাসের ঘটনা অতিরিক্তকে বর্জন করে যা যথার্থ ও সত্য তাকেই সমুজ্জ্বল রাখবে। একে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে ইতিহাসের কাছেই ইতিহাসকে অর্পণ করি না কেন?

চিরঞ্জীবী বিজয় দিবস

বিপুল আত্মত্যাগ ও অসংখ্য জীবনের বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ বিজয় এনে দিয়েছে। বাঙালি জাতির জন্য তার অর্জন হলো স্বাধীন বাংলাদেশ। এই বিজয় দিবস বহুমাত্রিকতায় উদ্ভাসিত। একটি সংগ্রামের ধারাবাহিকতা দীর্ঘদিন ধরে ক্রমসঞ্চিত দুঃখবোধ, ক্ষোভ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে জমে ওঠা ক্রোধের প্রকাশ। মুক্ত জীবনের জন্য দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন জাতি হিসেবে আমাদের ওপর অর্পিত যে দায়িত্ব, আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাষা, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য যে দীর্ঘ প্রয়াস, আত্মমর্যাদাবোধ, অর্থনৈতিক মুক্তি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা, যে জন্মগত অঙ্গীকার মানুষ হিসেবে নিজের কাছে ও বিশ্বের কাছে; বুদ্ধির মুক্তি, সৃষ্টিশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধের যে অনিবার্য লক্ষ্য প্রতিটি মানুষের—সবকিছুর অভিব্যক্তি আমরা দেখতে পাই বিজয় দিবসে।

এখানে একটি তাৎক্ষণিকতা আছে। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের সেই ক্রান্তিক মুহূর্তে যখন লাখ লাখ মুক্তিযোদ্ধা স্টেনগান হাতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা বহন করে বিজয়ের গান গেয়ে ফিরছিল ঘরে, যখন সমগ্র বাঙালি জাতি ফেটে পড়ছিল বিজয়ের আনন্দে; সেই মুহূর্তটি ছিল ইতিহাসের দীর্ঘকালের রেখায় একটি সময়ের বিন্দু। বিজয় দিবস ছিল বাঙালি জাতির জীবনে ঐক্যবদ্ধ হবার, বীরত্ব প্রকাশের, দেশপ্রেম প্রদর্শনের, আত্মত্যাগের, নিজেকে আবিষ্কার করার, অঙ্গীকার পালনের, অন্যায়কে প্রতিহত করার, বিশ্ববাসীর কাছে জাতীয় পরিচয় তুলে ধরার এবং বিপুল গৌরবে উদ্ভাসিত হবার অনন্য এক ঘটনা।

কালের সমুদ্রে বিজয় দিবসের মুহূর্তটি যে আকাশচুম্বী তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল, তার শক্তি সংগৃহীত হয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে। প্রতিবাদে, প্রতিরোধে, ক্ষোভ প্রকাশের অসংখ্য ঘটনা যে ঢেউ তুলেছে তারই শক্তি অভিসারী ও সমন্বিত হয়ে স্বাধীনতাযুদ্ধের বিপুল শক্তির জোগান দিয়েছে। সভায়, মিছিলে, বন্দিশিবিরে যে আবেগ ও যন্ত্রণাবোধ মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য জমা হয়েছে ইতিহাসের পাতায় তার সব অবদান রেখেছে বিজয় দিবসকে সার্থক করতে। গল্প, কবিতা, গানে, বক্তৃতার ভাষায়, প্রতিবাদ মিছিলে, শহীদের রক্তদানে যে চেতনার শিখা প্রজ্বলিত হয়েছে বাঙালির হৃদয়ে, সেই অনুভবের আগুন আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ডতা নিয়ে একসঙ্গে জ্বলে উঠে সৃষ্টি করেছে বিজয় দিবসের অগ্নিশিখা।

পাঠশালা, স্কুল, কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা যখন জ্ঞান লাভ করছে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ভূগোলের, জেনেছে ইতিহাসের ঘটনা, আধিপত্য সৃষ্টি, জবরদখলের, নৃশংসতার এবং সেখান থেকে মুক্তির জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মবলিদানে, সেখানে রোপিত হয়েছে বীজ নতুন ইতিহাস সৃষ্টির। শিক্ষক রাত জেগে যখন তৈরি করেছে পাঠ শিক্ষার্থীর জন্য; গবেষক তত্ত্বসৃষ্টি ও তত্ত্ববিশ্লেষণে ব্যয় করেছে ঘণ্টা, দিন, বছর; কৃষক ফসল ফলাতে গিয়ে দিয়েছে কঠোর শ্রম; শ্রমিক কারখানার চাকা ঘুরিয়ে তার পেশিকে শক্ত করেছে–এসবই ভিত্তি স্থাপন করেছে স্বাধীনতাযুদ্ধের। কারণ স্বাধীনতাযুদ্ধ ছিল জীবনের জন্য; যে জীবন শ্রমের, চেতনা লাভের, কর্মদক্ষতার, বুদ্ধির বিকাশের। দেশ ও মানুষকে ভালোবাসার। আমাদের বিজয় দিবস তাই কোনো আকস্মিক আলোর উদ্ভাস নয়; প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ফুলকি ছড়িয়ে যে বন জ্বলে ওঠে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে, তার উত্তাপ ও আলোর উৎস বৃক্ষের কাণ্ডে পল্লবিত শাখা-প্রশাখায়, ডাল ও পাতায় দীর্ঘদিন ধরে সূর্যের আলো শোষণ করে নিয়ে বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড, মাটি থেকে পানি ও নানা রাসায়নিক উপাদান সংগ্রহ করে সবুজ পাতায় সালোকসংশ্লেষণ ঘটিয়ে গাছের যে বৃদ্ধি ও শক্তির সঞ্চয় আপন দেহে দীর্ঘদিন ধরে, সেই শক্তি মুক্তি লাভ করে বৃক্ষের প্রজ্বলনে।

একটি জাতি অসংখ্য মানুষের শ্রমে, কর্মের সাধনায়, চেতনা ও সৃজনশীলতায় প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি ভালোবাসায় দীর্ঘদিন ধরে যখন গড়ে ওঠে, তার মধ্যে সঞ্চিত হয় বিপুল শক্তি। শান্ত ও সুপ্ত এই শক্তি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, নৃশংসতা ও অত্যাচারের উত্তাপে জ্বলে ওঠে আগুন হয়ে। স্বাধীনতাযুদ্ধের বাঙালি জাতির যে প্রস্তুতি, সেখানে জীবনের সাধনা, শক্তির জোগান দিয়েছে, সেই সঙ্গে সংস্কৃতির চর্চা, বুদ্ধির বিকাশ ও জ্ঞানের সাধনা দিয়েছে সেই রুচি, আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বাধীনতার প্রেরণা– যা জাতির সঞ্চিত শক্তিকে মুক্ত করেছে, সঞ্চারিত ও সমন্বিত করেছে স্বাধীনতাযুদ্ধের জন্য। বিজয় দিবসের সাফল্যকে তাই দেখতে হবে দীর্ঘকালের প্রস্তুতির মধ্যে অসংখ্য মানুষের অবদানে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে কৃষক, শ্রমিক, কর্মী, জীবন নির্বাহে নিয়োজিত সাধারণ মানুষ। সেই সঙ্গে জ্ঞানের সাধক, শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদসহ সব মানুষ। প্রথম দল দিয়েছে জীবনের বলিষ্ঠতাপূর্ণ সমাজের দেহ ও জীবনের শক্তি; দ্বিতীয় দল দিয়েছে জীবনবোধ, রুচি ও সৌন্দর্যচেতনা। বস্তুত এই বিভাজন শুধু বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য। কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ মানুষ গল্প শোনে, গান গায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ফসল উপভোগ করে, মূল্যবোধ ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। এই জন্যই শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার মূল্যপ্রাপ্ত বুদ্ধিগত কর্মরূপে। যারা চেতনার, সৌন্দর্যবুদ্ধি ও জ্ঞানের আলো সৃষ্টি করে, তারাও শেষ বিশ্লেষণে অনুপ্রেরণা লাভ করে সাধারণ জীবনের সুস্থতা ও

শক্তি থেকে। জীবনের প্রতিদিনের কাজ ও জীবনকে সুন্দর করার সাধনা তাই একীভূত, যেমন একীভূত জীবনের জন্য ভালোবাসা ও স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ।

আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধে স্বভাবতই ক্ষোভ ছিল, ক্রোধ ছিল, অন্যায় ও অবমাননার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা ছিল, প্রতিশোধ ও প্রতিরোধের আগুন ছিল, ছিল রক্তঝরা মৃত্যু ও প্রিয়জন হারাবার বেদনায় অশ্রুপাত—এসবই গভীর ত্যাগ ও মূল্য পরিশোধ জীবনের জন্য, স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদা লাভের জন্য। আমাদের বিজয় দিবস এসেছে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ভেতর দিয়ে। ফলে ৪০ বছর পর যে আলোর উদ্ভাস আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেখানে শহীদদের স্মৃতি ইতিহাসের ঘটনারূপে উজ্জ্বল; কিন্তু প্রথম বিজয় দিবস সদ্য-হারানো প্রিয়জনের শোক ধারণ করে যে গভীর যন্ত্রণা ও বেদনাবোধ মিশিয়ে দিয়েছিল বিজয় দিবসের আনন্দের সঙ্গে, তা এখন স্তিমিত। স্বাধীনতাযুদ্ধের অগ্নিঝরা দিনগুলোর ইতিহাস যারা পড়বে, তারা এর আলোটুকু শুধু লাভ করবে হয়তো, কিন্তু এর যে তাপ তা অনুভব করবে না। বিজয় দিবসের উৎসবে আমাদের মনে রাখতে হবে কী গভীর আত্মত্যাগ এই বাঙালি জাতিকে করতে হয়েছে স্বাধীনতার মূল্য পরিশোধ করতে। দীর্ঘদিনের শক্তি সঞ্চয় করে অসংখ্য মানুষের আত্মত্যাগ ও অবদানের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতার যে প্রস্তুতি এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের ভেতর দিয়ে যে চরম মূল্য পরিশোধ স্বাধীনতার জন্য, তার আলো ও চেতনার দীপ্তি অনন্তকাল ধরে প্রবাহিত হবে। আমাদের জীবনে এই সত্য যেমন আনন্দ ও তৃপ্তির স্বাধীনতাপ্রিয়দের জন্যে; তেমনি দুঃখ ও যন্ত্রণার স্বাধীনতাবিরোধীদের জন্য। বিজয় দিবসকে সফল করেই মাত্র আমরা পুরস্কৃত করতে পারি এ দেশের দেশপ্রেমিক নাগরিকদের, যেমন স্বাধীনতাবিরোধীদের ও দেশদ্রোহীদের প্রাপ্য শাস্তি নিহিত স্বাধীনতার উজ্জ্বল সাফল্যে।

বঙ্গবন্ধুর মুখোমুখি হবার অনন্য অভিজ্ঞতা

১৯৭২ সাল। বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানের কারাগারে বন্দিদশায় থেকে সবেমাত্র মুক্ত হয়ে এসেছেন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে। জীবনে বহুবার তিনি রাজবন্দী হয়েছেন, মৃত্যুর মুখোমুখিও। কিন্তু এই নয় মাসের বন্দিজীবন ছিল সবচেয়ে দুঃসহ। আপন দেশ ও দেশের মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন, আন্তর্জাতিক যোগাযোগহীন এক অন্ধকূপে আবদ্ধ নির্বাসিত জীবন। সেখানে প্রতিনিয়ত তাঁকে মৃত্যুভয় দেখানো হতো যদিও এই নির্ভীক মানুষটি নিজের জীবন নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার মানসিক অবস্থায় ছিলেন না। তাঁর আসল দুর্ভাবনা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের ফলাফল ও সমগ্র বাঙালি জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে। কারণ, তিনি জানতেন, তাঁর নিজের জীবন-মৃত্যুর দায়িত্ব তাঁর নিজের নয়, তা নির্ভর করছে শত্রুপক্ষের বিচার-বিবেচনার ওপর। কিন্তু বাংলাদেশের ও এর জনগণের জন্য যে ভাগ্য অপেক্ষা করছে তার দায়িত্ব তাঁর নিজের। এখানে কার্যকারণ সম্পর্ক এমনভাবে কাজ করেছে বলতে পারি, যেখানে বঙ্গবন্ধু ভেতর থেকে গড়ে উঠেছেন তাঁর ব্যক্তিত্বে, ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহের অভিঘাতে এবং তিনি নিজে স্বাধীনতা লাভের প্রধান কারণ হয়ে উঠেছেন তাঁর নেতৃত্বের মাধ্যমে। এই উপলব্ধি ও দায়িত্ববোধ তাঁকে এমন গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে, নিজের সম্পর্কে ভাবার কোনো অবকাশ ছিল না।

বঙ্গবন্ধুর নির্ভীকতা ও দৃঢ়তার উৎস আবিষ্কার করতে হলে এই উপলব্ধিটি প্রয়োজন যে নৈর্ব্যক্তিক নিঃস্বার্থ দৃষ্টি যখন ব্যক্তিমানুষকে বড় আদর্শ ও লক্ষ্যের মধ্যে আত্মস্থ করে ফেলে, তখন তাঁকে লোভ বা ভয় দেখিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট করা যায় না। বঙ্গবন্ধুর পাকিস্তানে কারাবাসের দিনগুলো ছিল একটি জাতির জন্মলগ্নের ক্রান্তিকাল, যার সমস্ত যন্ত্রণা ও উদ্বিগ্নতা বঙ্গবন্ধু অনুভব করেছেন। যুদ্ধের ভৌত যে ঘটনাপ্রবাহ, সেখানে বোমা, গ্রেনেড, গুলি, মৃত্যু, ধ্বংস, আগুন সবকিছু দৃশ্যমান ও পরিমাপযোগ্য, তার আড়ালে নির্বস্তুক এক যন্ত্রণাবোধ অদৃশ্য হয়ে কান্না বাড়ায় হৃদয়ে, যা অপরিমাপ্য ও অপ্রকাশ্য থেকে যায়। মানবিক উপলব্ধির সেই উত্তাপেই মাত্র সৃষ্টি হয় মূল্যবোধ ও দেশপ্রেম।

সাধারণ মানুষ অসাধারণ হয়ে ওঠে, যেমন প্রচণ্ড তাপ ও চাপে মাটির গভীরে জন্ম নেয় হীরা সাধারণ কার্বন পরমাণু থেকে এদের বিশেষ বন্ধনে ও বিন্যাসে।

বঙ্গবন্ধুকে বুঝতে হলে পাকিস্তানের কারাগারে তাঁর যন্ত্রণাকাতর দিনগুলোর কথা ভাবতে হবে যা তাঁকে বদলে দিয়েছিল বিশেষভাবে এবং যেমন তিনি রূপান্তরিত হয়েছেন ধাপে ধাপে বারে বারে নানা বিরুদ্ধতার মুখোমুখি হয়ে।

বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তান-কারাগারে প্রতিনিয়ত মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখানো হতো। তাঁর সত্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে জুলফিকার আলী ভুট্টোর ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যুবরণের আগে কারাগার থেকে এক গোপন চিঠি থেকে, যা ভারতের এক বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যদিও সারা জীবন বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা করেছেন ভুট্টো, তবু তাঁকে যে হত্যা করার আয়োজন চলছিল সে ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য তিনি তাঁর চিঠিতে লেখেন যে, শেখ মুজিবকে যেমন ভয় দেখানো হতো তাঁর জেল গেটের বাইরে কবর খুঁড়ে, তাঁর বেলাতেও তেমনটি ঘটছে। ভুট্টোকে শেষ পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝোলানো হয়, ফলে বঙ্গবন্ধুর বেলাতেও যে সেই প্রস্তুতি চলছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার বিশেষ ঘটনাটি তুলে ধরার আগে যে বিশেষ পরিস্থিতি ছিল সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের এবং বঙ্গবন্ধু কী মানসিক অবস্থান থেকে সেই অস্থির পরিস্থিতির মোকাবিলা করছিলেন, তার আভাস দেওয়া প্রয়োজন। পাকবাহিনী এবং তাদের দোসর রাজাকার ও আলবদর বাহিনী সমগ্র বাংলাদেশকে এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে গেছে। বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, দোকানপাট লুটপাট, কলকারখানা ভাঙচুর, ব্যাংক থেকে অর্থ পাচার, গুদাম থেকে সমস্ত মাল অপসারণ, নরনারী, শিশু হত্যা এবং শেষ মুহূর্তে বুদ্ধিজীবী নিধন—সব মিলে একটি নারকীয় কাণ্ড তারা ঘটিয়েছে। যুদ্ধের ছাপ বহন করে আছে সবকিছু। রাস্তাঘাট ব্যবহারের অযোগ্য, রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, পুলগুলো ভাঙা, নদীগুলো অব্যবহার্য, সামুদ্রিক বন্দর অকেজো, বিমানবন্দর থেকে প্লেনগুলো উধাও, ব্যাংক শূন্য কারণ কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পাকিস্তানিদের হাতে। মুক্তিযোদ্ধারা ফিরে আসছে অনেক সহযোদ্ধাকে হারিয়ে, কেউবা পঙ্গু হয়ে। ঘরে ফিরে দেখছে, অনেক প্রিয়জন মারা গেছে শত্রুদের হাতে।

শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী, ব্যবসায়ী, কৃষক ও শ্রমিক যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল এবং মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ করেছে পরম অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনায়, এবং ফিরে এসে ধ্বংস ও মৃত্যুর দৃশ্য দেখেছে, তাদের শান্ত হয়ে স্ব স্ব কর্মস্থলে যোগ দেবার মানসিক স্থিতিশীলতা তখনো আসেনি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হলো এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ভেতর দিয়ে। এই যুদ্ধ ছিল এক ভিন্ন ধারার। ইতিহাসে যার তুল্য ঘটনা বিরল। কারণ এই যুদ্ধে যারা বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করতে চেয়েছে বিদ্বেষ ও পরম শত্রুতায়, তারা অস্ত্র কিনেছে বাংলাদেশেরই পাট বেচা টাকায়, লালিত হয়েছে বাংলাদেশের সম্পদে। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির স্বরূপ নির্ধারণও ছিল কঠিন, কারণ এই ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃতি ছিল জটিল।

আমরা শুধু জীবন দেইনি যুদ্ধক্ষেত্রে, জীবন দিতে হয়েছে অসহায় শিশু, নারী, বৃদ্ধ ও সাধারণ মানুষকেও আপন গৃহে দগ্ধ হয়ে, গুপ্ত হত্যার শিকার হয়ে। নানা নির্যাতন, আতঙ্ক ও অবমাননার গ্লানি, ভস্মীভূত গৃহের মূল্যবান সব সামগ্রীর ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে মিশে একাকার হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধারা গৃহে ফিরেছে সহযোদ্ধা বন্ধুকে হারিয়ে এবং গৃহে ফিরে জেনেছে প্রিয়জনদের মৃত্যুর খবর, সেটাই সব ক্ষতি নয়; সব মৃত্যু নয়। মুক্ত বাংলায় ফিরে এসে দেখেছে অনেক পরিচিত জন রাজাকার হয়ে গেছে। প্রিয়জনদের দৈহিক মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই সব রাজাকারদের মানসিক মৃত্যু।

মনুষত্ব ও দেশপ্রেম হারিয়ে অমানুষে রূপান্তরিত হবার ভেতর দিয়ে অন্য এক মৃত্যু ঘটেছে অনেকের। অনেক ভণ্ড মুক্তিযোদ্ধা লুণ্ঠন ও চৌর্যবৃত্তিতে মেতে অপবাদ লেপন করেছে মুক্তিযোদ্ধাদের ভাবমূর্তিতে। অনেক স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার অস্ত্র হাতে ছদ্মবেশ ধারন করেছে ভণ্ড মুক্তিযোদ্ধার। অনেক মুক্তিযোদ্ধা আবার বিভ্রান্ত হয়েছে অন্যভাবে।

যখন অগ্নিকাণ্ড ঘটে, বহুদূর পর্যন্ত এর আলো ও তাপ ছড়িয়ে পড়ে। দূর থেকে এই দৃশ্য আলোকময়। কিন্তু যেখানে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে সেই স্থান-কালের দূরত্বহীন নিকট এলাকায় অনেক তাপ, যন্ত্রণার ছাপ ও কালো ধোঁয়া জমে। এসবই স্বাধীনতার মূল্য পরিশোধ।

মুক্তিযুদ্ধকে যারা তাই কাছ থেকে দেখেছে তাদের কাছে এর সামগ্রিক চিত্র অবিমিশ্র আনন্দ বা বেদনার নয়। মুক্তি লাভের তীব্র আনন্দ ও প্রিয়জনদের হারাবার গভীর বেদনার মিশ্রণে এক জটিল অনন্য অভিজ্ঞতা।

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ যে স্বাধীন এক নতুন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করল বিশ্বের মানচিত্রে, সেটা শুধু ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক স্বাধীনতা ছিল না, ছিল ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সামাজিক সম্পর্ক ও মানবিক মূল্যবোধ—সবদিক থেকে সার্বিক মুক্তি লাভ, কুসংস্কারমুক্ত, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ জাতিরূপে আত্মপ্রকাশের অঙ্গীকারব্দ্ধ ভবিষ্যতের স্বপ্ন অর্জন।

১৯৭২-এর ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১০ জানুয়ারি তিনি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টরূপে দায়িত্ব নিলেন। কিন্তু দুদিন পর ১২ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট পদ ছেড়ে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। প্রেসিডেন্ট হলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। বঙ্গবন্ধুর নিজের জীবন ও বাংলাদেশের অবস্থা দুই-ই মিশ্র এক অনুভূতিতে আলোড়িত হচ্ছিল সদ্য মুক্ত বাংলাদেশের প্রথম প্রহর। একদিকে পেছনে ফেলে আসা দুঃসহ সব শোক, বেদনা ও যন্ত্রণার স্মৃতি, অন্যদিকে মুক্তি লাভের অপার আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন। দশা পরিবর্তনের এই দিনগুলোতে বঙ্গবন্ধুর জন্য নতুন এক চ্যালেঞ্জ দেখা দিল। একদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত

বাংলাদেশের ভৌত কাঠামো গড়ে তোলা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন যাকে বলতে পারি বাহ্যিক সমস্যা। অন্যটি হলো মুক্তিযোদ্ধাদের আবেগ, দুঃখ, শোক এবং আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও প্রেরণাকে শান্তি ও গঠনমূলক কাজে ফিরিয়ে আনার মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি, যা অন্তর্গত। বাংলাদেশের অবস্থা তখন একজন সফল অস্ত্রোপচারকৃত রোগীর মতন, যে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছে। একদিকে নতুন জীবন লাভের আনন্দ ও উচ্ছলতা অন্যদিকে ক্ষতবিক্ষত দুর্বল শরীর যা ভেতর থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে সুস্থ ও স্বাভাবিক দেহে ফিরে আসতে। এই অস্ত্রোপচারে আর একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং তা হলো, বিষাক্ত রক্তপুঁজ যা অস্ত্রোপচারের পর বিযুক্ত হলেও অপসারিত হয়নি। অর্থাৎ স্বাধীনতাবিরোধী শত্রুরা পরাজিত হয়েও ছদ্মবেশে খুপচি মেরে আছে দেশের আনাচে-কানাচে। বাংলাদেশের সব সমস্যা ও সব সমাধানের জন্য বঙ্গবন্ধুকেই সবাই দায়ী করছে। তিনিই সব আশা-ভরসার কেন্দ্রবিন্দু, শুধু দেশে নয় আন্তর্জাতিক পরিসরেও। ছোট-বড় প্রতিটি ঘটনার ঢেউ তাঁকে গিয়ে স্পর্শ করত।

বঙ্গবন্ধুকে আমরা দেখেছি জনসভায়, রাজনৈতিক মঞ্চে, পার্লামেন্টে, কারাগারে, ভাষার অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার স্বায়ত্তশাসনের ও অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা অর্জনের সার্বিক প্রস্তুতিতে। এ সব ক্ষেত্রেই সমস্যা ছিল বাহ্যিক, শত্রু ছিল চিহ্নিত, লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট। কিন্তু সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে যে সমস্যার তিনি মুখোমুখি হলেন তা ছিল ভিন্ন ও জটিল। সব যুদ্ধেই যেমন হয়, বহু দল, বহু মত, সবাই উত্তেজিত, সবার প্রত্যাশা আকাশচুম্বী এবং সবকিছুর জন্য আবদার বঙ্গবন্ধুর কাছে। বঙ্গবন্ধুর অবস্থান অত্যন্ত কঠোর ও গভীরভাবে স্নেহশীল এক অভিভাবকের যাকে একই সঙ্গে দুষ্ট ও ভালো, আবেগ ও যুক্তি, দুঃখ ও আনন্দ, অতীতের দুঃস্বপ্ন ও ভবিষ্যতের আশাবাদ সবকিছু একই সঙ্গে ধারণ করতে হচ্ছে।

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর সংঘটিত একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বর্ণনার আগে তখনকার সার্বিক পটভূমি একটু বিস্তৃতভাবেই তুলে ধরতে হলো। কারণ বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক আদর্শ ও সমস্যা অবধারণ ও সমাধানের ক্ষমতা এবং বিনয়ের সঙ্গে ও নমনীয়তায় জনমতকে মূল্য দেবার অসাধারণ গুণ আমরা এই ঘটনা থেকে উপলব্ধি করতে পারি।

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরের সেই উত্তাল সময়ের, সঠিক তারিখটি মনে নেই। এক পড়ন্ত বিকালে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের পাশ দিয়ে শিক্ষকদের আবাসিক এলাকা ছুঁয়ে যে রাস্তাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছে, সেখানে একটি গাড়ি দ্রুত প্রবেশ করে। এর ঠিক সামনে তড়িৎকৌশল বিভাগের শিক্ষক ডক্টর নূরুল্লা যাচ্ছিলেন তাঁর গাড়ি নিয়ে। আবাসিক এলাকার এই রাস্তায় স্পিড ব্রেকার ছিল এবং গতির উচ্চতম সীমা নির্ধারক সাইনবোর্ডও ছিল। কিন্তু তা অমান্য করে বাইরে থেকে দ্রুতগতিতে আসা এই গাড়িটি প্রায় দুর্ঘটনা ঘটাবার

উপক্রম করে। এটি দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকজন শিক্ষক এই গাড়ির চালককে একটু রাগান্বিতভাবেই অভিযুক্ত করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে আগন্তুক তার গাড়ির পেছন দিকের বনেট খুলে একটি রাইফেল বের করে অভিযোগকারী অধ্যাপককে গুলি করতে উদ্ধত হয়। ঘটনাক্রমে আমি আমার বাসা থেকে বের হচ্ছিলাম এই পথে। তখন অবস্থা এমন ছিল যে আমরা সবাই দুঃসাহসী হয়ে উঠেছি স্বাধীনতা লাভের প্রেরণায়। এখন ভেবে অবাক হই, কীভাবে নিরস্ত্র হয়েও একজন অস্ত্রধারী ক্ষুব্ধ মানুষকে প্রতিহত করেছিলাম সেই সময়। আমি আগন্তুককে বলি, একজন নিরস্ত্র মানুষকে আপনি কীভাবে গুলি করতে যাচ্ছেন। যদি কিছু ঘটে থাকে তার বিচার অন্যভাবে হতে পারে। আমার বাধা প্রদানে আগন্তুক তার রাইফেল গাড়িতে রাখে, ছুটে গিয়ে অধ্যাপককে চড় মারল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্ল্যাটগুলোতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল মহিলারা। পুরো ব্যাপারটি প্রচণ্ড অপমানজনক মনে হলো। ভাগ্যক্রমে সেই সময় আমার এক ভাই সেখানে উপস্থিত হয়। সে বলল, আগন্তুক আসলে মুক্তিযোদ্ধা খসরু। স্বাধীনতাযুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে একজন পাকিস্তানি সৈন্যকে হত্যার অভিযোগ আনা হয় খসরুর বিরুদ্ধে। সেই মামলায় জুনিয়র আইনজীবী হিসেবে আমার সেই ভাই খসরুর বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় খসরুর পক্ষে কাজ করে। খসরু সেই মামলার অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়। সেই কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে সম্ভবত খসরু আমার ভাইকে সালাম জানায় এবং আমাকে ভাই হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ফলে আমার সঙ্গে কোনো দুর্ব্যবহার করেনি। পুরো ঘটনাটাই ঘটে আকস্মিকভাবে এবং মুক্তিযোদ্ধা খসরু দ্রুত সেখান থেকে চলে যায়।

এর পরের ঘটনাপ্রবাহ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। খসরু চলে যাবার পর উপাচার্য এবং অন্য শিক্ষকেরা নেমে এলেন ঘটনাস্থলে। সিদ্ধান্ত হলো থানায় মামলা করার। আমি বললাম, একজন মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে সরাসরি মামলা করতে গেলে ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। কারণ, তখন স্বাধীনতাবিরোধীরা নানা ছদ্মবেশে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এবং তারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে আছে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে কিন্তু সেটা হতে হবে ওপরের স্তরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিনিধিদল তখন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর কাছে যায়। তিনি প্রশ্ন করেন, এ ঘটনার জন্য তাঁর কাছে কেন অভিযোগ। উপাচার্য বলেন, প্রেসিডেন্ট যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্‌চেলর সেই জন্য তার কাছে বিচার প্রার্থনা। বিচারপতি বলেন, একমাত্র বঙ্গবন্ধু ছাড়া আর কেউ খসরুর বিচার করতে পারবে না। কারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে খসরু বঙ্গবন্ধুর খুব প্রিয়পাত্র।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল কক্ষে রুদ্ধদ্বার মিটিং হলো। সেখানে সিদ্ধান্ত হলো বঙ্গবন্ধুর কাছে বিষয়টি তুলে ধরতে ও অভিযোগ জানাতে শিক্ষকেরা একত্রে যাবেন। আমি তখন একজন জুনিয়র শিক্ষক, কিন্তু উপাচার্য মহোদয় ডক্টর

নাসের বললেন, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলার জন্য আমাকেই দায়িত্ব নিতে হবে। আমাকে নির্বাচনের পেছনে একটু পটভূমি আছে, স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিযোদ্ধাদের ওষুধ সরবরাহ করতে আমার সামান্য অবদান ছিল। আমার সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা একজন যেত ক্লিনার সেজে। হসপিটালে বর্জ্য ফেলার বাস্কেটে আবর্জনার নিচে কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধ ডাক্তার রেখে দিতেন এবং সেগুলো মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্তে নিয়ে যেত। আমি শুধু মধ্যস্থতা করতাম বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টির জন্য। কোনো কথা হতো না কারো সঙ্গে। বোবা কুশীলবের মতন নীরব ভূমিকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে আমার পরিচয় ছিল রক্ষাকারী আবরণ। স্বাধীনতার পর শহীদ মিনারে বুদ্ধিজীবীদের হত্যার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে যে শোকসভার আয়োজন হয় তাতে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমি আলোচনায় অংশ নিই। এমন ধরনের কিছু কাজের জন্য আমার যে পরিচয় ছিল তা হয়তো কারণ হয়ে থাকবে আমাকে এই অপ্রীতিকর ও বিব্রতকর আলোচনার নেতৃত্ব দিতে, যাতে ভুল-বোঝাবুঝির সম্ভাবনা কম থাকে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উপাচার্য মহোদয়সহ আমরা সকল শিক্ষক দল বেঁধে হেঁটে গেলাম প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দিকে। সে সময় বঙ্গবন্ধুর কার্যালয় ছিল রেসকোর্সের পূর্ব কোণের রাষ্ট্রীয় গেস্ট হাউসে।

সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত হয়েছিল বিকালবেলায়। আমাদের সঙ্গে ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরা যেতে চাইল। আমরা নিষেধ করলাম কারণ, এটা কোনো প্রতিবাদ মিছিল ছিল না অভিযোগ জানাবার, একটি যৌথ সাক্ষাৎকার মাত্র। ছাত্ররা তবু আমাদের সঙ্গে দূরত্ব রেখে আমাদের অনুসরণ করল। বঙ্গবন্ধু অফিসের সামনে আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। বঙ্গবন্ধু এলেন তাঁর গাড়ি দূরে রেখে পায়ে হেঁটে। আমরা যে ভেতরে বসার অনুমতি না পেয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছি তার প্রতি সম্মান জানাতেই হয়তো তিনি হেঁটে এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। জানতে চাইলেন, কী হয়েছে? তিনি নিশ্চয়ই ব্যাপারটি জেনেছেন আগে, তবু আমাদের কাছ থেকে জানতে চাইলেন আমাদের অভিযোগ।

আমি বললাম, বাইরের একজন দ্রুত গাড়ি চালিয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছিল প্রায়। এ ব্যাপারে একজন শিক্ষক তাঁকে অভিযুক্ত করায় শিক্ষককে সে লাঞ্ছিত করেছে। আমরা পরে জেনেছি এই আগন্তুক হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা খসরু। বঙ্গবন্ধু বললেন, দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে অনেক রকম সমস্যা। জেলখানায় এর ধারণক্ষমতার দশ গুণ বেশি বন্দী আছে। আপনাদের সবাইকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আমি বললাম, আমরা অবশ্যই ধৈর্য সহকারে সব কষ্ট মেনে নেব এই দুঃসময়ে, কিন্তু কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপস হতে পারে না। আমরা সব রকম কষ্ট করতে রাজি কিন্তু ন্যায় বিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেই মুক্তিযুদ্ধ। বঙ্গবন্ধু খুব নরম স্বরে বললেন, আপনাদের জন্য ক্যাম্পাসে প্রয়োজনে

পুলিশ দেব। আমি বললাম, আমরা সাধারণ নাগরিক। আমাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু চাই অপরাধের বিচার হোক।

এত দিন পর পেছনে তাকিয়ে মনে হয়, বঙ্গবন্ধুর মতন বিশাল ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে আমার ঐ দুঃসাহস দেখানো ঠিক হয়নি। তারুণ্য ও অনভিজ্ঞতা, সেই সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর উদারতা সম্পর্কে আস্থা এবং মুক্তিযুদ্ধের আবহে প্রাপ্ত আত্মমর্যাদাবোধ আমাকে ঐ সাহস জুগিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে নরম স্বরে কথা বলতে দেখে ছাত্ররা সাহস পেয়ে গেল। তারা বলল, বিচার না হলে তারা ক্লাস বর্জন করবে। বঙ্গবন্ধু এতে কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, তাহলে আমার কাছে এসেছ কেন?

আমি একাই সংলাপ চালাচ্ছিলাম। বললাম, স্যার, ওরা খুব মর্মাহত হয়েছে শিক্ষককে সবার সামনে লাঞ্ছিত করায় এবং আশা করেছে আপনিও মর্মাহত হবেন এই আচরণে। বঙ্গবন্ধু বললেন, অবশ্যই আমি মর্মাহত। খসরু যেয়ে শিক্ষকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, না হলে আমি তাকে জেলে পুরে ফেলব। এবং আরো কঠিন ভাষা ব্যবহার করলেন শাস্তির। শিক্ষক-ছাত্র সবাই এই শাস্তি ঘোষণায় সন্তুষ্ট হলো। খসরু পরের দিন এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং বিষয়টির একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান ঘটে।

ঘটনাটি মামুলি মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা যারা সমগ্র ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছি তারা অনুধাবন করতে পারি গভীরভাবে, বঙ্গবন্ধু কতটা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ লালন করতেন। কী অপার স্নেহ ও ভালোবাসা নিয়ে, সবার অভিযোগকে সহানুভূতির সঙ্গে শুনতেন এবং যান্ত্রিকভাবে নয়, মানবিকভাবে সুবিচার করতেন। তার নম্রতার উৎস ছিল মানুষের জন্য গভীর দরদ এবং তার দৃঢ়তা ও বর্বরতার আড়ালে কাজ করত অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও সুবিচারের জন্য তাঁর যুদ্ধ ঘোষণা।

তাঁর ঘোষিত শাস্তিও ছিল মানবিক এবং তা ছিল সংশোধনের লক্ষ্যে। ক্রোধ প্রকাশ, প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসারূপে নয়। তাঁর নীতিবোধ, আদর্শ জীবন থেকে নেওয়া। কোনো প্রতিষ্ঠিত মতবাদের অন্ধ অনুকারবৃত্তি ও যান্ত্রিক সমর্থন থেকে উৎসারিত নয়। বঙ্গবন্ধুর সব আচরণে সব সমস্যার সমাধানে একটি নিজস্ব সৃষ্টিশীলতার ছাপ দেখা যায় এবং সেখানেই যথার্থ মানবিকতার অভিব্যক্তি।

বিজয় দিবসের অফুরন্ত বৈভব

বিজয় দিবস বাঙালি জাতির সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা বলে আমরা জানি, যেখানে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দূরদৃষ্টি, প্রজ্ঞা ও সাহসিকতা; মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগ এবং সমগ্র জাতির চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আত্মোপলব্ধির চরম পরাকাষ্ঠা ঘটেছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাভূত করে স্বাধীনতা অর্জনের ভেতর দিয়ে। এটি ইতিহাসের একটি ক্রান্তিক ঘটনা— অনন্য ও উজ্জ্বল, কালের সমুদ্রে সৃষ্ট যেন আকাশচুম্বী এক তরঙ্গচূড়া। আমাদের প্রেরণা ও প্রচেষ্টার, প্রতিজ্ঞা ও স্বপ্নের ক্রমসঞ্চিত ও সমন্বিত ফসল। কিন্তু বিজয় দিবসের এই সাফল্য ও আনন্দ শুধু অতীতের ঘটনা নয়, স্মৃতিচারণার ও উৎসব পালনের। এই দিবসের মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য শুধু পেছন থেকে তাকিয়ে আবিষ্কারের নয়, বরং উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের নব নব চেতনায়।

এই বিজয় দিবসের মধ্যে বাঙালি জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের একটি চিরন্তন উৎস আমরা দেখতে পাই, যা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে স্বাধীনতাযুদ্ধের উত্তপ্ত দিনগুলোতে। গভীর ও চিরস্থায়ী যে আত্মোপলব্ধি বাঙালি জাতি অর্জন করেছে, তার প্রভাব নিঃশেষিত হওয়ার নয়। ভবিষ্যতের পথচলায় উদ্‌ঘাটিত এই তথ্য বাঙালি জাতিকে যেমন আত্মপ্রত্যয় দেবে, তেমনি স্বাধীনতার শত্রুদের জন্য ভীতিকর এক সাবধানবাণীরূপে কাজ করবে। অতীতের ঘটনা যেখানে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ও স্বপ্নকে নিয়ন্ত্রণ করে কার্যকারণের সম্পর্কে, সেখানে অতীত ও ভবিষ্যৎ সংযুক্ত অবিচ্ছিন্ন এক কালিক সূত্রে। সময়ের প্রবাহ ইতিহাসের ঘটনার উজ্জ্বলতাকে তাই স্তিমিত করে না। গভীরতর চেতনায় আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে ইতিহাসের ঘটনা ক্রমাগত গভীরতর তাৎপর্য ও দীপ্তি নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ইতিহাস তাই অন্তহীন এক সংলাপ অতীতের সাথে বর্তমানের এবং বর্তমানের সাথে অনাগত ভবিষ্যতের।

বাঙালি জাতির মুক্তিলাভের যে দীর্ঘ সংগ্রাম, সেখানে আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষাই শুধু প্রতিফলিত নয়, বরং বাঙালি জাতির আত্মত্যাগ প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া। বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতাবোধ, অধিকার সচেতনতা, ভাষা, সংস্কৃতি দেশের মানুষ ও দেশমাতৃকার

জন্য ভালোবাসার উপলব্ধি বাস্তব সব ঘটনাপ্রবাহের ভেতর দিয়ে ক্রমঅর্জিত। এ সবই ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরীক্ষা। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই বাঙালি জাতি তার চরিত্রবলে, আত্মমর্যাদাবোধে, অন্যায়ের প্রতিরোধে, সাহসিকতায় ও স্বপ্ন দেখায়, সৃজনশীলতা ও কর্মতৎপরতায় যে প্রতিভার অধিকারী, তা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে স্বাধীনতাযুদ্ধে বাঙালি জাতির বিজয়ে। নিজের শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে কল্পনাপ্রসূত ধারণা নয়। প্রমাণিত সত্য প্রতিভাত হয়েছে বিজয়ের আলোকে। প্রচণ্ড উত্তাপে অন্ধকারে উন্মুক্ত কোনো বস্তু যখন জ্বলে ওঠে, তখন তা শুধু পারিপার্শ্বিক বস্তুমালাকে দৃশ্যমান করে না, জ্বলন্ত বস্তুকেও উন্মোচিত করে সবার কাছে এর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যে। আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ বাঙালি জাতির বিভব শক্তিকে গতি, তাপ ও আলোর প্রভায় রূপান্তরিত করেছে। সেই আলোয় বিশ্ববাসী বাঙালি জাতিকে দেখেছে বিস্ময়ে; জেনেছে এই সত্য যে, এই জাতি নির্যাতন, শোষণ ও দুঃশাসনের কোনো এক সীমা অতিক্রম করলে তার বিরুদ্ধে জ্বলে ওঠে। পরীক্ষালব্ধ এই সত্য যেমন বিশেষ সময়ে ও বিশেষ জাতির জন্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তেমনি একটি সর্বকালীন সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে— যা সব জাতির জন্যই প্রযোজ্য।

আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ তাই একটি বিশেষ সময়ে সংঘটিত হলেও, আমাদের বিজয় একটি বিশেষ তারিখে অর্জিত হলেও এর প্রভাব যেখানে সর্বকালীন সেখানে অতীতের মধ্যে আমাদের ভবিষ্যৎ আমরা অবিষ্কার করতে পারি। ইতিহাসকে বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে এভাবে উপলব্ধি করেই মাত্র অতীতের সাথে ভবিষ্যতের সংলাপ সংঘটিত হতে পারে। একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধে সমগ্র বাঙালি জাতির ঝাঁপিয়ে পড়ার ঘটনাকেও এর পূর্বের ঘটনাপ্রবাহের আলোকে আমরা অনুধাবন করতে পারি।

১৯৪৭ সাল থেকে কিংবা তারও আগের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির সংগ্রাম আমাদের ভেতর ও বাইরে থেকে প্রস্তুত করেছে। আমরা যেমন নিজেদের আবিষ্কার করেছি, তেমনি জেনেছি স্বাধীনতা ও প্রগতির পক্ষে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী শত্রুদের। দৈহিক ও মানসিক শক্তি অর্জনের উপলব্ধি ও চেতনার বিকাশ ঘটাবার যে দীর্ঘ পথযাত্রা সময়ের মধ্যে ও অসংখ্য ঘটনার মধ্যে, তা অনুধাবন না করলে আমাদের বিজয় দিবসের উজ্জ্বলতা, এর তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্যের চিরন্তনতা আমরা বুঝতে ব্যর্থ হব। বাহান্নর ভাষা-আন্দোলন, চুয়ান্নর একুশ দফা আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছিষট্টির ছয় দফা আন্দোলন ও ঊনসত্তরের এগারো দফা আন্দোলন– সবই ক্রমবিস্তারমান তরঙ্গ, যার শক্তি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অভিসারী ও ক্রমসঞ্চিত হয়ে আকাশচুম্বী ঢেউ সৃষ্টি করেছিল স্বাধীনতাযুদ্ধের। স্বাধীনতাযুদ্ধের অসংখ্য উপাদান সংযুক্ত ও সমন্বিত হয়েছে— যেখানে সুস্থ ও সুন্দর জীবনের জন্য ভালোবাসা, আত্মসম্মানবোধ, স্বপ্ন দেখার শক্তি,

দেশ, দেশের মানুষ, ভাষা ও সংস্কৃতির জন্য গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা, শক্তি, সাহস, শৃঙ্খলা ও আদর্শের সৃজনশীল সংযোজন, নেতৃত্ব প্রদানের ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুণ– সবই অভিব্যক্ত স্বাধীনতাযুদ্ধে বাঙালি জাতির বিজয় অর্জনের ঘটনায়।

বিজয় দিবস পৌনঃপুনিকভাবে প্রতিবছরের ডিসেম্বরে ফিরে আসবে; কিন্তু সেখানে অতীতের সাফল্যের আলোটুকুই শুধু আমরা গ্রহণ করব না, আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের আবহে, বরং ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মদানের দৃষ্টান্তে যে স্থায়ী সত্য, কালনিরপেক্ষভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের, যে অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা আমরা করেছি নিজের কাছে— মানবিক অধিকার, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও প্রগতিশীলতার মহিমাকে বিকশিত করার, তা অপার এক দায়িত্ব অর্পণ করেছে আমাদের ওপর। বিজয় দিবসে এই চেতনা ও উপলব্ধি আমাদের অতীতের অহংকার নয়, আগামী দিনের আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তির বৈভব। যত দিন যাবে বাঙালি জাতি তার বৃহত্তর জনসংখ্যা ও গভীরতর চেতনা নিয়ে বিজয় দিবসের মহিমাকে আরো উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত করবে। এই সত্য যেমন আমাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধাবোধ জাগাবে, বিজয় দিবসের প্রতি আনন্দের শিহরণে, তেমনি যারা স্বাধীনতা, মানবিকতা ও প্রগতির শত্রু তাদের ভীত, শঙ্কিত ও দুর্বল করবে আত্মগ্লানিতে হৃৎকম্পন সৃষ্টি করে।

স্বাধীনতা : সম্মুখদৃষ্টিতে

আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস রক্তরঞ্জিত, ভারাক্রান্ত অসংখ্য শহীদের করুণ আত্মাহুতির স্মৃতিতে। সেই সাথে উজ্জ্বল বিজয়ের আনন্দে ও উদ্ভাসিত মুক্তির গৌরবে, যা অর্জিত হয়েছে আত্মত্যাগ, সাহসিকতা, দেশপ্রেম, ঐক্য ও নেতৃত্বের অনন্য দৃষ্টান্তে। দীর্ঘদিনের দমনমূলক আচরণ, কায়েমি স্বার্থের প্রতাপ; লুণ্ঠকদের দাপট, প্রতারণা ও কপটতা বাঙালি জাতিকে বঞ্চিত করে এসেছে। এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ; শোষণ ও শক্তি প্রয়োগের বিরুদ্ধে আমাদের ক্ষোভ আমাদের প্রস্তুত করেছে স্বাধীনতাসংগ্রামের জন্য। শক্তি প্রয়োগ ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, আমাদের দুঃখ ও বেদনার প্রকাশ, আমাদের অশ্রুপাত, আমাদের মৃত্যু সবই ঋণাত্মক ঘটনা মনে হয়। কিন্তু স্বাধীনতা আসলে একটি ধনাত্মক ঘটনা, একটি ইতিবাচক প্রতিভাস। স্বাধীনতার চেতনায় যাঁরা তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছেন স্বাধীনতার বেদিমূলে, তাঁরা তাঁদের রক্তের চেয়েও রক্তিম এক উজ্জ্বলতা প্রত্যক্ষ করেছেন স্বাধীনতার পতাকায়।

অসংখ্য জীবন যেখানে ঝরে গেছে স্বাধীনতাযুদ্ধে, সেখানে তা ঘটেছে জীবন মূল্যহীন বা সহজলভ্য ছিল বলে নয়। পরাধীনতার গ্লানি নিয়ে কোনো মুক্তিযোদ্ধা আত্মহত্যা করেননি, বরং জীবনকে ভালোবেসে স্বাধীনতার অপার মূল্য অনুধাবন করে জীবন যেখানে উৎসর্গিত, সেখানে সুন্দর এক ভবিষ্যতের স্বপ্ন উৎস ছিল প্রেরণার। একজন মুক্তিযোদ্ধা কোনো গভীর বনে অথবা নদীর পাড়ে অস্ত্র হাতে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে মোকাবিলা করেছে শত্রুর। সেখানে তাঁকে মনে হতে পারে একা, যে হিংস্রতা ও ঘৃণা নিয়ে শত্রুর জীবননাশের লক্ষ্যে দাঁড়িয়ে আছেন অন্ধকারে। আসলে এই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন সমগ্র বাঙালি জাতিকে তাঁর স্মৃতিতে ধারণ করে অসংখ্যের মধ্যে একাত্ম ও লীন। তার প্রাণে ছিল অপার ভালোবাসা মাতৃভূমি ও দেশের মানুষের জন্য। তাঁর চোখে কোনো হিংস্রতা ছিল না, ছিল ভালোবাসা ও স্বপ্ন স্বাধীনতার জন্য। জীবনকে প্রস্ফুটিত দেখার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত হয়ে অসংখ্য জীবনকে বাঁচাবার জন্যই তুলে নিয়েছিলেন অস্ত্র। অন্ধকার নয়, স্বাধীনতাবোধের একটি আলোর উদ্ভাস তাঁকে আলোকিত করেছিল। স্বাধীনতা তাই রক্তপাত, যন্ত্রণাবোধ, ঘৃণার প্রকাশ, মৃত্যুবরণ, কান্না, অশ্রুপাত— সবকিছুর ভেতর দিয়ে দুর্গম ও দুঃসহ পথ অতিক্রম করে উজ্জ্বল ও অন্তহীন সম্মুখযাত্রা।

স্বাধীনতার উৎস যেখানে নিহিত ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্নে, অসংখ্য মানুষের প্রেরণায়, সেখানে এর ঠিকানা পরিব্যাপ্ত মহাকালে এবং বিস্তৃত সমগ্র মানবসভ্যতায়। যদিও মৃত্যুর পথ বেয়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা, কিন্তু স্বাধীনতার উৎস ও ব্যাপ্তি জীবনে। মৃত্যু মুহূর্তের ঘটনা, কিন্তু জীবন অনন্ত এর পরম্পরায়। বেদনাবোধ ও অশ্রুপাত যেখানে ব্যক্তিগত সেখানে তা দুঃখের, কিন্তু উদার আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে যখন তা উজ্জ্বল, তখন তা মহিমান্বিত ভবিষ্যতের প্রেরণার উৎসরূপে। একেকজন শহীদ একেকটি হারিয়ে যাওয়া দেশপ্রেমিক নন, বরং তাঁদের দৃষ্টান্তে আমরা আবিষ্কার করেছি কী দীপ্ত সাহসিকতায় কী অপার দেশপ্রেম ও আত্মসম্মানবোধে জেগে উঠতে পারে আমাদের তরুণেরা, দেশমাতৃকার অবমাননার বিরুদ্ধে। স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস তাই অতীতের ঘটনা নয়, বরং ভবিষ্যতের পথ চলার উজ্জ্বল প্রত্যয়।

স্বাধীনতা প্রপঞ্চিত বিস্তৃতকালের মধ্যে, পরিব্যাপ্ত স্থানের মধ্যে, মানবজাতির বহুতার মধ্যে। স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে ক্রমসঞ্চিত অভিজ্ঞতা, চেতনা, আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদাবোধ, শক্তি সংগ্রহ, সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও মানবিক অধিকারবোধের অভিব্যক্তিরূপে। যেখানেই লুণ্ঠন, কায়েমি স্বার্থ, প্রতারণা, শোষণ, সেখানেই অক্ষমতা, জড়তা, কুশ্রীতা, কর্মহীনতা, আলস্য ও অন্ধকার। স্বাধীনতা তাই ব্যক্তিমানুষের স্বেচ্ছাচার নয়; স্বাধীনতা মানুষের আত্মশক্তির উদ্বোধন, সৃজনশীলতা ও কর্মতৎপরতার অভিব্যক্তি; জড়তা, অজ্ঞতা ও হীনম্মন্যতার বিরুদ্ধে মানবতার জাগরণ।

স্বাধীনতাসংগ্রাম কোনো বিশৃঙ্খল বিদ্রোহ নয়, শক্তির যথেচ্ছ প্রকাশ নয়; নেতৃত্বহীন বিস্ফোরণ নয় ক্ষোভ ও ঘৃণার। একটি দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস কালিক চেতনার প্রভাবেই শুধু রূপ লাভ করে। একটি জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম জাগ্রত হয় গভীর ও সূক্ষ্ম সাংস্কৃতিক আবহে যেখানে অসংখ্য মানুষের সৃজনশীলতা, অন্তর্দৃষ্টি, শ্রম ও সাধনা পারস্পরিক যোগাযোগ সৃষ্টি করে; দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে উপলব্ধির আলোকে। যারা অক্ষম পরাশ্রয়ী, আত্মকেন্দ্রিক ও অন্ধ, তারাই শুধু লুণ্ঠন, প্রতারণা ও হিংস্র শক্তির প্রতাপে আধিপত্য বিস্তার করে। স্বাধীনতার চেতনা হচ্ছে সেই উপলব্ধি যা মানুষের কর্মক্ষমতা, প্রতিভা ও সৃজনশীলতাকে সমস্ত অবরোধ ও দুঃশাসন থেকে মুক্ত করে। স্বাধীনতার এই অর্জনের পথে যে নিষ্ঠুরতা, যে ঘৃণার প্রকাশ, রক্তক্ষরণ ও অশ্রুপাত তা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকর; স্বাধীনতার উজ্জ্বল অর্জনের অনন্ত ভবিষ্যৎ, স্বাধীনতার অসংখ্য সৃষ্টির পেছনে সুন্দরের জন্য ভালোবাসা, শৈল্পিক দৃষ্টি, সাহসিকতা, দেশপ্রেম ও সৃজনশীলতার তুলনায়।

প্রতিটি মানুষের ওপরে অর্পিত যে দায়িত্ববোধ সভ্যতা অর্পণ করেছে, কর্মদক্ষতা, সৃজনশীলতার ভেতর দিয়ে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রকাশের, তারই প্রকাশ

ঘটার কথা আমাদের সহজাত স্বাধীনতাবোধে। স্বাধীনতা তাই সর্বজনীন এক লক্ষ্য সমগ্র মানবজাতির। নানা দেশে ও নানা কালে শোষণ ও দমননীতির পথ ধরে পরজীবীর মতো যারা শোষণ করেছে অন্যদের শ্রমের অর্জন, তারা শুধু শত্রু নয় কোনো নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠীর; তারা শত্রু সমগ্র মানবজাতির। এই শোষণ ও লুণ্ঠন থেকে একটি মানুষের মুক্তি একটি জাতির মুক্তিকে ত্বরান্বিত করে, যার সে অধিবাসী। একটি জাতির স্বাধীনতা মানবজাতির স্বাধীনতাকে সহায়তা করে, ত্বরান্বিত করে সভ্যতার অগ্রযাত্রা—প্রতিটি জাতি যার অংশীদার।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের যে দীর্ঘ ইতিহাস, তার ভেতর দিয়েই আমরা আবিষ্কার করেছি আমাদের শক্তি ও সম্ভাবনা। এই স্বাধীনতাকে শুধু পেছনে তাকাবার দৃষ্টি নিয়ে আমরা উপলব্ধি করব না; ভবিষ্যতের যে স্বপ্ন ও সম্ভাবনা এই স্বাধীনতা দিবসের ইতিহাসে নিহিত তাকে আমরা অবধারণ করব সম্মুখদৃষ্টিতে। স্বাধীনতার এই অর্জন শুধু আমাদের বিজয়লাভের আনন্দকে ধারণ করে না, এর শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চারিত সমগ্র মানবজাতিতে; যেমনটি ঘটেছে আমাদের স্বাধীনতার অনুঘটক ঘটনা ভাষা আন্দোলনে; বিশ্ব মাতৃভাষা দিবসরূপে একুশে ফেব্রুয়ারির স্বীকৃতিতে।

আমরা বলেছি, স্বাধীনতা কোনো লক্ষ্যহীন, নেতৃত্বহীন, বিশৃঙ্খল ঘটনার ফসল নয়। একটি দ্রুতগামী রেলগাড়ির দিকে তাকিয়ে মনে হতে পারে এর গতিশক্তি আসছে এর ইঞ্জিনের চুল্লিতে দাহ্যমান তেল বা কয়লা থেকে। সত্যি যে, চুল্লিতে দগ্ধ হয়ে কয়লাগুলোই জোগান দিচ্ছে সমস্ত তাপশক্তির; সেই শক্তিকে সমন্বিত ও অভিসারী করে সমগ্র রেলগাড়িকে গতিশীল ও দূরলক্ষ্যে নিয়ে যাবার জন্যই ইঞ্জিনটি কাজ করে এর সমগ্র নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার ভেতর দিয়ে। আমাদের স্বাধীনতাও অর্জিত হয়েছে অসংখ্য মানুষের আত্মত্যাগ ও অবদানের ভেতর দিয়ে। কিন্তু লুণ্ঠন ও শোষণের বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত ক্ষোভ ও ঘৃণা স্বাধীনতাযুদ্ধের আগুনে রূপান্তরিত করতে এবং সে আগুন থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখার আলো সৃষ্টির যিনি স্থপতি সেই বঙ্গবন্ধুকে অবধারণ করতে না পারলে আমাদের সম্মুখদৃষ্টি অস্বচ্ছ হয়ে পড়বে। বিক্ষিপ্ত আগুনের মতো আমাদের অনেক ত্যাগ ও অবদান যে ব্যর্থ হয়ে গেছে; তার কারণ আমরা স্বাধীনতার তাপটুকু অনুভব করেছি; কিন্তু এর আলোটুকু গ্রহণ করতে পারিনি দৃষ্টির স্বচ্ছতায়– যা আমাদের সম্মুখদৃষ্টিকে দূরলক্ষ্য করতে পারে।

স্বাধীনতা প্রিয় স্বাধীনতা

স্বাধীনতা একটি উজ্জ্বল প্রতিভাস; একটি আলোর উদ্ভাস। স্বাধীনতা নিয়ে নাটকীয়তা আছে, আছে চেতনার উজ্জ্বলতা, আত্মত্যাগ ও সাহসিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত; আছে বিজয়ের উল্লাস; প্রিয়জনকে হারাবার বেদনা। স্বাধীনতা অর্জনের প্রপঞ্চ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যত অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, বিস্ময় ও আনন্দ; তার তীব্রতা দিয়ে স্বাধীনতার মর্ম ব্যাখ্যাত নয়। স্বাধীনতার ঘটনার সবচেয়ে গভীর ও অনন্য বৈশিষ্ট্যি হলো, এর সামগ্রিকতা ও কালিক বিস্তৃতি। এই সামগ্রিকতা এ দেশের সমগ্র মানুষ নিয়ে। পথ চলার, কথা বলার, কাজ করার, নিজেকে রক্ষা করার ও আত্মপ্রকাশের যে আকুতি প্রতিটি মানুষের; যে অধিকার একটি মানুষের বেঁচে থাকার, স্বপ্ন দেখার, ইচ্ছা পূরণের, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে উন্নততর জীবনের পথে অগ্রসর হবার— এসবই ব্যক্তিগত।

দেশ ও কালের ঠিকানাবিহীন প্রতিটি মানুষের জন্মগত এই অধিকার মানবিক অধিকাররূপে স্বীকৃত। প্রতিটি মানুষের যে স্বকীয়তা, যে আত্মপরিচয় ও আত্মোপলব্ধি, যে আত্মসম্মান ও অহংবোধ— সবই মূল্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগত অধিকাররূপে মানবতাবাদে। যতই দুর্লভ ও মূল্যবান হোক ব্যক্তিমানুষের এই বৈশিষ্ট্য ও অধিকার তা স্থান, কাল ও সমাজনিরপেক্ষ। কিন্তু একটি জাতি যখন গড়ে ওঠে ও বিকাশ লাভ করে একটি ভৌগোলিক পরিবেশে, তখন একটি স্থানিক ঠিকানা সৃষ্টি হয়।

বিশেষ স্থানে এই যে ভৌগোলিক ঠিকানা— মাটি, পাহাড়, নদী, আকাশ, সমুদ্র, গাছপালা, ঝড়-বৃষ্টি, আবহাওয়া সব মিলে যে নিসর্গ, তা একটি পরিব্যাপ্ত স্থানিক প্রসঙ্গ-কাঠামো সৃষ্টি করে। একবার যখন আপন এই ভৌত পরিবেশের মধ্যে কেউ বড় হয়, একটি ঠিকানা সে লাভ করে; তখন সে আর স্থাননিরপেক্ষ থাকে না। ভৌগোলিক ঠিকানা বলতে অবশ্য অক্ষাঙ্ক ও দ্রাঘিমাঙ্ক বোঝায় না, বরং সেই বিশেষ এলাকায় যে পরিবেশ ও প্রতিবেশ প্রাণী, গাছপালা, ভূ-প্রকৃতি ও নিসর্গ নিয়ে এর জটিলতা ও বৈচিত্র্যে— সেসব কিছুই হয়ে ওঠে এই ঠিকানা। একজন নিঃসঙ্গ মানুষের ঘটনাবিহীন জীবন কালিক প্রবাহকে ধারণ করে না। কিন্তু যে সমাজ ও দেশ ঘটনার প্রবাহের মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত, সেখানে ঘটনার বিন্যাস এদের পারস্পরিকতা ও স্মৃতিকালের প্রবাহকে চিহ্নিত করে রাখে। অসংখ্য এসব ঘটনার

অভিঘাত; আনন্দ-বেদনার, জয়-পরাজয়ের, উচ্ছ্বাস ও বিমর্ষতার চাপ সৃষ্টি করে প্রতিটি জাতির ইতিহাস। ইতিহাস তাই এক অমোঘ সময়ের ঘড়ি, যেখানে পর্যায়ক্রমে ঘটে আসা ঘটনাগুলো সময়কে চিহ্নিত করে রাখে নানা উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল চিহ্নরূপে। একটি জাতির কালিক চেতনা শুধু ইতিহাসেই বিধৃত নয়, অতীতের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে এই কালিক চেতনা প্রক্ষিপ্ত অনাগত ভবিষ্যতেও— যেখানে নানা স্বপ্ন ও প্রত্যাশা লালিত আগামী দিনের সম্ভাব্য ঘটনামালার মধ্যে।

একটি সমাজ বা জাতির অন্তর্গত যে মানুষ, সে আরও একভাবে ভিন্ন ও অনন্য, জাতীয় ঠিকানাহীন, নিঃসঙ্গ একজন মানুষ থেকে। সমাজবদ্ধ মানুষ যে পরিচয়ে, মূল্যবোধে, বিশ্বাসে, রুচিতে এবং যে অহংকার, স্বপ্ন ও প্রত্যাশায় উজ্জীবিত—এর সবটাই তার নিজস্ব নয়। পারস্পরিক বন্ধনে, সংযোগ ও সংলাপে, কর্মে, সংগ্রামে, উৎসবে ও আনন্দের অনুভবে সে মিশে আছে অসংখ্যের মধ্যে। একটি সময় ছিল যখন একজন পদার্থবিজ্ঞানী ভাবতেন, একটি বৈদ্যুতিক চার্জের যা-কিছু শক্তি তা বন্দী হয়ে আছে ওই বৈদ্যুতিক চার্জ বহনকারী কণিকার মধ্যে। আধুনিক ক্ষেত্রতত্ত্ব এই বার্তাই বহন করে যে, বিচ্ছিন্ন কতকগুলো বৈদ্যুতিক চার্জ যদি ছড়িয়ে থাকে স্থানের মধ্যে পরস্পরের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে, সেখানে শক্তি ছড়িয়ে আছে পরিব্যাপ্ত স্থানের মধ্যে যত দূর পর্যন্ত এদের প্রভাববলয় বিস্তৃত। বৈদ্যুতিক চার্জগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে ভাবার এবং এদের শক্তির হিসাব বিচ্ছিন্নভাবে করার কোনো অবকাশ নেই। শুধু বৈদ্যুতিক চার্জের সমাবেশ কেন? এই ক্ষেত্রতত্ত্বের ধারণা প্রযোজ্য সমগ্র বস্তুজগতে।

আমাদের সৌরজগৎ সূর্য এবং এর গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে যে-ব্যবস্থা, সেখানেও এদের সামগ্রিক চলাচল শক্তি ও গতিপথ নিয়ন্ত্রিত পারস্পরিক মহাকর্ষবলের প্রভাবে। একটি জাতি একটি ব্যবস্থা; সেখানে ব্যক্তিমানুষ বিচ্ছিন্ন নয় একক অধিকার ও মূল্যবোধে। আবেগ, ভালোবাসা, পারস্পরিক স্নেহ ও মমত্ববোধ এবং শ্রদ্ধায় আমরা সম্পৃক্ত ও সমন্বিত, এমনকি প্রতিযোগিতা বিদ্বেষ ও শত্রুতাও যেখানে পরস্পরকে প্রভাবিত করে—সেটাও সামাজিক প্রভাববলয়ের অন্তর্ভুক্ত। বাঙালি হিসেবে আমরা যখন আমাদের অধিকারের কথা বলি, আমাদের চেতনা ও অহংকারের কথা; সেখানে আমাদের ইতিহাস, আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি, আমাদের সম্মিলিত স্বপ্ন ও প্রত্যাশা একীভূত হয়ে নতুন এক সম্বিত সৃষ্টি করে— যেখানে আমাদের স্থানিক ঠিকানা এর বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে যেমন উপস্থিত, তেমনি উপস্থিত ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা, যেখানে বিধৃত ইতিহাস। সেই সঙ্গে অনাগত সম্ভাব্য ও স্বপ্নময় ঘটনাও। স্থান-কালের মাত্রার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে আমাদের যৌথ চেতনা, যেখানে আমরা চিহ্নিত বাঙালি জাতি হিসেবে— আমাদের ভাষা, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, আমাদের কর্মতৎপরতা, সৃজনশীলতা ও উদ্দীপনায়। একটি জাতি তাই বহুমাত্রিক এক প্রতিভাস— যাকে অনুধাবন করতে

হবে এর স্থান, কাল ও জাতিসত্তার বিকাশের ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আলোকে।

আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামের আড়ালে যে পটভূমি তা অসংখ্য উজ্জ্বল ঘটনাকে ধারণ করে আছে সাহসিকতা, ত্যাগ, দেশপ্রেম ও সাংস্কৃতিক চেতনার দৃষ্টান্ত বহন করে। এ সমস্ত ঘটনাই ধাপে ধাপে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনাকে অভিসারী করে একটি সমুজ্জ্বল রূপ প্রদান করেছে। আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম, আমাদের ভাষা আন্দোলন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও মানবিক চেতনাকে ক্রমাগত উন্নত, গতিশীল ও আধুনিক করার যে প্রচেষ্টা, তা আমরা অর্জন করেছি আমাদের সম্যক দৃষ্টি, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও সৃজনশীলতার ভেতর দিয়ে। স্বাধীনতা অর্জন তাই কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়, আকস্মিক বা অলৌকিক নয়; এখানে প্রস্তুতি ছিল, দূরদৃষ্টি ছিল, ছিল আত্মত্যাগ, সাহসিকতা ও নেতৃত্ব।

ইতিহাসের ঘটনার বৈশিষ্ট্য হলো, অসংখ্য ঘটনার পরম্পরায় এদের কার্যকারণ, প্রভাব ও অভিসারিতায় এর গতিপথ অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং এসব ঘটনার প্রভাবকে দেশপ্রেম, সৃজনশীলতা ও চেতনার উজ্জ্বলতায় মানবিকভাবে ধারণ করেই মাত্র সৃষ্টি হয় নেতৃত্ব, যেমন প্রস্তুত হয় নেতৃত্বের দিকনির্দেশনায় সে দেশের মানুষ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। কোনো দেশের স্বাধীনতা লাভের প্রপঞ্চ ঘটনাকে উপলব্ধি ও অবধারণ করতে হলে সেই স্বাধীনতার নেতৃত্বদানকারী ও সংগ্রামী মানুষদেরও চিনতে হবে। যারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস, স্বাধীনতার ডাক দেবার পরিবেশ সৃষ্টি ও নিজেকে প্রস্তুত করার ঘটনাপ্রবাহকে অবধারণ করতে ব্যর্থ, সেই সঙ্গে সমগ্র বাঙালি জাতির ঐক্যবদ্ধ চেতনালাভের ঘটনা; তাদের জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার তাৎপর্য, এর গুরুত্ব ও প্রভাবকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আমাদের স্বাধীনতার সমুজ্জ্বল ঘটনা শুধু আমাদের জন্যই নয়, সমগ্র মানবসভ্যতার জন্য একটি অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত– যা পরিপূর্ণ ও উদ্ভাসিত নানা বৈশিষ্ট্যে।

কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, সম্প্রদায়িকতা, পশ্চাৎপদতা ও জড়তা অতিক্রম করে উদার, মানবিক, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, বিজ্ঞানভিত্তিক এক আধুনিক সমাজ গড়ার প্রত্যয় ও পরিকল্পনা নিয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছিল ছাব্বিশে মার্চ। আমরা ৪০ বছর পার হয়ে এসেছি স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম দীপ্ত ঘোষণার মুহূর্ত থেকে। মাঝখানে অনেক কালো মেঘ ও দুর্যোগের ঘনঘটা আমাদের স্বাধীনতার সূর্যকে আচ্ছন্ন করার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের ঘটনা যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের স্বাধীনতা, তা অন্যসব কাকতালীয় ঘটনার মতো ধীরে ধীরে ম্লান হয় না, বরং তা সময়ের প্রবাহে আরও উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হবে। এ সত্য যতটা গভীরভাবে আমাদের উপলব্ধির, ততটাই শঙ্কার কারণ স্বাধীনতার শত্রুদের।

স্বাধীনতা অসংজ্ঞায়িত এক শব্দ

স্বাধীনতা কথাটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে নানা দেশে নানা কালে। বিচিত্র অর্থে ব্যবহৃত এই শব্দটি কালের ছাপ বহন করেছে সভ্যতার বিকাশের ভেতর দিয়ে। অনেক অসংজ্ঞায়িত, অশেষ ও অসমাপ্ত ধারণার মতোই স্বাধীনতা শব্দটির অর্থের সীমানা অনির্দিষ্ট শুধু নয়, এর অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের কারণে অনির্বচনীয়। রাজনৈতিক পটভূমিতে স্বাধীনতা বলতে বিশেষ এক জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্র গঠনের ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব নির্বাচনের স্বাধীনতা বোঝানো হয়ে থাকে। যার ফলে, সে রাষ্ট্রের জনগণ সংখ্যাধিক্যের মতানুসারে নির্ধারণ করতে পারে কে হবে তাদের শাসক এবং কেমনভাবে শাসিত হবে দেশ। এই জাতীয় স্বাধীনতার পাশাপাশি, বরং বলা উচিত এরই অবিচ্ছিন্ন অংশরূপে, রয়েছে ব্যক্তিস্বাধীনতা, যেখানে প্রতিটি মানুষ স্বাধীনভাবে তার অভিমত প্রকাশ করতে পারে, নির্বাচন করতে পারে আপন জীবনধারা এবং নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে। এই ব্যক্তিস্বাধীনতা হতে পারে বাহ্যিক অথবা অন্তর্গত বা মানসিক। বাহ্যিক স্বাধীনতা সম্পর্কিত ভৌত পরিবেশের সাথে। এই বাহ্যিক স্বাধীনতার দ্বারাই মানুষ নির্ধারণ করে তার কর্মজীবন ও দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড। তার গৃহে খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, চলাফেরা, ব্যবহৃত যানবাহন, আসবাবপত্র— সবকিছুতেই ব্যক্তিমানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছার ছাপ রাখতে চায়। ব্যক্তিমানুষের পেশা, সম্পদের সংগ্রহ ও ব্যবহার এই বাহ্যিক স্বাধীনতারই প্রকাশরূপে গণ্য। বাহ্যিক এই স্বাধীনতার বিপরীতে মানুষের যে অন্তর্গত স্বাধীনতা তা মানুষের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

একজন মানুষের শিক্ষা, মূল্যবোধ ও চেতনা তার সাংস্কৃতিক জীবন, বিশ্বাস ও নৈতিকতা মানসিকভাবে কতটা তাকে মুক্ত রাখে সেটাই এই অন্তর্গত স্বাধীনতার মাপকাঠি; কিন্তু মানসিক স্বাধীনতা যেখানে কোনো মানুষকে অবাস্তব কল্পনা এবং অলৌকিক ভাবনার জগতে বিচরণের স্বাধীনতা দেয়, সেখানে তা পাগলামিরূপে গণ্য অথবা অস্বাভাবিক আচরণরূপে। এই অর্থে নিছক চিন্তার স্বাধীনতা এবং অবাধ ও অবাস্তব মুক্ত কল্পনা মূল্যহীন মনে হতে পারে। অন্যদিকে বস্তুগত সম্পদ লাভের যে স্বাধীনতা তা যদি চিন্তা, কল্পনা, মূল্যবোধ ও আদর্শবঞ্চিত হয়, ফলে হয়ে ওঠে একান্তই যান্ত্রিক; তাকে স্বাধীনতা বলা যায় না। আমরা যদিও বলে থাকি বন্য পশুরা স্বাধীনভাবে বনে ঘুরে বেড়ায়, পাখিরা স্বাধীনভাবে আকাশে উড়তে পারে ডানা

মেলে— এরা কেউই স্বাধীন নয়। কারণ, প্রাণীদের কালিক চেতনা নেই বলে এদের কোনো কল্পনা নেই। এরা পরিচালিত হয় সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা। প্রতিমুহূর্তের জৈবিক প্রয়োজনবোধ, ক্ষুধা, দৈহিক আড়ম্বর, আত্মরক্ষার প্রবণতা অথবা পুরোনো অভ্যাস তাদের পরিচালিত করে। স্বাধীনতা তাই মূলত মানসিক স্বাধীনতা, যেখানে বুদ্ধি ও সৃজনশীলতা আমাদের অধিকার দেয় আমাদের পরিবেশকে বদলে দেওয়ার এবং ভবিষ্যৎকে সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণের। মানসিক স্বাধীনতার সাথে বাহ্যিক বা ভৌত স্বাধীনতার যেমন মূলত কোনো বৈপরীত্য নেই, বরং আছে পরিপূরকতা ও পারস্পরিকতা। ব্যক্তিস্বাধীনতার সাথে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতারও কোনো বিরোধ নেই এবং এরা পরস্পর সম্পর্কহীন নয়।

ব্যক্তিমানুষের মুক্তচিন্তা, তার আত্মপ্রকাশ, তার সম্ভাবনা ও প্রতিভার বিকাশ নিঃসন্দেহে মূল্যবান; কিন্তু ব্যক্তিমানুষ বিচ্ছিন্ন নয় সমাজ থেকে। মানুষ মাত্রই সৃজনশীল, অনন্য ভাবনার অধিকারী এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে অনিশ্চিত ও অনির্বচনীয় এক মুক্ত পথের অভিযাত্রী। ফলে, কোনো দুজন ব্যক্তি অভিন্ন চিন্তা ও প্রত্যাশার ভেতর দিয়ে বিকাশ লাভ করে না। সভ্যতার বিকাশের এবং বিজ্ঞানের ভেতর দিয়ে অভিব্যক্তি লাভের ক্ষেত্রে সব মানুষের চিন্তা, কর্মদক্ষতা ও আকাঙ্ক্ষা অভিন্ন হওয়া প্রত্যাশিতও নয়। সভ্যতার অগ্রযাত্রা সংঘটিত হচ্ছে ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে। এই পরীক্ষা ঘটছে স্থানের বৈচিত্র্যে, প্রবহমানকালের মধ্যে এবং অসংখ্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও সৃজনশীলতার বৈচিত্র্যে। সমাজবদ্ধ মানুষ তাই যে যৌথ স্বাধীনতা অর্জন করে ও উপভোগ করে, তা তাদের যৌথ উদ্ভাবন। অসংখ্য মানুষের মধ্যে তাদের কাজে, ভাবনায়, তাদের রুচি ও প্রত্যাশায় যে বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা, তাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার যে কাজ, সেটি হলো সংস্কৃতি— যার ধারক ও বাহক হলো মানুষের ভাষা, যোগাযোগসাধ্যতা ও যৌথ জীবনধারণ।

ভাষা যেমন ব্যক্তিমানুষের ভাবনা ও জ্ঞানের ধারক ও সঞ্চাররূপে কাজ করছে, তেমনি মানুষের উৎপাদিত সামগ্রী এবং উদ্ভাসিত জীবনযাত্রার নানা কলাকৌশল বস্তুগত জীবনকে ধারণ করে আছে ও বিকশিত করছে। ভাষা যেমন সৃষ্টি হয়েছে আমাদের ব্যক্তিগত ভাবনা ও জ্ঞানকে সামাজিকভাবে বিনিময় ও প্রমিত করার ভেতর দিয়ে; ফলে সৃষ্টি হয়েছে মানসিক সংস্কৃতি, তেমনি ব্যক্তিগতভাবে উৎপাদিত বস্তুগত সামগ্রী ও উদ্ভাবিত নানা যান্ত্রিক কৌশল সামাজিকভাবে বিনিময় ও ভাগ করে নেওয়ার ভেতর দিয়ে গড়ে উঠেছে অর্থনৈতিক জীবন— যাকে আমরা বস্তুগত সংস্কৃতি বলতে পারি। এই মানসিক সংস্কৃতি ও বস্তুগত সংস্কৃতি মিলে এবং এদের পারস্পরিকতায় ও পরিপূরকতায় সৃষ্টি হয়েছে পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

স্বাধীনতা তাই এর যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ অর্থে সীমিত নয়। কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা, কোনো ব্যক্তিমানুষের স্বেচ্ছাচারিতা বা অবাধ শক্তি প্রদর্শন, বাস্তবতা-বর্জিত

আবেগের প্রকাশ বা অলৌকিক ভাবনা নয়, স্বাধীনতা নয় কোনো লোভের প্রাপ্তি, অনিয়ন্ত্রিত লক্ষ্যহীন ইচ্ছার প্রকাশ; স্বাধীনতা নয় অহংবোধ বা আত্মশ্লাঘার প্রকাশ এবং অলৌকিকভাবে পাওয়া যান্ত্রিক অর্জন। স্বাধীনতা এক সমন্বিত অভিব্যক্তি— চেতনার, শ্রমের, উদ্ভাবনের, সৃজনশীলতার, ত্যাগের, সৌন্দর্যবুদ্ধির, ভালোবাসার ও কালের মধ্যে যৌথ আত্মপ্রকাশের। কোনো দেশের স্বাধীনতা সেই জাতির ত্যাগের বীরত্বের ইতিহাস যেমন বহন করে, তেমনি ধারণ করে অনাগতকালের স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রতিজ্ঞা। স্বাধীনতা যেমন মত প্রকাশের, স্বপ্ন দেখার; তেমনি গভীর সাধনা সেই স্বপ্নকে সফল করার প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন, উদ্ভাবন ও শ্রমের।

ক্ষুধার্ত মানুষের অন্ন চাইবার ও পিপাসার্ত মানুষের পানি চাইবার স্বাধীনতা শুধু তাকে বাকস্বাধীনতা দেয়; কিন্তু খাদ্য উৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবন, পানির উৎস অনুসন্ধান, সবার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানি নিশ্চিত করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ, কলাকৌশল অর্জন— সেটাই বৃহত্তর স্বাধীনতা। স্বাধীনতা মানুষের সবচেয়ে গভীর, সবচেয়ে চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর এক সম্বিত, এক প্রতিজ্ঞা ও কর্মতৎপরতা— স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্ন পূরণের, যা সঞ্চারিত ব্যক্তি থেকে সমাজ, রাষ্ট্র ও সমগ্র মানবসভ্যতায়; যা প্রবহমান অতীত থেকে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। ফলে, স্বাধীনতার সংজ্ঞায়ন অসাধ্য ও অসম্পূর্ণ, কিন্তু উপলব্ধ আমাদের প্রেরণায় ও চেতনায়।

স্বাধীনতা কোনো যান্ত্রিক ঘটনা নয়

পদার্থবিজ্ঞানের একটি বিপ্লবাত্মক ধারণা হলো ক্ষেত্রতত্ত্ব। এই ধারণার প্রথম প্রবক্তা ফ্যারাডে, যিনি, চৌম্বকমেরু থেকে বলরেখার বিচ্ছুরণ ঘটে— এই চিত্র তুলে ধরেন। আইনস্টাইন এই ক্ষেত্রতত্ত্বকে আরো গভীর ও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন আপেক্ষিকতার তত্ত্বে। শুধু তড়িৎ-চৌম্বকশক্তির ক্ষেত্রে নয়, প্রকৃতিতে যত রকম বল আছে, তা সবই এখন ব্যাখ্যাত আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রতত্ত্বের দ্বারা। প্রাকৃতিক সমস্ত ঘটনা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, বল প্রয়োগ, বস্তু ও শক্তির মিথষ্ক্রিয়া— সবকিছুই চমৎকার করে ব্যাখ্যা করা যায় বিশেষ বিশেষ প্রভাববলয় দ্বারা।

সনাতনী ক্ষেত্রে অস্ত্রের ধারণা এখানে ব্যাপকার্থে গ্রহণ করছি। সরলভাবে ক্ষেত্রতত্ত্বের মূলকথা হলো— প্রত্যেক ধরনের চার্জ থেকে আনুষঙ্গিক বলরেখা ছড়িয়ে পড়ে স্থানের মধ্যে। এই বলরেখার সংখ্যা যত ঘনীভূতভাবে অবস্থান করে কোনো এলাকায়, তত তীব্র বল সেখানে কাজ করে। ক্ষেত্রতত্ত্বের ধারণার আগে মনে করা হতো, স্থানের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন চার্জের যে শক্তি তার অবস্থান চার্জগুলোর মধ্যেই সীমিত। কিন্তু ক্ষেত্রতত্ত্বের ধারণা অনুসারে একটি চার্জের অবস্থানের জন্য যে শক্তি তা ছড়িয়ে আছে চার্জকে ঘিরে পরিব্যাপ্ত স্থানের মধ্যে বলরেখাগুলোর স্থিতিস্থাপকতায়। এই নতুন তত্ত্বানুসারে দুটো চার্জের মধ্যে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, টানাপড়েন বা মিথষ্ক্রিয়া তা ঘটে এদের দূরক্রিয়ারূপে অব্যবহিত স্থানের ভেতর দিয়ে বলরেখার মাধ্যমে। ফলে চার্জজনিত শক্তি ছড়িয়ে আছে সমগ্র স্থানের মধ্যে। বস্তুত চার্জের অনুপস্থিতিতে শূন্যস্থানের যে বৈশিষ্ট্য ছিল, চার্জের উপস্থিতি সেই স্থানকে বদলে দেয়। একে দুমড়েমুচড়ে এর বক্রতা সৃষ্টি করে স্থিতিস্থাপক শক্তিরূপে চার্জজনিত শক্তি স্থানের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

পদার্থবিজ্ঞানের এই ক্ষেত্রতত্ত্বের ধারণাকে আমরা প্রয়োগ করতে পারি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ব্যাখ্যায়। আমাদের স্বাধীনতার চেতনা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ, মানবিকতা ও দেশপ্রেমের আদর্শ সৃষ্টিতে যাঁরা নতুন ভাবনা, সাহসিকতা, ত্যাগ ও দূরদৃষ্টি নিয়ে জাতিকে অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপিত করেছেন, তাঁরা জাতীয় রাজনৈতিক চেতনাবোধের উৎস। রাজনৈতিক নেতাকে তাই রাজনৈতিক প্রভাববলয় সৃষ্টির উৎসরূপে রাজনৈতিক আধান বা চার্জ

বলতে পারি। কিন্তু কোনো রাজনৈতিক নেতার আদর্শ, তাঁর চেতনা ও দর্শন বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার যে প্রক্রিয়া তা স্থান ও কালনিরপেক্ষ নয়। প্রতিটি মানুষের চেতনা ও ভাবনাকে ধাপে ধাপে ও ক্রমাগতভাবে প্রভাবিত না করে দূরক্রিয়ারূপে আত্মপ্রকাশ করে না এটি। বস্তুত একটি চার্জের উপস্থিতি যেমন এর চারপাশের স্থানকে বদলে দেয় এবং চার্জের শক্তি বিন্দু বিন্দু করে ছড়িয়ে পড়ে চার্জের প্রভাবে নতুন বক্রতাপ্রাপ্ত স্থানের মধ্যে; একজন রাজনৈতিক নেতার আদর্শ, মানসিক চেতনাগত শক্তি তেমনই তার চারপাশের জনগণকে বদলে দেয় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও চেতনা তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে। নেতৃত্বের শক্তি তাই ছড়িয়ে পড়ে তার অনুসারীদের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে অব্যবহিত স্থানের ভেতর দিয়ে ধাপে ধাপে দূরত্ব অতিক্রম করে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি তাই একটি প্রভাববলয় যা পরিব্যাপ্ত স্থান, কাল ও জনতার মধ্যে।

রাজনৈতিক নেতা তার নেতৃত্বের শক্তি, তার আদর্শের মহিমা ও চেতনার ভিত্তি তার জীবন ও দেহের মধ্যে ধারণ করে রাখে না যান্ত্রিকভাবে। আর এ জন্যই একজন আদর্শ নেতার দৈহিকভাবে বেঁচে থাকা, তাঁর ব্যক্তিগত উপস্থিতি, অপরিহার্য শর্ত নয় তাঁর প্রভাবকে অনুভব করার জন্য। লাঠি বা বন্দুক যতক্ষণ হাতে ধরা থাকে ততক্ষণই এর যান্ত্রিক প্রভাব আমরা লক্ষ করি তাৎক্ষণিকভাবে। বস্তুত কোনটি যান্ত্রিক এবং কোনটি চেতনাগত, তার একটি স্পষ্ট পার্থক্য আমরা প্রত্যক্ষ করি এদের প্রভাব সৃষ্টির প্রক্রিয়ায়। বদ্ধঘরের দরজা খোলার সংকেত বহন করে যে বৈদ্যুতিক ঘণ্টাটি বেজে ওঠে, সে বেজে ওঠার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত জানে না সে বেজে উঠবে। আর এ জন্যই এটি যন্ত্র মাত্র। একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বেজে ওঠার সঙ্গে একটি কাব্য রচিত হওয়ার, একটি তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার পার্থক্য এই যে, কাব্য রচিত হতে অথবা তত্ত্ব উদ্ভাবিত হতে দীর্ঘ প্রস্তুতি চাই; চাই সৌন্দর্যবুদ্ধি, রুচির সংগ্রাম, সৃষ্টিশীলতা ও পরিকল্পনা। স্বাধীনতার কাব্য রচিত হতে তেমনই দীর্ঘ সংগ্রাম, গভীর আত্মত্যাগ ও ব্যাপক প্রস্তুতি কাজ করেছে।

যান্ত্রিক ঘটনা কালনিরপেক্ষরূপে একটি মুহূর্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ। একটি কাগজের ফুলের অস্তিত্ব যাচাই করতে এর ইতিহাস জানার প্রয়োজন নেই। কাগজের ফুলকে দক্ষতা ও কৌশলে এক মুহূর্তে নির্মাণ করা যেতে পারে। এই ফুলের অস্তিত্ব, বাস্তবতা ও মূল্য কৌশলের ফসল। কিন্তু যেটি আসল ফুল, তা নির্মিত নয় কৃত্রিম বুদ্ধি বা আকস্মিক খেয়ালে, এটি বিকশিত ও উদ্ভাসিত দীর্ঘকালের ছাপ বহন করে সূর্যের আলো, বায়ুমণ্ডল ও মাটির সাহচর্যে।

একজন রাজনৈতিক নেতা একজন ব্যক্তি বটে; কিন্তু নিতান্তই কৌশলী ক্ষমতাধর ব্যক্তিবিশেষ নয়। তার আদর্শ, নীতি ও মূল্যবোধ যে স্বীকৃতি ও সমর্থন লাভ করে এবং উৎস হয়ে ওঠে জাতীয় প্রেরণা ও রাজনৈতিক শক্তির— তা এই জন্য যে, তার নিজস্ব চিন্তা, আদর্শ ও প্রেরণা সে সঞ্চারিত করতে সক্ষম জনগণের

মধ্যে। এবং সেটা কোনো জাদুকরি শক্তি, মানুষের আবেগ ও দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে নয়। দীর্ঘ সময় ধরে মানুষের মধ্যে রুচি ও সচেতনতা সৃষ্টি করে তাদের বিচারবুদ্ধি ও মূল্য যাচাইয়ের ভেতর দিয়ে জনসমর্থন লাভ এই নেতৃত্বের উৎস। দীর্ঘ সময় ধরে এই নেতৃত্বের উদ্ভব বলেই চেতনার অভিন্নতায় একজন যথার্থ রাজনৈতিক নেতা তার নেতৃত্বের শক্তিকে সঞ্চারিত করে। শক্তির উদ্ভাবক ও কেন্দ্রবিন্দু সে হতে পারে, কিন্তু তারই সূচিত রাজনৈতিক শক্তির সে সার্বিক আধার নয়। একটি বৈদ্যুতিক চার্জের শক্তি ক্ষেত্রতত্ত্বের ধারণায় যেমন অবস্থান করে বিস্তৃত স্থানের মধ্যে, নেতৃত্বের শক্তিও তেমনি স্থান করে নেয় জনগণের মধ্যে।

ইতিহাস তাই বহুমাত্রিক এক প্রতিভাস। বিস্তৃত স্থান, পরিব্যাপ্ত কাল, অসংখ্য মানুষের সচেতন ভাবনা ও স্মৃতি এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় ইতিহাসকে নির্মাণ ও বিকশিত করে। আমরা যা-কিছু গলাধঃকরণ করি আপন ইচ্ছায় অথবা বলপ্রয়োগের প্রভাবে, তা সবই খাদ্য নয়। একটি সুস্থ দেহের পরিপাকযন্ত্র অখাদ্যকে বর্জন করে পরিপাক ঘটায় খাদ্যবস্তুর। এই বর্জন ও চয়নের দক্ষতা যেমন সুস্বাস্থ্যের পরিচায়ক, তেমনই পূর্বশর্ত সুস্থ থাকার।

আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস বাঙালি জাতির দীর্ঘ সংগ্রাম, অসংখ্যের আত্মত্যাগ, স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার যে প্রক্রিয়া তারই সজীব ও সক্রিয় দলিল। দীর্ঘ সময় ধরে অসংখ্য ঘটনা, আত্মত্যাগ ও সাহসিকতার নানা দৃষ্টান্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও উদ্দীপিত করেছে। এ জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সৃজনশীল মানুষদের অবদান, জীবনসংগ্রামে প্রতিনিয়ত নিয়োজিত মানুষের আত্মোপলব্ধি— সবকিছু সমন্বিত হয়েছে ধাপে ধাপে। এখানে কাজ করেছে একটি অভিব্যক্তি, যা দীর্ঘকালের ছাপ বহন করে ক্রমে শিক্ষা, আত্মোপলব্ধি ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমগ্র জাতি দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্তুত হয়েছে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য। সমগ্র ব্যাপারটি মানবিক চেতনাগত, সৌন্দর্যবুদ্ধি ও নিজেকে আবিষ্কার করার এবং সেটা বিচ্ছিন্ন ও এককভাবে নয়। বুদ্ধি, চেতনা, অনুভব ও প্রেরণার যে সমন্বয় তা সৃষ্টি হয় উপলব্ধি ও অভিজ্ঞানের দীর্ঘসময় ধরে বিনিময়ে।

একটি প্রস্তুত জাতি দেশের স্বাধীনতার জন্য সীমাহীন আত্মত্যাগ ও অপার সাহসিকতা দেখাতে পারে, যেমনটি ঘটেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে। প্রস্তুত করা ও স্বাধীনতাযুদ্ধের জন্য জাতিকে ডাক দেওয়া একটি অবিচ্ছিন্ন ঘটনা, যা বিস্তৃত দীর্ঘ প্রস্তুতিকাল ও অসংখ্য যোগাযোগ সৃষ্টির মধ্যে। যখন বাঙালি জাতি একটি অবিচ্ছিন্ন ও সমন্বিত সংস্কৃতির আবহে তৈরি হয়েছে স্বাধীনতার জন্য, তখন অতীতের সমস্ত আত্মত্যাগ ও অবদান, অভিজ্ঞান ও উপলব্ধি একটি অনিবার্য ও পরম ঘটনার দিকে ইতিহাসকে পরিচালিত করেছে।

বিজয় দিবসের সর্বজনীনতা

বিজয় দিবস নানা বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্যে মহিমান্বিত। বিজয় দিবস আমাদের জন্য এনে দিয়েছে স্বাধীনতা, অবসান ঘটিয়েছে পাশবিক অত্যাচার ও শোষণের। বিজয় দিবস শত্রুকে পরাভূত করার উল্লাস ও আনন্দ মঞ্চায়িত করেছে, আমাদের হৃদয়ে শান্তি ও অত্যাচারিত হওয়ার গ্লানি থেকে মুক্ত করেছে বাঙালি জাতিকে। বিজয় দিবস সন্ধান দিয়েছে উন্মুক্ত পথের; আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশের অপার স্বাধীনতা আমরা লাভ করেছি এই দিনটিতে। সমগ্র বাঙালি জাতির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, সমন্বিত প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগ, পারস্পরিক ভালোবাসা, অভূতপূর্ব সাহসিকতা, সৃজনশীলতা ও শক্তির অভিব্যক্তি ঘটেছে বাঙালি জাতির বিজয় দিবসের সাফল্যে। এসব উজ্জ্বলতা ও আকর্ষণীয় সব বৈশিষ্ট্যের আড়ালে বিজয় দিবসের আবার একটি সর্বজনীনতা, একটি কালিক ব্যাপ্তি এবং দেশ বা স্থান-নিরপেক্ষতা আছে। নানা যুদ্ধের খেলায়, প্রতিযোগিতায় বা পরীক্ষায় সাফল্য কোনো ব্যক্তি, দল বা জাতির জন্য সাফল্য হতে পারে, সেই সঙ্গে তা আনন্দের ও উৎসবের। কিন্তু এ সমস্ত যুদ্ধ, প্রতিযোগিতা ও খেলায় বিজয়লাভ এক পক্ষের জন্য যেমন আনন্দের অন্য পক্ষের জন্য তেমনি দুঃখের। জয়-পরাজয়ের বিষয়টি এ ক্ষেত্রে আপেক্ষিক, পরম নয়।

সম্পদ লাভ, পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার বা আধিপত্য অর্জনের জন্য যুদ্ধ, কে বেশি শক্তিধর তা প্রমাণের জন্য যে প্রতিযোগিতা, নিছক দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জনের জন্য অথবা খেলায় জয়-পরাজয়ের অনিশ্চয়তার উত্তেজনাকে অনুভবের জন্য যে খেলা সেখানে পক্ষ ও বিপক্ষের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। এখানে জয়ের আনন্দ অর্জিত হয় পরাজিতের দুঃখের মূল্যে। লক্ষ্যহীন যুদ্ধের ফলাফল বিজয়ের দিক থেকে দেখলে যতটা উজ্জ্বল মনে হয় অথবা আনন্দের, বিজিতের দিক থেকে দেখলে একই ফলাফলকে মনে হবে ততটাই হতাশা ও বেদনার। আর এ জন্যই সাধারণ যুদ্ধ প্রতিযোগিতা ও খেলার ফলাফল নিরপেক্ষ বিচারে অর্থহীন। কোনো পরম সত্য, কোনো নিরপেক্ষ আনন্দ ও সর্বজনীন লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার নয় সাধারণ যুদ্ধ ও প্রতিযোগিতায়। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের বিজয় দিবসের যে আনন্দ তা শুধু বাঙালি জাতির জন্যই নয়— নিপীড়ন, শোষণ, অত্যাচার ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত পৃথিবীর সব জাতির জন্যই আনন্দের ও আশাবাদের।

যুদ্ধ সাধারণ অর্থে বিশৃঙ্খলার, অনৈক্য ও বিদ্বেষের। এখানে কাজ করে লোভ, স্বার্থ, আত্মকেন্দ্রিকতা ও হিংসা। মানুষের জন্য ভালোবাসা ও সহানুভূতির অভাব, সৌন্দর্যবুদ্ধি ও সত্যানুসন্ধানের অনুপস্থিতি মানুষকে নৃশংস, ধ্বংসাত্মক ও নিষ্ঠুর করে। কিন্তু স্বাধীনতার যুদ্ধ পরিচালিত হয় ঐক্য, শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও সাহসিকতায়। এখানে একটি ধারাবাহিকতা আছে। অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে, দুঃশাসন ও প্রভাব বিস্তারকে প্রতিহত করতে যে আত্মত্যাগ, সাহস ও প্রেরণার প্রয়োজন তার উৎস সহজাত স্বাধীনতাবোধ ও আত্মোপলব্ধি। এ চেতনা সর্বজনীন ও চিরন্তন। প্রতিটি স্বাধীনতাসংগ্রামের তাই একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের ভেতর দিয়ে অর্জিত বিজয়ের একটি চিরন্তন প্রভাব আছে অনাগতকালের ওপর। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ কোনো অহংবোধ, লোভ ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য সংঘটিত হয়নি। শান্তিকামী সাধারণ নিরীহ মানুষ, ছাত্র-শিক্ষক তাদের হাতের বই রেখে, ক্লাসরুম ছেড়ে, কর্মক্ষেত্র ও প্রিয় আত্মীয়স্বজনকে পেছনে রেখে বাধ্য হয়েছে অস্ত্র তুলে নিতে। সেখানে ব্যক্তিগত কোনো প্রাপ্তি ছিল না। ছিল দেশপ্রেম, মানুষের জন্য ভালোবাসা এবং গভীর এক দায়িত্ববোধ আত্মত্যাগের ও জীবন বিসর্জনের। এই প্রেরণা ও সাহসিকতার উৎস মানবজাতি ও সভ্যতার প্রতি অঙ্গীকার।

যখন নির্যাতন, অমানবিক আচরণ, বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও নিষ্পেষণ চলছিল পাক জান্তাদের দ্বারা এ দেশের শিশু, নারী ও নিরীহ সাধারণ নাগরিকদের ওপর; তখন জ্বলে উঠেছিল সমগ্র বাঙালি জাতি, যেমন করে জ্বলে ওঠে বনের সবুজ বৃক্ষরাজি, যখন তাপমাত্রা একটি সীমা অতিক্রম করে তাদের দাহ্য করে তোলে। গাছের সবুজ পাতা তো জ্বলে ওঠার জন্য নয়, সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষণ ঘটানো এর কাজ। গাছের ডাল ও কাণ্ড গাছের বিপুল শক্তিকে ধারণ করে রাখে সেলুলোজ রূপে। এর শেকড় মাটি থেকে পানি ও নানা উপাদান সংগ্রহ করে গাছের খাদ্য উৎপাদন ও বিকাশকে সফল করে তুলতে। শান্তিকামী বাঙালি জাতিও তেমনি তার স্বাধীনতাবোধের ও চেতনার আলোকে শোষণ করে নেওয়ার কাজে শিক্ষা ও সংস্কৃতির নানা সবুজ পাতা নিয়ে পল্লবিত হচ্ছিল। মাটির নিচ থেকে পানি ও রাসায়নিক উপাদান গাছের শেকড় যেমন টেনে তোলে, বাঙালি জাতিও তেমনি তার ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করছিল স্বাধীনতাবোধের নানা উপাদান। সবাই শান্তভাবে তাদের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত ছিল। কৃষক মাঠের শস্য উৎপাদনে, জেলে নদীতে মাছ ধরার কাজে, শ্রমিক ছিল তার কারখানায়, ছাত্ররা পাঠগ্রহণে, শিক্ষক পাঠদানে ব্যস্ত ছিল; রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, সমাজসেবক, সাধারণ নাগরিক– সবাই নিরুত্তাপ আবহে সম্পাদন করছিল তাদের কাজ। কিন্তু প্রতি কাজে বাধা ধীরে ধীরে তাপ সৃষ্টি করছিল– সংঘর্ষ সৃষ্টির কারণে– যেমনটি ঘটে পথের অমসৃণতায়। এর নাটকীয় রূপ ঘটল '৭০-এর নির্বাচনের পর,

যখন দীর্ঘদিনের শোষণের পুঞ্জীভূত রূপ প্রকাশ পেল। পাকিস্তানি জান্তাদের চরম অযৌক্তিক ও অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে বলিষ্ঠ কণ্ঠ নিয়ে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও জাগ্রত করলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার চেতনায়।

মিলিটারি জান্তার নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সৃষ্টি করল সেই ক্রান্তিক তাপমাত্রা যা একটি জাতিকে প্রজ্বলিত করে তার সুপ্ত শক্তিকে মুক্ত করে। স্বাধীনতাযুদ্ধের ভেতর দিয়ে ছাত্র, শিক্ষক, জনতা, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবীর অদম্য সাহসিকতা ও আত্মত্যাগ এনেছিল বাঙালি জাতির বিজয়। স্বাধীনতার জন্য যে যুদ্ধ সেখানে বিজয় বিলম্বিত হতে পারে, কিন্তু কখনোই পরাজয় ঘটে না। কারণ এ যুদ্ধ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের। ফলে প্রতিরোধের আগুন ও প্রতিজ্ঞার শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে সংগ্রামের ভেতর দিয়ে, যতক্ষণ না বিজয় অর্জিত হয়। প্রতিটি জাতির স্বাধীনতাযুদ্ধের বিজয় এই সত্যকে সঞ্চারিত করে অন্য সকল জাতির মধ্যে, যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে। আমাদের বিজয় দিবসের আনন্দ ও গৌরব এ জন্যই একটি সর্বজনীনতা নিয়ে উদ্ভাসিত।

চাই সৌন্দর্যবুদ্ধি ও মানবিকতার বিজয়

বাঁশির সুর আর পেশিশক্তির যান্ত্রিকতা দুই ভিন্ন মেরু সমগ্র মানবসমাজের। এমনকি এই বৈপরীত্য বিস্তৃত প্রাণিজগৎ ও প্রকৃতিতেও। বাঁশির আবেদন, সুর, সৌন্দর্য, ছন্দ, অনুভূতির মিল ও সাযুজ্যের কাছে। বাঁশি আবেদন করে উপলব্ধি, সহানুভূতি, যোগাযোগসাধ্যতা ও সৌন্দর্যবুদ্ধির কাছে শব্দের লহরি ছড়িয়ে, অনুভবের তন্তুগুলোকে অনুরণিত করে। বাতাসে সৃষ্ট কম্পনহারের বৈচিত্র্য ও বিস্তার যেখানে ধাপে ধাপে বিন্যস্ত হয়ে ঐকতান সৃষ্টি করে শিল্পীর অনুভবকে সুরের ভাষায় প্রকাশ করতে, সেখানে বিনিময় ঘটে তথ্যের, শিল্পী ও শ্রোতার মধ্যে। বস্তুত, বিশ্বজুড়েই চলছে এই যোগাযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়া। দীর্ঘ সময় ধরে সৃজনশীলতায় অভিজ্ঞতার নির্যাসকে সমন্বিত করে ও সাজিয়ে যা নির্মিত হয়, সেখানে কালের প্রবাহ, স্থানের বিস্তার ও ঘটনার বৈচিত্র্য একীভূত ও সমন্বিত হয়ে সৃষ্টি করে ঐক্য। যে কাজগুলো ধ্বংসের, বিচ্ছেদ ঘটাবার ও বিপর্যয় সৃষ্টির, সেখানে শক্তির প্রয়োগ আছে, আছে নৃশংসতা ও ভীতি প্রদর্শন। স্থূল আচরণ মানুষের ভয়, লোভ, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বিচ্ছেদকে মূলধন করে যান্ত্রিক ও পেশিশক্তির সাফল্য লাভের প্রয়াস পায়। এই বলপ্রয়োগকারীরা নানা অর্থে বিচ্ছিন্ন, কুৎসিত, লোভী, স্থূল ও ভীত। বিচ্ছিন্ন কারণ, এদের সমস্ত দাপট ও অভিব্যক্তি সীমাবদ্ধ একটি মুহূর্তের মধ্যে। এদের বলপ্রয়োগের কাজটি যেমন অতীত ও ভবিষ্যৎকে উপেক্ষা করে শুধু বর্তমান বা অব্যবহিত কালের মধ্যে নিহিত; এদের চিন্তাভাবনা, দক্ষতা ও কৌশলও তাৎক্ষণিকভাবে অর্জিত। শিক্ষালাভের যোগ্যতা অর্জনের বা রুচি সৃষ্টির জন্য যে দীর্ঘ সময় ধরে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ও চেতনার সমন্বয় তা একজনকে শিল্পী ও সৃজনশীল করে তার নির্মাণের কাজে। ধ্বংস ও সন্ত্রাসের কাজে যারা নিয়োজিত, তাদের সেই কালিক চেতনা নেই।

আমাদের সমস্ত সহানুভূতি, সহমর্মিতা, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার মূলে কাজ করে একটি বুদ্ধিগত চেতনা ও উপলব্ধি। উপদেশ, শাসন বা আইন প্রয়োগ করে কাউকে দয়ালু বা বন্ধুপ্রিয় করা সম্ভব নয়। এটি একটি মানসিক বিকাশ, একটি ব্যক্তিত্ব লাভ, বুদ্ধিগত অভিব্যক্তি, যা ঘটতে পারে যথার্থ শিক্ষালাভ ও প্রজ্ঞার ভেতর দিয়ে। প্রাণিজগতে যে জ্ঞাতিত্ব ও আনুগত্য দেখা যায় একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্য এবং

শিশু ও মায়ের মধ্যে, সেখানেও একটি অপার্থক্যযোগ্যতা কাজ করে পরস্পরের মধ্যে। বস্তুত জড়জগতেও নানা বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণবল সেখানেও কাজ করে একধরনের আদান-প্রদান বা বিনিময়-প্রক্রিয়া। বৃক্ষরাজি এদের বংশ বিস্তার করছে বীজ বা কোষে বিচ্ছুরণ ও সংযোজন ঘটিয়ে। কাশফুল যে বাতাসে ভেসে ভেসে ছড়িয়ে পড়ে দূরে, সে-ও এক সংযোগ স্থাপন বংশবৃদ্ধির কৌশলরূপে। প্রাণীদের যে সামাজিক বন্ধন, সহযোগিতা ও সম্পর্ক আপন প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে সেখানেও শব্দ, অঙ্গভঙ্গি ও আচরণের ভেতর দিয়ে তথ্যের বিনিময় ঘটছে। বস্তু ও প্রাণিজগতের বিবর্তন ও বিকাশের প্রতিভাস তাই দীর্ঘমেয়াদি ও পারস্পরিক।

ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতে অথবা মানুষের ব্যবহৃত বিস্ফোরকে কোনো পাহাড়কে উড়িয়ে দিতে একটি মুহূর্তই যথেষ্ট। কোনো প্রাণীকে হত্যা করতে বিশেষ সময় লাগে না। অথচ একটি পাহাড়ের উদ্ভব ও একটি প্রাণীর বিকাশ কত দীর্ঘ সময় ধরে, কত অসংখ্য ঘটনার পরম্পরায় ও নানা উপাদানের সমন্বয়ে সম্পন্ন হয়। ধ্বংসের কাজে দক্ষতা পেতে প্রয়োজন নেই সৃজনশীলতার, প্রস্তুতি বা শিক্ষার জন্য দীর্ঘ সময়। এতে প্রয়োজন শুধু শক্তির ঘনীভূতরূপ স্থান-কালের একটি বিন্দুতে। জড়জগৎ ও প্রাণিজগতের বিকাশ ও বিন্যাসে স্থান, কাল ও নানা ঘটনার পরম্পরায় সমন্বয় আছে। কিন্তু কোনো সচেতন প্রেরণা, অভিজ্ঞতা, সৌন্দর্যবুদ্ধি, পরিকল্পনা বা শিক্ষাগত প্রস্তুতি নেই। মানুষের সৃষ্ট সভ্যতা, উদ্ভাসিত নির্মাণকৌশল, আবিষ্কৃত বিশ্বচিত্র, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ও নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে যে অভিব্যক্তি, তা তাই ভিন্ন ও অনন্য। যেটুকু মিল জড়জগৎ, উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণিজগতের সঙ্গে মানুষের তা এই জন্য যে, মানুষের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে জড়বস্তুর রূপান্তর ও প্রাণিজগতের অভিব্যক্তিলাভের পথ ধরেই। পার্থক্য শুধু এই যে, অন্য সব প্রাণীর ক্ষেত্রে বিবর্তন ও বিকাশের পথ যেখানে আটকে গেছে নানা অন্ধগলিতে, সেখানে মানুষই শুধু একমাত্র প্রজাতি যার বিকাশের পথ উন্মুক্ত ও অন্তহীন।

যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে মানুষ ভিন্ন বস্তুজগৎ ও প্রাণিজগৎ থেকে তা হলো, তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমরূপে মানুষের সৃষ্ট ভাষা। আর এই ভাষাকে অবলম্বন করেই মানুষ বিশ্বজগতের রহস্যোদ্‌ঘাটন করেছে, সেই সঙ্গে মানবপ্রজাতির আপন বৈশিষ্ট্যও। আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো মানুষের সৃজনশীলতা, দীর্ঘকালের মধ্যে ক্রমসঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে অর্জিত যে উপলব্ধি, বিমূর্ত ভাষা, সৌন্দর্যবুদ্ধি ও কালিক চেতনায় তার যে অভিব্যক্তি, তা প্রায়শ অপমানিত ও অবদমিত হিংস্র পাশবিক শক্তি ও যান্ত্রিকতার কাছে। মানুষ যে নানা হাতিয়ার লাভ করেছে, উদ্‌ঘাটন করেছে নতুন সব শক্তির উৎস, বিপুল ও ভয়ংকর, যা তার হাতে তুলে দিয়েছে পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা, রাসায়নিক ও জীবাণুযুদ্ধের বীভৎস সব অস্ত্র এবং সেগুলোকে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ ও নিক্ষেপের কৌশল, তা

প্রকৃতির রহস্যোদ্‌ঘাটনের অনুসন্ধিৎসা এবং প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার ও বিশ্বজগৎকে জানার সৃজনশীল বুদ্ধিরই অপভ্রংশ। বর্ণাঢ্য সৌন্দর্যের প্রতীক প্রজাপতির পরিব্যক্তি যেমন ঘটে কুৎসিত শুঁয়োপোকায়; ধ্বংসাত্মক নানা যুদ্ধাস্ত্র তেমনি বিজ্ঞানের আবিষ্কার, সৃজনশীলতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাকে শোষণ করে নিয়ে পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে ধ্বংসের আয়োজনে। যারা যুদ্ধ, ধ্বংস ও সন্ত্রাসের নিয়ন্ত্রণে তারা শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শক্তিকেই প্রয়োগ করছে না নৃশংসতায় ও অবিমৃষ্যকারিতায়; আদি মানুষের যে আবেগ ও প্রবৃত্তিচালিত শঙ্কা ও বিদ্বেষ লুকিয়ে আছে অতীতের পশুজীবনের চিহ্ন বহন করে, তাকেও উসকিয়ে দিচ্ছে আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থা এবং ভাষাকে বিকৃত ও সত্যকে লুকাবার কৌশল প্রয়োগ করে। সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানবিক বৈশিষ্ট্যের আবরণে লুকানো পাশবিক নৃশংসতা থেকে আমাদের বাঁচতে হলে পরিচ্ছন্ন বিশ্লেষণ চাই সমগ্র পরিস্থিতির। সচেতন উপলব্ধি, সৌন্দর্যবুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও মানবিক মূল্যবোধকে পৃথক করা চাই ধূর্ততা, অবিমৃষ্যকারিতা ও সাম্প্রদায়িক নৃশংসতা থেকে— যার অবস্থান পশুসুলভ প্রবৃত্তিতাড়িত, সচেতন মানবিকতার বিপরীতে।

সত্য ও স্বাধীনতা

স্বাধীনতার সংজ্ঞায়ন সহজ নয়। কারণ স্বাধীনতাকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখতে পারি। স্বাধীনতাকে যদি প্রত্যাশা পূরণের পথে সব ধরনের বাধার অনুপস্থিতি বলে ভাবি, তাহলে প্রশ্ন ওঠে : যা-কিছু আমাদের আকাঙ্ক্ষা, তা কি অনিবার্যভাবেই কল্যাণকর? এ ছাড়া আমাদের ইচ্ছা ও প্রত্যাশা হতে পারে নানা ধরনের, বা পরস্পরবিরোধী। যেমন সুস্থ থাকার আকাঙ্ক্ষা এবং মাদকদ্রব্য সেবনের ইচ্ছা একই সঙ্গে পূরিত হতে পারে না। যেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না অলস জীবনযাপনের ইচ্ছা এবং গুণী, কর্মতৎপর ও সফল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। অন্যদিকে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা ও যৌথ বা সামাজিক স্বাধীনতার মধ্যে সংঘাত দেখা দিতে পারে। সবচেয়ে বড় যে সমস্যা দেখা দেয় স্বাধীনতার প্রশ্নে, তা হলো স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব।

যেখানে কোনো ব্যক্তি বা দলের স্বাধীনতা অন্য ব্যক্তি বা দলের মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে, সেখানে স্বাধীনতা অথবা মৌলিক অধিকার বা সুবিচার লাভের দাবি, কোনটি বেশি গুরুত্বের তা নির্ধারণ করা সহজ নয়। স্বাধীনতাকে তাই আমরা নানাভাবে ও নানা স্তরে সংজ্ঞায়িত করতে পারি। স্বাধীনতা হতে পারে নানা লক্ষ্যের ও নানা মাত্রার। ব্যক্তিস্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা শুধু ব্যাপ্তির দিক থেকেই ভিন্ন নয়, বিভিন্ন স্তরের এসব স্বাধীনতা গুণগতভাবেও ভিন্ন এবং কখনো কখনো পরস্পরের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতা, যেমন—কথা বলার বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা, নিরাপদ জীবনের স্বাধীনতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সম্পদ ও দূষণমুক্ত পরিবেশ লাভের স্বাধীনতা— সবই ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত এবং সেই স্বাধীনতা কখনো শুধু চাওয়ার, কখনো বা তা অর্জনের।

স্বাধীনতা যেমন পর্যায়ভুক্ত এক বা অনেকের বলে, তেমনি স্বাধীনতার ব্যাপ্তি সীমিত হতে পারে স্থান-কালের মধ্যে। স্বাধীনতার মূল অর্থ ও লক্ষ্য তাহলে কী— এ প্রশ্ন সংগতভাবেই উত্থাপিত হতে পারে। সাধারণার্থে আমরা স্বাধীনতা বলতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথাই বুঝে থাকি। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে সংজ্ঞায়িত করা আরো জটিল কাজ। রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তি নয়—এর নিজস্ব কোনো

আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা, অনুভূতি বা চেতনা নেই। দেশ বা রাষ্ট্র বলতে রাষ্ট্রবদ্ধ মানুষ ও দেশের জনগণকেই বোঝায়, যাদের প্রত্যেকের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, মূল্যবোধ, ইচ্ছা ও স্বপ্ন আছে, যা বিচিত্র ও ভিন্ন। এই ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাগুলো পরিবর্তনশীল এবং কখনো কখনো কারো কারো ইচ্ছা অন্যের আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী। ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও শক্তিধর কোনো কোনো ব্যক্তি তার আপন ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে অন্যের স্বাধীনতা ও সুবিচার লাভের অধিকারকেও ক্ষুণ্ন করে। এমন পরিস্থিতিতে স্বাধীনতার সংজ্ঞার্থ নির্ধারণ শুধু বিমূর্তভাবেই আমরা করতে পারি।

যেখানে রাষ্ট্রবদ্ধ সব মানুষের সৎ আকাঙ্ক্ষা সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রতিফলিত, সমগ্র জাতির সেই সম্মিলিত ও সমন্বিত আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কোনো কিছু চাওয়া বা পাওয়ার স্বাধীনতা তখনই বাস্তবতা ও স্থায়িত্ব লাভ করে, যখন সেই ইচ্ছা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ত্যাগ, শ্রম ও প্রেরণা কাজ করে। যা অবাস্তব, ক্ষণস্থায়ী ও সংকীর্ণ, ফলে লোভ ও ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত, তা কখনোই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে না অন্যের সৎ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে। এমনকি কোনো লোভী, অসৎ ও স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির কিছু চাওয়া ও পাওয়ার যে স্বাধীনতা কোনো বিশেষ মুহূর্তের, তা তার নিজেরই পরবর্তী সময়ে চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা তাই কোনো স্বেচ্ছাচারীর যথেচ্ছা আচরণের বা ইচ্ছা পূরণের অবাধ ক্ষমতা নয়। স্বাধীনতা একটি স্থান-কালে বিস্তৃত বাস্তব অসংখ্য ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অসংখ্য মানুষের উপলব্ধ সত্যের দ্বারা পরিচালিত।

ছোট-বড় নানা সত্য আমরা বিচ্ছিন্নভাবে নানা সময়ে নানাজন উদ্‌ঘাটন করতে পারি। কিন্তু এ সমস্ত সত্য কার্যকারণ সম্পর্কে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত বলে সব মিলে একটি অবিচ্ছিন্ন সত্য সৃষ্টি করে। আমরা এর দৃষ্টান্ত পাই আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের ও বিজয় দিবসের ঘটনায়। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে অসংখ্য মানুষের স্বপ্ন, সাহসিকতা, উপলব্ধি, চেতনা, ত্যাগ ও তিতিক্ষা কাজ করেছে। এদের অবদান সঞ্চিত হয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে নানা ক্ষেত্রে। কেউ কাজ করেছেন জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা ও উপলব্ধি সৃষ্টিতে, কেউ কাজ করেছেন সংস্কৃতির জগতে এই দেশ, এই দেশের মানুষ, প্রকৃতি, পরিবেশ, ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে অসংখ্য মানুষের মনে অঙ্কিত করে। কেউ বা রাজনৈতিক চেতনা ও উপলব্ধি সৃষ্টি করে মিছিলে, সভায়, কারাবাসে জাতিকে উদ্বুদ্ধ ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। যারা কলকারখানা ও ফসলের মাঠে কাজ করেছে উৎপাদন বৃদ্ধিতে ও মানুষের জন্য অন্ন জোগাতে, তারাও পরোক্ষভাবে সচ্ছল ও সুন্দর জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করেছে। স্বাধীনতাযুদ্ধে যারা প্রাণ দিয়েছে অথবা প্রিয়জন হারিয়েছে, তারা শুধু স্বপ্ন লালন করেছে, বাস্তবে কোনো ফল ভোগ করেনি। কিন্তু এরা সবাই মিলে যে ইচ্ছাকে লালন করেছে দেশকে ভালোবেসে, সেখানে সব আকাঙ্ক্ষা, সব স্বপ্ন সমন্বিত ও একীভূত হয়ে এক

অবিচ্ছিন্ন পূর্ণাঙ্গ আকাঙ্ক্ষাকে জন্ম দিয়েছে। তার বাস্তব রূপ আমাদের স্বাধীনতা, যা প্রতিভাত হয়েছিল বিজয় দিবসের উজ্জ্বলতায়।

কিন্তু প্রতিটি উজ্জ্বল শিখারই আলো সৃষ্টি হয় জ্বলন্ত সলতের দহনে। বিজয় দিবসের যে উজ্জ্বলতা, তার অনুষঙ্গরূপে আছে শোক ও আঘাতের যন্ত্রণা। যাঁরা প্রাণ দিল স্বাধীনতার জন্য, যেসব পরিবার শোকার্ত হলো প্রিয়জনকে হারিয়ে, তাঁদের কাছে বিজয় দিবসের অর্জন অবশ্যই বিচার্য নয় মুহূর্তের হিসেবে; বরং তা মূল্যায়িত হতে হবে দীর্ঘকালের ব্যাপ্তিতে। সলতে, কালো ধোঁয়া, বাতির নিচের অন্ধকারের কোনোটিই আমাদের চোখে ধরা পড়ে না, যখন দূর থেকে আমরা আলোর শিখাকে দেখি। এর কারণ, আলোই শুধু প্রবাহিত ও বিস্তৃত পরিব্যাপ্ত স্থান ও কালে, যেমন প্রবাহিত সমুদ্রের ঢেউ স্থান ও সময়ের মধ্যে। ঢেউয়ের পাদদেশ যেমন স্থায়ী নয় কোনো স্থান-কালের বিন্দুতে, ঢেউয়ের শক্তি অবশ্যই প্রতিস্থাপিত করবে ঢেউয়ের পাদদেশকে ঢেউয়ের চূড়া দিয়ে। ঠিক তেমনি স্বাধীনতার মূলে যে সত্য ও শক্তি, তা অবশ্যই স্বাধীনতার প্রেরণা ও চেতনা দিয়ে কোনো মুহূর্তের বেদনা ও অন্ধকারকে অপসারিত করবে। স্বাধীনতা যেখানে প্রতিষ্ঠিত সত্যের ওপরে, যে সত্য নিহিত এ দেশের অসংখ্য সৎ, সাহসী ও ত্যাগী মানুষের চেতনায়, উপলব্ধিতে, স্বপ্নে, শ্রমে, প্রতিদিনের জীবনসংগ্রামে, সেখানে স্বাধীনতাকে আবিষ্কার করতে হবে কোনো স্থান-কালের বিন্দুতে নয়; ব্যক্তিমানুষের দুঃখ, বেদনা, সাফল্য ও আনন্দের উপলব্ধিতে নয়; পরিব্যাপ্ত স্থান, কালে এবং সমগ্র জাতির ভাবনা ও সম্বিতে।

একটি বহুমাত্রিক প্রতিভাস

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের গৌরবময় বিজয়কে একটি কালিক বিন্দুতে উদ্ভাসিত করেছে যে দিনক্ষণ, তা চিহ্নিত হয়ে আছে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে। এই তারিখটি ঘুরে ঘুরে আসে ক্যালেন্ডারের পাতায়। পঞ্জিকার এই হিসাব নিয়ন্ত্রণ করে সৌরজগৎ, সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর পৌনঃপুনিক পরিক্রমায়। কিন্তু বাঙালি জাতির জীবনে, ষোলো কোটি মানুষের মনে, স্বাধীনতাবোধে বিজয় লাভের প্রেরণা ও আনন্দের যে উৎসব বারবার ফিরে আসে বছরান্তে, তার কেন্দ্রে রয়েছে গভীর এক চেতনা। যে স্বাধীনতার বোধ ও চেতনা সমস্ত বাঙালির হৃদয়ে, তারা মস্তিষ্কের চিন্তার নিগড়ে ক্রমসঞ্চিত হয়েছে এই জাতির দীর্ঘ সংগ্রামমুখর ইতিহাসে এবং সেটাই অসীম এক উৎস, আমাদের সামগ্রিক আচরণের।

দিয়াশলাইয়ের কাঠি যেমন ঘর্ষণে সৃষ্ট উত্তাপে জ্বলে ওঠে, তাপমাত্রা একটি সীমা অতিক্রম করলে বনের সবুজ গাছপালাও দাহ্য হয়ে ওঠে, পারমাণবিক বোমার ইন্ধন ইউরেনিয়াম বা থরিয়াম পরমাণুর সমাবেশ একটি ক্রান্তিক ভর লাভ করলে ভয়াবহ বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে; একটি জাতির মুক্তিচেতনা, স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার শৌর্য ও সাহস তেমনি উদ্দীপিত হয়ে ওঠে শোষণ, দুঃশাসন ও নির্যাতনের সীমানা যখন অতিক্রান্ত হয়। কিন্তু স্বাধীনতার চেতনায় জ্বলে ওঠার জন্য যে মূল্যবোধ ও উপলব্ধি তা একটি জাতির মধ্যে সৃষ্টি হয় শিক্ষা, অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, মূল্যবোধের বিকাশ, সৌন্দর্য, বুদ্ধি ও জ্ঞানের দীপ্তিতে। একটি জাতির এবং সে জাতির প্রতিটি সদস্যের চরিত্র গঠিত হয় কর্মে, সংগ্রামে উপলব্ধির প্রেরণা লাভের সৃষ্টিশীলতা ও কালিক চেতনার আবহে দীর্ঘদিন ধরে। আর এ জন্যই স্বাধীনতার চেতনা অন্তহীন এক উৎস। আমাদের বিজয় দিবস কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, একটি কালিক বিন্দুতে যদিও দীর্ঘ সংগ্রামে, আত্মত্যাগ, সাহসিকতা, স্বপ্ন ও প্রত্যাশার কালিক প্রবাহকে অভিসারী করেছিলেন বঙ্গবন্ধু, তাঁর অনন্য নেতৃত্বে, স্বাধীনতাযুদ্ধ ও বিজয়ের ভেতর দিয়ে যার উদ্ভাসিত অভিব্যক্তি ১৬ ডিসেম্বরে বিজয় দিবস চেতনার দীর্ঘকালিক প্রবাহকে ধারণ ও আত্মস্থ করে আত্মপ্রকাশ করেছে। অন্তহীনকালের মধ্যে এই চেতনা ও দীপ্তি সঞ্চারিত বলে, বিজয় দিবস অশেষ ঘটনা ইতিহাসের। বিজয় দিবসের ভেতর দিয়ে আমরা আমাদের অতীতকে আবিষ্কার করেছি। বাঙালি

জাতির দীর্ঘ সংগ্রাম, তার সাফল্যের অসংখ্য ছোট-বড় বিজয়গাথা বিজয় দিবসে এসে মিশেছে। বিজয় দিবস তাই একটি তারিখে উদ্‌যাপিত হলেও বাঙালি জাতির যে অন্তহীন সংগ্রাম, আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশের ভাষা, সংস্কৃতি, মানবিকতা, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রেরণায় সংঘটিত যত প্রতিবাদ ও যুদ্ধ— সবকিছুর শক্তি ও উত্তাপ শোষণ করে নিয়েই বিজয় দিবসের উজ্জ্বলতা লাভ করেছে।

অনাগত দিনগুলোতে জাতি হিসেবে আমাদের যা কিছু স্বপ্ন, প্রত্যাশা ও প্রতিজ্ঞা তার প্রেরণার উৎস এই বিজয় দিবস। বিজয় দিবস তাই ইতিহাসের ঘটনা। ইতিহাসের ঘটনার বৈশিষ্ট্যই হলো কার্যকারণের প্রভাব বহন করে কালের সাক্ষী, তথ্যের ধারক এবং তা ঘটনাপ্রবাহের পারস্পরিক সম্পর্ক ধারণ করে থাকে। শুধু অতীতের ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষীরূপে ইতিহাসের ঘটনা বিবেচ্য নয়, ঘটনাপ্রবাহের আড়ালে সজীব যে চেতনা, মূল্যবোধ ও মানবিক বোধগুলো কাজ করে– সবকিছু মিলে কার্যকারণের যে স্থায়ী সত্য ইতিহাসে বিধৃত, তার জন্যই ইতিহাস মূল্যপ্রাপ্ত।

আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের আগের সমস্ত প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়া বিজয়ের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত। এ দেশের ছাত্র, শিক্ষক, জনতা, নারী, পুরুষ, শিশু, পুলিশ, বাঙালি সৈন্য, শ্রমিক, রাজনীতিজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী সেই সঙ্গে মানবিকতা ও স্বাধীনতার পক্ষের বহির্বিশ্বের জনগণ যেভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছে ও সমর্থন জুগিয়েছে স্বাধীনতাযুদ্ধে, তার সমন্বিত ফসল আমাদের বিজয় দিবস। স্বাধীনতাযুদ্ধের অগ্নি-উজ্জ্বল দিনগুলোতে কে কেমন আচরণ করেছে তার আলোকে আমরা আবিষ্কার করেছি বাঙালি জাতির বৈশিষ্ট্য, এমনকি বিশ্বসভ্যতার চেতনার স্তর। চেতনালব্ধ মানুষই শুধু জ্বলে ওঠে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। মানবতার অবমাননায় ক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে আত্মসম্মানবোধ মানবিক আদর্শ ও মূল্যবোধে যারা সমৃদ্ধ।

স্বাধীনতাযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতা, আত্মাহুতি, জনগণের আত্মত্যাগ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রতি বিশ্ব জনগণের অনুভূতি ও সমর্থন যে উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত করেছে বিজয় দিবসকে, তার আলো শুধু বাঙালি জাতির ইতিহাসকে নয়, মানবসভ্যতার ইতিহাসকে গৌরবময় করেছে। ইতিহাস শুধু অতীতের ঘটনাপ্রবাহের কার্যকারণ সম্পর্ক ও কালিক সত্যকে ধারণ করে না, ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনারূপে কাজ করে। ঘটনামালার আড়ালে যে কার্যকারণ সম্পর্ক, যে জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং মানবিক চেতনা ও মূল্যবোধ কাজ করে তা অনেক বেশি স্থায়ী ও প্রভাববিস্তারী। ইতিহাসের কার্যকারণ সম্পর্ক যদিও যান্ত্রিক অনিবার্যতা নয়; একটি, সূক্ষ্ম, গভীর ও সজীব সম্ভাবনার নিয়ম এখানে কাজ করে কার্যকারণের। ইতিহাসের স্রষ্টা মানুষ, যে মানুষ শিক্ষা, চেতনা, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির প্রভাবকে শোষণ করে নিয়ে ব্যক্তিত্বপ্রাপ্ত। ইতিহাসের ঘটনাকে বুঝতে হলে সেই সূক্ষ্ম ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি চাই, আবিষ্কার করা চাই সেই মানুষগুলোকে তাদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যে, যারা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের ভেতর দিয়ে আমরা আবিষ্কার করেছি আমাদের তরুণেরা, তাদের মা, বোন ও অভিভাবকেরা কেমন করে দেশপ্রেমকে যাচাই করেছে জীবনের মূল্যে। নক্ষত্রের গভীরে যে প্রচণ্ড তাপ ও চাপ তারই আবহে পারমাণবিক বিক্রিয়া সূচিত হয় এবং হাইড্রোজেন পরমাণুর ফিউশন প্রক্রিয়ায় হিলিয়াম তৈরির ভেতর দিয়ে পরমাণুর ভরের একটি অংশ রূপান্তরিত হয় বিপুল শক্তিতে। তারাভরা রাতে দূর-নক্ষত্রের যে স্নিগ্ধ আলো আমাদের চোখে এসে পড়ে, আমরা মুগ্ধ হই; কিন্তু নক্ষত্রের অভ্যন্তরের যে-রহস্য পারমাণবিক বিক্রিয়ায় উত্তাপ ও আলো সৃষ্টির তার অবধারণ আমাদের গভীরতর এক উপলব্ধিতে নিয়ে যায় বিপুলকে জানার বিস্ময়ে।

বিজয় দিবসের আনন্দের স্নিগ্ধ আলো একমাত্র সত্য নয়। আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধে, বিপুল আত্মত্যাগে ক্ষুব্ধ আত্মার, অত্যাচার ও মানবতার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদে জ্বলে ওঠে বাঙালির আত্মার যে উত্তপ্ত কটাহ, সেখানেই সৃষ্টি হয়েছে স্বাধীনতার উজ্জ্বল সূর্য। বারবার আমাদের বিজয় দিবস, আমাদের সাফল্য ও গৌরবের আনন্দ বয়ে আনবে। এই আনন্দের বাহ্যিক প্রকাশের আড়ালে আরও গভীর ও প্রদীপ্ত যে উপলব্ধি তা হলো বাঙালি জাতির প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার, স্বপ্ন ও দূরদৃষ্টি যা প্রসারিত ও সঞ্চারিত অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। বিজয় দিবস এখানে অতীতের ঘটনা নয় শুধু, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকাও। নতুন প্রত্যাশা, উপলব্ধি ও সৃজনশীলতায় আমরা বিজয় দিবসের মহত্ত্ব, এর তাৎপর্য ও গুরুত্ব গভীরভাবে আবিষ্কার করব আরও বেশি সংখ্যায়, আর এ জন্যই কালের প্রবাহে বিজয় দিবসের উজ্জ্বলতা স্তিমিত না হয়ে তীব্রতর হবে।

স্বাধীনতার জন্য বিজ্ঞান বিজ্ঞানের জন্য স্বাধীনতা

স্বাধীনতার অনেকগুলো মাত্রা আছে এবং বিভিন্ন সব বৈশিষ্ট্য। সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে বোঝানো হয়ে থাকে—যেখানে একটি ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বসবাসকারী নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী যথার্থভাবে সমাজ পরিচালনা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন করে। রাষ্ট্রীয় এই স্বাধীনতা অর্জনের যে ইতিহাস বিভিন্ন জাতির ও দেশের তা বৈচিত্র্যপূর্ণ, ঘটনাবহুল এবং অনন্য প্রতিটি দেশের জন্য। স্বাধীনতা অর্জনের আড়ালে একটি জাতির সমন্বিত চেতনা, আকাঙ্ক্ষা, আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মত্যাগের প্রতিজ্ঞা থাকে। এই চেতনাবোধ দেশ ও স্বজাতির প্রতি ভালোবাসা, আত্মত্যাগের প্রেরণা ও সাহসিকতা একটি ক্রম-অর্জিত উন্নত উপলব্ধির ফসল। বাংলাদেশের জন্য বাঙালি জাতির যে গভীর আত্মত্যাগ, দীর্ঘ সংগ্রাম ও ঐক্যবদ্ধ অভিব্যক্তি, দেশপ্রেম ও সাহসিকতার ভিত্তি কোনো অন্ধ জাত্যভিমান, আধিপত্য বিস্তারের লোভ বা সম্পদ লাভের প্রলুব্ধতা নয়। একটি সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ ও উত্তরণ, আত্মপ্রকাশ, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মপরিচয়ের বিশুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা, অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা ও পরনির্ভরতা থেকে মুক্তি লাভের যে প্রেরণা, তা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে দিয়েছে গৌরবোজ্জ্বল, মানবিক ও বুদ্ধিদীপ্ত বৈশিষ্ট্য।

একটি ভৌগোলিক সীমানা নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভব ২৬ মার্চের দীপ্ত ঘোষণায়। এই স্বাধীনতা অর্জন যতই নাটকীয় হোক আকস্মিক প্রপঞ্চ ঘটনারূপে, পৃথিবীর মানচিত্রে নির্দিষ্ট সীমানারূপে চিহ্নিত হয়ে এবং সভ্যতার কালিক মাত্রার একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তকে বাঙালি জাতির জন্য উদ্ভাসিত করে তারিখ, মাস ও বছরের ঠিকানায়— এর একটি বিস্তার ও প্রভাব রয়েছে, পরিব্যাপ্তি স্থান ও কালে। জাতীয় স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো একটি চেতনা ও উপলব্ধির, মূল্যবোধ ও প্রেরণার সর্বজনীনতা। আত্মরক্ষা, আত্মপ্রকাশ ও আত্মপরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণা যখন ব্যক্তিগত তখন তা যতই তীব্র ও বস্তুনিষ্ঠ হোক, সংকীর্ণতা ও আত্মপ্রকাশের প্রেরণা যখন ব্যক্তিকে ছাপিয়ে হয়ে ওঠে পারস্পরিক, তখন একটি সমবায়ী প্রক্রিয়া, চেতনার আগুন ও উপলব্ধির আলো ক্রমাগত সঞ্চারিত হয় ব্যক্তি থেকে সমাজ ও জাতির মধ্যে, একটি বিনিময় ও যোগাযোগ-প্রক্রিয়া পরস্পরকে আবদ্ধ করে চেতনা ও মূল্যবোধে।

উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাকে পরস্পরের মধ্যে বিনিময় ঘটাতে গিয়ে যাচাই ও প্রমিতকরণ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। বিমূর্ত ভাবনা, যুক্তি প্রয়োগ, প্রতীকের ব্যবহার ও যোগাযোগ সৃষ্টির নানা কৌশল উদ্ভাবন করতে গিয়ে ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে।

প্রাণিজগতেও একধরনের সমাজবদ্ধতা আছে, কিন্তু তা একান্তই ইন্দ্রিয়নির্ভর ও প্রবৃত্তিজাত। সমাজবদ্ধ মানুষেরই একমাত্র চেতনা ও উপলব্ধিনির্ভর বিমূর্ত ভাষা আছে, যাকে ভিত্তি করে মানুষের কল্পনা, যুক্তিপ্রয়োগ ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। অভিজ্ঞতাকে ভাষার বিমূর্ত প্রতীকে প্রকাশ ও সংরক্ষণের স্বাধীনতা মানুষকে করেছে অনুসন্ধিৎসু, উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল। পরস্পরের আলোকে পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, যুক্তিপ্রয়োগ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরস্পরের জ্ঞানকে যাচাই ও সংশোধনের ভেতর দিয়ে মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে প্রমিত জ্ঞান অর্জন করেছে। নানা ঘটনার মধ্যে মিল ও কার্যকারণ সম্পর্ক উদ্‌ঘাটনের ভেতর দিয়ে মানুষ অর্জন করেছে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার মূল ভিত্তি হচ্ছে জ্ঞান এবং কল্পনাশক্তি, কালিক চেতনা ও পরিবর্তন সাধনের প্রেরণা।

মানুষ দীর্ঘদিন বন্দী ছিল অজ্ঞতা, ভৌত পরিবেশের বিরূপতা, দারিদ্র্য ও কুসংস্কারের প্রভাবে। প্রকৃতি ও পরিবেশকে জানা, অনুসন্ধিৎসা ও উদ্ভাবনের ভেতর দিয়ে প্রাকৃতিক ঘটনাবলির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা অর্জনকে যদি বিজ্ঞান বলি, তাহলে বিজ্ঞানই মানুষকে দিয়েছে মুক্তির পথ, মানসিক কুসংস্কার ও প্রকৃতিগত বন্দীদশা থেকে। মানুষ যত দিন প্রাকৃতিক দুর্যোগকে অতিপ্রাকৃত ঘটনা বলে জানত, বিশ্বাস করত অলৌকিক শক্তিতে এবং সমস্ত দুর্ভোগ ও দারিদ্র্যের জন্য দায়ী করত ভাগ্যকে, তত দিন মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সমাজপতিরা অথবা ধর্মযাজকেরা তাদের শোষণ করেছে অলৌকিক শক্তির প্রতিনিধি সেজে। এই মানসিক ও ভৌত অনুশাসন ও আরোপিত পরাধীনতা থেকে মুক্তিলাভের একমাত্র পথ হলো এই বিশ্বজগৎ, প্রকৃতি ও পরিবেশ, প্রাণিজগৎ ও সমাজকে জানা কার্যকারণের নিয়মে।

স্বাধীনতা তাই একটি ব্যাপক ও বিকাশমান ধারণা, যা নির্দিষ্ট স্থান বা কালের ঠিকানায় সীমাবদ্ধ নয়। তবু জ্ঞানের বিকাশ, অভিজ্ঞতার ক্রমসঞ্চয় ও চেতনার বিস্তার এর পরিমাণগত অগ্রগতির ধারায় যখন একটি ক্রান্তিক পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন একটি সমাজ বা দেশের পরিবর্তন ঘটায় স্বাধীনতাবোধের। পানি যেমন একটি বিশেষ তাপমাত্রায় ফুটতে থাকে, পানির সমগ্র দেহজুড়ে তাপের আদান-প্রদান ঘটিয়ে, আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে চেতনার আগুনও তেমনি সমগ্র জাতিকে উদ্দীপিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল স্বাধীনতাবোধে।

এ জন্য অবশ্য প্রয়োজন হয়েছে দীর্ঘ প্রস্তুতি—জ্ঞান সাধনা, শ্রমের, উপলব্ধির ও সৃজনশীলতার। প্রয়োজন পড়েছে আত্মত্যাগের, সাহসিকতার, ঐক্যসৃষ্টির এবং

দেশপ্রেমের সঞ্চারণের। রাজনৈতিক নেতৃত্ব, দূরদৃষ্টি, সাংগঠনিক দক্ষতা ও রাজনৈতিক সৃজনশীলতার দুর্লভ মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছিল বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্বে। তাঁর গভীর যে ভালোবাসা বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের জন্য, তার শক্তিতেই তিনি স্বাধীনতার চেতনাকে সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন সমগ্র জাতির মধ্যে আত্মত্যাগের মহিমায় ও উজ্জ্বল সাহসিকতায়। যে দীর্ঘ কালের প্রস্তুতি ও আত্মত্যাগের অসংখ্য ঘটনা, অসংখ্য মানুষের ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত প্রচেষ্টা বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্যকে উদ্ভাসিত করেছে ১৯৭১-এর ২৬ মার্চে, তা কখনো বিচ্ছিন্ন আলোকবর্তিকা নয় স্থান-কালের সন্ততিতে। স্বাধীনতা অর্জনের উজ্জ্বল ঘটনাকে অনুধাবন করতে হবে স্থান-কালের বিস্তৃতির মধ্যে—যেখানে অসংখ্য ঘটনা সাক্ষী হয়ে আছে আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামের অতীত ইতিহাসে।

স্বাধীনতার জন্য এ দেশের মানুষের গভীর আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যয়কে ধারণ করে এবং যেখানে অনাগত ভবিষ্যতে স্বাধীনতার আলো ও অঙ্গীকারকে সঞ্চারিত করার প্রতিজ্ঞায় প্রদীপ্ত বাংলাদেশের জাগ্রত জনতা। বস্তুত বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন, অর্থনৈতিক মুক্তি এবং ভাষার অধিকার ও গণতান্ত্রিক চেতনাকে ভিত্তি করে সাফল্য অর্জন করেছে, তার প্রেরণা ও উদ্ভাস একটি বিশ্বজনীন আবেদন নিয়ে স্বাধীনতাপ্রত্যাশী অন্যসব জাতিকেও নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত করবে। স্বাধীনতা এর ব্যাপকার্থে যেখানে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, আধিপত্য বিস্তার ও শোষণের বিরুদ্ধে এক অন্তহীন পথযাত্রা, সেখানে সেই পথচলার আলোকবর্তিকা হলো জ্ঞানের সাধনা, বিজ্ঞানের সৃজনশীলতা ও উপলব্ধির বিকাশ, যা একই সঙ্গে মানসিক ও বস্তুগত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সহায়ক।

বিপুল আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে অর্জিত যে স্বাধীনতা তা উপলব্ধি করার অর্থবহ ও অগ্রসর করে নেবার যে গুরুদায়িত্ব সেখানে বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম। স্বাধীনতার দুটো প্রধান অভিব্যক্তি আছে। একটি উপলব্ধিগত, অন্যটি বস্তুগত সমৃদ্ধিনির্ভর। কুসংস্কার, অলৌকিকতা, অজ্ঞতা, অযৌক্তিকতা মানবসভ্যতাকে গ্রাস করে রেখেছে দীর্ঘদিন। বিশ্বজগৎ ও প্রকৃতি, এখানে সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহ ও শক্তির খেলা মানুষকে বিহ্বল, আতঙ্কিত ও অদৃষ্টবাদী করে রেখেছে দীর্ঘদিন। অজ্ঞতাজনিত মানসিক দুর্বলতা, বস্তুগত দৈন্য এবং প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগ সৃষ্টি করেছিল ম্যাজিকাল বা ইন্দ্রজালিক এক বিশ্বের ধারণা। এর বিরুদ্ধে যে মানসিক চেতনা কাজ করে তা হলো, অনুসন্ধিৎসা, প্রশ্ন উত্থাপনের স্বাধীনতা পর্যবেক্ষণ প্রবণতা, সৃষ্টিশীলতা, যুক্তিপ্রয়োগের শক্তি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা।

আদি মানুষের মধ্যেও এই গুণগুলো ছিল কিন্তু তা প্রতিহত হয়েছে সামাজিকভাবে সুবিধাভোগী কিছু মানুষের জন্য, যারা কখনো ধর্মযাজক বা সমাজপতি সেজে মানুষকে বন্দী করে রেখেছে মুক্তচিন্তা ও আবিষ্কারের পথ থেকে। এখানে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ছিল ভয়, লোভ ও অন্ধ আনুগত্য। বিজ্ঞানের

ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে অনুসন্ধিৎসু, উদ্ভাবনী, সৃষ্টিশীল যেসব জ্ঞানের সাধক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন প্রচলিত বিশ্বধারণা ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে, তারা কীভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। বস্তুত মানুষের বিস্মিত হবার ক্ষমতা, কল্পনাশক্তি ও কালিক চেতনা তাকে একই সঙ্গে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অথবা সৃষ্টিশীল হবার সম্ভাবনা দিয়েছে। এই পরস্পরবিরোধী দুই শক্তির অধিকারী মানুষ দীর্ঘদিন ধর্ম, কাব্য, দর্শন ও বিজ্ঞানচর্চাকে অভিন্নভাবে দেখেছে। অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে প্রযুক্তিগত কিছু কৌশল মানুষ অর্জন করেছে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের।

প্রথম দিকে বিজ্ঞানের অপরিপক্ব জ্ঞান ও প্রযুক্তির অনগ্রসর দশার মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা ও পরিপূরকতা সৃষ্টি হয়নি। বিজ্ঞানের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে সামাজিক জড়তা, মুক্তচিন্তার পরিপন্থী ছিল বলে। পরিবেশ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকে নিয়ন্ত্রণ করা এমনকি এসব ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কে বুঝতে না পারার কারণে কুসংস্কার ও জড়তা বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে, যা থেকে এখনো আমরা মুক্ত নই।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দীর্ঘ সংঘাতের পথ অতিক্রম করে নতুন এক সম্ভাবনার পথ সৃষ্টি করেছে। এখানে প্রকৃতির ঘটনাবলির কার্যকারণ সম্পর্কে আবিষ্কার নতুন উপলব্ধি দিয়েছে এবং প্রযুক্তির নানা উদ্ভাবন দিয়েছে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা। দেশে দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার যে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে তা মূলত উপলব্ধিগত উত্তরণ ও বস্তুগত সমৃদ্ধির ফসল।

প্রথমটি ঘটেছে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ভেতর দিয়ে যা স্থান, কাল, কার্যকারণ সম্পর্ক, এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও প্রাণের উদ্ভব সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি দিয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতিও সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অভূতপূর্ব অগ্রগতির ভেতর দিয়ে। মানুষের বস্তুগত যে সমৃদ্ধি ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের যে দক্ষতা, তা এসেছে প্রযুক্তির অভিনব সব উদ্ভাবনের ভেতর দিয়ে। বস্তুত বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর সাফল্য সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পারস্পরিক প্রভাব ও নির্ভরতায়।

এটি সম্ভব হয়েছে কারণ, বিজ্ঞান প্রযুক্তির অগ্রগতি এদের মধ্যে প্রাবরণ ঘটিয়েছে। সবচেয়ে বড় যে ঘটনা ঘটেছে তা হলো, বিজ্ঞান ও সমাজের মধ্যে পরিবৃত্তি বা মিউটেশন। আমাদের স্বাধীনতার চেতনা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণা সৃষ্টি করেছে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে বর্ধিত জ্ঞান ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা। স্বাধীনতার মূলে রয়েছে চিন্তার স্বাধীনতা, সৃষ্টির স্বাধীনতা এবং সেই কারণে বিজ্ঞানচর্চার স্বাধীনতা। ব্যাপকতর অর্থে

স্বাধীনতা যেখানে জ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান সৃষ্টির স্বাধীনতা, প্রশ্ন করার ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হবার স্বাধীনতা, সুস্থতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও উপলব্ধির স্বাধীনতা, ঘটনার কারণ উদ্‌ঘাটন ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা, সেখানে স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের জন্য স্বাধীনতা। বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির বর্তমান অগ্রগতি মানবজাতির জন্য যে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তা অবিমিশ্র শুভ নয়। কারণ, সৃষ্টি ও ধ্বংসের সম্ভাবনা বিমিস্র বিজ্ঞানের প্রতিটি নতুন আবিষ্কারের মধ্যে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের আবিষ্কৃত নতুন শক্তির উৎস ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতাকে যুদ্ধবাজ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ব্যবহার করছে ধ্বংস ও ভীতি প্রদর্শনের কাজে। মানবকল্যাণ নিশ্চিত ও স্বাধীনতাকে বিকশিত করতে বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য হতে পারে দিকদর্শক। কিন্তু সে জন্য নিশ্চিত করতে হবে বিজ্ঞানচর্চায় স্বাধীনতা, এবং সে দায়িত্ব সমাজের। একেই আমি বলেছি বিজ্ঞান ও সমাজের মধ্যে পরিবৃত্তি।

বিজয় দিবস ও ভবিষ্যতের প্রত্যয়

বিজয় দিবস প্রতিবছর ফিরে আসে। এই দিনটি বাঙালি জাতির বীরত্ব, সাহসিকতা, আত্মত্যাগ ও আত্মোপলব্ধির পরম গৌরব বহন করে আনে। চার দশক ধরে বিজয় উৎসবের এই পৌনঃপুনিকতা এর উজ্জ্বলতাকে কি ম্লান করেছে? যেমনটি ঘটে আমাদের ব্যক্তিজীবনের কোনো সাফল্যের ঘটনার স্মৃতির ক্ষেত্রে। বস্তুত যে ঘটনা ঐতিহাসিক তার সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘটনার পার্থক্য এইখানে যে, কালের প্রবাহে ব্যক্তিগত আনন্দ বা বেদনার স্মৃতি যেমন ম্লান ও বিস্মৃত হয়, ইতিহাসের ঘটনার ক্ষেত্রে তার বিপরীতটি ঘটে। ব্যক্তিগত ঘটনা প্রায় ক্ষেত্রেই আকস্মিক। এর পেছনে কার্যকারণ সম্পর্ক থাকলেও তা স্থানীয় ও সংকীর্ণ। একজনের আনন্দ অন্যজনের দুঃখের মূল্যে, একটি বিজয় অন্যের পরাজয়কে ভিত্তি করে। ছোট ছোট এসব ব্যক্তিগত বিজয়ের আনন্দ তাই সঞ্চারিত হয় না অথবা বিবর্ধিত এক থেকে অনেকের মধ্যে, বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে, সীমা থেকে অসীমে।

ইতিহাসের ঘটনার আড়ালে একটি অনিবার্যতা থাকে যা নিয়ন্ত্রণ করে কার্যকারণ সম্পর্কের জাল। যে ব্যবস্থা বা সিস্টেম সীমিত উপাদান নিয়ে গঠিত সেখানে যা সম্ভাবনার তা অনিবার্যতার নয়। আমরা যখন কোনো বড় ব্যবস্থাকে বিবেচনা করি, যেখানে অসংখ্য উপাদান পারস্পারিক সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়, সেখানে সম্ভাবনার নিয়ম অনিবার্য কার্যকরণ সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়। যেমন, একা রাস্তা অতিক্রম করার সময় প্রতিটি মানুষের জন্য একটি সম্ভাবনার নিয়ম কাজ করে। বহুবার বিনা দুর্ঘটনায় একজন রাস্তা পার হতে পারেন আবার কেউ বা একবার রাস্তা পার হতে গিয়েও দুর্ঘটনায় পড়তে পারেন। এ জন্যে ব্যক্তিমানুষের ক্ষেত্রে এ ধরনের দুর্ঘটনা আকস্মিক মনে হয়। কিন্তু অসংখ্য মানুষ যখন প্রতিদিন নানা রাস্তা পার হচ্ছে তখন বছরে কতজন দুর্ঘটনায় পতিত হবে সে হিসাব সম্ভাবনার নিয়মে কষলেও তা বাস্তবের সঙ্গে প্রায় মিলে যায়। বীমা কোম্পানির এই দুর্ঘটনার হিসাব তাই নির্দিষ্ট গাণিতিক হিসাবে রূপান্তরিত হয়।
দীর্ঘ সময় ধরে সংঘটিত অসংখ্য ঘটনার অভিঘাতে সমগ্র জাতি আহত, বিক্ষুব্ধ, প্রতিবাদী, সাহসী ও সচেতন, সংঘবদ্ধ এবং আত্মত্যাগী হয়ে ওঠার অনিবার্য পরিণতি হলো আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ। ভাষার জন্য, স্বাধিকার ও গণতন্ত্রের জন্য,

অর্থনৈতিক মুক্তি ও মানবিক অধিকার লাভের জন্য যে বিচ্ছিন্ন সংগ্রাম তা ধাপে ধাপে জাতিকে সুসংবদ্ধ করেছে অভিন্ন এক চেতনায়—দেশপ্রেম ও প্রগতিশীলতায়। এখানে কাজ করেছে শান্ত ও সুস্থ জীবনের জন্য অসংখ্য মানুষের ভালোবাসা।

প্রতিদিনের শ্রমে, উৎপাদনশীল কাজে, প্রকৃতির সঙ্গে সংস্পর্শে দেশ ও দেশের মানুষকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার যে প্রক্রিয়া, সেটাই ভিত্তি দেশপ্রেমের। আমাদের অবচেতনায় এটি সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু এই উপলব্ধিকে গভীর, সর্বজনীন ও সক্রিয় করে তুলতে সাহায্য করেছে সাহিত্যিক, শিল্পী, কবি, গায়ক, চিত্রকর, নাট্যকার। ইতিহাসবিদ, সমাজবিজ্ঞানী দিয়েছে বিশ্লেষণ। রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামের প্রেরণা ও সাহস, যার চরম পরাকাষ্ঠা ঘটেছিল বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের মুক্তির সংগ্রাম ও স্বাধীনতার সংগ্রামের ডাকে। এর আগে অবশ্য দীর্ঘ আন্দোলন, কারাবাস, জনগণকে বোঝাবার ও উপলব্ধি সৃষ্টির কাজ করতে হয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নিরবচ্ছিন্ন জনসমর্থনের বাস্তব ও প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে। এ সমস্ত প্রচেষ্টা, ত্যাগ ও শ্রম সমন্বিত ও অভিসারী হয়ে সমগ্র জাতিকে প্রস্তুত করেছে মুক্তিযুদ্ধের জন্য। বিজয় দিবস এ সমস্ত আয়োজনের প্রপঞ্চ পরিণতিরূপে জাতিকে দিয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। কিন্তু এই বিজয় দিবস শুধু অতীতের আত্মত্যাগ ও সাফল্যের স্মৃতি বহন করে না; ভবিষ্যতের অঙ্গীকার ও অনিবার্যতাকেও নিশ্চিত করে।

যারা স্বাধীনতাযুদ্ধের মূল প্রেরণা, এর লক্ষ্য ও মূল্যবোধ, এর স্বপ্ন ও প্রতিজ্ঞা প্রতিফলিত হবার পথে নানা প্রতিবন্ধকতা দেখে অবদমিত, তাদের মনে রাখতে হবে মুক্তিযুদ্ধে যে সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত মুক্তিযোদ্ধারা রেখেছে, তা শুধু অতীতের ঘটনা নয়; সমগ্র জাতির এই জেগে ওঠার ভেতর দিয়ে আমরা আমাদের জাতিকে চিনেছি। পাথরে পাথর ঘষে আগুন জ্বালাবার ঘটনা শুধু প্রথম আগুন দেয়নি, দিয়েছে আগুন জ্বালাবার পদ্ধতি। এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়েছে আগুনের চিরস্থায়ী ঠিকানা। প্রথম আগুন জ্বালাবার ঘটনা তাই আকস্মিক ঘটনা নয়। একটি আবিষ্কার। আমাদের বিজয় দিবস যেখানে ভবিষ্যতের প্রত্যয়কে ধারণ করে আছে সেখানে তা শুধু সমুজ্জ্বল নয়, আরো উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হবার অঙ্গীকার বহন করে। স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষদের জন্য সাময়িক কোনো বাধা, এমনকি পশ্চাৎগতি যদি হতাশা সৃষ্টি করে, তাদের মনে রাখতে হবে বাহ্যিক পীড়ন যখন স্থিতিস্থাপক বস্তুকে সংকুচিত করে এর ভেতরের বিভব শক্তি ততই প্রবল হয়ে ওঠে গতিশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশের প্রস্তুতি নিয়ে।

এই সত্য শুধু স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তিদেরই জানার নয়, যারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে, নানা প্রবঞ্চনা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও পশ্চাৎপদতা দিয়ে স্বাধীনতার অর্জনকে ম্লান করতে প্রয়াস পেয়েছে, তাদের জন্যও সাবধানবাণী।

স্বাধীনতার বিরোধীদের আশ্বস্ত হবার কোনো কারণ নেই যে, বিজয় দিবসের স্মৃতি কালের প্রবাহে স্তিমিত হয়ে পড়বে। মুক্তিযোদ্ধারা বৃদ্ধ, ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়বে। মৃত্যুর কোলে তারা আশ্রয় নেবে। আর তখন বিজয় দিবসে উজ্জ্বল প্রভা তাদের অন্ধ দৃষ্টিকে আর ঝলসে দেবে না।

আসলে ইতিহাস সমুদ্রের মতন, যেখানে চেতনার ও আত্মত্যাগের সমস্ত ঘটনা সংস্কৃতির স্রোতধারায় সেখানে গিয়ে জমা হচ্ছে ক্রমাগত। দেশপ্রেম ও সভ্যতার প্রভা এই ইতিহাসের সমুদ্র থেকে আত্মত্যাগের সমস্ত ঘটনাকে অতীত থেকে জাগ্রত করবে, যেমন করে সূর্যের আলো সমুদ্রের পানিকে বাষ্প করে মেঘরূপে নিয়ে যায় পর্বতের চূড়ায়। বিজয় দিবসের তারিখটি সেই অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিবছর তাই ফিরে আসবে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে, শুধু অতীতের স্মৃতিরূপে নয়।

বিজয় দিবস–প্রসারিত দৃষ্টিতে

বিজয় দিবস বাঙালি জাতির গৌরবোজ্জ্বল অতীতরূপে একটি তারিখকে শুধু নির্দেশ করে না। এই দিনটির উৎস ও প্রভাব বিস্তৃত দীর্ঘকালের মধ্যে, যেখানে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একীভূত হয়ে আছে ঘটনা পরম্পরার কার্যকারণ সম্পর্কে। যদি ১৬ ডিসেম্বরকে ফেলে আসা একাত্তরের দুর্যোগপূর্ণ, সংগ্রামমুখর দিনগুলোর পটভূমিতে স্মরণ করি, আমরা দেখব—এই বিজয় দিবস যেমন আলোর উদ্ভাস নিয়ে আনন্দ ও গৌরবকে বহন করছে, তেমনি অনেক দুঃখ, শোক ও যন্ত্রণাকে ধারণ করে আছে। বস্তুত যেখানেই আলো সৃষ্টি আছে উজ্জ্বল শিখাকে প্রজ্বলিত করে, সেখানেই তার অনুষঙ্গরূপে আছে আগুনের উত্তাপ, ধোঁয়া ও ভস্মের উপস্থিতি। আমরা আনন্দকে নির্মলভাবে উপভোগের লক্ষ্যে এর সাথে মিশে থাকা শোক ও দুঃখের ঘটনাকে ভুলে থাকতে চাই; কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সত্যের একটি নিজস্ব দাবি আছে আপন স্বরূপ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াবার।

স্বাধীনতাযুদ্ধের সমস্ত আগুন ও ভস্মকে চাপা দিয়ে বিজয়ের স্নিগ্ধ আলোটুকু শুধু নিতে চাইলেও নিষ্ঠুর সমগ্র সত্য তা ঘটতে দেবে না। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পেছনে যে উপাদানগুলো কাজ করেছে সেখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানবিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক ভাবনা, শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টি হতে হয়েছে সমগ্র জাতির মধ্যে। সুন্দর, স্বাভাবিক নিরাপদ জীবনকে ভালোবাসা, সমাজবদ্ধভাবে উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখা, এ জন্য শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করা—সবই গুরুত্বপূর্ণ ধাপ সমাজের স্থিতিস্থাপকতা ও দৃঢ়তা সৃষ্টিতে। যেখানে স্থিতি আছে, শান্তি আছে, সুবিচার আছে সেখানেই শুধু সৃষ্টি হতে পারে মর্যাদাবোধ, আত্মবিশ্বাস ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন। স্থিতিস্থাপক বস্তুই শুধু প্রতিরোধ ও প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে পীড়নের বিরুদ্ধে।

বাঙালি জাতি দীর্ঘদিন ধরে ধাপে ধাপে একটি সুসংবদ্ধ জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পরই মাত্র সেই পটভূমি সৃষ্টি হয়েছে অন্যায়কে অন্যায় বলে জানার, অধিকার কেড়ে নেবার বিরুদ্ধে অধিকার সচেতনতা নিয়ে প্রতিবাদ করার। মাঠে ফসল ফলাতে গিয়ে ভূমিকর্ষণ, বীজ রোপণ, ঘাস ও আগাছা বাছাই করে আকাঙ্ক্ষিত শস্যের বৃদ্ধিকে সহায়তাদান আসলে একই সাথে শ্রম ও রুচির চর্চা। এখান থেকে উদ্ভব কৃষ্টির। অভিজ্ঞতার বিনিময় ঘটাতে যোগাযোগ সৃষ্টির প্রয়োজন মেটাতে ও সৃজনশীল ভাবনা ও স্বপ্নকে বিমূর্ত রূপ দিতে বিকাশ লাভ করেছে ভাষা। প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে জীবনধারাকে মিলিয়ে নিতে উৎপাদনশীল কাজে

দুর্যোগ ও বিপদের বিরুদ্ধে একত্রে মোকাবিলা করতে গড়ে উঠেছে সামাজিক ঐক্য ও দেশের জন্য মমত্ববোধ। জ্ঞানের চর্চা ও শিক্ষার বিকাশ বহির্বিশ্বের সাথে পরিচয় জাগ্রত করেছে মানবিক মূল্যবোধ, অধিকার সচেতনতা, রাজনৈতিক চেতনা। ধাপে ধাপে নানা কাজের ভেতর দিয়ে যে ঐক্য ও সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তারই পূর্ণতর রূপ জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্ববোধের উদ্বোধন ঘটিয়েছে।

জলীয় বাষ্পে ঘনীভূত হয়ে জলকণা সৃষ্টির জন্য কেন্দ্রীণ প্রয়োজন হয়। এ জন্যই পাতার তীক্ষ্ণ প্রান্তে শিশির জমে, বাতাসে ভাসমান ধূলিকণাকে ঘিরে বৃষ্টির ফোঁটা জন্ম নেয়। সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতেও তেমনি নেতৃত্ব প্রয়োজন হয়। ব্যক্তিমানুষের ভাবনা, অধিকারবোধ, দেশ ও দেশের মানুষের জন্য বিক্ষিপ্ত মমত্ববোধ ও বিচ্ছিন্ন ভালোবাসাকে অভিসারী ও ঐক্যবদ্ধ যে করে, অনুপ্রেরণা ও আত্মত্যাগের মহিমায়, তাকেই আমরা বলি জাতীয় নেতা। ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ছোট ছোট আয়োজন বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছোট ছোট দলের সমন্বয় ও ঐকমত্য এবং পটভূমি সৃষ্টি করে বৃহৎ জাতিসত্তা গড়ে ওঠার। বাঙালি জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির পেছনে দীর্ঘ যে পথপরিক্রমা, অসংখ্য মানুষের কর্ম, ত্যাগ, সৃজনশীলতা, দূরদৃষ্টি, দেশপ্রেম ও সংগ্রামের ফসল সংগ্রহ করে তা সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি না করলে বিজয় দিবসের পটভূমি অবজ্ঞাত থাকবে। বৃক্ষের উচ্চতম শাখায় যে ফুলটি প্রস্ফুটিত তার বিচ্ছিন্ন কোনো আবির্ভাব ঘটেনি আকস্মিকভাবে। মাটির নিচে শিকড় প্রোথিত করে পানি ও রাসায়নিক উপাদান সংগ্রহ ও নিজের ঋজু অবস্থানকে টিকিয়ে রাখা এবং পল্লবিত সবুজ পাতায় সূর্যের আলো ও বাতাস থেকে নেওয়া কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষণ ঘটানো, গাছকে দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্তুত করে ফুল ফোটাবার জন্য। আমাদের বিজয় দিবস তেমনি সমগ্র জাতির দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্তুতির ভেতর দিয়েই অর্জিত হয়েছে।

বস্তুত গাছের ফুল ফোটার মতন মুক্তিযুদ্ধের বিজয় সুনিশ্চিত কালনির্ভর ঘটনা নয়। অর্থাৎ একটি বিশেষ সময় পরে বিকাশ লাভের একটি পর্যায়ে নিশ্চিতভাবে স্বাধীনতা আসবে এ কথা বলা যাবে না, যেমনটি আমরা বলতে পারি গাছের ফুল ফোটার ক্ষেত্রে। মুক্তিযুদ্ধের বিজয় এসেছে অবশ্যই কার্যকারণের নিয়মে; কিন্তু সেই কার্যকারণ সম্ভাবনার নিয়ম দ্বারা পরিচালিত, নিশ্চয়তার নিয়ম দ্বারা নয়। মুক্তিযুদ্ধের জন্য একদিকে মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, প্রেরণা ও সাহসিকতার প্রয়োজন হয়েছে, যা বস্তুগত নয়, বিমূর্ত। অন্যদিকে জীবনকে বিপন্ন করে, সমগ্র জাতিকে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে, ত্রিশ লক্ষ শহীদকে জীবন দিয়ে, এই বিজয় অর্জন করতে হয়েছে। জীবন, সম্পদ ও স্বাভাবিক জীবনকে বিসর্জন দেওয়ার মধ্যে যে আত্মত্যাগ ও সাহসিকতা তা ভৌত। সমগ্র জাতির আত্মত্যাগের কথা বললেও আসলে দেশের সবাইকে নিয়ে সেই সমগ্র জাতি গঠিত ছিল না।

একই বয়সের একজন তরুণ যেখানে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেখানে সেই বয়সের একজন রাজাকার তখন স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ

করেছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসর ও দালাল সেজে। আর এ জন্যই স্বাধীনতাযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে শুধু অস্ত্র ও শক্তি দিয়ে নয়, শুধু জীবন দিয়েও নয়, জীবনের চেয়েও মূল্যবান এক মূল্যবোধ ও আদর্শ মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেছে দেশের জন্য জীবনকে বিপন্ন করতে। বিজয় দিবসকে স্মরণ করতে, এর গভীরতম তাৎপর্যকে উপলব্ধি করতে মুক্তিযুদ্ধের এই দর্শন, এই বিমূর্ত লক্ষ্যকে অবধারণ করতে হবে।

আত্মপরিচয়, আত্মমর্যাদাবোধ, গণতান্ত্রিক চেতনা, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা—সবকিছুর সমন্বিত অভিব্যক্তি আমরা দেখতে পাই মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির মধ্যে। এখানে দৃঢ়সংকল্প একটি যৌথ সিদ্ধান্ত জাতিকে দিয়েছিল ইস্পাতের দৃঢ়তা। এ জন্য অপরিহার্য ছিল বঙ্গবন্ধুর মহান নেতৃত্ব। তাঁর নেতৃত্বেই জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি হয়েছিল বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে একটি উদার মানবিক চেতনার প্রভাবে। দৃঢ় অনুবন্ধনই কঠিন বস্তুকে স্থিতিস্থাপকতা দেয়। অর্থাৎ সেই স্থিতিস্থাপক বস্তুকে পীড়ন করলে তাকে সমগ্র পরমাণুগুলো প্রতিহত করে একত্রে। বাঙালি জাতিও তেমনি সাংস্কৃতিক ও গণতান্ত্রিক চেতনার আলোকে দেশপ্রেমকে রূপ দিয়েছিল উদার ও মানবিক বৈশিষ্ট্যে। আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ এখানেই অনন্য। লোভ, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, ভয় প্রভৃতি স্থূল ও সংকীর্ণ প্রভাব ব্যবহার করেও কখনো কখনো মানুষকে দলবদ্ধ করা যায়; কিন্তু মানসিক ঐক্য সৃষ্টি হয় না। মানুষের সবচেয়ে অনন্য অর্জন হলো সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যবুদ্ধি, রুচি, আত্মমর্যাদাবোধ, যোগাযোগসাধ্যতা। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ও আধুনিক এই গুণগুলো ভিত্তি করে।

কিন্তু সংস্কৃতির ও মানবিক মূল্যবোধের এই প্রভাববলয় শুধু তাদেরই প্রভা করে যারা এই রুচি ও শিক্ষার দ্বারা আবিষ্ট হয়েছে। শুধু একটি চার্জযুক্ত বস্তু যেমন বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র বা প্রভাববলয় দ্বারা প্রভাবিত হয়, একজন রুচিসম্পন্ন সাংস্কৃতিক ও মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ ব্যক্তিই শুধু প্রভাবিত হয় সাংস্কৃতিক ও মানবিক মূল্যবোধ দ্বারা। অসাম্প্রদায়িক চেতনায়, মানবিক মূল্যবোধে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে যারা পাশবিক প্রবৃত্তিগুলো অতিক্রম করতে পারেনি তারাই ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল আদর্শ ও দর্শনকে অবধারণ করতে। প্রবৃত্তির পরিবর্তে সৌন্দর্যবুদ্ধি, রুচি ও উদার মানবিক চেতনার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার যে শিক্ষা তা সহজাত নয়; কষ্টার্জিত, শ্রম সাধনা ও ক্রমাগত গভীরতর দৃষ্টি ও নতুন সৃষ্টির ফসল।

বিজয় কোনো আকস্মিক কাকতালীয় ঘটনা নয়। এর অর্জনে যেমন দীর্ঘ প্রস্তুতি, মানসিক উত্তরণ ও জাতীয় ঐক্য প্রয়োজন ছিল, এই বিজয় দিবসকে সার্থক করতে তেমনি চাই চেতনার অব্যাহত বিকাশ, প্রেরণা ও সাহস। বিজয় দিবসকে কোনো ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির মতন একবার ঘটে যাওয়া ঘটনারূপে দেখলে তা অতীতের মনে হবে; কিন্তু বিজয় দিবস প্রবাহিত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ। এর বাহ্যিক যে প্রকাশ উৎসবের আয়োজনে, তার চেয়েও বড় সত্য এর চালিকা শক্তি। বাহ্যিক চেহারার পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং এর উচ্চতার হ্রাস-বৃদ্ধি, কিন্তু অন্তর্নিহিত

চালিকা শক্তি এর গতি ও স্থিতির রূপ বদলায় পর্যায়ক্রমে; কিন্তু নিঃশেষিত হওয়ার নয় অথবা ম্লান।

বিরূপ পরিবেশ ও বাহ্যিক পীড়ন যে প্রতিরোধের শক্তিরূপে জমে ওঠে একটি স্থিতিস্থাপক বস্তুর মধ্যে, একটি জাতিও তেমনি দুর্যোগ, দুঃশাসন ও পীড়নের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করে ভেতর থেকে, এবং তার অভিব্যক্তি ঘটে প্রতিরোধ ও পরিবর্তনের ঢেউরূপে। প্রবাহিত ঢেউয়ের বৈশিষ্ট্য হলো একে যাচাই করতে হয় পূর্ণ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে। তরঙ্গের চূড়া অথবা পাদদেশ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কারণ, এর চালক যে শক্তি তা শুধু রূপ বদলায় স্থিতি থেকে গতি এবং গতি থেকে স্থিতিতে। এই শক্তি সংরক্ষণের মূলে কাজ করে বস্তু কণিকাগুলোর ছন্দিত গতি, এদের সংসক্ততা।

অন্যায়, অত্যাচার, পাশবিকতার বিরুদ্ধে যে জাতীয় ঐক্য, যে সংসক্ততা, তার জন্য ভালোবাসা চাই জীবনের প্রতি; মানবিক চেতনায় উদ্দীপিত মূল্যবোধ চাই, আধান চাই জ্ঞান ও সৃজনশীলতার, যেখান থেকে জন্ম নেয় অসাম্প্রদায়িক ভাবনা, সৌন্দর্যবুদ্ধি ও প্রগতিশীলতা।

বিজয় দিবসকে গভীরতর উপলব্ধিতে আবিষ্কার করতে হলে ক্রমসঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে অতীতকে বিশ্লেষণ করতে হবে। বস্তুত বিজয় দিবস যতবার ফিরে আসছে বছর পরিক্রমায় ততই ব্যাপকতর ও গভীরতর হচ্ছে এর প্রভাববলয়। বিজয় দিবসের সমগ্র চেতনা, মূল্যবোধ, প্রেরণা ও শক্তি নিয়ে যেখানে অভিব্যক্ত সেখানে এর উৎসের সীমানা ক্রমাগত দূরতর অতীতে প্রসারিত, এর বর্তমান তত বেশি বস্তুনিষ্ঠ, কঠোর ও পরিব্যাপ্ত এবং ভবিষ্যৎ দীর্ঘতর পথচলায় অঙ্গীকারবদ্ধ। বিজয় দিবস অধিকসংখ্যক মানুষের গভীরতর চেতনা, উপলব্ধি ও দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রতিবছর আবির্ভূত হওয়ার; যাঁদের আত্মত্যাগ, সাহসিকতা ও স্বপ্ন বিজয় দিবসকে আমাদের উপহার দিয়েছে এর সমগ্র উজ্জ্বলতা নিয়ে, তাঁরা আমাদের স্মৃতিতে ক্রমাগত উজ্জ্বলতর হওয়ার কথা। ইতিহাসের ঘটনার এটাই বৈশিষ্ট্য তাকে গভীরতর দৃষ্টিতে জানতে ও আবিষ্কার করতে দীর্ঘতর সময় প্রয়োজন। আর সে জন্যই তা উজ্জ্বলতর হয় কালের প্রবাহে, ক্রমাগত ম্লান ও স্তিমিত না হয়ে। সাময়িক কোনো বিপর্যয়, অগ্রগতির পথে কোনো বাধা এলে মনে রাখতে হবে এই পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শক্তি প্রগতির ঢেউকে সঞ্চারিত করবে দ্রুততায়, যেমনটি ঘটে সমুদ্রের প্রবাহিত ঢেউয়ে বা কঠিন বস্তুর মধ্যে সঞ্চারিত যান্ত্রিক তরঙ্গের ক্ষেত্রে।

বিজয় দিবস যে আত্মপরিচয়, আত্মবিশ্বাস ও চেতনায় নিজেদের আবিষ্কার করার শক্তি দিয়েছে তা থেকে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎকে নির্মাণ করতে পারি। বর্তমানের চেতনা, দৃষ্টির স্বচ্ছতা ও কৃতজ্ঞতাবোধ দিতে পারে সেই দর্পণ যেখানে ভবিষ্যৎ প্রতিফলিত অতীতের উজ্জ্বল ঘটনায়। স্বাধীনতার শত্রু তারাই যারা বিজয় দিবসের মূল প্রেরণা, আদর্শ ও চেতনাকে ম্লান করতে নিয়োজিত। বর্তমানের উপলব্ধির দর্পণে ভবিষ্যৎকে দেখার যে দৃষ্টি মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহে, তাকে স্বচ্ছতর করাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের। এ জন্যই প্রয়োজন ব্যাপকতর ও গভীরতর বিশ্লেষণ প্রতি নতুন বছরের বিজয় দিবসের।

বিজ্ঞান ও স্বাধীনতা

স্বাধীনতা শব্দটি আমরা প্রায়শ রাজনৈতিক অর্থে শুধু ব্যবহার করে থাকি। স্বাধীনতার কথা যখন বলি, তখন বিশেষ ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বসবাসকারী জনগণ নিজেরাই তাদের রাষ্ট্র পরিচালনা করছে কি না সেটাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা বা কোনো সমাজের স্বাধীনতা বলতে আমরা বুঝি কতটা মুক্তভাবে, আপন ইচ্ছায় কোনো ব্যক্তি বা সমাজ ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবন যাপন করছে। আপন ইচ্ছা বা নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বলতে আমরা কথা বলা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাই বুঝে থাকি। রাজনৈতিক নানা কর্মকাণ্ডে ব্যক্তি ও সমাজের মত প্রকাশের, শাসক নির্বাচনের অথবা তাদের কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করার রাজনৈতিক স্বাধীনতায় সাধারণত প্রকাশ পায়।

এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমরা সংঘবদ্ধ হই, প্রতিবাদী ও সংগ্রামী হই, এমনকি যুদ্ধ করি। রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের এই সংগ্রাম স্বাধীনতা শব্দটির প্রায় সমগ্র অর্থ অধিকার করে আছে। রাজনৈতিক এই স্বাধীনতার গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপার এবং সেই মূল্য প্রতিফলিত ও মূল্যায়িত এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অসংখ্য মানুষের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের ঘটনা যদিও একটি নির্দিষ্ট তারিখ দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকে এবং স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামকে একটি যুদ্ধের নাটকীয় ঘটনার দ্বারা প্রকাশ করা হয়, বাস্তবে স্বাধীনতা একটি পরিব্যাপ্ত ও বহুমাত্রিক ব্যাপার। স্বাধীনতা অর্জনের নাটকীয় ঘটনার পূর্বাপর ইতিহাস তাই যেমন প্রাসঙ্গিক, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতার গভীর অর্থ উপলব্ধি করা।

স্বাধীনতা শুধু কথা বলা ও মত প্রকাশের অবাধ সুযোগরূপে বিবেচিত হলে আমাদের অবস্থার পরিবর্তন বাস্তবে সম্ভব না-ও হতে পারে। আমাদের বস্তুগত পরিবেশ এবং প্রয়োজন মেটাবার ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের যে শক্তি তা নিহিত আমাদের কাজ করার স্বাধীনতার ওপর। কথা দিয়ে আমরা মানুষকে প্রভাবিত বা উত্তেজিত করতে পারি, কিন্তু মানুষের বস্তুগত প্রয়োজন ও ভৌত পরিবেশ যে কঠোর প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত তা কথার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না; যদি না সেই কথায় নতুন তথ্য থাকে অথবা কর্মপদ্ধতির নির্দেশমালা। প্রকৃতির নিয়মগুলোকে যত গভীরভাবে আমরা জানতে পারি, ততই স্বাধীনভাবে আমরা

প্রকৃতির ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হই। প্রতিটি আবিষ্কৃত প্রকৃতির নিয়ম, উদ্‌ঘাটিত তত্ত্ব ও উদ্ভাবিত যন্ত্র আমাদের কর্মের স্বাধীনতাকে নতুন মাত্রায় সমৃদ্ধ করে। পিপাসার কথা জানাবার স্বাধীনতা অবশ্যই একটি স্বাধীনতা। কিন্তু পিপাসা মেটাবার জন্য পানি সংগ্রহের দক্ষতা যদি অর্জিত না হয় তাহলে পিপাসা মেটাবার স্বাধীনতা আমরা পাই না। পানির উৎস আবিষ্কারের ভেতর দিয়েই মাত্র পিপাসা নিবৃত্তির বৃহত্তর স্বাধীনতা আমরা অর্জন করতে পারি।

বস্তুত পানির উৎস যে কোথাও আছে, পানি যে পাওয়া সম্ভব এই জ্ঞান ও উপলব্ধি লাভ ঘটলেই মাত্র পিপাসার কথা জানাবার স্বাধীনতা আমাদের মনে জাগ্রত হয়। যা আমাদের মনের স্বাধীনতা বলে জানি, গভীর বিশ্লেষণে দেখা যাবে তা আসলে আমাদের জ্ঞানের স্বাধীনতা। যেখানে বিকল্প কোনো পথ নেই, সেখানে স্বাধীনভাবে পথ নির্বাচনের প্রশ্নই ওঠে না। আমরা কোথায় যেতে চাই বা নির্ধারিত কোথায় যাবার জন্য পথ নির্মিত হয়েছে অথবা পথ নির্মাণের প্রয়োজনীয় তথ্য উদ্‌ঘাটন ও কৌশল উদ্ভাবন আমরা করতে পেরেছি, সেটাই নির্ধারণ করে আমরা কতটা স্বাধীন।

বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বিকাশমান ও অন্তহীন বলেই আমাদের স্বাধীনতাও ক্রমাগত সমৃদ্ধতর হতে পারে নতুন মাত্রায়। আমরা যে আমাদের বুদ্ধির প্রয়োগে, অনুসন্ধিৎসায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাধীনতায় আমাদের জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে পারি, এই উপলব্ধি বা চেতনাই রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ভিত্তি।

মানুষ যত দিন জেনেছে তার ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত, তত দিন সে সমস্ত দুর্ভোগ, ক্ষুধার যন্ত্রণা ও প্রতিকূল পরিবেশকে মুখ বুজে সহ্য করেছে বোবা পশুদের মতো। মানুষ যে ভাষা লাভের স্বাধীনতা অর্জন করেছে, লাভ করেছে কালিক চেতনা, তার মূলে কাজ করেছে তার দৃষ্টি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচালনাকে সমন্বিতভাবে নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা অর্জন। বৃক্ষবাসী মানুষ, বরং বলা উচিত তার পূর্বপুরুষ, যখন তার সামনের দুটি পাকে রূপান্তরিত করল হাতে, ফলে ঋজু হয়ে দাঁড়াল সে, এবং তার দৃষ্টির সাথে সামনের পা-কে সমন্বিতভাবে ব্যবহার করল কোনো বস্তুকে ধরার কাজে, তখনি সামনের পা রূপান্তরিত হলো হাতে। কোনো কিছুকে ধরার শক্তি অর্জনের মধ্যেই নিহিত কোনো কিছু ধরার ইচ্ছা এবং এই ইচ্ছাকে শব্দের প্রতীকে সৃষ্টি করার ভেতর দিয়েই ভাষার জন্ম।

প্রাথমিক অবস্থায় অঙ্গ পরিচালনার স্বাধীনতা যেখানে সীমাবদ্ধ ছিল আত্মরক্ষা ও খাদ্য সংগ্রহের কাজে এবং ভাষা ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম, কালের বিবর্তনে তার রূপান্তর ঘটল। যা প্রকৃতিতে সহজলভ্য নয়, তাকেও মানুষ নির্মাণ করতে আগ্রহী হলো। যে ঘটনা শুধু জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজন তাকে অতিক্রম করে এমন ঘটনাও মানুষ ঘটাতে আগ্রহী হলো—যা প্রয়োজন মেটায় না, কিন্তু অনুসন্ধিৎসা ও জানার ইচ্ছাকে পূরণ করে। এর ফলেই জন্ম নিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

মানুষের পরিকল্পিত ও আপন ইচ্ছায় সংঘটিত ঘটনাই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, যা প্রকৃতির নতুন রহস্যকে উদ্‌ঘাটন করে।

পরীক্ষালব্ধ, অভিনব এসব তথ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে আমাদের দৈনন্দিন ভাষা রূপান্তরিত হলো বিজ্ঞানের ভাষায়। পরিমাপ, পরিমাণ নির্ণয়, তুলনা, যৌক্তিক সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন—এসব কিছুর জন্যই জন্ম হলো গণিতের। ভাষার এই সূক্ষ্ম ও বিমূর্ত রূপ মানুষের চিন্তার স্বাধীনতাকে গুণগতভাবে বদলে দিল। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের যে স্বাধীনতা মানুষ ধাপে ধাপে লাভ করেছে, তার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে।

মানুষ যত দিন ফলমূল ও কাঁচা মাংস খেয়ে জীবন যাপন করত, তত দিন তার দাঁতের ব্যবহার প্রধান ভূমিকা পালন করত, খাদ্যবস্তুকে চিবিয়ে হজমযোগ্য করার কাজে। ফলে, মানুষের দুই মাড়ি বড় বড় দাঁত সমস্ত মুখমণ্ডল অধিকার করে থাকত। এ জন্য মস্তিষ্কের মগজের জন্য যথেষ্ট স্থানসংকুলান ছিল না। আগুনের আবিষ্কার মাড়ির গুরুত্ব, সেই সাথে এর অধিকৃত স্থানকে কমিয়ে এনে মস্তিষ্কের বিবর্তন ও বিকাশকে সম্ভব করেছে।

কৃষির উদ্ভাবন মানুষকে মুক্ত করেছে সার্বক্ষণিকভাবে খাবার অন্বেষণের শ্রম ও প্রয়োজনীয় খাদ্যের অনিশ্চয়তা থেকে। শক্তির উৎস আবিষ্কার এবং নানা যন্ত্র উদ্ভাবনের ভেতর দিয়ে পেশিশক্তির পরিবর্তে বাহ্যিকভাবে যান্ত্রিক শক্তির ব্যবহার মানুষকে মুক্ত করেছে কায়িক শ্রম থেকে। এর আগে মানুষ পশুদের মতোই আপন পেশিবলনির্ভর ছিল খাদ্য সংগ্রহ ও জীবন নির্বাহের কাজে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ও প্রযুক্তির উদ্ভাবনের সেই আদিপর্ব মানুষকে ভৌত স্বাধীনতা দিয়েছ ক্ষুধা নিবৃত্তির, গৃহ নির্মাণের, রোগ মুক্তির, চলাচলের এবং সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করার। সামাজিকভাবে একত্রে বাস করতে গিয়েই মানুষ প্রয়োজন বোধ করেছে যোগাযোগ সৃষ্টির, যার অভিব্যক্তি ঘটেছে ভাষার উদ্ভাবনে।

ভাষার সৃষ্টি মানুষকে বিমূর্ত চিন্তার সুযোগ ও দক্ষতা দিয়েছে। ভাষাহীন প্রাণীরা অব্যবহিত বস্তুমালা ও ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই অবস্থায় কালিক চেতনা সম্ভব নয়। মানুষই যে একমাত্র প্রাণী, যার ভাষা আছে এবং সেই সাথে কালিক চেতনা, তার মূলে রয়েছে মানুষের মস্তিষ্কের অনন্য গঠন। এই মস্তিষ্ক মানুষ লাভ করেছে দীর্ঘকালের মধ্যে সংঘটিত এক বিবর্তনের ফলে। বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি যেহেতু পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার দক্ষতা অর্জন। ফলে, নতুনকে মোকাবিলা করার স্বাধীনতা বিজ্ঞানচর্চার ভেতর দিয়েই সৃষ্টি হয়। যত বেশি বিকল্প পথ আমাদের সামনে খোলা থাকে, যত বেশি দক্ষতা আমরা অর্জন করি অপ্রত্যাশিত ও অভিনব পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে, তত বেশি স্বাধীনতা আমরা লাভ করি। বিজ্ঞান যেহেতু

ক্রমাগতভাবে আমাদের সম্মুখে নতুন পথ ও নতুন সম্ভাবনা উন্মোচিত করে, তাই বিজ্ঞানের প্রদত্ত স্বাধীনতাও অশেষ, বিজ্ঞানের বিকাশের অন্তহীন পথের মতোই।

বিজ্ঞান বহু অর্থে আমাদের স্বাধীনতাকে গভীরতর ও সমৃদ্ধতর করেছে। প্রথম স্বাধীনতা হলো নতুন ঘটনা ঘটাবার ও অভিজ্ঞতা অর্জনের স্বাধীনতা। বিজ্ঞানের বিমূর্ত, যৌক্তিক ও গাণিতিক ভাষায় এই অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা ও সম্পর্কিত করার স্বাধীনতা সূক্ষ্মতর ও শুদ্ধতর এক অভিব্যক্তি স্বাধীনতাবোধের। প্রকৃতির নিয়মকে জেনে ও তার প্রয়োগে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতাই হলো প্রযুক্তির স্বাধীনতা। নতুন বস্তু নতুন শক্তির উৎস, নতুন নির্মাণ-কৌশল, যেমন মানুষের বাহ্যিক ও ভৌত স্বাধীনতাকে বৃদ্ধি করেছে, তেমনি এই দক্ষতা অর্জন মানুষকে দিয়েছে আত্মবিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা ও অনাগত ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণের। কিন্তু বিজ্ঞান সবচেয়ে গভীরভাবে যে স্বাধীনতার চেতনা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছে তা হলো, বিশ্বজগৎকে জানার ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের যে শক্তি মানুষের তা অনির্ণেয় ও অন্তহীন।

মানুষের ভাগ্য মানুষেরই হাতে। ক্রমাগত উপলব্ধি ও উপযোগের উত্তরণ ঘটিয়ে মানুষ সামনের দিকে এগোবে অথবা দায়িত্বহীনতা ও অবিমৃষ্যকারিতায় সমগ্র মানবসভ্যতাকে এক মুহূর্তে ধ্বংস করে ফেলবে—এই দুই বিকল্প পথ বিজ্ঞান মানুষের কাছে তুলে ধরেছে। সভ্যতা সংরক্ষণের এক গভীর দায়িত্ববোধ তাই যুক্ত হয়েছে বিজ্ঞানের প্রদত্ত স্বাধীনতার সাথে, যা একই সাথে অপার সম্ভাবনার ও চরম বিপর্যয়ের।

বস্তুবিজ্ঞান ও গণিতের অগ্রগতি জন্ম দিয়েছে কমপিউটার ও তথ্য বিপ্লব। ফলে মানুষের বুদ্ধিগত কাজে সহায়ক হয়েছে নতুন সব উদ্ভাবন যেমন সুপার কমপিউটার স্পেন ইলেকট্রনিক্স এবং স্বাধীনতা নতুন মাত্রা লাভ করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শুধু ভৌত স্বাধীনতা নয় মানসিক স্বাধীনতা দিয়েছে মানুষকে। বুঝতে হবে বর্ধিত এই স্বাধীনতা শুধু উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহারের স্বাধীনতা নয়, বিশ্ব প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের ও নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের স্বাধীনতা।

স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস প্রসঙ্গে

স্বাধীনতাযুদ্ধ আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অনন্য ঘটনা, যেমন অন্য সব জাতির জন্যেও। এটি এমন এক প্রবঞ্চ ব্যাপার যে একে ঘটনা না বলে প্রতিভাস বলাই সংগত। স্বাধীনতা বিস্ময়কর এক দশা পরিবর্তন। সূর্যের আলোয় পর্বতচূড়ায় বন্দী তুষারের গলে গলে জলপ্রপাত বা পাহাড়ে নদীর প্রবাহ সৃষ্টির মতন, বাষ্পীভূত সমুদ্রের পানির মেঘ হয়ে আকাশে পরিভ্রমণ। স্বাধীনতা যেন শস্যবীজের অঙ্কুরোদ্গমন—মাটির উষ্ণতা নিয়ে, আর্দ্রতা নিয়ে একটি মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ—আবরণ বিদীর্ণ করে মাটি চিরে অন্ধকার থেকে আলোয় সবুজ পাতা মেলা। স্বাধীনতা ডিমের খোলস ভেঙে পাখির ছানার ডানা মেলা মুক্ত আকাশে।

এ সমস্ত ঘটনার মধ্যেই নাটকীয়তা আছে, আকস্মিকতা আছে, ক্রান্তিক সমন্বয় আছে নানা উপাদানের। কিন্তু কোনো অলৌকিকতা নেই, কোনো বিচ্ছিন্নতা নেই স্থান-কালের বিস্তার ও ঘটনাপ্রবাহ থেকে। ঐতিহাসিকের কাজ স্বাধীনতার ঘটনাকে পুনরাবিষ্কার করা কার্যকারণ সম্পর্কে, স্থান ও কালের ব্যক্তির মধ্যে, ঘটনার পারম্পর্যে স্বাধীনতার বিশেষত্ব উপলব্ধি করা। স্বাধীনতাযুদ্ধকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলেছি আমাদের জীবনে, কারণ সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনা নিয়ে বাঙালি জাতির উদ্ভব এবং সংজ্ঞায়ন দুই-ই ঘটেছে স্বাধীনতার ভেতর দিয়ে। অনন্য বলেছি কারণ, স্বাধীনতা একবারই শুধু অর্জিত হয়। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সীমাহীন আত্মত্যাগ, দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম—সবই উপাদান স্বাধীনতাযুদ্ধের। কিন্তু সবচেয়ে গভীর ও উজ্জ্বল হয়ে উদ্ভাসিত আত্ম-আবিষ্কার। সুন্দর জীবনের স্বপ্ন। দেশের মাটি ও মানুষের জন্য ঐক্যবদ্ধ ও অপার ভালোবাসার প্রকাশ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম ঘটনা কেমন করে ঘটল? কে এর স্বপ্নদ্রষ্টা? কী কার্যকারণ সম্পর্ক স্বাধীনতাযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করেছে আগে ও পরে? এসব প্রশ্নের সমন্বিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ জবাব নিয়েই স্বাধীনতার ইতিহাস রচিত হবার কথা। স্বাধীনতার ইতিহাস স্বভাবতই বিশাল ক্যানভাসে আঁকা বর্ণাঢ্য এক চিত্র। বস্তুত ইতিহাস কোনো স্থির চিত্র নয়। ইতিহাসের ঘটনা ঐতিহাসিকের উপলব্ধি ও চেতনায় সজীবতা ও সাযুজ্যপ্রাপ্ত। এখানে ঘটনামালাকে ইতিহাসবিদ সাজান পারস্পরিকতায়, পারম্পর্যে ও কার্যকারণ সম্পর্কে। এ জন্য অবশ্যই তাকে মূল্যায়ন ও যাচাই করতে হয় সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তকে। এমনকি ঘটনার মূল্যায়ন

যাচাই বা বিন্যাসের আগেই অসংখ্য ঘটনাকে নির্বাচন করেন ঐতিহাসিক। এখানে অবশ্যই কাজ করে ঐতিহাসিকের মূল্যবোধ, চেতনা, উপলব্ধি, সত্যনিষ্ঠা এবং একটি তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক সূত্র যা ফুলের স্তবকের মতন, গাঁথা মালার মতন ঐক্যবদ্ধ ও বিন্যস্ত করে তোলে স্বাধীনতাযুদ্ধের ঘটনার ফুলগুলোকে। ঘটনার মালা অবশ্য ফুলের মালার মতন শুধু স্থানের মধ্যে বিন্যস্ত নয়, এর অবস্থান কালের মধ্যেও।

যে ক্যানভাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ছবি আঁকা তার স্থানিক বিস্তার আমাদের মানচিত্রে, এর সীমানা বিস্তৃত বাংলাদেশের ভূখণ্ডে। স্বাধীনতাযুদ্ধের ঘটনা বিস্তৃত একাত্তরের যুদ্ধকালীন নয় মাসে। কিন্তু মানচিত্র ক্যালেন্ডারের এই সীমানা ছাড়িয়ে পরিব্যাপ্ত একটি পটভূমি আছে স্থান-কালের, যেখানে অঙ্কিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস। একজন শিল্পী তাঁর ক্যানভাসের ওপর বসেই ছবিটি আঁকেন না, তাঁকে দাঁড়াতে হয় ক্যানভাসের বাইরে শুধু তাঁর হাত ও তুলি কাজ করে ক্যানভাসের ওপর।

শিল্পীকে যদি জিজ্ঞেস করি ছবিটি কখন এঁকেছেন? তিনি কি ক্যানভাসে তুলির আঁচড় টানার সময়টুকুই শুধু হিসাবে আনবেন? ক্যানভাসের পাশে শিল্পীর যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, তাঁর যে দীর্ঘ সময় ধরে পরিকল্পনা, রং ও তুলির আঁচড় টানার আগে মনের মধ্যে বারবার ছবি আঁকার যে প্রক্রিয়া, তা কি হিসাবের বাইরে? আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসকে অনুধাবন করতে হলে এই পরিব্যাপ্ত স্থান-কালের পরিসরকে বুঝতে হবে। উপলব্ধি করতে হবে আকস্মিক প্রাপ্তি, দুর্ঘটনা বা দৈব দুর্যোগের সঙ্গে ইতিহাসের ঘটনার পার্থক্য। বুঝতে হবে ইতিহাসের ঘটনার আড়ালে একটি চেতনার জগৎ থাকে, সজীব প্রেরণা থাকে, সৃষ্টিশীল ভাবনা থাকে, সংকল্প থাকে, দূরলক্ষ্য থাকে।

স্বাধীনতার ইতিহাস নিয়ে যাঁরা মনগড়া কাহিনি সৃষ্টি করেছেন, বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনার সঙ্গে তাঁদের সম্পৃক্তিকে মূলধন করে ইতিহাসবিদ হবার প্রয়াস পাচ্ছেন, বিকৃত ব্যাখ্যা উপস্থিত করে বিভ্রান্ত করছেন নতুন প্রজন্মকে, তাঁদের মনে রাখতে হবে সব ঘটনাই ইতিহাসের ঘটনা নয়। কোনো ঘটনার আড়ালে যে কার্য-কারণ, যে উপলব্ধি ও প্রেরণা, যে সজীবতা ও চঞ্চলতা তা অবধারণ না করে মৃত কঙ্কালের মতন ঘটনার বা তথ্যের নিষ্প্রাণ লক্ষ্যহীন স্তূপীকরণ ইতিহাস নয়। আমরা লক্ষ্য করছি, দুই ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলেছে আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস নিয়ে। এর একটি হলো স্বাধীনতার সামগ্রিক ঘটনাপ্রবাহ ও আয়োজন থেকে সজীবতা ও রক্তপ্রবাহকে বর্জন করে ঘটনার অসংলগ্ন ও অসম্পন্ন কঙ্কাল উপস্থিত করার অপচেষ্টা। অন্যটি হলো বিকৃত ও মিথ্যা ঘটনার অবতারণা করে ভ্রান্ত ইতিহাস বা বিকল্প ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কল্পকাহিনি নির্মাণের অপপ্রয়াস।

অনেকেই এটা অনুধাবন করতে ব্যর্থ যে সব ঘটনাই ইতিহাসের ঘটনা নয়,

এবং যেসব ঘটনা ইতিহাসের উপকরণ তাকেও ঐতিহাসিকের যৌক্তিক ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে যাচাই করে ইতিহাসের শরীরে স্থাপন করতে হয় সৃজনশীলতায়। একটি সামগ্রিকতা, সামঞ্জস্য ও সত্যানুসন্ধানের আন্তরিক মনোভাব, সেই সঙ্গে দক্ষতা প্রয়োজন ইতিহাস রচনায়। ইতিহাসে ঐতিহাসিক নিরপেক্ষ শুধু নির্ভেজাল তথ্য চাই, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইতিহাসের ঘটনাকে নির্বাচন করা চাই এমন একটি দর্শন ইতিহাসবিদের মধ্যেই কাজ করেছে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। ইউরোপের সমস্ত দেশেই, যথা জার্মানিতে, ব্রিটেনে ও ফ্রান্সে একটি অতিব্যবহৃত শব্দ ইতিহাসবিদগণ ব্যবহার করতেন তা হলো, ঐতিহাসিকের নিজস্ব ভাবনা ও ব্যাখ্যার দ্বারা কলুষিত হয়নি এমন বিশুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক তথ্য ও ঘটনাই শুধু প্রয়োজন ইতিহাস লিখতে। দৃষ্টবাদ দার্শনিক ও অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকেরাও এই মতকে সমর্থন করেছেন দীর্ঘদিন।

স্যার জর্জ ক্লার্ক যিনি সমালোচনার দৃষ্টিতে ইতিহাসকে যাঁচাই করতেন তিনিও বলেছেন, ইতিহাসের মর্মস্থল হচ্ছে কঠিন নির্ভেজাল ঘটনা যাকে ঘিরে থাকে ব্যাখ্যা প্রদানের কোমল নমনীয় অংশ। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই এই আপ্তবাক্যটি উচ্চারিত হয় যে ঘটনা নিজে থেকেই কথা বলে। সাধারণ্যে, যেমন অনেক ঐতিহাসিকের মনে, এই বিশ্বাসটি কাজ করে যে, এমন কিছু ঘটনা আছে যা সব ঐতিহাসিকের জন্যই অভিন্ন। ঘটনা হচ্ছে অলঙ্ঘনীয়, পবিত্র।

মতামত হচ্ছে উন্মুক্ত, ব্যক্তিনির্ভর। কিন্তু একটু গভীরভাবে তাকালেই আমরা দেখব ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিকদের এই অতিতথ্যপ্রীতি আসলে বাস্তবতাবর্জিত। আমাদের মস্তিষ্ক এমন কোনো যন্ত্র নয় যা নৈর্ব্যক্তিকভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভেতর দিয়ে যান্ত্রিকভাবে ক্রমাগত তথ্য গ্রহণ করে। আমাদের প্রতিটি দেখাই বিশেষ কিছু দেখা। দৃষ্টিকে আমরা একই সঙ্গে দূরের ও কাছের বস্তুর ওপর নিবদ্ধ করতে পারি না। আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের ওপর ক্রমাগত যে হট্টগোলের শব্দ এসে প্রবেশ করে তা আমাদের চেতনায় পৌঁছে না। আমাদের পরিধেয় কাপড় ও জুতা স্নায়ুর ওপর যে ক্রমাগত চাপা দিচ্ছে তা আমরা ভুলে থাকি।

আসলে নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা বলে কিছু নেই। প্রতিটি দেখার ও অনুভবের মধ্যেই একটি সচেতন প্রচেষ্টা আছে—একধরনের নির্বাচন। প্রশ্ন উঠবে, ঐতিহাসিক সত্য বলে কিছু নেই? আমাদের স্বাধীনতার সত্যিকারের ইতিহাস আমরা কী করে জানব? এর জবাব হলো একটি বটবৃক্ষ, একটি নদী বা একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে আমরা যখন দেখি নানাজন নানা দিক থেকে আমরা অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখি না। কিন্তু বটবৃক্ষ, নদী বা অগ্নিকাণ্ডকে চিনতে আমাদের ভুল হয় না। এর কারণ বটবৃক্ষ, নদী বা অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে আমাদের মনে একটি পূর্বধারণা আছে। যে বিচ্ছিন্ন ছোট-বড় তথ্য আমাদের কাছে পৌঁছে তা সবার কাছে একইভাবে না পৌঁছলেও খণ্ড খণ্ড তথ্যগুলো সমন্বিত করে আমাদের মস্তিষ্কে

নানাভাবে সাজিয়ে আমরা উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হই। আমাদের কোনো পূর্ব ধারণার সঙ্গে। এই পরিলক্ষিত তথ্যগুলো মিলে যায় এদের সামগ্রিকতায় এদের বিশেষ বিন্যাসে। আসলে প্রতিটি পর্যবেক্ষণই একটি সচেতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, একটি ধাঁধার সমাধান। সব তথ্যই আমরা গ্রহণ করি না, গ্রহণ ও বর্জনের ভেতর দিয়ে নির্বাচিত তথ্যের বিন্যাসে ইতিহাস নির্মাণ করেন ঐতিহাসিক। ইতিহাস তবু যে সত্যকে উদ্‌ঘাটন করে ও সবার কাছে, অন্তত অসংখ্যের কাছে, গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে তার কারণ ইতিহাসের ঘটনায় একটি অন্তর্নিহিত মিল আছে এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে। বিভিন্নভাবে দেখা বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে সাজিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গতার ও সামঞ্জস্যের আবিষ্কার ইতিহাসবিদের কাজ। স্থান-কালের সন্ততির মধ্যে নানা ঘটনার পারম্পর্যে ইতিহাসের ঘটনা আত্মপ্রকাশ করে।

ইতিহাসের ঘটনা মানুষের সচেতন ও উদ্দেশ্য পরিচালিত কর্মকাণ্ডের ব্যাপার। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক যে কর্মকাণ্ড আত্মপ্রতিষ্ঠার, স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার যে সংগ্রাম ব্যক্তি ও সমাজের, তাই হচ্ছে উপাদান ইতিহাসের। বাঙালি জাতির আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশের দীর্ঘ যে সংগ্রাম তা জন্ম দিয়েছে নানা ঐতিহাসিক ঘটনার। এই সব ছোট-বড় ঘটনার ক্রমসঞ্চিত প্রভাব স্বাধিকার সংগ্রাম ও স্বাধীনতাযুদ্ধের দিকে অভিমুখিনতা লাভ করেছে। চেতনানির্ভর এই ঘটনাপ্রবাহ একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যাপার নয়, প্রয়োজন ছিল নিদ্রিত বাঙালি জাতীয়তা বোধকে জাগ্রত ও সঞ্চারিত করা।

রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা বঞ্চনা ও পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে একটি ঐক্যের বন্ধন যেমন তৈরি হচ্ছিল বাঙালি জাতির মধ্যে, তেমনি এই সব সংগ্রামকে সংগঠিত উদ্দীপিত করতে গিয়ে অনেকেই নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু এ সমস্তই ছিল ছোট-বড় নানা বিচ্ছিন্ন ঢেউ বাঙালিত্বের চেতনা-সাগরে। ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে একটি সর্বব্যাপী চেতনার ঢেউ বাঙালি জাতীয়তাবোধকে সঞ্চারিত করে আমাদের সবার মধ্যে। ভাষা আন্দোলন, অর্থনৈতিক আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলন নানা মাত্রায় ঢেউ তুলে একটি উত্তাল সমুদ্র সৃষ্টি করেছিল একাত্তরে। সেই ভয়ংকর ক্ষুব্ধ সমুদ্রের গর্জন আমরা শুনতে পাই সাতই মার্চ, বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে। লক্ষ করতে হবে, এই উত্তাল সমুদ্র সৃষ্টির জন্য সমগ্র বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হয়েছে একটি অবিচ্ছিন্ন জলের বিস্তাররূপে। এর আগে নানা দেয়াল তুলে বিচ্ছিন্ন জলরাশিরূপে অবস্থান করছিল যে জাতি, সেখানে ঢেউয়ের বেগ সব দেয়াল ভেঙে একাকার করে দিল জলের বিস্তারকে।

জাতীয়তাবাদের চেতনাকে জলরাশির সঙ্গে তুলনা করছি এই জন্যে যে, জলের অবিচ্ছিন্ন বিস্তারে যেকোনো আন্দোলন সৃষ্টি করলে তা তরঙ্গরূপে প্রবাহিত হয় জলরাশির দেহজুড়ে। একটি জাতি যখন সাংস্কৃতিক বন্ধনে চেতনার আলোকে

ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন এর কোনো অংশকেই আলাদা করে পীড়ন করা যায় না। প্রতিটি আঘাতের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে তরঙ্গিত প্রবাহের মতন। আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের আসল প্রস্তুতি এভাবেই এখানেই সম্পন্ন হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে। একটি বাদ্যযন্ত্রের মতন সমগ্র জাতি যখন বাঁধা হয়ে যায় অভিন্ন সুরে, তখন এতে সংগীত সৃষ্টি প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সংগীত যন্ত্রকে প্রস্তুত করা ও সুরে বাঁধার দীর্ঘ প্রস্তুতিপর্বকে যারা সমগ্র আয়োজন থেকে বাদ দিয়ে দেখে অজ্ঞতায় বা অনবধানতায় তাদেরকে অবজ্ঞা করাই তাদের প্রতি সবচেয়ে ভদ্র আচরণ।

আশ্চর্য লাগে, এই সব নির্বোধ ও অজ্ঞ অর্বাচীন স্বাধীনতার ইতিহাস নিয়ে মনগড়া তত্ত্ব দিতে থাকে। স্বীকার করি এদের কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং পরবর্তিতে স্বাধীনতাবিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এদের আচরণ দেখে মনে হয় এরা সবাই অজ্ঞ রাজমিস্ত্রী যারা সৌভাগ্য লাভ করেছিল স্বাধীনতার তাজমহল নির্মাণের দু-একটি ইট বিছাতে, কিন্তু উপলব্ধি করেনি সাধারণ গৃহ নির্মাণের বেলায় ইটের দেয়াল গাঁথা ও তাজমহলের দেয়াল গাঁথার কাজে পার্থক্য স্পষ্ট না হলেও তাজমহলের স্থপতির কাজ কত বেশি ভিন্ন ও অনন্য, সাধারণ গৃহের নকশা তৈরির তুলনায়। গত চল্লিশ বছর ধরে বিজয় দিবসের যেসব আলোচনা শুনেছি কিছু বুদ্ধিজীবীর মুখে, মনে হয়েছে হঠাৎ করে বাঙালি কিছু যুবক এবং কিছু পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে চাকুরিরত বাঙালি সেনা পোশাক বদলে মুক্তিযুদ্ধে নেমে গেল এবং কাকতালীয়ভাবে স্বাধীনতা অর্জিত হলো তাদের মতে।

ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গে কাকতালীয় ঘটনার পার্থক্য হলো, সময়ের সঙ্গে ইতিহাসের ঘটনা উজ্জ্বলতর হতে থাকে। কিন্তু সাধারণ ঘটনার স্মৃতি সময়ের সঙ্গে ম্লান হতে হতে হারিয়ে যায়। এর কারণ, ইতিহাসের ব্যাখ্যা সময়ের সঙ্গে শুদ্ধতর ও গভীরতর হতে থাকবে এবং আমাদের চেতনার আলো অভিসারী হয়ে উজ্জ্বল করে ইতিহাসের ঘটনাকে সময়ের দূরসীমায়, যেমন করে দূরবীক্ষণ দূরনক্ষত্রের ছবি ফেলে আমাদের অক্ষিপটে।

ঐতিহাসিককে স্বাধীনতার ইতিহাস লিখতে হলে এই ইতিহাস যাঁরা নির্মাণ করেছেন তাঁদের হৃদয়ের উষ্ণতা, চেতনার উজ্জ্বলতা, দুঃসাহসের অগ্নিশিখা আপন হৃদয়ে ও উপলব্ধিতে ধারণ করতে হবে এবং এই ইতিহাসকে অনুধাবনের জন্য পাঠককেও পেতে হবে সেই কল্পনাশক্তি যা তাকে পৌঁছে দেবে স্বাধীনতাযুদ্ধের আগুন ঝরা দিনগুলোতে। যাঁরা আবেগমুক্ত নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইতিহাসের ঘটনাকে দেখতে চান, তাঁদের কাছে আমার প্রশ্ন, মুক্তিযোদ্ধাদের কবরে যে কঙ্কাল, বধ্যভূমিতে যে হাড়ের স্তূপ সেখানে তারা স্বাধীনতাযুদ্ধকে কেমন করে আবিষ্কার করবেন? অবশ্যই আমাদের কল্পনা করতে হবে সেই বলিষ্ঠ পেশি, সেই স্ফীত ধমনি, আগুন ঝরা দৃষ্টি এবং স্পন্দিত হৃৎপিণ্ড যা ঘিরে ছিল এই কঙ্কালগুলোকে।

তার চেয়েও বড় কথা সেই সব বীর যোদ্ধাদের নশ্বর দেহকে আশ্রয় করে যে অবিনশ্বর চেতনার আলো ছিল তা তো কোনো দিন দৃশ্যমান নমুনারূপে আবিষ্কৃত হবে না ইতিহাসের নমুনারূপে।

স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস রচনা তাই কোনো অতীতের ব্যাপার নয়, নয় কোনো সম্পন্ন গবেষণা। সময়ের প্রবাহ আমাদের দৃষ্টিকে যত উজ্জ্বল করবে এবং আমাদের চেতনাকে যত উদ্দীপিত করবে ততই স্পষ্ট হবে স্বাধীনতার ইতিহাস আমাদের উপলব্ধিতে। স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পর অনেক বুদ্ধিজীবীর মুখে স্বাধীনতার জয়গান এত বিলম্বে শুনে আমার এই ধারণারই সমর্থন খুঁজে পাচ্ছি।

যারা স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশ নিয়েও বিভ্রান্ত হয়েছেন পরে, তাদের আচরণের ব্যাখ্যা অনেকে জানতে চান। এদের কথা ভেবে আমার তানসেন সম্পর্কে লেখা গল্পটি মনে পড়ে। তানসেনের সংগীতের সুরে পাথর বেয়ে নাকি অশ্রু ঝরত। এরাও সেই প্রস্তর তুল্য যাঁরা ঝংকৃত হয়েছিল স্বাধীনতার সংগীতে। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার কী অপূর্ব সুরে বেঁধেছিলেন বাঙালি জাতিকে তারই দৃষ্টান্ত দেখতে পাই এখানে। পাথরের স্থবিরতার দুঃখকে অতিক্রম করে যায় তখন এই আনন্দ যে, এই পাথরেও সুর জাগাতে সক্ষম হয়েছিল যে স্বাধীনতার গান, তার শিল্পী কত বড় মাপের ছিলেন।

পরিশেষে এই কথা বলে শেষ করছি যে, স্বাধীনতার ইতিহাসকে কেউ বিকৃত করতে পারে না, পারে শুধু নিজের দৃষ্টিকে বিকৃত করতে। এরা যতটা ধিক্কার পাবার যোগ্য তার চেয়ে বেশি এদের প্রাপ্য করুণা। স্বাধীনতা অর্জনের চল্লিশ বছর পরও এদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন থেকে গেল, এতই দুর্ভাগ্য এদের। ইতিহাসকে কখনো কখনো সংজ্ঞায়িত করা হয় অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সংলাপরূপে, বরং অতীতের সঙ্গে অনাগত সুন্দরতর ভবিষ্যতের। আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস তাই অতীতের ঘটনা নয় শুধু, বর্তমানের উপলব্ধি ও ভবিষ্যতের সুন্দর স্বপ্ন দেখার উজ্জ্বল উৎস হয়ে উঠুক, এটাই আমাদের প্রত্যাশা স্বাধীনতার ইতিহাস স্মরণে।

ইতিহাসের দৃষ্টি

ইতিহাস শুধু উপাত্তের নির্বিকার সংগ্রহ নয় অতীতের ঘটনামালার, বরং কালের ব্যাপ্তিতে ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহের সচেতন উপলব্ধি। ইতিহাস শুধু পেশাজীবী ও ইতিহাসবিদই রচনা করেন না, বরং ইতিহাস সৃষ্টি করে সচেতন, সংগ্রামী ও সৃষ্টিশীল মানুষ নানা ঘটনায় অংশ নিয়ে, অনুধাবন করে এবং কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে ঘটনাকে যাচাই করে ও স্মৃতিতে বিন্যস্ত করে। যুদ্ধবিগ্রহ, রাজনীতি, সামাজিক আন্দোলন, শিল্প-সাহিত্য—সব ক্ষেত্রেই ইতিহাস রচিত হয়, কখনো পরিকল্পিতভাবে, বিশেষজ্ঞ ইতিহাসবিদের সচেতন প্রচেষ্টায়, কখনো বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাকেন্দ্র বা জ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠিত পাদপীঠে। আবার কখনো বা প্রভাবশালী রাজন্যবর্গের বা শক্তিধর রাষ্ট্রের স্বার্থে ও প্ররোচনায়।

ইতিহাস যেহেতু অতীতের ঘটনাকে ভিত্তি করে রচিত হয়, যা প্রত্যক্ষ করার ও যাচাই করার অবকাশ নেই সাধারণ্যের, ফলে অনেক অনিশ্চয়তা, বিস্মৃতি ও ভ্রান্তি প্রভাবিত করতে পারে ইতিহাসকে। কিন্তু যেখানে ইতিহাসের লেখক প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত অথবা পক্ষপাতদুষ্ট কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, স্বার্থসন্ধানী ক্ষমতাসীন দলের দাপট, প্রলোভন বা ভীতিপ্রদর্শনের দ্বারা; সেখানে ইতিহাসবিকৃতি অনিবার্য হয়ে ওঠে। অবশ্য বিকৃত ইতিহাস স্থায়িত্ব লাভ করে না। কারণ, ইতিহাসের নিজস্ব একটি সজীব ও যৌক্তিক গঠন আছে প্রাণীদেহের মতো। একটি জীবন্ত প্রাণীর শরীর যেমন এর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সক্রিয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয়েই শুধু সমগ্রতা লাভ করে, অন্যথায় বাইরে থেকে সংযোজিত বিচ্ছিন্ন প্রত্যঙ্গ শরীর বর্জন করে; ইতিহাসের শরীরও তেমনি বাস্তব ও সত্য ঘটনার সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় ঘটিয়েই স্থায়িত্ব পায়।

স্থানকালে অসংখ্য মানুষের কর্মময় জীবনের প্রবাহে যে ঘটনার উদ্ভব ঘটে তা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত কার্যকারণের নিয়মে। কোনো ঘটনাকেই প্রকৃতির এই নিয়মের জাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্থায়িত্ব প্রদান করা সম্ভব নয়, ইতিহাসের স্মৃতিধরে, যেমন সম্ভব নয় দেহকে বিচ্ছিন্ন করে কোনো প্রত্যঙ্গকে রক্ষা করা। ইতিহাসের সত্যতা যাচাই তাই একটি বুদ্ধিগত সততা, যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করে। সেসব ঘটনা সামাজিক, রাজনৈতিক, এমনকি

পারিবারিক; ফলে, ব্যক্তিগত বিশ্বাসপ্রবণতা, স্বার্থ ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তার নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ ও যাচাই খুব কঠিন কাজ। এসব মনুষ্যনির্ভর ঘটনামালা প্রাকৃতিক ঘটনার তুলনায় অনেক বেশি জটিলও বটে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, পারস্পরিক আচরণ এবং সেই অর্থে সমাজবিজ্ঞান যে অন্তর্নিহিত নিয়মনীতির দ্বারা পরিচালিত, তা অনেক বেশি পরিবর্তনশীল, সেই সঙ্গে অনুদ্‌ঘাটিত ও অজ্ঞাত। ফলে যে কার্যকারণ সম্পর্ক, যৌক্তিক ভিত্তি ও সামঞ্জস্যের উপস্থিতি যাচাই করে সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার ইতিহাসের নির্ভুলতা বা সত্যতা নির্ধারিত হওয়ার কথা তা সহজ নয়।

ইতিহাসের রচয়িতা একজন জীবন্ত মানুষ। প্রলোভন, ভীতি, আনুগত্য, সংস্কার, পক্ষপাতিত্ব—এ সবই তাকে প্রভাবিত করতে পারে। সবচেয়ে বড় যে সমস্যা তা হলো, ইতিহাস রচয়িতা বেঁচে থাকেন একটি বিশেষ সময়ে– যেটা তার একধরনের বন্দিদশা বর্তমানের মধ্যে; কিন্তু যেসব ঘটনা ইতিহাসের উপাদান, তা বিস্তৃত দীর্ঘকালের মধ্যে। এসব প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে একমাত্র সহায়ক সূত্র হলো ইতিহাসের ঘটনাবলি, অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ যৌক্তিক জাল এবং ইতিহাসের শরীরের পূর্ণাঙ্গতা, যা ক্রমাগত বিন্যস্ত হয়ে গ্রহণ ও বর্জনের প্রক্রিয়ায় বিকাশ লাভ করে।

ইতিহাসের সত্যকে আবিষ্কার ও অবধারণের যে সৌন্দর্যবুদ্ধি ও কালিক চেতনা, তার অনুপস্থিতিতে ভুল তথ্য ইতিহাসে সংযোজিত হলে তা শুধু বাইরে থেকে সংযোজিত বিচ্ছিন্ন কৃত্রিম প্রত্যঙ্গের মতোই প্রত্যাখ্যাত হয় না কালের পরীক্ষায়; সেই সঙ্গে বর্জিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়, ভুল ইতিহাসের রচয়িতাও। অবশ্য ইতোমধ্যে দেশ, রাষ্ট্র বা জাতির অনেক ক্ষতি হয়ে যায়, যা অপূরণীয়। এর কারণ, ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যে কর্মপ্রেরণা, নিষ্ঠা, আত্মবিশ্বাস, শ্রম, ত্যাগ ও সৃষ্টিশীলতা তা এক অদৃশ্য প্রভাববলয়ের মতো নিয়ন্ত্রণ করে একটি ইতিহাসচেতনা। আমরা শুধুই প্রত্যক্ষ বা দৈনন্দিন ঘটনার দ্বারা পরিচালিত নই, বাস্তব এবং অব্যবহিত ঘটনার আড়ালে একটি কল্পনা, স্বপ্ন ও ভাবনার জগৎ আছে। একটি জগৎ আছে বিশ্বাস ও স্মৃতির। নির্বস্তুক এই মানসিক জগৎ অনেক বেশি সুসংগত, সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ।

যা প্রত্যক্ষ ও বাস্তব, যা বর্তমান সময়কে ঘিরে সরাসরিভাবে প্রভাবিত করে আমাদের দৈনন্দিন জীবন, তাকে গভীরভাবে যাচাই ও উপলব্ধি করার সময় আমরা পাই না। অবিন্যস্ত, বিশৃঙ্খল এসব ঘটনা তাৎক্ষণিকভাবে প্রভাব বিস্তার করলেও তার তীব্রতা দ্রুত হ্রাস পায়। প্রত্যক্ষ ও পারিপার্শ্বিক ঘটনা অনেক বেশি আবেগ, অদূরদর্শিতা ও তাৎক্ষণিকতা নিয়ে আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে বলে বেশি ঘটনাকে একই সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার ও সমন্বিত করার সময় মেলে না।

ইতিহাসের ঘটনা অসংখ্য ও বিচিত্র হলেও পরস্পরের সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্কে

সমন্বিত করার শর্ত পালন করতে গিয়ে অনেক বেশি নৈর্ব্যক্তিকতা ও নিরপেক্ষতা লাভ করে। যত বেশিসংখ্যক ঘটনাকে আমরা পারস্পরিকতা ও সামঞ্জস্যে গ্রহণ করতে যাই, তত বেশি সূক্ষ্মভাবে ভুল-ত্রুটিগুলো ধরা পড়ে। এখানেই ইতিহাসের ঘটনার একটি আপাত বৈপরীত্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই এবং তা হলো, যে-ঘটনা যত দূরে কালিক ব্যবধানে এবং যত জটিল, বেশিসংখ্যক মানুষ ও উপাদানের সমন্বয়ে, তা তত বেশি নির্ভুলভাবে আমরা দেখতে পাই।

যে অগ্নিকাণ্ড আমাদের অবস্থানের অতি কাছে সংঘটিত হয় তা অনেক বেশি পরিদৃশ্যমান ও অনুভূত এর উজ্জ্বলতা ও তাপ নিয়ে। কিন্তু একে যদি তুলনা করি দূর নক্ষত্রের সঙ্গে, যা প্রচণ্ড দূরত্বের কারণে এর আলোর একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই মাত্র আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়, ফলে অনুজ্জ্বল বলে প্রতিভাত হয়, তা অনেক বেশি সত্য তুলে ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছে। কাছের অগ্নিকাণ্ড অল্প স্থান-কালের ব্যবধানেই ম্লান হয়ে যায়, কিন্তু দূর নক্ষত্রের আলো বিশ্লেষণ করে যে তথ্য আমরা পাই, তা কোথায় দাঁড়িয়ে, কখন সংগ্রহ করা হলো তার দ্বারা প্রভাবিত নয়। ক্রমাগত ইতিহাসের ঘটনাকে অন্যসব ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে কার্যকারণ সম্পর্ক ও পাম্পরিক সামঞ্জস্যে যাচাই করতে হয় বলেই ইতিহাস কালের প্রবাহে অনুজ্জ্বল না হয়ে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। সময়ের সঙ্গে ক্রমসঞ্চিত অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও সত্য যাচাইয়ের শক্তি ইতিহাসকে নবরূপে আবিষ্কারের দক্ষতা দেয় বলেই ইতিহাস শুধু অতীতের ঘটনা নয়, বর্তমানের প্রজ্ঞা ও চেতনার ফসলও।

শিক্ষা ও রাজনীতির সীমানা

বেশ কিছুদিন ধরে এ দেশের বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, অভিভাবক এমনকি শিক্ষাবিদেরাও শিক্ষায়তনগুলোকে রাজনীতিমুক্ত করার পরামর্শ দিতে শুরু করেছেন, এমনকি এ ব্যাপারে আইন তৈরি ও তা কঠোরভাবে প্রয়োগের দাবিও তুলছেন। এটা অনুধাবনযোগ্য যে, বিভিন্ন পেশার এসব পরামর্শদাতাদের উদ্দেশ্য ও আন্তরিকতা অভিন্ন নয়। রাজনীতি ও শিক্ষা সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞান এবং উপলব্ধি নানা স্তরের ও ধরনের।

যেসব ব্যক্তি নিজেদের রাজনৈতিক সংকীর্ণ স্বার্থে নিমগ্ন, তারা নিজেদের সংকীর্ণ ও তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক ক্ষমতা সংহত করার পথে যে-কোনো কর্মকাণ্ডকে অন্তরায় বলে শঙ্কা অনুভব করেন। তারা তা বন্ধ করার কৌশল খুঁজবেন সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যা হলো, তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও সংকীর্ণ লক্ষ্যার্জনের মনোবাসনা তারা স্পষ্ট করে বলতে চান না। বরং আপাত একটি সমাজকল্যাণমূলক শুভ ইচ্ছার প্রকাশরূপে সমাজকে তথা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের রাজনৈতিক প্রভাবের কলুষতা থেকে মুক্ত রাখার উদার আহ্বান জানান। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, রাজনীতিবিদ হিসেবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে তারা কীভাবে দেখেন? তাদের নিজস্ব বিচারে রাজনীতি আসলে কি কোনো কুকর্ম অথবা সিগারেট-বিড়ি, গাঁজা, চরস বা ড্রাগের মতো কোনো ভয়াবহ নেশার বস্তু, যা বড়রা ভুল করে পান করলেও ছোটদের তা থেকে দূরে রাখার জন্য নিঃস্বার্থ আহ্বান জানাচ্ছেন তারা?

এ কথা সত্য, রাজনীতির নামে অনেক ভণ্ডামি, ষড়যন্ত্র, মিথ্যাচার এবং নির্যাতন ও খুনোখুনি চলছে। যারা রাজনীতির সঙ্গে মিশে থাকা এসব দুষ্কর্মকে ভয় পেয়ে নিজেদের রাজনীতি থেকে দূরে রাখেন, রাজনীতিকে একটি ভয়াবহ বিপজ্জনক অসৎ পেশারূপে গণ্য করেন, তারা যতই ভ্রান্ত হোন, রাজনীতি সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞানে, রাজনীতি সম্পর্কে অন্যকে সাবধান করার পেছনে তাদের অসৎ উদ্দেশ্য আছে, এ কথা হয়তো বলা যাবে না; কিন্তু যারা তদ্‌গত রাজনীতিবিদ, রাজনীতিকে যারা পেশারূপে বেছে নিয়েছেন তাদের পক্ষে আপন পেশাকে বর্জনীয় ও ভিন্ন বলে প্রচার করা এবং অন্যদের এই কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ প্রদান মোটেই যৌক্তিক নয়। কারণ, সে ক্ষেত্রে আপন পেশার প্রতি

পরম অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। অবশ্য, সমাজে কিছু কিছু পেশা আছে, অথবা খারাপ অভ্যাস, যেমন—চৌর্যবৃত্তি, দস্যুবৃত্তি বা নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি নিজেরা নিজের পেশার প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন এবং সে-কারণেই নিজের সন্তান বা প্রিয়জনদের সাবধান করে থাকেন। রাজনীতি কোনো অর্থেই এ ধরনের বর্জনীয় পেশা নয়।

বস্তুত, রাজনীতি সবার জন্য পেশা না হয়েও চর্চার বিষয় হয়ে উঠতে পারে। অন্যরা রাজনীতি সম্পর্কে অর্থাৎ এর সংজ্ঞার্থ ও প্রভাববলয় বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করলেও একজন রাজনীতিকের অবশ্য সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে রাজনীতির অর্থ ও সীমানা সম্পর্কে। তারা অবশ্যই আপন পেশাকে নিজেদের জন্য আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণরূপে তুলে ধরে অন্যদের জন্য তা শুধু বর্জনীয় নয়, আলোচনা ও চর্চার বহির্ভূত বলে উপদেশ প্রদান বা আইন প্রণয়ন করতে পারেন না। একটি প্রশ্ন উঠতে পারে : শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের জন্য জ্ঞানচর্চা এতই গুরুত্বপূর্ণ, বিশুদ্ধ ও সার্বক্ষণিক কাজ যে, শিক্ষালাভে ও শিক্ষাদানে ব্রতী কোনো ব্যক্তির পক্ষে অন্য কোনো বিষয়ে নজর দেওয়ার সময় নেই। একে যদি একধরনের শিক্ষাদর্শন বা শিক্ষানীতিরূপে গ্রহণ করি, তাহলে প্রশ্ন জাগে : শিক্ষাদর্শন, শিক্ষার বিষয় নির্বাচন, শিক্ষার সীমানা নির্ধারণ, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের কৃত্য সম্পর্কে কে উপদেশ দেওয়ার অধিকার রাখে?

আধুনিক শিক্ষা এতই ব্যাপক, গভীর ও সূক্ষ্ম, পরিবর্তনশীল ও বিশেষ বিষয় যে, শিক্ষার আদর্শ ও নীতি-নির্ধারণ শিক্ষা-দার্শনিক, শিক্ষাবিদ গবেষকদের বিবেচনার বিষয়, এবং সেটাও যৌথভাবে পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতামতের ভিত্তিতে গতিশীলভাবে নির্ধারিত হবার, কোনো পূর্ব-নির্ধারিত মতবাদ, অপরিবর্তনীয় আদর্শ বা কর্তৃত্বব্যঞ্জক উপদেশ দ্বারা শিক্ষানীতি নির্ধারিত হওয়ার নয়। আধুনিক শিক্ষা সর্বগ্রাসী ও সর্বব্যাপী; এর বিকাশের পথ উন্মুক্ত। আমাদের প্রকৃতি, পরিবেশ, সব রকম পেশা ও আচরণ, কর্মকাণ্ড, ভাবনা ও উপলব্ধি, যা কার্যকারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশসাধ্য, তা সবকিছুই জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। ফলে, শিক্ষার ব্যাপকতর সংজ্ঞার্থে কোনো অর্থপূর্ণ ও যথার্থ কর্মকাণ্ডকেই শিক্ষাবহির্ভূত ভাবা সম্ভব নয়। আমাদের সমস্ত পেশা, কর্মকাণ্ড, উৎপাদনশীলতা, নৈতিক ভাবনা, কল্পনা ও সৃষ্টিশীলতা—সবই জ্ঞাননির্ভর। শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের সে পথ উন্মুক্ত ও অন্তহীন।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের কী করণীয় তা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে শিক্ষা। কিন্তু শিক্ষা-দর্শন ও শিক্ষানীতিতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের কৃত্য সম্পর্কে অন্য পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের মতামত থাকতে পারে; তবে নিয়ন্ত্রণের অধিকার নেই। কারণ, সেই প্রজ্ঞা ও দার্শনিক উপলব্ধি তাদের থাকার কথা নয়। যত দিন শিক্ষা বলতে কিছু প্রচলিত অপরিবর্তী তথ্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচিত করাই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল, সমাজের স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ, অপরিবর্তনীয় উৎপাদন কৌশল অনুশীলন করে

পৌনঃপুনিকভাবে পুরোনো জীবনধারাকে সংরক্ষণের লক্ষ্যে শিক্ষা পরিচালিত ছিল, তত দিন অভিজ্ঞ ও বৃদ্ধ সেজে শিক্ষা সম্পর্কে উপদেশ দেওয়ার সুযোগ ছিল।

নতুন শতাব্দীতে নতুন উদ্ভাবন, আবিষ্কার ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে যে শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করছে এবং যে শিক্ষক নিয়োজিত শিক্ষাদানের সুকঠিন দায়িত্বে, তাদের করণীয় সম্পর্কে ঢালাও উপদেশ দেওয়ার সুযোগ উচ্চশিক্ষাবঞ্চিত এবং জ্ঞানের সীমান্ত সম্পর্কে অবজ্ঞাত নানা পেশায় নিয়োজিত সাধারণ মানুষের খুব কমই আছে। এ গেল শিক্ষার বিকাশমান সীমানার কথা। অন্যদিকে রাজনীতির যে সংজ্ঞার্থ তাও রূপান্তরিত ও সম্প্রসারিত হয়েছে নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের আলোকে, অভিনব সব প্রযুক্তির প্রভাবে এবং জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান সচেতনতা ও প্রত্যাশার আলোকে। রাজনীতিকে এখন আর সংকীর্ণভাবে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়, যেখানে রাজনীতি হলো শুধু সেই সব কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমিত, যা রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের সহায়ক।

একটি সময় ছিল যখন অস্ত্রবলে, কূটনৈতিক কলাকৌশলে বা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের আবেগ, অন্ধবিশ্বাস, জাত্যভিমান ও পারস্পরিক বিদ্বেষকে ব্যবহার করে, ভয় দেখিয়ে বা আধিপত্য বিস্তার করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা ও সেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভব ছিল। রাজনীতি বলতে যদি এই অর্থে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের কার্যকলাপকে বোঝানো হয়, তাহলে রাজনীতিকে সংজ্ঞায়িত করতে হয় কতকগুলো ঋণাত্মক বল বা প্রবণতার দ্বারা, যথা– বলপ্রয়োগ, ভীতিপ্রদর্শন, প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষ প্রকাশ, ষড়যন্ত্র ও কুটিলতা, মানুষের অজ্ঞতা ও আবেগের সুযোগ গ্রহণ। কিন্তু রাজনীতি যেখানে সবার মতামতের ভিত্তিতে, তাদের প্রত্যাশা, কর্মদক্ষতা, দেশপ্রেম, সৃষ্টিশীলতা ও বিচারশক্তির স্বাধীন ও মুক্ত প্রয়োগে রাষ্ট্র পরিচালনা—সেখানে রাজনীতি তার সংকীর্ণতা, হীনম্মন্যতা ও কূটকৌশল অতিক্রম করে উন্মোচিত ও উদ্ভাসিত।

নতুন জ্ঞান উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির সফল ব্যবহার ছাড়া একটি সচেতন সমাজের প্রত্যাশা মেটানো কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষেই সম্ভব নয়। যেহেতু নতুন জ্ঞান, নতুন প্রযুক্তি ও উৎপাদনের কলাকৌশল উদ্ভাবিত হচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং প্রতিটি শিক্ষার্থী রাষ্ট্রের কাছে কী প্রত্যাশা করে তা নির্ধারিত হয় দেশের সম্পদ, জনশক্তি, উৎপাদন দক্ষতা, অর্জিত জ্ঞান ও প্রয়োগযোগ্য প্রযুক্তির ওপর; তাই, গণতান্ত্রিক সমাজে একজন নাগরিকের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা নির্ধারিত হয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। দ্রুত পরিবর্তনশীল ও বিকাশমান উপলব্ধির এই বিশ্বে শিক্ষার সীমানা ও প্রভাববলয়– সেই সঙ্গে রাজনীতির পরিধি এতই রূপান্তরিত ও বিকশিত যে এদের ব্যাপক উপরিপাতন বা প্রাবরণ ঘটেছে। রাজনীতির সদর্থ ও শিক্ষার যথার্থতা এদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করেছে তা অনুধাবন না করে এদের পরস্পর থেকে পৃথক করা বিপর্যয় আনতে পারে রাজনীতি ও যথাযোগ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে।

সন্ত্রাস দমনের বিকল্প পথ

আমি এখানে সন্ত্রাস দমনের এক বিকল্প পথের কথা বলছি। আসলে এটা কোনো বিকল্প পথ নয়। বস্তুত একমাত্র পথ বলেই আমি মনে করি। তবু বিকল্প বিশেষণটি ব্যবহৃত হয়েছে শিরোনামে এই জন্য যে, প্রতিটি দেশে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সন্ত্রাস দমনের যে পথ অনুসৃত হচ্ছে ক্রমাগতভাবে অস্ত্রের ব্যবহারকে বৃদ্ধি করে, সৈন্য, প্রতিরক্ষা ব্যয়, নিরাপত্তার নামে বিধিনিষেধ বাড়িয়ে— সেটাই একমাত্র সমাধানরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সন্ত্রাস দিয়ে সন্ত্রাস বন্ধের এই প্রচেষ্টা যতই ব্যর্থ হোক, মনে করা হচ্ছে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অস্ত্রের ব্যবহার, সৈন্য সমাবেশ, প্রতিরোধমূলক শক্তি প্রয়োগ এবং সাধারণ মানুষের চলাচল, বিদেশ ভ্রমণ ও যোগাযোগের ওপর নিষেধাজ্ঞা যথেষ্ট নয় বলে সন্ত্রাস বন্ধ করা যাচ্ছে না। যে যুক্তি ও বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে ক্রমাগতভাবে সন্ত্রাস দমনের নামে শক্তি প্রয়োগ, যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার এবং নৃশংস প্রতিশোধমূলক প্রতিহিংসার তীব্রতাকে বৃদ্ধি করা হয়েছে তা হলো, একমাত্র সন্ত্রাস দিয়েই সন্ত্রাসকে দমন করা সম্ভব।

সন্ত্রাস দমনে যে ব্যর্থতা, তা আসলে অস্ত্র প্রয়োগ ও প্রতিরোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অপ্রতুলতা ও কৃৎকৌশলগত অদক্ষতা নয়। ভুলটা মূলত তত্ত্বগত এবং অনুসৃত পদ্ধতির অন্তর্নিহিত ভ্রান্তির। বনে আগুন লাগলে তা প্রতিরোধের সহজাত পথ হচ্ছে পানি বা দাহ্য অক্সিজেনকে অপসারণকারী অগ্নিনির্বাপক অদাহ্য গ্যাস ব্যবহার করা। অবশ্য আগুন দিয়েও আগুন নেভানোর কৌশল কখনো কখনো প্রয়োগ করা হয় যা দাহ্যতাকে কমায় না, শুধু বাতাসের প্রবাহকে বদলে দেয়। সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে আগুন দিয়ে আগুন নেভানোর নীতি কার্যকর নয়। কারণ, আগুনের দ্বারা সৃষ্ট উত্তপ্ত হাওয়া যেভাবে বিপরীত দিক থেকে আসা উত্তপ্ত হাওয়ার প্রবাহকে প্রতিহত করে, সন্ত্রাস দ্বারা ভয় দেখিয়ে সন্ত্রাসপ্রবণতাকে সেভাবে প্রতিহত করা যায় না। এর কারণ মানুষের মনস্তত্ত্ব, বিশেষ করে যখন তা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত যৌথভাবে লালিত কোনো আদর্শ বিশ্বাস, সংস্কার ও জেদ দ্বারা, তখন তা মোটেই যান্ত্রিক নয়, জটিল ও অনির্বচনীয়। বনে আগুন লাগার সঙ্গে সন্ত্রাসের আগুন ছড়িয়ে পড়ার মিলটি বরং যেখানে পরিলক্ষিত তা হলো, প্রতিটি জ্বলন্ত বিক্ষোভ, এর উৎপন্ন তাপ দিয়ে চারপাশের বিক্ষোভগুলোকে দাহ্য করে তোলে। প্রতিটি সন্ত্রাসের ঘটনা তা আক্রমণ অথবা প্রতি আক্রমণ যেভাবে ঘটুক না কেন, সমাজের স্থিতিশীলতা নষ্ট করে এবং অসহিষ্ণুতা ও সন্ত্রাসপ্রবণতা বৃদ্ধি করে।

একটি হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ারূপে অথবা প্রতিরোধের নামে আরো একটি হত্যার আয়োজন হত্যার কারণকে দূর করে না, শুধু হত্যার সংখ্যাকে বৃদ্ধি করে; সেই সঙ্গে হত্যাযজ্ঞের সংক্রমণ ঘটায় পৌনঃপুনিকতায়। সন্ত্রাস দিয়ে যে সন্ত্রাস বন্ধ করা যায় না বা ক্রমাগত সন্দেহবাদ, নিষেধাজ্ঞা ও যোগাযোগহীনতাকে বৃদ্ধি করে সন্ত্রাস কমানো যায় না, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা দেখছি মধ্যপ্রাচ্যে। বিপরীত দিক থেকে একই প্রমাণ আমরা পাচ্ছি ইউরোপে। কথাটাকে সংক্ষেপে বলা যায় এভাবে যে, মধ্যপ্রাচ্যে সন্ত্রাস হচ্ছে বলেই সন্ত্রাস হচ্ছে এবং ইউরোপে যুদ্ধ হচ্ছে না বলেই যুদ্ধ হচ্ছে না। অথচ কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপ ছিল যুদ্ধের সূতিকাগার। কথাটা হেয়ালি মনে হতে পারে, কিন্তু যে মূল তথ্যটি আমরা পাই এ থেকে তা হলো– যুদ্ধ, সংঘাত, নৃশংস হত্যাকাণ্ড, সন্ত্রাস আসলে একটি উত্তপ্ত, উচ্ছৃঙ্খল সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ফসল। যার কারণ নিশ্চিত অসামঞ্জস্য, যোগাযোগহীনতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অন্ধত্ব।

সেই কারণ উদ্‌ঘাটন করতে হলে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন, তার মনস্তত্ত্ব, তার আত্মরক্ষা, কর্মস্পৃহা ও সৃষ্টিশীলতা সেই সঙ্গে তার জেদ, লোভ অহমিকা– সবকিছুকে জানতে হবে গভীরভাবে। সভ্যতার দীর্ঘ পথ ধরে মানুষ যেভাবে সংঘবদ্ধ হয়েছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে গড়ে তুলেছে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, আদর্শিক, নৈতিক ও জ্ঞানের নানা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সেখানে নানা বৈচিত্র্য, বৈপরীত্য ও বিরোধ ক্রমসঞ্চিত। যে উত্তাপ ও চাপ প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও এলাকার সীমানায় পারস্পরিক সংঘর্ষে, সেই তাপকে দ্রুত সঞ্চারিত করতে হবে। যোগাযোগ ও উপলব্ধির প্রবাহকে বৃদ্ধি করে। এ জন্য প্রয়োজন যোগাযোগের ভাষা সৃষ্টি, উপলব্ধি ও বোধের সঞ্চারণ এবং এর জন্য প্রয়োজন যথার্থ শিক্ষা ও গবেষণা। আমাদের সৃষ্টিশীলতা, যোগাযোগসাধ্যতা, উপলব্ধি ও বোধের ক্ষমতা যদি বিভিন্ন ব্যক্তি, সমাজ, দেশ, আদর্শিক ও ধর্মীয় সংগঠনের সীমানায় সৃষ্ট উত্তাপ ও দুর্বোধ্যতাকে দ্রুত অতিক্রম করতে না পারে, তাহলে সন্ত্রাস, সংঘাত ও যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব নয়।

সন্ত্রাস ও সংঘাতের কারণ যেখানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, মনস্তাত্ত্বিক ও উপলব্ধিগত সেখানে প্রয়োজন গভীরতর দৃষ্টি, বিশ্লেষণ ও গবেষণা। ১১ সেপ্টেম্বরের পর আন্তর্জাতিকভাবে যে আয়োজন প্রয়োজন ছিল তা হলো, সন্ত্রাসের মূলে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, ধর্মীয় ও শিক্ষাগত কারণ নিহিত এবং যা দীর্ঘদিন ধরে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ, অসন্তুষ্টি, বিরুদ্ধতা ও অসহযোগিতার জন্ম দিয়েছে, তা উদ্‌ঘাটন করা। এ জন্য প্রয়োজন দক্ষ রাজনীতিক, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, সমাজকর্মী, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, মনোবিজ্ঞানী, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের ঐক্যবদ্ধ ও সৃষ্টিশীল অবদান। তাঁদের গবেষণা ও শ্রম সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিক অর্থবিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা। কিন্তু এর পরিবর্তে আমরা অধিক সৈন্য, অধিক অস্ত্র, অধিক প্রতিরোধ ও যোগাযোগহীনতা– যা সন্ত্রাসের বিপরীতে কাজ না করে এর আনুকূল্য সৃষ্টি করেছি। যে সন্ত্রাস ও যুদ্ধাবস্থার দীর্ঘদিন ধরে সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধানও হতে হবে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভেতর দিয়ে, যা দীর্ঘমেয়াদি। এর তাৎক্ষণিক সমাধান নেই।

অস্ত্রের ভাষা বনাম মুখের ভাষা

বিশ্বে যা কিছু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ এমনকি পারস্পরিক বিরোধিতার ভেতর দিয়ে সম্পর্কিত, সেখানে একধরনের যোগাযোগ থাকতেই হবে। আনন্দ, ভালোবাসা, জ্ঞান অথবা বিদ্বেষ, ভীতি বা ক্রোধের প্রকাশ শেষ পর্যন্ত করতে হয় দুই পক্ষের মধ্যে। এই সংযোগ ঘটানো সম্ভব হয়ে ওঠে সংকেত, উপাত্ত, তথ্য বা উপলব্ধির বিনিময়ে। যে মাধ্যম ব্যবহার করে তথ্য বা উপলব্ধির বিনিময় ঘটে সেটাই ভাষা। ভাষা শুধু মানুষের একচ্ছত্র কৌশল নয় সংযোগ স্থাপনের, প্রাণিজগতে সব প্রজাতিই বেঁচে থাকার সংগ্রামে প্রতিনিয়ত সংকেতের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করছে। তথ্য পৌঁছে দিচ্ছে অথবা বিনিময় ঘটাচ্ছে তথ্যের। এমনকি জড়প্রকৃতির ক্ষেত্রেও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়ে প্রতিটি অণু-পরমাণু এদের অস্তিত্ব প্রকাশ করছে এবং পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। বস্তুজগতের যে নানা রূপ, কখনো ধূলিকণা, কখনো মেঘ, বরফ, প্রস্তরখণ্ড, বিশাল পর্বতমালা— এসবই অনুবন্ধনের বিন্যাসের ফল। এই অনুবন্ধন ও প্রভাববলয় যেখানে শুধু স্বল্প দূরত্বে প্রসারিত সেখানে বড় আকারের কোনো বস্তু সৃষ্টি হয় না। যেখানে এই অনুবন্ধনগুলো সঞ্চারিত ও বিস্তৃত ক্ষুদ্র দূরত্ব থেকে বহুদূর পর্যন্ত, ফলে পারস্পরিক প্রভাববলয় দূরপাল্লার, সেখানেই বড় আকারের সব বস্তুর অস্তিত্ব আমরা প্রত্যক্ষ করি। প্রকৃতির সব বলই বিনিময়ী বল। এই বিনিময় ঘটছে কোনো একধরনের সংকেতগ্রহণ বস্তুর ভেতর দিয়ে। এটি হতে পারে বৈদ্যুতিক, চৌম্বক মহাকর্ষজনিত বা নিউক্লিউীয় বলের ক্ষেত্রে যা প্রভাববলয় দ্বারা পরিচালিত। প্রভাববিস্তারের বা সংযোগসৃষ্টির এমন একটি সাধারণীকৃত প্রক্রিয়াকে ভাষা বলে গ্রহণ করলে ভাষা হয়ে ওঠে সর্বজনীন। কিন্তু প্রাণিজগতের ভাষা অর্থাৎ যোগাযোগ সৃষ্টির মাধ্যম জড়জগতের তুলনায় ভিন্ন ও উন্নত। সাপ যখন ফণা তুলে ভীতি প্রদর্শন করে, ব্যাঙ যখন শব্দ করে বা ময়ূর পেখম তুলে সঙ্গীকে আহ্বান করে সেটা এদের ভাষা। ষাঁড়ের উদ্ধত শিং, বাঘের থাবা, ভ্রমরের হুল সবই এদের জন্মগতভাবে প্রাপ্ত হাতিয়ার শত্রুকে আক্রমণ করার। এগুলোই তাদের মাধ্যম আক্রমণের ভাষার। এসব কিছু সত্ত্বেও আমরা বলে থাকি একমাত্র মানুষেরই ভাষা আছে। এর কারণ মানুষের ভাষা অন্য সব প্রাণী বা জড়জগতের প্রভাব বিস্তারের ভাষা থেকে ভিন্ন এর জটিলতায়, সূক্ষ্মতায় ও প্রতীকী বৈশিষ্ট্যে। মানুষের ভাষা শুধু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে না, কল্পনা, যুক্তি এবং সৌন্দর্যবুদ্ধিকেও ধারণ ও লালন করে।

অন্য প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের নানা পার্থক্যের মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য আত্মরক্ষা, আত্মপ্রকাশ ও অভিব্যক্তি লাভের ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহারের চিন্তায়। প্রাণী যেখানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চলাচল দ্বারা অর্থাৎ দৈহিক ভাষা ব্যবহার করে যোগাযোগ সৃষ্টি করে এবং সেই সঙ্গে শব্দ সৃষ্টি, আভা বিকিরণ বা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে একধরনের তথ্য প্রেরণ করে, মানুষ সেখানে ব্যবহার করে প্রতীকী ও বিমূর্ত ভাষা। যোগাযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্য প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য শুধু ভাষার এই বাহ্যিক রূপে সীমিত নয়, বরং ভাষার মাধ্যমে প্রেরিত তথ্যের গুণগত পার্থক্য, এর লক্ষ্য ও প্রভাবের ভিন্নতা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণীরা শুধু তাৎক্ষণিক ও অব্যবহিত ঘটনা এবং প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া স্নায়বিক অনুভূতিকেই প্রকাশ করে এবং মূলত আত্মরক্ষার প্রয়োজনে বা বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্যসংগ্রহ, শত্রুকে ভীতিপ্রদর্শন, সঙ্গী সংগ্রহের জন্য প্রলোভন বা আকর্ষণ সৃষ্টির প্রয়োজনে নানা ইঙ্গিত ও সংকেত ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু মানুষের ভাষা শুধু পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত তথ্যকে প্রকাশ করে না, বরং ভাষাকে ব্যবহার করা হয় তথ্যবিশ্লেষণ, যুক্তিপ্রয়োগ, নতুন জ্ঞান ও উপলব্ধি সৃষ্টি, পরিকল্পনা গ্রহণ, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের কাজে। আমরা কতটা আমাদের অতীতের প্রাণীসুলভ বৈশিষ্ট্য অতিক্রম করে মানবিক গুণাগুণ অর্জন ও মানসিক উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছি তা পরিমাপ্য। আমাদের ভাষায় অর্থাৎ আমাদের যোগাযোগ সৃষ্টিতে, প্রভাব বিস্তারে এবং ভাষা প্রয়োগে, ভীতিপ্রদর্শন, দৈহিক আক্রমণ ও প্রলোভন সৃষ্টির বিপরীতে যুক্তি, তথ্য, উপলব্ধি ও জ্ঞানের বিনিময় ঘটিয়ে পরস্পরকে প্রভাবিত করতে কতটা সক্ষম সেটাই নির্ধারণ করে মানবসভ্যতার অগ্রগতি।

অন্য প্রাণীদের মতো প্রত্যক্ষভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনার মাধ্যমে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, ক্ষোভ, আবেগ বা ক্রোধ প্রকাশ না করে হিংস্র থাবা, তীক্ষ্ণ শিং বা বিষাক্ত দাঁত ব্যবহার করে প্রতিশোধ গ্রহণ বা শত্রুকে আক্রমণ করার পরিবর্তে মানুষ যে বিমূর্ত ভাষার মাধ্যমে তার সমস্ত অনুভূতি ও উপলব্ধি প্রকাশ করে এটা কোনো ব্যর্থতা বা আযোগ্যতা নয় মানবপ্রজাতির। বরং তার সভ্যতা, অগ্রগতি ও শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি হলো ভাষা। ভাষার কল্যাণে মানুষ অব্যবহিত মুহূর্তকে অতিক্রম করে চলে যেতে পারে অতীতে অথবা সে উদ্দীপিত হতে পারে অনাগত ভবিষ্যতের কল্পনায়। মানুষের সৃষ্টিশীলতা, যুক্তি প্রয়োগের দক্ষতা, জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান সৃষ্টির ক্ষমতা একান্তভাবেই ভাষানির্ভর। ভাষাকে অবলম্বন করেই নানা দেশের, নানা কালের ও নানা মানুষের অর্জিত জ্ঞান, লব্ধ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধ চেতনা সমন্বিত ও একীভূত হয়ে মানবসভ্যতাকে দিয়েছে বহুমাত্রিকতা, গভীরতা ও সূক্ষ্মতা। ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ একদিকে যেমন প্রকৃতি ও বিশ্বজগতের রহস্যোদ্‌ঘাটনে সফল হয়েছে এবং সেই সঙ্গে লাভ করেছে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের অপরিসীম দক্ষতা, তেমনি তার বর্ধিত জ্ঞান ও গভীরতর উপলব্ধি ভাষাকে করেছে ক্রমাগতভাবে দক্ষতর, সূক্ষ্ম ও নমনীয়। সাহিত্যের ভাষা, শিল্পী ও দার্শনিকের

ভাষা, যুক্তি ও গণিতের ভাষা সবই নিজস্ব তীক্ষ্ণতা, দক্ষতা ও নৈপুণ্যে শুধু বিস্ময়কর নয়, অন্তহীনভাবে ক্রমবিকাশমান।

মানুষ তার ভাষার কল্যাণে অপ্রতিরোধ্য ও অসীম এক সম্ভাবনা লাভ করেছে নিজেকে প্রকাশ করার ও যোগাযোগ সৃষ্টির। মানুষের অভিব্যক্তি লাভ ও বিকশিত হওয়ার পথ যে অন্তহীন, অন্য প্রাণীদের মতো মানুষের বিবর্তন ও অভিব্যক্তির ধারা যে রুদ্ধ হয়ে যায়নি অন্ধগলিতে আটকে গিয়ে, তার কারণ মানুষের ভাষা। ভাষার উৎকর্ষ এর সূক্ষ্মতা ও নমনীয়তা, তীক্ষ্ণতা ও সংবেদিতা নির্ধারণ করে কতটা শুদ্ধ ও গভীরভাবে প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্বজগৎকে আমরা জানতে পারি। আবার আমাদের জ্ঞানের অগ্রগতি নির্ধারণ করে ভাষার উত্তরণ ও উৎকর্ষ। এই পারস্পরিকতা মানবসভ্যতাকে দিয়েছে ক্রমবিকাশের অব্যাহত ধারা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভাষার কল্যাণে অর্জিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি মানুষকে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের যে বর্ধিত দক্ষতা দিয়েছে এবং সম্ভব করছে নানা হাতিয়ার ও যন্ত্রের উদ্ভাবন, তা অনেককেই মোহমুগ্ধ করেছে। তারা মানবসভ্যতার অগ্রগতি যাচাই করতে চায় অর্জিত যান্ত্রিক শক্তি এবং উদ্ভাবিত নানা মারণাস্ত্রের দক্ষতার বিচারে। এসব যন্ত্র মানবসভ্যতার একটি নগণ্য অপভ্রংশমাত্র; সভ্যতার মূল আদর্শচ্যুত ভ্রান্ত ফসল। এ যেন কবির মস্তিষ্কের আবরণ ভেদ করে তীক্ষ্ণ শিং গজিয়ে ওঠা। কোনো নৃত্যশিল্পীর চম্পক অঙ্গুলিতে বিষাক্ত নখরের সংযোজন। কোনো কবি বা লেখক নিশ্চয়ই তার কাব্য বা সাহিত্যের প্রতিকল্পরূপে শিংকে দর্পভরে গ্রহণ করবে না। অথবা কোনো নৃত্যশিল্পী তার নৃত্যের মনোমুগ্ধকর আবেদনের পরিবর্তে বিষাক্ত নখের আঁচড় দিয়ে প্রভাব বিস্তার করতে চাইবে না। অথচ মানবসভ্যতা এর সমস্ত সৌন্দর্য, শ্রেষ্ঠত্ব, শক্তি ও সম্ভাবনা যেখানে লাভ করেছে ভাষার কল্যাণে অর্জিত ও ধারণকৃত এবং সঞ্চারিত জ্ঞানকে অবলম্বন করে, সেখানে সেই জ্ঞানের পথ ও যোগাযোগ সৃষ্টির স্বাধীনতাকে পাশ কাটিয়ে সভ্যতার অপভ্রংশরূপে অবাঞ্ছিত, কুৎসিত ও ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির ফসল যেসব যুদ্ধাস্ত্র নির্মিত হয়েছে দর্পভরে তারই প্রয়োগ ও প্রদর্শন চলছে। অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে আবেগ, ভীতি ও লোভ, ফলে অস্ত্রের ভাষায় যে নিয়ন্ত্রণ সেখানে মানবিক বৈশিষ্ট্যগুলো যথা আদর্শ, যুক্তি, উপলব্ধি, জ্ঞান, মানবিক সম্পর্ক– সবই অবহেলিত। মানুষের মুখের ভাষা, যা তার উপলব্ধি, চেতনা, জ্ঞানার্জন ও সৃষ্টির ভাষাও, তার বিকল্পরূপে অস্ত্রের ভাষার প্রয়োগ একটি কুৎসিত পাশবিক আচরণ। এই মুহূর্তে যা প্রয়োজন তা হলো, অস্ত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে একটি সুস্থ, সুস্পষ্ট মানবিক ভাষায় সমগ্র মানবজাতির ঐক্যবদ্ধভাবে ঘৃণা প্রকাশ এবং তীব্র প্রতিবাদ তুলে ধরা। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে অমানবিক নৃশংসতা চলছে সন্ত্রাস ও অস্ত্রের নির্লজ্জ দাপটে, তার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আমাদের মানবিক ভাষাকে যা নির্বস্তুক, প্রতীকী, বিশুদ্ধ, বারুদের গন্ধমুক্ত কিন্তু তথ্যনির্ভর।

দুর্নীতি যেখানে স্থানীয় ও আপেক্ষিক পরম ও আন্তর্জাতিক না হয়ে

দুর্নীতি বলতে আমরা নিয়মের লঙ্ঘন বুঝি। এই নিয়ম হতে পারে মৌলিক, ব্যাপক, সর্বজনীন ও সর্বকালীন অথবা হতে পারে কৃত্রিম, সংকীর্ণ, স্থানীয় বা সাময়িক। নীতির উৎস হতে পারে ভৌত প্রকৃতি ও বিশ্বজগতের ঘটনামালা অথবা রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক, ধর্মীয় বা নৈতিক, মানবিক চেতনা, সৌন্দর্যবুদ্ধি ও রুচি। গভীর বিশ্লেষণে দেখা যাবে, নীতির একটি যৌক্তিক ভিত্তি আছে যা কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত ও বস্তুগত ঘটনানির্ভর। নীতির উৎস বস্তু, ঘটনা ও প্রাণিজগতের সমষ্টিগত সহাবস্থান, পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ও সমন্বিত বিবর্তন। প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা, বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন এবং বিশ্বজগতের একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ যৌক্তিক উপলব্ধি লাভের লক্ষ্যে বিজ্ঞানীরা কাজ করে চলেছেন। গ্রহ-নক্ষত্রের গতিপথ, পরমাণুর মধ্যে মৌলিক কণিকাগুলোর আচরণ, নানা শক্তির প্রয়োগে বস্তুর প্রতিক্রিয়া ও রূপান্তর আবিষ্কৃত ভৌত প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানুষই এগুলো আবিষ্কার করেছে তার অনুসন্ধিৎসা, মেধা ও শ্রম দিয়ে।

বিজ্ঞানীদের একটি লক্ষ্য থাকে, আবিষ্কৃত নিয়ম যেন স্থান-কাল ও আবিষ্কারক-নিরপেক্ষ হয় অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক এবং বিষয়গত অর্থাৎ অবজেকটিভ। বিচিত্র ও ঘটনাবহুল এই বিশ্বকে উপলব্ধি করার বিকল্প কোনো পথ নেই ভৌত নিয়মগুলোর সাহায্য না নিয়ে। বিজ্ঞানীদের এই অর্জিত উপলব্ধি ও উদ্ভাবিত প্রাকৃতিক নিয়মগুলো অবশ্য একটি অতিরিক্ত ফসল দিয়েছে, যেখানে বিকাশ ঘটেছে প্রযুক্তির। প্রকৃতির নিয়মগুলোকে লঙ্ঘন করে কোনো ঘটনাই ঘটানো সম্ভব নয়। প্রচলিত নিয়মে কোনো ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব না হলে বিজ্ঞানীরা ঘটনাকে অস্বীকার করে, না, উদ্ভাবিত নিয়মের ত্রুটি উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হয়। প্রাণী ও উদ্ভিদজগতেও অর্থাৎ সমগ্র জীবজগতের অনেকগুলো নিয়ম রয়েছে যা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। জীববিদ্যার নিয়মগুলো স্বভাবতই অজৈব বস্তুজগতের চেয়ে জটিল। জীবদেহের অণু-পরমাণুগুলো ভৌত নিয়মে চললেও জীবের জীবতার কারণে জীবজগতের আচরণ অনেক বেশি জটিল। স্বভাবতই বস্তুজগতের তুলনায় উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদের তুলনায় প্রাণীর আচরণের ব্যাখ্যা বেশি কঠিন। মানুষ যেহেতু সবচেয়ে উন্নত প্রাণী, ফলে মানুষের সার্বিক আচরণে নীতিমালা সবচেয়ে জটিল এবং সেই সঙ্গে বহুলাংশে অজ্ঞাত। এর কারণ একাধিক।

প্রথমত, মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় তিনটি স্তরে। নিষ্প্রাণ বস্তুজগতের মতো মানুষের দেহ গঠিত অণু-পরমাণু দিয়ে, ফলে যে মৌলিক ও ভৌত নিয়মগুলো বস্তুজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করে, মানুষের ক্ষেত্রেও সেগুলো প্রযোজ্য। মানুষ তার ইচ্ছার বলে তার নৈতিকতা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়মে দেহের গঠনকারী পরমাণুগুলোর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আবার মানুষ যেহেতু প্রাণী, ফলে প্রাণিজগতের যেসব জৈব নিয়ম যা কোষ, জিন, ক্রোমোজম, স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সর্বোপরি সমন্বিতভাবে জীবনের উদ্ভব, বিকাশ, সংরক্ষণ, মৃত্যু ও বংশবৃদ্ধিকে পরিচালনা করে তা মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মানুষের যে তৃতীয় বৈশিষ্ট্য তা হলো, শ্রেষ্ঠ প্রাণীরূপে মানুষই একমাত্র জীব যার কালিক চেতনা আছে, ভাষা আছে, আত্মবিকাশের ও অভিব্যক্তির পথ যার মুক্ত ও অন্তহীন। মানুষ তার সৃজনশীলতায়, হাতিয়ার নির্মাণের দক্ষতায়, কল্পনা, স্বজ্ঞা ও তত্ত্বসৃষ্টির ভেতর দিয়ে অপরিসীম আধিপত্য বিস্তার করেছে এই বিশ্বে। বস্তুজগতের যে নিয়ম তা মানুষই আবিষ্কার করেছে, প্রাণিজগতের নিয়মও। স্বভাবতই ভৌতজগতের নিয়মগুলো যতটা শুদ্ধ, পরিমাণগত ও গাণিতিকভাবে জানা সম্ভব হয়েছে, উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের নিয়ম এদের অধিকতর জটিলতার কারণে অতটা সূক্ষ্ম ও নির্ভুলভাবে জানা সম্ভব হয়নি। সমাজ ও রাষ্ট্রবদ্ধ মানুষ যেসব সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়ম সৃষ্টি করেছে তা স্বভাবতই অনেক বেশি ভঙ্গুর ও স্থানীয়, এই বিচিত্র ও জটিল ঘটনাপ্রবাহকে এদের পারস্পরিক সম্পর্কে সমন্বিতভাবে দেখা এবং আবিষ্কৃত নিয়মের প্রয়োগে ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা— সেই বৈশিষ্ট্য সামাজিক নিয়মের ক্ষেত্রেও প্রত্যাশিত।

প্রকৃতির নিয়মগুলো যথার্থ কি না তা যাচাই করার একমাত্র পথ হলো প্রকৃতির ঘটনাসমূহের ব্যাখ্যায় আবিষ্কৃত নিয়ম সফল কি না তা দেখা। প্রাণিজগতে যখন বিভিন্ন প্রজাতি সহাবস্থান করে তখন এদের যে আচরণবিধি বা নীতি সেটাও তারা উদ্ভাবন করে অভিজ্ঞতার আলোকে। যে মৌলিক নিয়মটি এখানে কার্যকর তা হলো, প্রতিটি প্রজাতি তাদের জৈবিক অস্তিত্ব সংরক্ষণে একনিষ্ঠ, এদের খাদ্য সংগ্রহ, বাৎসল্য, স্বপ্রজাতির প্রতি সহানভূতি, আশ্রয় সন্ধান, শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা, বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে যৌথ প্রতিক্রিয়া— সবই নিয়োজিত একটি মৌলিক লক্ষ্যে এবং তা হলো, আপন প্রজাতিকে রক্ষা করা। প্রাণিজগতে মৌলিক নীতি তাই স্বজাতির সংরক্ষণ ও যৌথ কল্যাণ। প্রাণিজগতের নিয়মে সবচেয়ে অনৈতিক কাজ হলো আপন প্রজাতিকে হত্যা করা এবং আপন প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটতে পারে এমন কাজে অংশ নেওয়া। মানুষ নিজেকে উন্নত প্রাণী দাবি করলেও এবং তার বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতা এই দাবির পক্ষে অনন্য দৃষ্টি স্থাপন করলেও দেখা যায় অনেক অনৈতিক কাজে সে লিপ্ত, যা প্রাণিজগতে ঘটে না। এর মূল কারণ মানুষের সৃষ্ট যে তৃতীয় স্তরের নীতিমালা যা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্ভাবিত ও প্রয়োগকৃত

তা ভ্রান্তিযুক্ত, অসম্পন্ন ও অনেক ক্ষেত্রে অসৎ। মানুষের সৃষ্ট এই সামাজিক নীতি অনেক ক্ষেত্রে ভৌত প্রাকৃতিক নিয়ম ও জীবজগতের নিয়মকে লঙ্ঘন করে ফলে তা আত্মঘাতী হয়ে ওঠে যেহেতু মানবপ্রজাতি যতই উন্নত হোক প্রাণিজগতের ও ভৌতজগতের নীতিমালাকে লঙ্ঘন করতে পারে না। কারণ, সেগুলো অনেক বেশি মৌলিক, সর্বজনীন ও চিরন্তন। ফলে যখন কেউ কোনো নীতি-লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত হয়, আমাদের বিচার করতে হবে কোন স্তরের নীতিকে সে লঙ্ঘন করেছে।

কয়েকশ কোটি বছরের বিবর্তন ও কয়েক লাখ বছরের সচেতন সভ্যতার ফসল শোষণ করে নিয়ে আজকের যে মানবজাতি তার শক্তি ও সম্ভাবনা যেমন অসীম, তেমনি অপার এর ওপর অর্পিত দায়িত্ব। দুর্নীতির অভিযোগ যখন উত্থাপিত হয় কোনো ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তখন অবশ্যই যাচাই করতে হবে, এই নীতি-লঙ্ঘনের সার্বিক প্রভাব সমগ্র মানবজাতির ওপর কতটা গভীর, ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী।

সবচেয়ে বড় যে অপরাধ ও নীতি লঙ্ঘন করার ক্ষমতা মানুষ অর্জন করেছে তা হলো, প্রলয়ংকারী যুদ্ধের প্রস্তুতি, পারমাণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, জীবাণু ও রাসায়নিক অস্ত্র নির্মাণে, এবং তা দ্রুত বহন করে নিক্ষেপণের আয়োজন একদিকে মানবপ্রজাতি ও পৃথিবীকে মুহূর্তে ধ্বংস করার অবস্থায় নিয়ে এসেছে, অন্যদিকে মানসিক বিকৃতি, পারস্পরিক বিদ্বেষ ও ঘৃণার আগুন সঞ্চারিত করছে। বিপুল মহাবিশ্বে আমাদের এ ক্ষুদ্র পৃথিবী যে জীবনের অনুকূল নানা ভৌত শর্ত পূরণ করেছে তা অনন্য এক দৃষ্টান্ত। তার চেয়েও অনন্য হচ্ছে মানুষ তার বিস্ময়কর অভিব্যক্তি ও সম্ভাবনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

যুদ্ধের আয়োজন হচ্ছে সবচেয়ে বড় অদূরদর্শিতা, যেখানে অপচয় ঘটছে মেধার, শ্রমের, সম্পদের ও সময়ের। সুন্দর জীবনের গভীর উপলব্ধি, বিশ্বজগতের রহস্যোদ্‌ঘাটনের, আনন্দ উপভোগের অপার সম্ভাবনা অসংখ্য বিজ্ঞানী, দার্শনিক, শিল্পী, সাহিত্যিক ও শান্তিপ্রিয় মানুষ সৃষ্টি করেছে; তার বিপরীতে অল্পসংখ্যক অপরিণামদর্শী, হঠকারী, যুদ্ধবাজ, নির্বোধ মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আবিষ্কার ও সম্ভাবনাকে মানবজাতির ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করছে। ঠান্ডা মস্তিষ্কে পরিকল্পিতভাবে অসৎ ক্ষমতা দখল ও অবৈধ অর্থোপার্জনের এক ষড়যন্ত্রের জাল এখানে ক্রিয়াশীল। যুদ্ধের এই প্রস্তুতি শুধু বাহ্যিক ধ্বংসের ভয়াবহতা নিয়েই উপস্থিত নয়, যে অন্ধ লোভ ও সংকীর্ণতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতা যুদ্ধের আয়োজনের আড়ালে কাজ করে, তারই উপাংশরূপে এসেছে মাদকব্যবসা, বোমাবাজি, কুসংস্কারের বিস্তার, পরিবেশদূষণ ও সম্পদের অপচয়, ফলে অচিকিৎসা, অশিক্ষা, অপুষ্টিও। দারিদ্র্যের শিকার হচ্ছে অনুন্নত দেশের বিপুলসংখ্যক শিশু, যুদ্ধাস্ত্রের জন্য ব্যয়িত অর্থের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই যেখানে রক্ষা

করতে পারত এই শিশুদের। সবচেয়ে বেদনার ঘটনা হলো, এই যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবসা যারা করছে তারা বাহ্যিক পোশাকে ও ব্যক্তিগত আচরণে অতিভদ্র ও নীতিবান হলেও যে শত শত বিলিয়ন ডলার তারা অস্ত্র ব্যবসায় অর্জন করছে বিশুদ্ধ গাণিতিক নিয়মে সেই অর্থের অনুপাতে পৃথিবীর কোথাও না কোথাও মানুষ মারা যাচ্ছে। কৃত্রিম সংঘাত বাধিয়ে প্রতিহিংসায় উন্মত্ত করে, অপপ্রচার ও কুসংস্কার ছড়িয়ে, কাল্পনিক জুজুর ভয় সৃষ্টি করে, কখনো বা গোপন হত্যা, ঘুষ প্রদান বা রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে অনুন্নত দেশগুলোতে এই অস্ত্র বিক্রি করছে।

অনুন্নত দেশগুলোতে যে সামাজিক অস্থিরতা এবং তথাকথিত অনৈতিকতা, তার মূলে কাজ করছে আন্তর্জাতিকভাবে প্রকৃতির মৌলিক নিয়মগুলোর লঙ্ঘন। আন্তর্জাতিক সংস্থা সেজে স্বচ্ছতার বিশ্লেষণ নিয়ে যারা দুর্নীতির শ্রেণীবিভাগ করছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ও জাতির, তাদের মনে রাখতে হবে এই পৃথিবীর সম্পদের কত অংশ কতসংখ্যক মানুষ ভোগ করছে। আন্তরাষ্ট্রীয় ব্যবসা-বাণিজ্যে কে কাকে শোষণ করছে, পরিবেশদূষণে, আতঙ্ক সৃষ্টিতে, মানুষের শুভবুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করতে অস্ত্র পাচারে, মতবাদের ড্রাগ রপ্তানি করে কারা সম্পদ গ্রাস ও আধিপত্য বিস্তার করছে।

বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র ও সীমিত সম্পদের দেশ। সবচেয়ে বেশি ঘনবসতি নিয়েই, নানা ধর্ম ও ধারণার মানুষকে নিয়ে শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতির পরিবেশে সংগ্রাম করে চলেছে। পৃথিবীর নানা দেশের মানুষকে বাঙালি জাতি স্থান দিয়েছে শুধু তার ভূখণ্ডে নয়; তার উদার, অনুসন্ধিৎসু ও জ্ঞানপিপাসু হৃদয়ে। বাঙালি জাতি যুদ্ধ করেছে বিদেশি শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে; কিন্তু পরম উদারতায় পৃথিবীর সব জ্ঞানী-গুণী ও মহৎ ব্যক্তিদের শিক্ষা ও আদর্শকে গ্রহণ করছে। আন্তর্জাতিক প্রভাব, ষড়যন্ত্র, অস্ত্র ব্যবসা মূলত দায়ী উন্নয়নকামী দেশগুলোতে মিলিটারি শাসন ও একনায়কত্ব সৃষ্টি হওয়ার পেছনে। এরই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনরূপে নানা দেশকে, যারা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে উচ্চকণ্ঠ অথচ বাংলাদেশ যুদ্ধ করছিল স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবিক অধিকারের জন্য। বিপুল আত্মত্যাগ, সাহসিকতা, দেশপ্রেম ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে যে বাংলাদেশের উদ্ভব তার গণতান্ত্রিক ধারায় যে ছেদ পড়ল হত্যা, অসাংবিধানিক ক্ষমতা দখল এবং একটি শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সংবিধানকে মুলতবি করার ভেতর দিয়ে, সেখানে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রই কাজ করছে। কারণ আন্তর্জাতিক স্নায়ুযুদ্ধের তখনকার আবহে অনুন্নত দেশগুলোকে গণতন্ত্রের বিপরীতে সেনানায়কদের অধীনে রাখাই সহায়ক ছিল।

বাংলাদেশ যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ করে না, অর্থনৈতিকভাবে কোনো দেশকে শোষণ করে না, কোনো ড্রাগ উৎপাদন ও পাচার করে না, অন্য দেশের পরিবেশদূষণ ঘটায়

না; তবু এখানে যে বিশৃঙ্খলা, সামাজিক নীতি লঙ্ঘন, অর্থনৈতিক দুর্নীতি তা ভবিষ্যতের শুদ্ধতর গণতন্ত্রে উত্তরণের সংগ্রামেরই অনিবার্য অপভ্রংশ। একে যদি দুর্নীতি বলি, তার সঙ্গে জড়িত শুধু মুষ্টিমেয় ব্যক্তি যারা অতীতের দুষ্কর্ম ও দুর্ঘটনা এবং আন্তর্জাতিক দুর্নীতির চিহ্ন বহন করে। একটি দেশকে যাচাই করতে হবে সে দেশের জনগণ, তাদের মূল আদর্শ, মানসিক স্বাস্থ্য, বুদ্ধি ও শ্রমের বিনিয়োগ, তাদের সততা ও দূরলক্ষ্যের দ্বারা; স্থানীয় যা কিছু বিশৃঙ্খলা, নিয়ম লঙ্ঘন ও দুর্নীতি তা কতটা প্রভাববিস্তারী আন্তর্জাতিকভাবে, মানবজাতির জন্য কতটা অকল্যাণকর, কতটা দীর্ঘমেয়াদি তার ভিত্তিতেই এর আপেক্ষিক গুরুত্ব যাচাই হবে। দুর্নীতির যে অভিযোগ ও শ্রেণীবিভাগ দেশীয় ভিত্তিতে করা হয় স্বচ্ছতার নামে তার মাপকাঠি অবশ্যই হতে হবে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, বস্তুনিষ্ঠ ও স্বচ্ছ, যেখানে আন্তর্জাতিক শোষণ, অনৈতিকতা ও প্রকৃতির মৌলিক নিয়মগুলো লঙ্ঘিত তা হিসাবে এনে।

সন্ত্রাসীরাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত–
প্রয়োজন এর বিপরীত ব্যবস্থা

সুস্থতার সঙ্গে অসুস্থতার, সুন্দরের সঙ্গে কুৎসিতের; মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গলের যে বিরোধ, তা বস্তুত ভিন্ন দুই অস্তিত্বের মধ্যে নয়। আমাদের প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষা এবং কর্মতৎপরতা সুস্থতা, সুন্দর ও মঙ্গলের জন্য। এদের অনুপস্থিতি জন্ম দেয় অসুস্থতা, অসুন্দর ও অমঙ্গলের। নেতিবাচক এসব ধারণা ও কর্মকাণ্ড টিকে থাকে সব ধরনের দুর্বলতা, ভীতি ও ঋণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিকে অবলম্বন করে। যেখানে সম্পদ আছে সেখানেই সেই সম্পদকে কেন্দ্র করে লুণ্ঠন ও চৌর্যবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করে। যেখানে সৌন্দর্যবুদ্ধি ও সৃষ্টিশীলতায় শিল্পের উদ্ভব সেখানে সেই শিল্পকর্মকে ধ্বংস করে কুৎসিতের দাপট দেখানো সম্ভব। যেখানে স্বপ্ন ও কল্পনা আমাদের প্রত্যাশার জন্ম দেয়, সেখানেই স্বপ্নভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে।

সভ্যতার অগ্রযাত্রায় মানুষের শ্রম, সৃষ্টিশীলতা, স্বপ্ন ও সাধনা যত কিছু নির্মাণ করেছে সুখ-সমৃদ্ধি, সুস্থতা ও সৌন্দর্যের জন্য, সেখানে মাঝে মাঝেই শূন্যতা ও বৈপরীত্য নানা কুৎসিত রূপ নিয়ে বিনষ্ট করেছে সুস্থতা, সৌন্দর্য ও স্বপ্নকে। কিন্তু যা সবচেয়ে মর্মান্তিক ও বেদনার তা হলো, এসব নেতিবাচক, ঋণাত্মক পরাশ্রয়ী ঘটনা বেশি গুরুত্বপ্রাপ্ত ইতিবাচক সব অর্জন ও অস্তিত্বের বিপরীতে। আমরা জানি, গভীর ও পরিব্যাপ্ত কোনো পানির বিস্তারে যদি বুদ্‌বুদ সৃষ্টি হয় সেটাই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বস্তুত পানির বিস্তারের মধ্যে যেসব শূন্য এলাকা পানির অনুপস্থিতিতে, সেগুলোই বুদ্‌বুদ। পানির সমস্ত শরীর যেখানে পৃথিবীর টানে স্থিতিশীল সেখানে বস্তুহীন পানির বুদ্‌বুদগুলো ঊর্ধ্বগামী। কারণ এদের ওপর কাজ করে না এদের অভিকর্ষ ও বস্তুহীনতার জন্য। অন্ধকারের যেমন কোনো নিজস্ব অস্তিত্ব নেই, আলোর অনুপস্থিতি থেকেই কৃষ্ণগহ্বরের সৃষ্টি, সমাজেও তেমনি অযোগ্য, নিষ্কর্মা, দায়িত্বহীন মানুষ তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে যোগ্য, সক্রিয়, উৎপাদনশীল মানুষের অর্জনকে লুণ্ঠন করে। এরা অযোগ্য বলেই যোগ্যতার মূল্যাবধারণ করে না। দেশ, সমাজ ও সভ্যতার প্রতি এদের কোনো দায়িত্ব নেই। কারণ, এদের কোনো অবদান নেই দেশ, সমাজ ও সভ্যতাকে গড়ে তোলার কাজে।

যে সূক্ষ্ম মূল্যবোধ, দূরদৃষ্টি, সৌন্দর্যবুদ্ধি ও চেতনা মানুষকে সৌন্দর্যপিপাসু, সহানুভূতিশীল ও মানবিক করে তা অনন্য এক বৈশিষ্ট্য। দীর্ঘ সময় ধরে অসংখ্য

মানুষের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির বিনিময়ে মানুষ অর্জন করেছে এই অপূর্ব কল্পনাশক্তি, যার ভেতর দিয়ে সে নিজেকে স্থাপন করতে পারে অন্যের অবস্থানে এবং হয়ে ওঠে সংবেদী ও সহমর্মী তার দুঃখ ও বেদনায়। সে ভাগ নিতে পারে অন্যের আনন্দ ও সুখানভূতির। এটি একটি বুদ্ধিগত চেতনা, যা স্থানকালের ব্যবধান অতিক্রম করে মানুষকে সংযুক্ত করে দূরের জগৎ, অতীতের ঘটনা ও ভবিষ্যতের স্বপ্নের সঙ্গে। মানুষ যে শুধু নৈকট্য, তাৎক্ষণিকতা, আত্মীয়তা ও আত্মকেন্দ্রিকতা অতিক্রম করে অতীতের ঘটনা, ভবিষ্যতের সম্ভাবনা, দূরের জগৎ ও অনাত্মীয় মানুষের জন্য মঙ্গল কামনা করে, অবদান রাখে, ত্যাগ স্বীকার করে এবং নিজের অস্তিত্বকে একীভূত করে বিপুল বিশ্ব বৃহত্তর সমাজ ও পরিব্যাপ্ত কালের মধ্যে সেটা তার বিকশিত মানবিক চেতনার কল্যাণে।

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের অভিজ্ঞতার যে সঞ্চয় ও বিনিময়, চারপাশের ঘটনাপ্রবাহকে উপলব্ধি ও বিশ্লেষণের যে প্রচেষ্টা প্রতি মুহূর্তে, তার যে শ্রম, উৎপাদনশীলতা, উদ্ভাবন—সবকিছু মিলে গড়ে উঠেছে সভ্যতা। প্রতিটি সুস্থ মানুষ জীবনকে ভালোবেসে কল্যাণবোধে, জীবনসংগ্রামে অংশ নিয়ে তিলে তিলে গড়ে তুলেছে সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার অবকাঠামো। এর মূল উপাদান নতুন জ্ঞান, সামাজিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, প্রশাসনিক ও আইনগত কাঠামো সৃষ্টিশীল ভাবনা, যা সবার যৌথ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়। কর্মক্ষেত্র নির্বাচন, পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ, দায়িত্ব বণ্টন, নিয়মশৃঙ্খলার সংরক্ষণ, কর্মপ্রেরণা সৃষ্টি, পরিকল্পনা গ্রহণ–এসবই ব্যবস্থাপনাসম্পর্কিত এবং নির্বস্তুক। সমাজ স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্যই এসব ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালার উদ্ভব ঘটিয়েছে। সমাজ যত দিন একই ধরনের উৎপাদনব্যবস্থা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তত দিন অপরিবর্তী ধারায় প্রায় একই জীবনপদ্ধতি পৌনঃপুনিকভাবে চলত। তখন সামাজিক ব্যবস্থাপনাও ছিল স্থবির।

জ্ঞানের দ্রুত বিকাশ, নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, সেই সঙ্গে পরিবর্তনশীল উৎপাদনব্যবস্থা যখন সমাজকে দ্রুত পরিবর্তনের ধারায় নিয়ে গেল, তখন সামাজিক ব্যবস্থাপনাও গতিশীল করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। পুরোনো জ্ঞানকে সংরক্ষণ ও সঞ্চারিত করা, প্রচলিত উৎপাদনব্যবস্থাকে সংরক্ষণ, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা সমাজপতি ও সরকারের প্রধান দায়িত্বরূপে যে গণ্য করা হতো তার স্বরূপ গেল বদলে। নতুন জ্ঞানসৃষ্টি শিক্ষায় দ্রুত প্রসার ঘটাল, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ভেতর দিয়ে উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন এবং গতিশীল পরিকল্পনা গ্রহণ, ব্যবস্থাপনাকেও গতিশীল ও উদ্ভাবনী করার অপরিহার্যতা সৃষ্টি করল। সমাজ ও দেশ পরিচালনার এই নির্বস্তুক অবকাঠামোর অভ্যন্তরে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও বস্তুনিষ্ঠ কর্মধারা সমাজের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শক্তি সৃষ্টি করল উন্নত দেশগুলোর জন্য, যেখানে কর্মরত অসংখ্য মানুষ। এরা ব্যস্ত উৎপাদনের কাজে,

নতুন যন্ত্রের নির্মাণে, অভিনব সব প্রযুক্তি ও উৎপাদন কৌশলের উদ্ভাবনে, নতুন জ্ঞানসৃষ্টি ও তত্ত্ব আবিষ্কারের সৃজনশীল কাজে। জ্ঞানের সংরক্ষণ, বিস্তার, বিশ্লেষণ, সংশোধন ও বিনিময়— এদের কর্মতৎপরতা, শ্রমসাধ্যতা, সৃষ্টির প্রেরণা ও সুস্থ জীবনের প্রত্যাশা সভ্যতার মূল চালিকা শক্তি।

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় গতিশীল, দ্রুত পরিবর্তনীয়, উদ্ভাবনী ও কর্মতৎপর অসংখ্য সৎ ও স্বাভাবিক মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে সহায়তা দেওয়াই একমাত্র কাজ। মনে রাখতে হবে, একটি কর্মব্যস্ত ল্যাবরেটরিতে গবেষকেরা যখন নিয়োজিত গবেষণার কাজে, সেখানে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ল্যাবরেটরিতে গবেষণার কাজ যাতে চলতে পারে সে জন্য নিরাপত্তা বিধানে তাদেরও একটি গুরুত্ব আছে। কিন্তু তা প্রত্যক্ষ বা প্রধান নয়। একইভাবে যে শিল্পকারখানায় নানা সামগ্রীর উৎপাদনে চলছে অসংখ্য শ্রমিকের উৎপাদনশীলতায়, নানা যন্ত্র নির্মাণের উদ্ভাবন ও কর্মকুশলতায়, সেখানে কারখানার প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে যে পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব পালন করছে তার দায়িত্ব ও অবদান কারখানার সমগ্র উৎপাদনশীলতার তুলনায় নগণ্য। একইভাবে কৃষকের সোনালি ফসলের জমি এবং শস্যভান্ডার সংরক্ষণের দায়িত্বে যারা নিয়োজিত তারা কখনোই প্রধান নয় সেই দক্ষ কৌশলী কঠোর শ্রম বিনিয়োগকারী কৃষকের মতো, যারা বীজরোপণ, কর্ষণ, সেচ প্রদান ও শস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে ক্রমাগত নতুন কর্মকৌশল প্রয়োগ করছে।

মোট কথা সমাজের মূল শরীর গঠিত উৎপাদনশীল, কর্মব্যস্ত অসংখ্য ও বিচিত্র সব পেশায় নিয়োজিত মানুষদের নিয়ে। এরা শান্তিপ্রিয়, সুশৃঙ্খল, কর্মঠ, স্বাভাবিক মানুষ। এদের সুস্থতা সমাজকে দেয় স্থিতিশীলতা; এদের অবদান ও উৎপাদিত সামগ্রী সৃষ্টি করে দেশের সম্পদ; অথচ রাষ্ট্রকর্মে রাজনৈতিক নানা আদর্শ প্রচার, অঙ্গীকার ও স্লোগানে মূলধারার এই মানুষগুলো নেই। কেউ সুস্থতা ও স্বাভাবিকতা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। যেখানে অসুস্থতা, বিকৃতি ও বিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস ও অসততা সেখানে সবার দৃষ্টি। আমাদের পুলিশ এমনকি সেনাবাহিনী নিয়োজিত সন্ত্রাস দমনে; আমাদের বিচারপতিরা এবং আইন ব্যবসায়ীরা সদাব্যস্ত অপরাধী ও সন্ত্রাসীদের নিয়ে আইনের পরিচালনায়। তাদের প্রতি সুবিচার হলো কি না, মানবিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে কোথাও এরা বেল পাওয়ার যোগ্য কি না, তার বিচার, পুনর্বিচার, আপিল আবেদন ও তার মীমাংসা এবং এদের নিয়ে এদের পরিবারের সদস্যদের সদা ব্যস্ততা, যন্ত্রণাভোগ ও অর্থবিনিয়োগ যে পরিমাণে চলে, সে অনুপাতে বিচারের অগ্রগতি ঘটে না। অপরাধীদের মুক্তির জন্য একদিকে রাজনীতিবিদ ও প্রভাবশালীদের তদবির, অন্যদিকে সন্ত্রাস দমনের নতুন আইন তৈরি এবং নানা কৌশলে সন্ত্রাসের জন্য রাজনীতিকে ব্যবহার করা এবং রাজনীতিকে সন্ত্রাসের জন্য ব্যবহার করার কাজে ব্যস্ত ও ব্যয়বহুল সংসদে সমালোচনা ও বিতর্কের বড় অংশ দখল করে থাকে যে প্রসঙ্গ তা হলো সন্ত্রাস।

সন্ত্রাসীদের জন্য জেলখানা এবং বিপুলসংখ্যক জনশক্তি নিয়োজিত, সেখানে জেলার থেকে কারারক্ষী, রাঁধুনি, ধোপা-নাপিত, ঝাড় দার— সবাই নিয়োজিত সন্ত্রাসীদের জন্য। রাজনীতিবিদেরা ব্যস্ত সন্ত্রাসীদের কখনো ব্যবহার করা, কখনো শাস্তি দেওয়া, কখনো সন্ত্রাসের ইস্যুকে ব্যবহার করে ভোটযুদ্ধে জয়ী হওয়ার কৌশল নির্ধারণে, কখনো সন্ত্রাসের নামে রাজনৈতিক বিপক্ষকে শাস্তি প্রদানে। সাংবাদিকেরা ব্যস্ত সন্ত্রাসের খবর সংগ্রহ ও সন্ত্রাস নিয়ে প্রতিবেদন ছাপানোর কাজে; পত্রিকা পাঠকদের পত্রিকা পাঠে নিয়োজিত সময়ের বিরাট অংশ দখল করে নেয় সন্ত্রাসীরা। অর্থাৎ সন্ত্রাস শুধু সংঘটিত হয় না পথে, বাজারে, ব্যাংকে, ট্রেন, বাস, লঞ্চ বা গৃহে, সন্ত্রাস দখল করে নিয়েছে কোর্ট, জেলখানা, পার্লামেন্ট, রাজনৈতিক মঞ্চ, সংবাদপত্র এবং আমাদের অবকাশ মুহূর্তগুলো। অথচ সন্ত্রাস কোনো স্বনির্ভর অথবা অনিবার্য ঘটনা নয় সভ্যতার। পরগাছার মতো সন্ত্রাস টিকে আছে সুস্থ, স্বাভাবিক, নিয়মতান্ত্রিক, উৎপাদনশীল মানুষদের উপার্জন ও সম্পদকে অবলম্বন করে। সমাজের সামগ্রিক শক্তি ও অনিবার্যতার কাছে এর ব্যাপকতা ও চিরন্তনতার তুলনায় সন্ত্রাস নিতান্তই নগণ্য, পরাশ্রয়ী, ভিত্তিহীন, নেতিবাচক দুর্ঘটনামাত্র। অথচ সন্ত্রাস ধ্বংসাত্মক অগ্নিকাণ্ডের মতো ক্ষণস্থায়ী ঘটনা হলেও তা ধ্বংস করেছে অসংখ্য মানুষের দীর্ঘদিন ধরে গড়ে তোলা সমাজ ও সভ্যতা।

এখান থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ সন্ত্রাসের উদ্ভবের মূল কারণকে দূর করা, যেমন অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ তাপমাত্রা হ্রাস। অগ্নিকাণ্ড ঘটে যাওয়ার পর তার নির্বাপণের আয়োজন স্বভাবতই হয়ে পড়ে দুঃসাধ্য, ধ্বংসাত্মক ও ব্যয়বহুল। অথচ কত সহজে তাপমাত্রা কমিয়ে রেখে অগ্নিকাণ্ড থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। দাহ্য তাপমাত্রায় পৌঁছে গেলে আপাতত অদাহ্য বস্তুগুলো দাহ্য হয়ে ওঠে। সমাজে বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাসপ্রবণতা বন্ধ করতে হলে মানসিক সুস্থতা চাই যথার্থ শিক্ষা, সহনশীলতা ও সামাজিক স্বাস্থ্যের আবহে। সন্ত্রাসীরা যে অবজ্ঞার, অবহেলার, ঘৃণার পাত্র, তারা যে অবাঞ্ছিত ও গুরুত্বহীন এমন একটি ভৌত ও মানসিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে আমাদের রাজনীতি, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, প্রশাসন ও সামাজিক সামগ্রিক আয়োজনে। একটি বলিষ্ঠ, মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরোধ চাই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, যেখানে বিপুল সংখ্যাধিক্যের সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষগুলো গুরুত্বপ্রাপ্ত সবার ভাবনায় ও আচরণে, সন্ত্রাসীরা নয়।

সুবিচার ও অর্থনীতি

অর্থনীতিবিদেরা ইকোনমিকম্যান বা অর্থনৈতিক মানুষ বলে একধরনের সামাজিক জীবকে সংজ্ঞায়িত করেছেন, যারা একান্তভাবে স্বার্থপর, যুক্তিনির্ভর এবং মানবিক দুর্বলতামুক্ত এই অর্থে যে, মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রতিটি অর্থনৈতিক মানুষ কট্টরভাবে তার ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতি যাচাই করে চলেন কোনো সামগ্রীর ক্রেতা বা বিক্রেতা হিসেবে। এখানে সে যান্ত্রিকভাবে অর্থনৈতিক স্বার্থে তার যুক্তি ও দক্ষতাকে প্রয়োগ করবে এটাই ধরে নেওয়া হয়। অর্থনীতিকে সনাতনী অর্থাৎ নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার মতোই বস্তুনিষ্ঠ, অপরিবর্তী কার্যকারণের নিয়মে পরিচালিত একটি গাণিতিক বিষয়রূপে দাঁড় করবার প্রয়াসে অর্থনীতিবিদরা ইকোনমিকম্যানের সংজ্ঞার্থ এবং অর্থনীতির নিয়মকে উপস্থাপন করে এসেছেন প্রচলিত এই অর্থনীতিতে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক অনেক মূল্যবোধ স্থান নেই। যে ব্যক্তির চাহিদা ক্রয়ক্ষমতার দ্বারা সমর্থিত নয়, অথবা যে বা অর্থকরী উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী নন, যে মানুষ মানবিক মূল্যবোধ, ন্যায়বিচার পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের কারণে নানা সহানুভূতি, ত্যাগ বা আবেগ দ্বারা পরিচালিত। তিনি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত নন।

এ কথা বোধগম্য যে, মানবিক নানা দোষ-গুণ, মূল্যবোধ, আবেগ, চেতনা ও প্রেরণা-সমৃদ্ধ যে বাস্তব মানুষ, সে অত্যন্ত জটিল; ফলে অর্থনীতি নিয়ে তত্ত্ব সৃষ্টি, বিশ্লেষণ ও হিসাব-নিকাশের জটিলতা এড়ানোর জন্য সরল কিছু স্বীকার্য বা স্বতঃসিদ্ধ ধরে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারটি বোধগম্য। বিশেষ করে অনেকেরই ধারণা, কোনো বিষয়কে বিজ্ঞানভিত্তিক ও গাণিতিক হতে হলে তা যান্ত্রিক এবং সব ধরনের অনিশ্চয়তামুক্ত হতে হবে। কারণ, সে ক্ষেত্রেই মাত্র সুনির্দিষ্ট যুক্তি ও কার্যকারণের নিয়মে বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যা ও পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। উল্লেখ্য যে, আধুনিক বিজ্ঞান বিশেষত পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই যান্ত্রিকতা ও নিশ্চয়তার নীতি কার্যকর নয়।

অর্থনৈতিক সনাতনী যে ধারণা যেখানে কট্টর যুক্তিনির্ভর অর্থনৈতিক হিসাব কষা স্বার্থপর মানুষ এবং লাভ-লোকসানের নিরবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার দ্বারা মুক্তবাজার অর্থনীতি সংজ্ঞায়িত তা ভালো কিংবা মন্দ, নৈতিক বা অনৈতিক সেই

বিচারে না গিয়েও আমরা বলতে পারি, প্রচলিত এই অর্থনীতির মূল স্বতঃসিদ্ধ ও ধারণাগুলো ভুল এবং অবাস্তব। এই সত্যটি সম্প্রতি পরীক্ষাগতভাবে পাওয়া গেছে। অবশ্য বর্তমান বিশ্বে মুক্তবাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে সঠিক তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় তার পরোক্ষ প্রমাণ আমরা পাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই অভূতপূর্ব অগ্রগতির যুগেও বিশ্বজুড়ে অসংখ্য মানুষের অপুষ্টি, অশিক্ষা, কর্মহীনতা, চিকিৎসা ও আশ্রয়হীনতা, নিরাপত্তা ও লক্ষ্যতার ব্যাপ্তি দেখে।

যে পরীক্ষাটির মাধ্যমে অর্থনীতিবিদদের ইকোনমিকম্যানের কট্টর অর্থনৈতিক স্বার্থপরতার ধারণাটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ :

ধরা যাক, দুজন মানুষের মধ্যে একটি খেলা প্রবর্তন করা হলো যার নিয়ম হলো, কিছু টাকা দুজনের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। দুজনের কেউ কাউকে চেনে না এবং টাকা বণ্টনের ব্যবস্থাটি এমন যে, একজনকে সব অর্থ দিয়ে বলা হলো, সে এই অর্থের একটি অংশ দ্বিতীয়জনকে দেওয়ার প্রস্তাব দেবে। কিন্তু নিয়মটি এমন যে, একবারই মাত্র সে প্রস্তাবটি দিতে পারবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রস্তাবটি গ্রহণ না করলে কেউই এই অর্থের কোনো অংশ পাবে না। এখন প্রশ্ন, এক হাজার টাকা যদি প্রথম ব্যক্তিকে দেওয়া হয়, এর কত অংশ তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেওয়ার প্রস্তাব করবেন? এবং ন্যূনতম কত অংশ না পেলে দ্বিতীয় ব্যক্তি এ প্রস্তাব বর্জন করবেন? যেহেতু খেলার নিয়মটি প্রস্তাবকারী ও প্রস্তাব গ্রহণকারী দুজনই জানেন, ফলে টাকার কত অংশ প্রস্তাবক দিতে চাইবেন এবং ন্যূনতম কত অংশ না পেলে দ্বিতীয় ব্যক্তি তা প্রত্যাখ্যান করবেন, তা নির্ভর করবে কতটা নিরঙ্কুশ অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত এবং কী পরিমাণ তাদের আচরণ সুবিচারের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত তার ওপরে।

প্রস্তাবক ইকোনমিকম্যান হিসেবে তার অর্থনৈতিক স্বার্থ বিচার করে হয়তো শতকরা ৯০ ভাগ টাকা নিজে রেখে বাকিটা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেওয়ার প্রস্তাব করবেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি যেহেতু জানেন প্রস্তাবটি গ্রহণ না করলে তিনি কিছুই পাবেন না; ফলে ন্যায়বিচারের কথা না ভেবে অর্থনৈতিক স্বার্থ বুদ্ধিতে এ প্রস্তাবকেই মেনে নেবেন। কিন্তু বিস্ময়ের যে, বিভিন্ন দেশে এই পরীক্ষাটি পরিচালনা করে এবং মূল টাকার পরিমাণকে বৃদ্ধি করে যে সাধারণ পরিসংখ্যানটি পাওয়া গেছে তা হলো, শতকরা ৭৫ জন লোক ৪০% থেকে ৫০% অর্থ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেওয়ার প্রস্তাব করে থাকেন। মাত্র ৪% লোক মূল অর্থের ২০%-এর কম দেওয়ার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব গ্রহণকারীর দিক থেকে দেখা গেছে, ২০%-এর কম প্রস্তাব করলে ৫০% লোক তা প্রত্যাখ্যান করেন।

এই পরীক্ষার ফলাফল ব্যাখ্যা করতে গেলে যে সাধারণ সিদ্ধান্তটিতে আমরা উপনীত হই তা হলো, সব দেশ এবং সব সমাজে মানুষ ন্যূনতম সুবিচারকে গভীর আবেগে মূল্য দেয়। মানুষ যান্ত্রিক বা নিছক যৌক্তিক ব্যাখ্যার দ্বারা তার অর্থনৈতিক স্বার্থ দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পারিবারিক বন্ধনে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার আবহে যে সভ্যতার উদ্ভব, সেখানে প্রতিটি মানুষের সম্পর্কে ন্যায়বিচার ও প্রতিটি ঘটনার যথার্থতা সম্পর্কে একটি গভীর উপলব্ধি ও প্রতীতি জন্ম নিয়েছে। এর লঙ্ঘন করলে তিনি তার প্রতিবাদ করেন নিজের তাৎক্ষণিক স্বার্থ বিসর্জন দিয়েও। এই পরীক্ষাটি আরো জটিল ও ব্যাপকভাবে পরিচালনা করে মানবজাতির অর্থনৈতিক আচরণের যে গভীরতর বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে হলো, কোনো অর্থনৈতিক আচরণ, সুবিচার নিরপেক্ষ নয়। নির্ভেজাল অর্থনৈতিগক মানুষ যা ইকোনমিকম্যান খুঁজে পাওয়া যাবে না সমাজবদ্ধ ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে।

কিছু উক্তি কিছু প্রশ্ন

আমাদের সম্মুখে দুটো সম্ভাবনার পথ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্মোচিত করেছে। একটি হলো প্রকৃতি ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আমাদের বর্ধিত জ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা এবং পরিবেশকে দীর্ঘতর সুন্দর জীবনের অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ করা অথবা আমাদের হিংস্র ও অযৌক্তিক আবেগকে ব্যবহার করে সমগ্র মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া এক মুহূর্তে। এই দুই বিকল্প সম্ভাবনার ভেতর থেকে যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সচেতন নির্দেশনা প্রয়োজন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের আয়োজনে। প্রথমটি ইতিবাচক আর দ্বিতীয়টি নেতিবাচক।

আমরা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে একটি সম্ভাবনার দ্বারে উপস্থিত হয়েছি, যেখানে যথার্থ জ্ঞানের চর্চা, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের কাজে অংশগ্রহণ ও বিশ্বের অগ্রগতির ধারাকে আত্মস্থ করে আমাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। এ জন্য যে আয়োজন তা হতে হবে সামগ্রিক। শিক্ষালাভের ভেতর দিয়ে আমাদের তরুণরা যেমন আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আত্মস্থ করবে, তেমনি আমাদের শ্রমিক, শিল্পপতি, রাজনীতিবিদ ও জনসাধারণকে একটি গভীর দায়িত্ববোধ ও চেতনায় আধুনিক হতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গীভূত করতে হলে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যে যৌক্তিকতা, বুদ্ধিগত সততা ও গণতান্ত্রিক মনোভাব ক্রিয়াশীল তা সঞ্চারিত হতে হবে সমাজের বিভিন্ন স্তরে।

উন্নয়ন একটি যৌথ আয়োজন। আমাদের মতো উন্নয়নকামী দেশগুলোর জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও শিল্পায়নের ভেতর দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন অত্যন্ত দুঃসাধ্য একটি কাজ। সীমিত সম্পদ, বিপুল জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগ, শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা এবং দীর্ঘদিন ধরে পরাধীনতা ও শোষণের প্রভাবে মানুষের অসহায়ত্ববোধ আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে করে তুলেছে আরও দুঃসাধ্য এবং চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এই মুহূর্তে আমাদের যা সবচেয়ে প্রয়োজন তা হলো, গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ, সহনশীলতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, সংযম ও সততা। এগুলো শুধু একটি সভ্য সমাজেরই প্রয়োজনীয় উপাদান নয়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ ও বিজ্ঞানমনস্কতা বিকাশের ভেতর দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের অপরিহার্য শর্তও বটে। গণতন্ত্রের মূল কথা হলো স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের ভেতর দিয়ে একটি সমন্বিত সিদ্ধান্তে পৌঁছা এবং তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র

পরিচালনা করা। এই মত প্রকাশের ক্ষেত্রে দেশের মঙ্গল-চিন্তা, সততা ও প্রজ্ঞা প্রয়োজন, সেই সঙ্গে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। আমরা লক্ষ করছি, সম্প্রতি এই যৌক্তিক সংলাপ ও মতের আদান-প্রদান এবং সহনশীলতার সঙ্গে ভিন্নমতকে যাচাই করার যে প্রক্রিয়া তার বিকাশ ঘটছে না। বরং ক্রমাগত উগ্রতা, অসহনশীলতা ও হিংস্রতার প্রকাশ ঘটছে গণতন্ত্রের নামে।

শিক্ষক-ছাত্র, শ্রমিক-কর্মচারী, চিকিৎসক বা রোগী, পথচারী বা নিরীহ নাগরিক হিসেবে প্রায়শ একটি তাণ্ডবলীলার শিকার হচ্ছি আমরা, যার নাম হরতাল।

যেখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই, ভাষা যেখানে বোবা, যেখানে শাসকের দুঃশাসন বা তার জনবিচ্ছিন্নতা যোগাযোগের সমস্ত পথকে এবং সংলাপের ভেতর দিয়ে সমস্যা সমাধানের সব সম্ভাবনা রুদ্ধ, সেখানে একটি কিংকর্তব্যবিমূঢ় সমাজ তাদের ক্ষোভ প্রকাশের জন্য হয়তো হরতাল বেছে নিতে পারে। এটা প্রায় যুদ্ধ ঘোষণার মতোই একটা চরম দুর্দশার অভিব্যক্তি।

কিন্তু যুদ্ধ যেমন সমস্যার সমাধান দেয় না, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ শেষে একটি সংলাপ বা সন্ধি প্রয়োজন পড়ে, হরতালও তেমনি একটি ক্ষোভের অভিব্যক্তি হতে পারে। কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান ঘটতে পারে, শুধু যুক্তিনির্ভর সংলাপ, যোগাযোগ ও মতামতের স্বচ্ছ প্রকাশের ভেতর দিয়ে।

যেকোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ও উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা পুরণের যে পদ্ধতি ও পরিকল্পনা যথার্থ বলে তারা মনে করেন, তা জনগণের সামনে উপস্থাপন করা এবং তাদের নিজস্ব নীতিমালা ও কর্মসূচি জনগণকে বোঝাতে প্রয়াস পাওয়া। এই প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দল এবং জনগণ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও পরস্পরকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবে। এখানে যে বুদ্ধিগত সততাটি প্রয়োজন তা হলো, নিজের মতের অনুকূলে অন্য কাউকে নিয়ে আসার সম্ভাবনা যেমন থাকবে, তেমনি সম্ভাবনা থাকবে অন্যের মত দ্বারা প্রভাবিত হবার।

একজন পরীক্ষক যেমন নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষার ফলাফল গ্রহণ করে, পরস্পরকে প্রভাবিত করার ও মত প্রকাশের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তেমনি একটি নৈর্ব্যক্তিকতা চাই। যেকোনো সত্যিকারের পরীক্ষায় সাহসিকতা ও বুদ্ধিগত সততা দাবি করে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি তাই পরীক্ষানির্ভর, ভাষানির্ভর, যুক্তিনির্ভর ও পারস্পরিক শ্রদ্ধানির্ভর। রাজনীতি অবশ্যই মানুষকে নিয়ে। তাদের স্বাধীনতা, আকাঙ্ক্ষা পূরণ, কল্যাণ ও উন্নয়ন সমষ্টিগতভাবে অর্জন করাই মূল আদর্শরূপে এখানে গণ্য হবার। ব্যক্তিগত বা দলীয় আধিপত্য বিস্তার, ক্ষমতা দখল বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য লোভ গোপনে লালন করে একটি মিথ্যা উক্তি ও ভ্রান্ত ধারণা প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে একটি অসৎ, অরাজনৈতিক ও অপরাধমূলক কর্ম। গণতন্ত্রের ভিত্তি হচ্ছে অবহিত মানুষের বিশ্লেষণী দৃষ্টি, স্বাধীনতা

ও সাহসিকতার সঙ্গে মত প্রকাশের ভেতর দিয়ে সংখ্যাধিক্যের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন। লক্ষ করার যে, বিষয়টি অর্জনের, দখলের নয়, জনগণকে শিক্ষিত করার, বিভ্রান্ত করার নয়। আমাদের দেখতে হবে হরতাল কি এই শর্তগুলোর অনুকূলে কাজ করে অথবা প্রতিকূলে?

হরতাল শব্দটির আভিধানিক যে অর্থ, সেটার প্রতি আমরা এখানে নির্দেশ করছি না। যেটি এর ব্যবহারিক অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাকে আমরা বোঝাচ্ছি। যেখানে আমরা লক্ষ করি, একজন নিরীহ বৃদ্ধ শুধু বাসে চড়ার অপরাধে নৃশংসভাবে নিহত কোনো সন্ত্রাসীর হাতে, কর্মরত মায়ের শিশুসন্তান বোমার আঘাতে রক্তাক্ত ও পঙ্গু, শুধু মায়ের অপেক্ষায় রাস্তায় বসে থাকার অপরাধে, একজন রিকশাচালক, একজন পথচারী এমনকি একজন কর্মরত পুলিশ যেখানে নিহত অজানা কোনো সন্ত্রাসীর বোমার আঘাতে, সেখানে গণতন্ত্রের কোন লক্ষ্য অর্জিত হয় হরতালের ভেতর দিয়ে তা আমাদের জানতে হবে।

রাজপথ দিয়ে আমি হেঁটে যেতে চাই অথবা চলতে চাই কোনো যানবাহনে। আমার গন্তব্যস্থল হয়তো স্কুল, কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়। আমি যেতে চাই কর্মস্থলে, অফিসে, কারখানায় আমার গবেষণাগারে অথবা হাসপাতালে রোগী দেখতে অথবা রোগী হিসেবে। কিন্তু হরতাল যারা ডাকছে, তারা তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতাই শুধু ব্যবহার করছে না, তারা হরণ করছে আমার পথচলার স্বাধীনতা, আমার কাজ করার স্বাধীনতা, আমার হরতাল না করার স্বাধীনতা, এমনকি আমার বেঁচে থাকার স্বাধীনতাও।

হরতালে যখন রাজপথ শূন্য হয়ে যায়, যদি না-চলে গাড়ি বা বাস, তা থেকে কি বোঝার উপায় আছে যারা নামেনি পথে, যে রোগী বোমার আঘাতে রাস্তায় মৃত্যুবরণের পরিবর্তে নিজ বাসাতেই হৃদরোগে মৃত্যুকে বরণ করা বেছে নিল— সেটা কি তার স্বাধীনতার প্রকাশ?

আমাদের যে অসংখ্য অভিযোগ ও দুঃসহ-দুর্ভোগ, শিক্ষাহীনতা, চিকিৎসাহীনতা, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানহীনতা এসবের মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা, আমাদের কর্মহীনতা, অশিক্ষা ও অদক্ষতা। আমাদের সমস্ত ক্ষোভের প্রকাশ যেখানে হরতালে, হরতাল যেখানে আমাদের কলকারখানা বন্ধ করে রাখে, বন্ধ করে রাখে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বৃদ্ধি পায় আমাদের উচ্ছৃঙ্খলতা, অকর্মণ্যতা, প্রশ্রয় পায় দুষ্কৃতিকারীরা, আস্ফালন বৃদ্ধি পায় হিংস্র মানুষদের— যেখানে আমরা আরও দরিদ্র হয়ে পড়ি, আরও অশিক্ষিত, আরও রুগ্‌ণ, আরও অলস ও অসৎ। ভাষা ব্যবহার, যুক্তির প্রয়োগ, সমস্যার বিশ্লেষণ, সংলাপ ও বিতর্কের ভেতর দিয়ে জনসাধারণকে অবহিত করার যে প্রক্রিয়া গণতন্ত্রে, হরতাল তার বিপরীতে কাজ করে।

পশুরাও সংঘাতে লিপ্ত হয় কখনো কখনো। আত্মরক্ষা অথবা স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে শত্রুকে আক্রমণ করে। পশুদের ভাষা নেই বলেই তাদের শিং আছে অথবা নখর। কিন্তু লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের ভেতর দিয়ে মানুষ অর্জন করেছে ভাষা, যে ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে পারে, বিশ্লেষণ ও বিতর্কে মানুষ অংশ নিতে পারে, লিখতে পারে প্রবন্ধ। এসব কিছুর জন্যই তৈরি হয়েছে পত্রপত্রিকা, মঞ্চ, সেমিনার কক্ষ, জনসভা এমনকি পার্লামেন্ট বা সংসদ।

সভ্যতার দীর্ঘপথ অতিক্রম করে, গণতন্ত্রের বিকাশের ভেতর দিয়ে– মত প্রকাশের, যোগাযোগ সৃষ্টির এবং আস্থাহীন সংলাপের এসব প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন আমরা অর্জন করেছি। এখানে প্রয়োজন শিক্ষা, প্রজ্ঞা বাগ্মিতা, মেধা, সততা ও সাহসিকতা। কিন্তু মত প্রকাশের, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ও ঐকমত্য সৃষ্টির সমস্ত পদ্ধতিকে পাশ কাটিয়ে যখন হরতাল সংঘটিত হয় এর সমস্ত নৃশংসতা নিয়ে, সেখানে যারা নায়ক তাদেরকে হতে হয় নির্বোধ, নিষ্ঠুর ভাষাহীন ও অপরিণামদর্শী। অথচ আজকের দিনে যাকে আমরা সফল হরতাল বলি, সেখানে এসব কাজগুলোই শুধু প্রশ্রয় পায়। দেশপ্রেম ও মানুষের জন্য মঙ্গল কামনাকে এবং উন্নয়নের সমস্ত আয়োজনকে ব্যর্থ করেই মাত্র একটি সফল হরতাল হতে পারে বাংলাদেশের স্টাইলে।

হরতাল সম্পর্কে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক, যৌক্তিক, অর্থনৈতিক, সুস্থ রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সর্বোপরি একটি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ এখন আমাদের প্রয়োজন, যার সমাধান অবশ্যই হরতালের ভেতর দিয়ে হবে না, হতে হবে স্বচ্ছ, সৎ ও প্রজ্ঞানির্ভর সংলাপে। এর জন্য স্বীকৃত ও বিশ্বজনীন প্রাতিষ্ঠানিক মঞ্চ হলো সংসদ।

বাংলাদেশের মানুষ কেন সন্ত্রাসী নয়

একটি দেশের পরিচয় হতে পারে নানাভাবে। ভৌগোলিক অবস্থান, এর আলো-বাতাস, নদী-সমুদ্র-মাটি, গাছপালা, প্রাণিজগৎ আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক ঘটনামালা নিয়ে যে ভৌতজগৎ— সেটি একটি পরিচয় কোনো দেশের। দেশের মানুষের দীর্ঘদিনের জীবনসংগ্রাম, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা, উদ্ভাবন, শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কাজের ভেতর দিয়ে সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ আরেকটি পরিচয় প্রতিটি দেশের। যে প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভৌত পরিবেশের মধ্যে একটি দেশের মানুষের উদ্ভব ও বিকাশ, সেটা অনেকার্থে পূর্বপ্রাপ্ত, যার ওপর মানুষের স্বাধীনতা নেই। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন, এর রূপান্তর, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শ্রমের মাধ্যমে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশকে বদলে দেওয়া কখনো কখনো সম্ভব হতে পারে। কিন্তু সেটা মানুষের অর্জন, প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত পূর্বনির্ধারিত সম্পদ নয়।

কোনো দেশের মানুষ তার অবদান, আচরণ, উদ্ভাবন, আবিষ্কার, শ্রম ও সাধনায় যা অর্জন করে দীর্ঘ সময় ধরে তা প্রতিফলিত হয় সে দেশের মানুষের ঐতিহ্য, জীবনধারা ও সংস্কৃতিতে। কোনো দেশের মানুষ সম্পর্কে প্রশংসা বা দুর্নামের চিহ্ন লেপনের ক্ষেত্রে একটি সার্বিক বিচার অপরিহার্য। কেউ যদি কোনো দেশের মানুষকে তার ভৌগোলিক পরিচয়ে তার বর্ণ, বংশপরিচয়, ভাষা, ধর্ম বা রাজনৈতিক পরিচয়ে ঢালাওভাবে ভালো বা মন্দের বিশেষণে চিহ্নিত করে, তাকেই আমরা বর্ণবাদী, সাম্প্রদায়িক, দেশ ও জাতি-বিদ্বেষী হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। কারণ মানুষের ব্যক্তিগত গুণাগুণ তার আচরণ ও অবদানকে যাচাই না করে তার স্বাধীনসত্তা, মানবিক সমতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করে তার প্রতি অবিচার করা হচ্ছে।

স্বার্থবুদ্ধি, অন্ধত্ব, অযৌক্তিকতা এবং কখনো বা অসততা ও ভণ্ডামির আশ্রয় নিয়ে এ ধরনের সাম্প্রদায়িকতা ও জাতি-বিদ্বেষ ছড়ানো হয়। বাংলাদেশকে সন্ত্রাসীদের সম্ভাব্য স্বর্গ হিসেবে তালিকাভুক্তিকে আমরা সন্ত্রাস দমনের সহায়ক আচরণ বলে যেমন মানতে পারি না, তেমনি গ্রহণ করতে পারি না এর যৌক্তিকতাকে। প্রথমত, একটি দেশ বা রাষ্ট্রকে সন্ত্রাসীরূপে সামগ্রিকভাবে অভিযুক্ত করার কোনো যুক্তি নেই। কারণ দেশ বলতে যদি দেশের মানুষকে বোঝায়, তাহলে সে দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও জীবনযাত্রায় যারা সবচেয়ে বেশি অবদান

রেখেছে, তাদের প্রতিভা, সৃজনশীলতা, শ্রম ও আত্মত্যাগ হিসেবে না এনে, যারা এই দেশ ও এই দেশের মানুষ ও দেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও প্রগতিশীলতার বিরুদ্ধে তাদেরকেই শুধু গুরুত্ব প্রদান এবং বাংলাদেশকে তাদের পরিচয়ে পরিচিতি করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অসংগত।

বাংলাদেশের মানুষের পরিচয় সবচেয়ে যেখানে উজ্জ্বল, বাস্তব ও চিরন্তন, তা হলো ভাষা, মানবাধিকার, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, শিক্ষা, শান্তি ও আন্তর্জাতিকতার জন্য এ দেশের মানুষের দীর্ঘ সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। সাহিত্যিক, শিল্পী, ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবীরূপে যাদের পরিচয়, তাদের মধ্যে নগণ্যসংখ্যক সংকীর্ণ স্বার্থান্বেষী অন্ধ ও নির্বোধ থাকতে পারে— যেমনটি প্রায় সব দেশেই পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলাদেশের বাকি সবাই অসাম্প্রদায়িক, মানবিক, গণতন্ত্রমনা ও শান্তিকামী। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ হলো বাংলা ভাষার জন্য, অর্থনৈতিক মুক্তি ও গণতন্ত্রের জন্য এ দেশের আপামর জনসাধারণের দীর্ঘ সংগ্রাম। গণভোটের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক আদর্শকে সমর্থন, বিপুল সাহসিকতা নিয়ে স্বাধীনতাযুদ্ধে সবার অংশগ্রহণ এবং সর্বোপরি এ দেশের জনগণের সার্বিক সমর্থনে ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি অসাধারণ, প্রগতিশীল সংবিধান বিনির্মাণ প্রমাণ করে যে শত দারিদ্র্য, প্রতিকূলতা এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মধ্যে এ দেশের মানুষ মানবতার পক্ষে, গণতন্ত্রের পক্ষে, প্রগতির পক্ষে।

এ কথা সত্য যে, আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের ঔজ্জ্বল্য ও সাফল্য অনেকটা কালিমালিপ্ত হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, ক্যু এবং বল প্রয়োগের ম্যাধমে ক্ষমতা দখল ইত্যাদির ভেতর দিয়ে। এটি বিস্ময়কর যে, একটি দেশের সাধারণ মানুষ একটি উদার রাজনৈতিক আদর্শে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা অসাম্প্রদায়িকতা ও সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অপার সাহসিকতায় ও আত্মত্যাগে যখন অর্জন করল স্বাধীনতা, এবং একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় যুদ্ধ করে চলেছে দারিদ্র্য, কুসংস্কার ও পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে, তখন তথাকথিত অনেক গণতান্ত্রিক দেশই বাংলাদেশের মানুষের এই সংগ্রামে সহায়তা দেয়নি। বরং যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিষ ছড়িয়ে লিপ্ত ছিল নানা ষড়যন্ত্রে, তাদেরই ইন্ধন জুগিয়েছে এবং আশ্রয় দিয়েছে হত্যাকারী ও সন্ত্রাসীদের; যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ও একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে ও বিকাশে সহায়তা না দিয়ে এ দেশের মানুষের প্রগতিশীল চেতনাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে, তারাই বস্তুত দায়ী বাংলাদেশের বর্তমান দুরবস্থার জন্য।

এটা অত্যন্ত দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় যে, বাংলাদেশের যে বিপুলসংখ্যক মানুষ প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে, নানা বঞ্চনা ও প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও যারা জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে লিপ্ত, যারা

প্রয়োজনবোধে ধানকাটার কাস্তে ও ভূমিচাষের লাঙল ফেলে, কলকারখানায় উৎপাদন ও নির্মাণের হাতিয়ার রেখে অবতীর্ণ হয় স্বাধীনতাযুদ্ধে, তারপর যুদ্ধ শেষে ফিরে যায় মাঠে, কলকারখানায়, নিজ নিজ কাজে, তাদের কথা কেউ স্মরণ করে না এবং তাদের পরিচয়ে বাংলাদেশকে চিহ্নিত করে না। যেসব ছাত্র-শিক্ষক, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার চেতনা সঞ্চারিত করে সাধারণ্যে, যে কবি, শিল্পী কবিতা লেখে, গান গায়, ছবি আঁকে জীবনের জন্য, শান্তির জন্য, যারা প্রতিবাদ করে সন্ত্রাস ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে, যে দেশে নির্মিত হয় না যুদ্ধাস্ত্র ও উৎপাদিত হয় না মাদকদ্রব্য ব্যবসায়িক ভিত্তিতে, সে দেশ কখনোই সন্ত্রাসের ভিত্তিভূমি হতে পারে না। বস্তুত যারা ধ্বংস, যুদ্ধ ও মাদকতাকে মূলধন করে মুনাফা লুটছে, শক্তি প্রয়োগের উন্মত্ততায় মানবিক মূল্যবোধ, স্বাধীনতা ও বেঁচে থাকার অধিকারকে নিষ্পেষিত করছে অস্ত্রবলে ও আধিপত্য প্রয়োগে, তাদের অপকীর্তির কিছু বিচ্ছিন্ন প্রভাব দরিদ্র দেশগুলোকে সংক্রমিত করছে কখনো কখনো।

বাংলাদেশের মানুষ সন্ত্রাসী কি না সে প্রশ্নের মীমাংস করতে হলে বাংলাদেশকে জানতে হবে এর ঐতিহ্য এবং স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবিক অধিকারের জন্য এ দেশের আপামর জনসাধারণের দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসে। দেশ বলতে যদি দেশের মানুষকে বোঝায়, যে দাবিটি রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন, তাহলে বাংলাদেশের পরিচয় হতে হবে সেই সব মানুষের অবদান, মূল্যবোধ, চেতনা, আদর্শ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে; যারা বাংলাদেশকে সৃষ্টি করেছে স্বাধীনতাযুদ্ধ ও অব্যাহত সংগ্রামের ভেতর দিয়ে, শত নির্যাতনকে সহ্য করেও মানবিক মূল্যবোধকে লালন করে চলেছে তাদের প্রতিদিনের কাজের মধ্য দিয়ে।

যারা বাংলাদেশের সমস্ত প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও মানবিক চেতনার বিরোধিতা করেছে, যারা এ দেশের মানুষের গভীর আত্মত্যাগ ও স্বপ্নের প্রভাব এবং প্রতিফলনে রচিত একটি আধুনিক সংবিধানকে বিকৃত করেছে, যারা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ও উজ্জ্বল ঘটনা স্বাধীনতাকে অস্বীকার করেছে; ফলে অপমানিত করেছে সমগ্র জাতির উপলব্ধি ও চেতনাকে, তারা নিশ্চয়ই বাংলাদেশের পরিচয় বহন করে না।

কটি জাতি সংজ্ঞায়িত হতে পারে এর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, এর মানুষ, মানুষের শ্রম, স্বপ্ন ও বিশ্বাসের দ্বারা। সেই বিচারে বাংলাদেশের যে পরিচয় সেই বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধাদের– যারা সাহসী, নির্লোভ, ত্যাগী, দেশপ্রেমিক ও মানবিক। এরা রক্ত দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবিক অধিকারের জন্য। শুধু দিয়েছে তা-ই নয়, এরা দিতে পারে। এরা যে দিতে পারে সবকিছু দেশ ও মানুষের জন্য প্রয়োজন হলে, সেই সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে আছে আমাদের বীর শহীদদের ইতিহাসে। বাংলাদেশের যে পরিচয় অতীতের ইতিহাসের যে সম্ভাবনা ভবিষ্যতের স্বপ্নে এবং যে বাস্তবতা এ দেশের অসংখ্য মানুষের প্রতিদিনের বেঁচে থাকার সংগ্রামে— সেই বিচারে বাংলাদেশ কখনো সন্ত্রাসী নয়, বরং যারা সন্ত্রাসী, তারা বাংলাদেশের নয়।

চাই ইতিবাচক পদক্ষেপ ও গতিশীল ভারসাম্য

প্রকৃতির নিয়মে সব সিস্টেমই ভারসাম্য পেতে চায়। ব্যবস্থা বলতে সেই সব উপাদানের এবং বস্তু ও শক্তির সমাবেশ বুঝি যাদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও আদান-প্রদান চলছে। এই যোগাযোগ ঘটতে পারে তথ্য ও জ্ঞানের বিনিময়ে অথবা একটি যান্ত্রিক সম্পর্কের মাধ্যমে, যেখানে বস্তুগত সামগ্রীর আদান-প্রদান অথবা শক্তি প্রয়োগের টানাপড়েন চলে। তথ্য ও জ্ঞানের আদান-প্রদানের ভেতর দিয়ে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেটি হলো মানসিক ও নির্বস্তুক সম্পর্ক। শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ও বস্তুর আদান-প্রদানের ভেতর দিয়ে যে সম্পর্ক, সেটি সাধারণত যান্ত্রিক, স্থূল। গভীরার্থে এই বিভাজন অবশ্য যথার্থ নয়; কারণ সব ধারণা, তথ্য ও জ্ঞানের মূলে রয়েছে বাস্তব জগৎ যেখানে বস্তু ও শক্তির খেলা চলছে। অন্যদিকে বস্তু ও শক্তির জগতে যে সম্পর্ক তা নিয়ন্ত্রণ করে বস্তু বা শক্তির প্রভাববলয়, যা নির্বস্তুক। যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলো যে ঘুরছে অথবা পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনগুলো যে আবর্তিত হচ্ছে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চারপাশে সেখানে কোনো রজ্জু দিয়ে বাঁধা নেই গ্রহ বা ইলেকট্রনগুলো এদের কক্ষপথের কেন্দ্রের সঙ্গে। বরং এখানে কাজ করছে যথাক্রমে মহাকর্ষ বল ও তড়িৎবলের আকর্ষণ, যা আসলে নির্বস্তুক প্রভাবক্ষেত্র। শুধু বস্তুজগৎ নয়, আমাদের সামাজিক জীবনও নানা স্তরের ব্যবস্থারূপে বিন্যস্ত। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি আন্তর্জাতিক সংস্থা সবই একেকটি সিস্টেম, যা এদের ঘটনকারী নানা অংশ বা উপাদানগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় সৃষ্টি করে টিকে থাকে। এই যোগাযোগ সৃষ্টি ও সমন্বয় সাধনের পেছনে যে পারস্পরিক প্রভাব কাজ করে তার মূলে কোনো না কোনো কিছুর বিনিময় ঘটছে এদের মধ্যে।

আমরা একটি সাধারণীকৃত ছবি তুলে ধরতে পারি সব সম্পর্কের মধ্যে এবং তা হলো, যেকোনো ব্যবস্থার ক্ষেত্রে, তা যান্ত্রিক বা স্থূল হোক অথবা মানসিক ও সূক্ষ্ম হোক, এর উপাদানগুলোর মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভারসাম্য রক্ষিত হতে হয়। আমরা যাকে স্থিতিশীলতা বলি, তা হতে পারে গতির অথবা স্থবিরতার। কেউ যখন দ্রুতগতিতে সাইকেল চালিয়ে যায়, তখন গতির মধ্যে তার দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে শক্তি প্রয়োগে ও দক্ষতায়। শক্তিহীনতায় অথবা দুর্ঘটনায় এই সাইকেল চালক যখন ভূপাতিত হয়, সেটাও একটি স্থিতিশীল অবস্থা। কিন্তু তা হলো

স্থবিরতা ও নিষ্ক্রিয়তার স্থিতাবস্থা। সমাজবদ্ধ হয়ে জীবনের জয়গান গেয়ে কর্মতৎপরতা, আনন্দ, প্রেরণা, পারস্পরিক আস্থা ও ভালোবাসা নিয়ে সভ্যতা যেখানে এগিয়ে চলে, সেখানে নানা গতিশীল ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাই। ছাত্রছাত্রীদের দল বেঁধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়া, ক্লাসরুমে শিক্ষক-ছাত্রের উদ্দীপিত আবহে শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানের কর্মব্যস্ততা একটি স্থিতিশীল অবস্থা সমাজে। কলকারখানায় শ্রমিকদের কর্মব্যস্ততা, উৎপাদন যন্ত্রগুলোর সচলতা, কাঁচামাল থেকে নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদন— সব মিলিয়েই একটি উৎপাদনব্যবস্থা। মাঠে মাঠে কৃষকদের ফসল বোনা, ফসল সংগ্রহ ও কর্মব্যস্ততা একটি গতিশীলতার মধ্যেও পরিবর্তনের ধারায় সম্পর্কিত থাকে পরস্পরের সঙ্গে।

আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছোট-বড় নানা ব্যবস্থা এমনিভাবে গড়ে উঠেছে, যেখানে কর্মপ্রেরণা, সম্মুখদৃষ্টি, উদ্দীপনা, শ্রম পারস্পারিক সহযোগিতা ও আস্থা নিয়ে সমন্বয় সাধিত হয়েছে। কর্মচঞ্চল, সক্রিয় এসব প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থা আবার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়ে বৃহত্তর ব্যবস্থার জন্ম দেয়। তারই একটি দৃষ্টান্ত হলো আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। লক্ষণীয় যে, প্রতিটি ব্যবস্থা, যেমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, গবেষণাগার, শিল্পকারখানা, কৃষিকাজ, হাটবাজার, সাংস্কৃতিক সংগঠন, বন্দর, বিচার বিভাগ, প্রশাসন ও প্রতিরক্ষাব্যবস্থা— সবই নিজস্ব কর্মসূচি নিয়ে অন্তর্নিহিত প্রয়োজনবোধে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রতিটি ব্যবস্থা এর লক্ষ্য প্রয়োজনীয়তা, কর্মক্ষমতা বিশেষ জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ লাভের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জনগোষ্ঠীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং যৌথ অগ্রগতিকে সহায়তা করাই সরকারের দায়িত্ব। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার কোনো বাইরে থেকে আসা বা স্বয়ম্ভু কোনো শক্তি নয়; বরং রাষ্ট্রবদ্ধ জনগণের ভাবনা, প্রত্যাশা ও মতামতের ভিত্তিতে যৌথ ও সমন্বিত যে কর্মসূচি তা জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিফলিত ও প্রতিপাদন করা।

যে মৌলিক সহজাত ব্যবস্থাগুলো গড়ে উঠেছে জীবনের প্রয়োজনে, অভিজ্ঞতার আলোকে, মানুষের প্রত্যাশা, স্বপ্ন ও কর্মতৎপরতায়, তা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। কারণ এগুলোই সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি ও চালিকা শক্তি। যেমন আমাদের দেহের প্রতিটি কোষ ও প্রত্যঙ্গ নিয়ে আমরা একেকজন সুস্থ সর্বাঙ্গীণ মানুষ। একটি সজীব, সক্রিয় ও সুস্থ মানুষের প্রতিটি প্রত্যঙ্গ, কোষ, রক্তকণিকা সক্রিয় ও চঞ্চল বলেই সে ভিন্ন একটি রুগ্‌ণ বা মৃত মানুষ থেকে আমাদের স্নায়ুতন্ত্র দেহের প্রতিটি অংশে স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালনের ভেতর দিয়ে শক্তির যে জোগান দেয় প্রতিটি কোষে, সেটি নিশ্চিত করে আমাদের সুস্থতা ও সক্রিয়তা। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এমনই একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন যা রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের সক্রিয়তা ও উৎপাদনশীলতা ব্যাহত না করে এদের মধ্যে গতিশীল ভারসাম্য ও সমন্বয় সাধন করবে।

যখন লক্ষ করি কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে, উৎপাদনশীলতা হারিয়ে শিল্পকারখানা স্তব্ধ হয়ে গেছে, অসংখ্য মানুষ আছে কিন্তু তারা কর্মহীন ও বেকার, রাস্তায় অসংখ্য যানবাহন ভিড় করে আছে কিন্তু তাদের চাকা ঘুরছে না, তখন বুঝতে পারি আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার যে স্নায়ুতন্ত্র তা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। দেহের একেকটি প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা অথবা নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া কোনো সুচিকিৎসা নয়। রোগের কারণ উদ্‌ঘাটন ও নিরাময়ে ব্যর্থ হয়ে রোগীকে কোরামিন দিয়ে নিষ্ক্রিয় ও অচেতন করে রাখাও কোনো চিকিৎসা নয়। অথবা একসময় অপচিকিৎসার শেষ পরিণতিরূপে রোগীকে মৃত ঘোষণা করাও সাফল্য বলে বিবেচিত নয় কোনো চিকিৎসকের। কিন্তু এসব দুঃখজনক ব্যবস্থাপনাও একধরনের স্থিতিশীলতা দেয় যা স্থবিরতা, রুগ্‌ণতা বা মৃতের স্থিতিশীলতা।

আমরা ক্রমাগত লক্ষ করছি উৎপাদনশীল শিল্পকারখানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গবেষণাকেন্দ্র এমনকি বীজের অভাবে কৃষকের ফসল বোনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি, ইকুইপমেন্ট বোর্ড, জিএম প্লান্ট, আদমজী জুটমিলসহ অসংখ্য শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ঘন ঘন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে নানা বাহ্যিক হস্তক্ষেপ ও অব্যবস্থাপনায়। সবকিছুর পরও দেশ চলছে এবং টিকে আছে পরাশ্রয়ী ও পরভৃক মানুষেরা অন্যদের শোষণ করে। ক্রমাগত নতুন কর্মসংস্থান, উৎপাদনশীল মানুষের সংখ্যা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, উন্নততর প্রযুক্তি আত্মস্থ করে নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে শিল্পকারখানাকে আধুনিকীকরণ, নতুন শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা যেখানে একটি জাতিকে দিতে পারে গতিশীল ভারসাম্য, সেখানে আমরা ক্রমাগত স্থিতিশীলতা খুঁজছি নিষ্ক্রিয়তা ও স্থবিরতার মধ্যে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, উন্নততর জীবন ও উচ্চতর শিক্ষার জন্য আকাঙ্ক্ষার বিকাশ, বিশ্বজুড়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার পরিবেশে আমাদের টিকে থাকার ও ভারসাম্য রক্ষার একমাত্র পথ অধিকতর কর্মতৎপরতা, উৎপাদনশীলতা, ব্যাপকতর কর্মসংস্থান, দীর্ঘতর সময় ধরে গভীরতর প্রচেষ্টায় জ্ঞানের সাধনা ও গবেষণায় অংশগ্রহণ— একমাত্র সেটাই দিতে পারে ইতিবাচক পদক্ষেপ প্রয়োজনীয় গতিশীল ভারসাম্য রক্ষায়।

সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গড়ার প্রয়াসে

একটি সমাজকে সন্ত্রাসমুক্ত করার দুটো পথ আছে। একটি হলো বল প্রয়োগ, আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনকে কঠোরতর করা। অন্যটি হলো সন্ত্রাসের মূল কারণ উদ্‌ঘাটন এবং সন্ত্রাসী সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশকে দূর করা। ব্যাধির ক্ষেত্রে যেমন দুটি পথ খোলা থাকে, একটি হলো রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা, অস্ত্রোপ্রচার বা ওষুধ প্রয়োগ; অন্যটি হলো রোগ প্রতিরোধক হিসেবে সুস্বাস্থ্য ও সুস্থ জীবনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি। কোনো সংক্রামক ব্যাধি যখন মহামারিরূপে ব্যাপক রূপ নেয়, তখন রোগী শুধু নিজেই আক্রান্ত হয় না, রোগজীবাণু ছড়িয়ে চারপাশের লোকদের মধ্যেও সংক্রমিত করে সেই রোগ। সেই বিষাক্ত পরিবেশে সুস্থ মানুষেরা, এমনকি চিকিৎসকও নিরাপদ নয়। মানুষের সুস্থতা, নিজস্ব প্রতিরোধক্ষমতা, পোশাক ও আবাসগৃহের নির্বাচন ও সংরক্ষণে পরিচ্ছন্নতা, সার্বিক পরিবেশ জীবাণুমুক্ত ও দূষণমুক্ত রাখার সামাজিক সচেতনতা ও প্রচেষ্টা ব্যাধির সংক্রমণকে প্রতিরোধ করে। কিন্তু যে সমাজে পূর্বপরিকল্পনা, দূরদৃষ্টি ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার অভাব, সে সমাজে ব্যাধির উদ্ভব ও সঞ্চারণ সমগ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রতিটি আক্রান্ত রোগী জীবাণু ছড়িয়ে সুস্থ মানুষের সংখ্যা কমিয়ে ক্রমবর্ধিত হারে পরিবেশকে অসুস্থকর করে ব্যাধির যে বিস্ফোরণ ঘটায় সেটাই মহামারি। সন্ত্রাস আমাদের সমাজে কীভাবে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং মহামারির রূপ নিচ্ছে তা অনুধাবন না করে সন্ত্রাসের মূল উৎসকে অপসারণ না করলে শুধু যান্ত্রিকভাবে বল প্রয়োগে এর নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। একটি পর্যায়ের পর সন্ত্রাসের ক্রমবর্ধমান হার যে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে তা যৌক্তিক বিশ্লেষণে ও গাণিতিক হিসাবে সহজেই দেখানো সম্ভব।

প্রথমত, সন্ত্রাসের ঘটনাকে যখন আমরা নির্মোহ দৃষ্টিতে নৈর্ব্যক্তিকভাবে বিচার করি, তখন প্রথমেই সন্ত্রাসের বড় লক্ষণ যেটি ধরা পড়ে তা হলো, মানুষের ভাষার ব্যবহার, যুক্তি প্রয়োগ, মানবিক মূল্যবোধ, সহানুভূতি ও সামাজিক সম্পর্ক যেখানে অবদমিত ও অপমানিত বল প্রয়োগ, অস্ত্রের ব্যবহার ও নৃশংসতার কাছে, সেখানে সন্ত্রাস প্রপঞ্চিত এর নিষ্ঠুরতা ও ধ্বংসাত্মক মূর্তি নিয়ে। সন্ত্রাসের মূল ভিত্তি ভীতি প্রদর্শন ও পাশবিক বল দ্বারা কাউকে নিয়ন্ত্রণ করা। জীবননাশের, অবমাননার বা

স্বাধীনতা হননের হুমকি প্রদর্শন করে অথবা নৃশংস কোনো ঘটনা ঘটিয়ে কেউ যখন কারো সম্পদ লুণ্ঠন করে তখন তা সন্ত্রাসী কার্যকলাপরূপে চিহ্নিত। এর কারণ, এ ক্ষেত্রে ভীতি প্রদর্শনই একমাত্র কার্যকর শক্তিরূপে ব্যবহৃত। একটি মানুষের অনেকগুলো চৈতন্য আছে যাদের প্রভাবিত হওয়ার ও প্রভাবিত করার নানান সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য মানুষ অর্জন করে, যথার্থ শিক্ষালাভ ও সংস্কৃতিকে বিকশিত করার ভেতর দিয়ে। মানুষের যে সৌন্দর্যবুদ্ধি, রুচি, সহমর্মিতা, মূল্যবোধ, আদর্শ, সামাজিক ও মানবিক সম্পর্ক তা তাকে সংবেদিতা ও প্রভাবিত হওয়ার বৈশিষ্ট্য দেয়। একটি মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন, সাংস্কৃতিক বিকাশ ও চেতনা লাভ তাকে রুচিবান করে নিজেকে ভালোবাসতে শেখায়, সেই সঙ্গে পরিবার ও সমাজের অন্য সবাইকে। এটাই মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান অর্জন ও বৈশিষ্ট্য লাভ, শিক্ষা ও সামাজিক জীবনের ভেতর দিয়ে। এই বৈশিষ্ট্য ও মানবিক গুণগুলো আছে বলেই তার কাছে বন্ধুত্ব, সামাজিক সম্পর্ক, মানবিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম ও আদর্শের আবেদন মূল্য প্রাপ্ত। একটি সংগীতযন্ত্রের তারগুলো যেমন নানা সুরে বাঁধা হয় জটিল নির্মাণ কৌশলে; এবং সূক্ষ্ম ঝঙ্কারে সেই তারগুলো অনুরণিত হয় বাহ্যিক সুরের প্রভাবে। পুরো ব্যাপারটাই গভীর শ্রম ও সাধনার, শৈল্পিক ও সৌন্দর্য সৃষ্টির। কোনো নির্বোধ হাতুড়িওয়ালা নির্বিচারে আঘাত হেনে সূক্ষ্ম এই সুরের জালকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতে পারে, থামিয়ে দিতে পারে এর সমস্ত ঝঙ্কার; কিন্তু কোনো সুর সৃষ্টি করতে পারে না, নির্মাণ করতে পারে না কোনো সংগীতযন্ত্র। সন্ত্রাস শুধু কুৎসিত ভয়ের উপস্থিতি নয়, পাশবিক বল প্রয়োগ ও নিষ্ঠুরতা নয়; অনেক কিছুর অনুপস্থিতি, যথা সৌন্দর্যবুদ্ধি, জীবনবোধ, রুচি, মানবিক চেতনা, মমত্ববোধ ও ভালোবাসার উপলব্ধি।

মানুষের জন্য মানুষের ভালোবাসা, সমবেদনা ও মঙ্গলকামনা আসলে একটি বুদ্ধিগত চেতনার ফসল। একটি সংগীতযন্ত্র যেমন একই সুরে বাঁধা যন্ত্রের ঝঙ্কারে অনুরণিত হয়, সংস্কৃত, যথার্থ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিও তেমনি অন্যের বেদনাবোধে ও আনন্দের উপলব্ধিতে নিজেও বেদনার্ত ও আনন্দিত হয়। এটি একটি মানসিক সংযোগ, যা ঘটে শুধু একজন মানুষের সঙ্গে মানুষের। আমরা যাকে নৈতিকতা, আদর্শবাদ, দেশ ও সমাজের প্রতি আনুগত্য, ধার্মিকতা বা শৃঙ্খলা বলি তা কোনো বিমূর্ত ভাবনা নয় যা উপদেশ, অনুশীলন বা যান্ত্রিক অনুকরণ দ্বারা সঞ্চারিত বা অর্জন করা যায়। একজন মানুষের প্রতিদিনের নানা ঘটনা, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও প্রাপ্ত তথ্যের ভেতর দিয়ে বড় হয়ে ওঠা ও শিক্ষালাভ তাকে যে ব্যক্তিত্ব দেয় সেটাই উৎস মানবিক নানা চেতনার। যে নিজেকে কল্পনায় অন্যের অবস্থায় স্থাপন করতে পারে না, শিল্প-সাহিত্য-সংগীতে, সৃষ্টিশীল ভাবনায়, জ্ঞানের উদ্ভব ও সুন্দর জীবনের স্বপ্ন সৃষ্টির যে সভ্যতা তার আবেদন গ্রহণে ব্যর্থ, সে জড়বস্তুর মতো।

একচোখা দৈত্য বা ক্ষিপ্ত ষাঁড়ের মতো; তাকে মানবিক কোনো উপলব্ধি বা চেতনার দ্বারা প্রভাবিত করা সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয় বৈদ্যুতিক চার্জহীন বস্তুকে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা অথবা ভরহীন বস্তুকে মহাকর্ষ বল দ্বারা নিয়ন্ত্রণ। সন্ত্রাসের মাধ্যমে যারা নিজেদের শক্তি ও প্রাধান্য প্রদর্শন করে, বস্তুত তারা সংজ্ঞায়িত তাদের মধ্যে মানবিক দিকগুলোর অনুপস্থিতির জন্য, অস্ত্র ও পাশবিক শক্তির উপস্থিতির জন্য নয়। সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে কোনো সমাজ বা সরকার যখন শক্তি প্রয়োগে অবতীর্ণ হয় এবং এ জন্য পুলিশ, বিডিআর, আর্মি নিয়োগ করা হয় আইনকে কঠোরতর এবং অস্ত্রের শক্তিকে তীব্রতর করাকেই সমাধান মনে করে, সেখানে ভয় দেখানো ও ভয় পাওয়ার নেতিবাচক এবং আদিম পশুজীবনের বৈশিষ্ট্যকে শুধু গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই সমাধান যান্ত্রিক, তাৎক্ষণিক, প্রবৃত্তিজাত ও প্রতিক্রিয়াপ্রসূত।

পরমার্থে সন্ত্রাস বলতে যদি ভীতি প্রদর্শন ও আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে এবং আনুষঙ্গিক নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতায় উদ্দেশ্য হাসিল বোঝায় এবং তা অগ্রহণীয় হয় কুৎসিত আচরণরূপে, তাহলে এই ব্যবস্থায় সন্ত্রাসের বিকল্পরূপে উন্নততর কোনো আদর্শ বা পদ্ধতির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ এখানে নেই। একজন সন্ত্রাসী সে নীতি বা নীতিহীনতায় তার কাজ সমাধান করছে, সেই একই নীতি ও পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান আমরা করছি। বস্তুত, এখানে অস্বীকার করা হচ্ছে যে, শিক্ষা, সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি ও সংস্কৃতিচর্চার ভেতর দিয়ে মানুষের মধ্যেই সেই সব ইতিবাচক চেতনা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি সম্ভব যা সন্ত্রাসকে বন্ধ করতে পারে। সন্ত্রাসীকে আরো বড় সন্ত্রাস দ্বারা শাসন করে নয়, বরং সন্ত্রাসী হওয়ার মূল কারণকেই অপসারণ করা।

এ কথা সত্য যে, শিক্ষা, সুন্দর জীবনের স্বপ্ন, সৃষ্টিশীলতা, সচ্ছলতা ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটিয়ে ভেতরের মানুষটিকে বিকশিত করার যে পথ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, তা দীর্ঘ সাধনা, কঠোর শ্রম ও অনেক সময়ের ব্যাপার। সমাজ ও দেশের পরিচালনায় জ্ঞানী, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, রুচিবান, সৎমানুষের আবির্ভাব না ঘটলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধরূপে ইতিবাচক মানবিক গুণগুলোকে দাঁড় করানো দুঃসাধ্য। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতা সংরক্ষণ, এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তারে শক্তি প্রয়োগ ও ভীতি প্রদর্শন, হিংস্রতার আশ্রয় ও হুমকি প্রদান যেখানে অনুসৃত, সেখানে এক সন্ত্রাস দিয়ে অন্য সন্ত্রাস প্রতিস্থাপিত হতে পারে। কিন্তু ভয়ের বিরুদ্ধে অভয়, যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি, আবেগের বিরুদ্ধে যুক্তি, কুৎসিতের বিপরীতে সৌন্দর্য, পাশবিকতার বিরুদ্ধে মানবতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বিশৃঙ্খল পশ্চাৎপদ, শিক্ষাবর্জিত, দারিদ্র্য ও লোভাতুর সমাজে মানবতার জয়গান গাওয়া অবাস্তব কল্পনামাত্র। বস্তুত, দেশের সাধারণ মানুষ ও বৃহত্তর সমাজ অতটা অবিবেচক, অযোগ্য ও অসৎ নয়, যেভাবে তাদের

সমস্যা : ব্যক্তিগত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক

সমস্যাকে সাজাতে পারি নানাভাবে। একটি বিভাজন হলো সমস্যার গুরুত্বের ভিত্তিতে, যে সমস্যা কম গুরুত্বের তাকে আমরা অবহেলা করে থাকি বা পাশ কাটিয়ে যাই। এ ক্ষেত্রে সমস্যাটি কী পরিমাণ ক্ষতি বা কর্মক্ষেত্রে কী পরিমাণ অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে, তার পরিমাপ আমরা করে থাকি কখনো অর্থের হিসাবে, কখনো বা জীবন বা সুনামের প্রতি ঝুঁকিরূপে। কিন্তু আরো একভাবে সমস্যার গুরুত্ব যাচাই করতে পারি তা হলো সমস্যাটি তার প্রভাববলয়, স্থান, কাল বা জনসমষ্টির ভিত্তিতে কতটা ব্যাপক তা বিচার করে। যে সমস্যা ব্যক্তিগত তা যতই ভয়াবহ হোক সমাজ বা দেশের জন্য মারাত্মক না-ও হতে পার। যেমন অসুস্থ হয়ে বা দুর্ঘটনায় ব্যক্তিমানুষের মৃত্যু, নিঃসঙ্গ পরিবারহীন ও সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে একান্তই নিজস্ব ক্ষতি। সে যখন পরিবারের অথচ ততটা সমাজের নয় অথবা দেশের, সেখানে তার অসুস্থতা, কোনো সমস্যা এমনকি মৃত্যুও শুধু পারিবারিকভাবেই অনুভূত।

কোনো সমস্যা যখন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ তা যতই তীব্র হোক, সে এলাকার বাইরে প্রভাব না-ও রাখতে পারে। যেমন— কোনো মৃত প্রাণীর গলিত দেহ স্থানীয়ভাবে দুর্গন্ধ ছড়াতে পারে বা কোনো বোমাবর্ষণ স্থানীয় কিছু মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে। যারা এ সমস্যা দ্বারা আক্রান্ত, তাদের জন্য যতই দুর্ভাগ্যের হোক এ ঘটনা, নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে কোনো প্রভাব থাকে না এসব সমস্যা।

কালিক বিচারে কোনো কোনো সমস্যা অত্যন্ত তীব্র ও যন্ত্রণাদায়ক হলেও একটি সময়ের সীমা পার হওয়ার পর আমরা প্রভাবমুক্ত হতে পারি এ ধরনের সমস্যা থেকে। দুর্ঘটনায় বা বোমার আঘাতে আহত হওয়া হতে পারে অতি যন্ত্রণার এবং তীব্র আতঙ্কের কিন্তু চিকিৎসার ভেতর দিয়ে যদি আরোগ্যপ্রাপ্তি ঘটে তাহলে সুস্থ দেহে অতীতের দুর্ঘটনা শুধু সাময়িক দুর্ভোগের স্মৃতি হয়ে থাকে। এর চেয়ে ব্যাপকতর ক্ষতি হলো অঙ্গহানি, স্থানীয় পঙ্গুত্ব বা মৃত্যুতে। কিন্তু মৃত্যুর চেয়েও মারাত্মক ও দীর্ঘস্থায়ী দুর্ঘটনা এবং সমস্যা ঘটতে পারে, যার দৃষ্টান্ত আমরা পাই হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত পারমাণবিক বোমায়। সাধারণ বোমা থেকে এ পারমাণবিক বোমা শুধু এর ধ্বংসাত্মক ক্ষমতায় ভিন্ন ছিল না, এ বোমার প্রধান

বৈশিষ্ট্য হলো এর দীর্ঘকালিক প্রভাব। এ বোমার তেজস্ক্রিয়তায় যে জেনেটিক রূপান্তর ঘটেছে জাপানের নাগরিকের, তাদের মৃত্যু না ঘটলেও বংশানুক্রমে যে দৈহিক বিকৃতি সঞ্চারিত, তা তাৎক্ষণিক মৃত্যুর চেয়েও অনেক বেশি ভয়াবহ কালিক বিস্তারে।

তাৎক্ষণিক মৃত্যু যতই যন্ত্রণার ও শোকের হোক, তা ব্যক্তিমানুষ ও নিকটতম পূর্বপুরুষ বা প্রজন্মের শোক ও সমস্যার। কিন্তু জেনেটিক রূপান্তর বংশপরম্পরায় যে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিসাধন করে, তা কালের বিস্তারে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। পারমাণবিক যুদ্ধের আরেকটি দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের কথাও এখানে উল্লেখ করার মতো। আর তা হলো বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের কাছে মানুষের যে প্রত্যাশা ছিল এবং সভ্যতার অগ্রযাত্রায় যে আস্থা, সে সামাজিক ও মানসিক পরিবেশ, প্রয়োগ ও প্রগতির প্রতি বিশ্বাস মানুষ হারিয়েছে।

সমস্যার গুরুত্ব অবধারণে এর প্রভাব কতটা ব্যক্তিগত, কতটা সামাজিক বা জাতীয়, কখন তা স্থানিক এবং কখন তা পরিব্যক্ত সুদূরে, কখন সমস্যাটি সাময়িক এবং কখন তা প্রসারিত দীর্ঘকালের মধ্যে, সেটি বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যখন নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হই, তখন শুধু সমস্যার তীব্রতাই যাচাই করি, কিন্তু সমস্যার প্রভাববলয় স্থান-কাল ও সামাজিক বিচারে কতটা বিস্তৃত, তা যাচাইয়ে প্রায়শ ব্যর্থ হই। স্বার্থবুদ্ধি, সমাজ সচেতনতা, অদূরদর্শিতা, কালিক চেতনাহীনতা, সমস্যার স্বরূপ যাচাইয়ে আমাদের ব্যর্থ করে।

সমস্যার সমাধান ও বিশ্লেষণ, যত পর্যালোচনা ও পদক্ষেপ সেখানে প্রতিটি সমস্যার যে স্বরূপ স্থান-কাল ও মানবসমাজের পরিসরে, তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যে ব্যক্তি পকেটমার এমনকি সিঁধকাটা চোর, তার দুষ্কর্মের ভেতর দিয়ে ব্যক্তি বা পরিবারে যে আর্থিক সমস্যা সৃষ্টি করে তা অত্যন্ত সীমিত সময়ের বিস্তারে ও সামাজিক প্রভাবে। কিন্তু যে নকল টাকা ছাপিয়ে অর্থোৎপাদন করছে, তার সৃষ্ট সমস্যা সুদূরপ্রসারী স্থান-কাল-রাষ্ট্রের বিচারে। কারণ, তার নকল টাকা শুধু আসল টাকার মান কমিয়ে বস্তুত সব মানুষের অর্থই চুরি করছে না, সে টাকা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা, সে সঙ্গে মানুষের আস্থাকে নষ্ট করে দিচ্ছে।

পরিবারবদ্ধ প্রতিটি মানুষের ওপর যেমন একটি পারিবারিক দায়িত্ব আছে, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রবদ্ধ মানুষের দায়িত্ব রয়েছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়। দায়িত্ববোধের এই স্তরবিন্যাসকে প্রসারিত করে বিশ্বের নাগরিক হিসেবে এবং মানবপ্রজাতির সদস্যরূপে আমাদের আন্তর্জাতিক ও মানবিক দায়িত্ব আমরা লাভ করেছি। আমরা শিক্ষা, চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধে স্থান-কাল ও ব্যক্তিস্বার্থের ক্ষুদ্র সীমানা অতিক্রম করে কতটা বিকাশ ও উত্তরণ লাভ করেছি তার ওপর নির্ভর করে কোন সমস্যা কতটা গুরুত্ব পাচ্ছে আমাদের কাছে।

যে ক্ষুধার্ত মানুষ নিজে খাবার সন্ধান করে, তার কাছে খাদ্যহীনতা ব্যক্তিগত সমস্যা। বস্তুত, যেকোনো প্রাণী তার খাবার ও আত্মরক্ষার সমস্যা সমাধানে সক্রিয় হয় প্রকৃতিজাতভাবে। খাদ্য, আশ্রয়, নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাধীনতা—সবই ক্রমোচ্চ চাহিদা মানুষের। এবং তা এ জন্য যে, সে পরিবারের, সমাজের, দেশের বা পৃথিবীর নাগরিকরূপে ক্রমান্বয়ে অভিসিক্ত ও উত্তীর্ণ হয় তার কালিক চেতনা ও দায়িত্ববোধের বিকাশে। বার্ট্রান্ড রাসেল তার 'ওয়্যার ক্রাইমস ইন ভিয়েতনাম' বইয়ে বলেছেন যে, আমাদের দৃষ্টি এতই সংকীর্ণ এবং স্বার্থবুদ্ধি এতই ব্যক্তিগত যে, আমাদের নতুন গাড়িতে একটি আঁচড় পড়লে আমরা যতটা বেদনাহত হই সে অনুপাতে দূরে কোথাও যুদ্ধ ও ধ্বংসলীলা চললেও আমরা নির্বিকার থাকি। তিনি এখানে শুধু স্থানিক দূরত্বের কথা তুলেছিলেন সমস্যার গুরুত্ব অবধারণে, কিন্তু আমরা বিষয়টিকে স্থান-কালের বিস্তারে ও সমগ্র মানবসভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে যদি পর্যালোচনা করি তাহলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আমাদের কালিক চেতনার বিস্তার, দৃষ্টির প্রসারতা ও সামাজিক হওয়ার ব্যাপকতা নির্ধারণ করে আমরা কখনো একান্তভাবে ব্যক্তিমানুষ, কখনো পরিবারের সদস্য অথবা সমাজের, কখনো নাগরিক দেশের এবং কখনো সদস্য মানবজাতির।

সমাজে, দেশে ও বিশ্বজুড়ে যেসব সমস্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি, সম্পদগত দৈন্য ও বৈষম্যের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার সামাজিক, রাজনৈতিক ও জাতিগত সংঘাত ও যুদ্ধের এবং পরিবেশগত বিপর্যয়ের, তার মূলে কাজ করছে দৈহিকভাবে সমাত্মাকারের এবং প্রায় অভিন্ন চেহারার হয়েও মানবজাতি নানা আকারে বিভক্ত তাদের বুদ্ধি, চেতনা, দূরদৃষ্টি ও মূলবোধে। পৃথিবীতে এত ক্ষুদ্র মনের ও সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির মানুষ রয়েছে, সে সঙ্গে বিশাল হৃদয়ের উদার দৃষ্টির মহৎ মানুষও যে, একই পৃথিবীর সমস্যাগুলোকে এঁরা দেখছে, নানাভাবে। কারো কাছে ব্যক্তিগত প্রয়োজন অব্যবহিত সমস্যাই তাকে আচ্ছন্ন ও সংকীর্ণ করে রেখেছে, কারো কাছে সমাজ, দেশ ও মানবজাতির সমস্যা, তার ভাবনা ও চেতনাকে আকর্ষণ করছে উদারতা ও কর্মতৎপরতায়। শিক্ষা, বুদ্ধি, দূরদৃষ্টি ও চেতনার এ পার্থক্য আছে বলেই আমরা একই দেশে দেশপ্রেমিক, উদার, ত্যাগী মানুষ যেমন দেখতে পাই, তেমনি স্বাধীনতাবিরোধী, আত্মমর্যাদাহীন, স্বার্থবুদ্ধির হিংস্র অসৎ মানুষও। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাকে যথার্থ স্বরূপে যেমন চিনতে হবে তেমনি চিনতে হবে মানুষকে, এদের মানসিক আকার ও উচ্চতার পরিমাপে।

একুশ শতকের সমাজ– প্রত্যাশা ও চ্যালেঞ্জ

একুশ শতক নতুন সম্ভাবনা ও প্রত্যাশা সেই সঙ্গে নতুন প্রশ্ন, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। দেশের মধ্যে ও আন্তর্জাতিক পরিসরে সম্প্রতি সংঘটিত ঘটনামালা এটি স্পষ্ট করে তুলেছে যে, একটি ক্রান্তিকালের ভেতর দিয়ে আমরা এই মুহূর্তে পার হচ্ছি। আমাদের একটি গৌরবময় অতীত আছে। মানবিক অধিকার, অর্থনৈতিক মুক্তি, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য আমরা দীর্ঘ সংগ্রাম করেছি। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির আত্মত্যাগ, সাহসিকতা, দেশপ্রেম ও বীরত্বের রয়েছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমাদের মূল সংবিধানে শান্তি, প্রগতি, শিক্ষা, আইনের শাসন, মৌলিক অধিকার, অসাম্প্রদায়িকতা, রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সুবিচার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ। এ সমস্ত ঘটনাপ্রবাহের ভেতর দিয়ে আমরা নিজেদের আবিষ্কার করেছি অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার শক্তিকে, সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার সম্ভাবনায়। বিশ্ব দরবারে বাঙালি জাতির একটি উজ্জ্বল চিত্র আমরা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলাম।

প্রশ্ন উঠেছে, বাঙালি জাতির এই ধর্মনিরপেক্ষ, শান্তিকামী, উদার, ত্যাগী, সাহসী, আধুনিক, প্রগতিশীল, মানবিক ও গণতান্ত্রিক পরিচয় কি আসল? অথবা পরবর্তী সময়ে কিছুসংখ্যক বিপথগামী, বিভ্রান্ত, অসৎ মানুষের অপকীর্তির প্রভাবে সৃষ্ট বাংলাদেশের বিবর্ণ চিত্রটি সত্য। সাধারণ মানুষের মনে যে হতাশা, শঙ্কা, অনিশ্চয়তা ও গ্লানিবোধের কালো মেঘ ঘণীভূত হচ্ছে তা অপসারণের এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিনষ্ট ভাবমূর্তি থেকে আমাদের সত্যিকারের পরিচয় পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব সুধী সমাজের।

একুশ শতক অনেকগুলো পরিবর্তনের ধারা সূচিত করেছে। জ্ঞানের বিস্ফোরণ, প্রকৃতি ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে নতুন উপলব্ধি, অভিনব সব প্রযুক্তির উদ্ভাবন, যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন, তথ্যের জগতে বিপ্লব সাধন, মানুষের প্রত্যাশার বিস্ফোরণ—উন্মোচিত করেছে বিপুল সম্ভাবনার দ্বার। একই সঙ্গে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, পরিবেশদূষণ, প্রাকৃতিক সম্পদের দ্রুত নিঃশেষণ, ধ্বংসাত্মক যুদ্ধাস্ত্রের স্তূপীকরণ, সন্ত্রাসীদের সংখ্যা ও আধিপত্য বৃদ্ধি সমগ্র বিশ্বকে একটি বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। একদিকে অপার সম্ভাবনা, অন্যদিকে প্রচণ্ড বিপর্যয়ের

ঝুঁকি মানবসভ্যতার জন্য এই ক্রান্তিলগ্ন সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের জন্য এই সময়টি বিশেষভাবে সংকটময়। এই মুহূর্তে সচেতন মানুষদের নিষ্ক্রিয়তা ও অনবধানতা ভয়াবহ বিপর্যয় বয়ে আনতে পারে। অতীতের সমস্ত আত্মত্যাগ ও সাধনার মূল্যে অর্জিত যে ঐতিহ্য, আত্মপরিচয়, স্বপ্ন ও সম্ভাবনা তা হারিয়ে যেতে পারে।

এই মুহূর্তে অশিক্ষা, অদক্ষতা, অসততা, অপচয়, অসাবধানতা, অদূরদর্শিতা, অবিমৃশ্যকারিতা ও নিষ্ক্রিয়তার অবকাশ নেই। একটি কর্মতৎপর, দক্ষ, সৃজনশীল, ঐক্যবদ্ধ উদার ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সমাজ গড়ার দায়িত্ব দেশের সমগ্র সুধী ব্যক্তিদের যারা নিয়োজিত বিভিন্ন পেশায়, প্রত্যক্ষদর্শী নানা ঘটনার।

সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও হীম্মন্যতা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা— জাতীয় ঐক্যকে ধ্বংস করে, সেই সঙ্গে যোগ্য ব্যক্তির যথাস্থানে অবদান রাখার সুফল থেকে জাতি বঞ্চিত হয়। সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে বিকশিত করতে সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি চাই, মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তার স্বাধীনতা চাই। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ, মুক্ত আলোচনা, সমালোচনা ও ভুল ধরিয়ে দেবার ও সংশোধিত হবার সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টির একমাত্র পথ হচ্ছে অভিজ্ঞতার আলোকে ক্রমাগত শুদ্ধতর উপলব্ধি লাভের এবং এটাই গণতান্ত্রিক পথ। সৃষ্টিশীলতার পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় ভয়, লোভ ও অন্ধবিশ্বাস, যা প্রশ্ন করার ও সত্য যাচাইয়ের সাহস কেড়ে নেয়। দেশপ্রেম ও কর্মপ্রেরণায় সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ অপরিহার্য। প্রতিটি মানুষের মুক্তচিন্তার, প্রশ্ন করার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা আমরা নিশ্চিত করতে চাই, সেই সঙ্গে উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার অবাধ বিনিময়। শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, কৃষিবিদ, রাজনীতিক, সমাজকর্মী– সবার ওপরই একটি দায়িত্ব অর্পিত এবং তা হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখা।

একুশ শতকের যথাযোগ্য সমাজ গড়ার কাজে এমন একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশ আমরা গড়ে তুলতে চাই যার মূল লক্ষ্য তথ্য উদ্‌ঘাটন, অভিজ্ঞতার বিনিময়, সত্যানুসন্ধান, মুক্ত আলোচনা, যাচাই, বিশ্লেষণ ও বাস্তবতার আলোকে ক্রমাগত শুদ্ধতর উপলব্ধি অর্জন, শিক্ষা, সভ্যতা, মানবাধিকার, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জন এবং সার্বিক গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি ও ব্যক্তিস্বাধীনতা লাভে যা সহায়তা করবে।

বাজেট কেন? কাদের জন্যে?

বাজেট নিয়ে কথা বলার অধিকার অর্থনীতিবিদদের। বাজেট তৈরি করেন পরিকল্পনাবিদগণ, বাজেট বিতর্কের বিষয় রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য। বাজেটের ফলাফল ভোগ করে ব্যবসায়ী মহল। বাজেট দ্বারা প্রভাবিত হয় চাকরিজীবী ও সাধারণ ক্রেতা। বাজেটকে বলা হয়ে থাকে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও কর্মসংস্থানের পরিসংখ্যানগত দলিল। সংক্ষেপে বাজেট হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক ইঞ্জিনের রাজনৈতিক হাল বা স্টিয়ারিং। আমাদের দেশে অন্য সব প্রতিষ্ঠান, ব্যবস্থা ও আচরণের মতোই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে ধার করা। কিন্তু সেটি এদের সামগ্রিকতায়, অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যে, কার্যকারণ সম্পর্কে ও বস্তুনিষ্ঠতায় নয়। শুধু কৃত্রিমভাবে এসব প্রতিষ্ঠানের বাহ্যিক রূপকে প্রতারণামূলক পোশাকরূপে ধারণ করে আছি আমরা।

সরকার বাজেট উপস্থাপন করুক বা না করুক, প্রস্তাবিত বাজেট অনুসৃত হোক অথবা না হোক, যেখানেই যৌথ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচেতনভাবে পরিচালিত হয় সেখানেই একধরনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও হিসাব-নিকাশ কাজ করে। সে অর্থে একটি বাজেট প্রকাশ্য অথবা প্রচ্ছন্নভাবে তৈরি হয়ে যায় আমাদের ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে। যদি অর্থনীতি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, উৎপাদনে অংশগ্রহণ, উৎপাদিত সামগ্রীর বিনিময় ঘটিয়ে ব্যবহার্য সামগ্রীর চাহিদা, সরবরাহ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করত, তাহলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কোনো গুরুত্ব থাকত না। অর্থনৈতিক বাজেট কেন? এ প্রশ্নের জবাব নির্ভর করে অর্থনীতিকে আমরা কেমন করে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই তার ওপর। যে প্রশ্নটি আরও মৌলিক তা হলো, অর্থনীতির চাকা কি আমাদের নিয়ন্ত্রণ-সাধ্য? প্রকৃতির নিয়মগুলোকে যে পরিমাণে আমরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি যতটা শুদ্ধ ও সূক্ষ্মভাবে, ততটাই সাফল্যের সঙ্গে এর প্রয়োগে উদ্ভাবিত হয়েছে নানা যন্ত্র ও উৎপাদনশীল শিল্পকারখানা। প্রকৃতির নিয়মগুলোকে ভুল করে জেনে বা না জেনে অথবা আবিষ্কৃত নিয়মকে লংঘন করে কোনো যন্ত্র উদ্ভাবন করা সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা আমাদের সেই

পরিমাণে, যতটা গভীর ও নির্ভুলভাবে প্রকৃতির নিয়মগুলোকে আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছি। এর পরও আর একটি প্রশ্ন থেকে যায় এবং তা হলো প্রকৃতির নিয়মগুলোকে ব্যবহার করে যে যন্ত্র বা শিল্প নির্মিত হলো তা মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে অথবা অকল্যাণে, তা প্রকৃতির নিয়ম বলে দেয় না; বরং এর নির্ধারক মানুষের রুচি ও আকাঙ্ক্ষা।

পরিকল্পিত লক্ষ্যে প্রকৃতির নিয়মকে ব্যবহার করে প্রাকৃতিক সম্পদের কল্যাণকর উপভোগ তাই একটি যৌথ প্রক্রিয়া, যার একটি উপাদান হলো বিশুদ্ধ জ্ঞান, কৃৎকৌশল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা; অন্যটি হলো মানুষের শুভবুদ্ধি, স্বপ্ন ও প্রত্যাশা, কল্যাণবোধ ও সৃষ্টিশীল স্বাধীনতা। অর্থনীতি যদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মতোই মৌলিক নিয়মাবলি ও অন্তর্নিহিত কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বারা সংজ্ঞায়নসাধ্য হতো এবং এই নিয়মগুলো যদি অর্থনীতিবিদেরা সঠিকভাবে আবিষ্কার করতে সক্ষম হতেন এবং প্রয়োগে দক্ষ, যেমনটি সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের ক্ষেত্রে, তাহলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে অনেক সুনির্দিষ্টভাবে কথা বলা সম্ভব হতো। বাস্তবে আমরা জানি, অর্থনীতি কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ, বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন ব্যবস্থা নয়। পুরোনো কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি যেমন রোদ, বৃষ্টি, মাটি, কৃষকের কায়িক শ্রম ও অপরিবর্তী কৌশল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো, তখন অর্থনীতির কার্যকারণ সম্পর্ক ছিল অনেক সহজ যেমন সহজ ছিল প্রথম আবিষ্কৃত কয়লাচালিত ইঞ্জিনের কার্যক্রম। আধুনিক উৎপাদনব্যবস্থা, উৎপাদনের কাঁচামাল, শক্তির উৎস, উৎপাদিত সামগ্রীর বৈচিত্র্য, উৎপাদনে যন্ত্রের উদ্ভাবক, চালক ও শ্রমিকের পরিবর্তনশীল দক্ষতা উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে করেছে জটিল। অন্যদিকে অর্থকরী উপাদানরূপে বস্তুগত সামগ্রীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উদ্ভাবিত তথ্য ও জ্ঞান। শিল্প কারখানার মতোই শিক্ষায়তন ও গবেষণাগারগুলোর নির্বস্তুক অথচ মূল্যবান উৎপাদ সৃষ্টি করছে অর্থনীতিতে যার প্রভাব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এর ফলে একই সঙ্গে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পুরোনো অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ ছিল নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণে। চাহিদা ও সরবরাহকৃত সামগ্রীর উৎপাদনব্যবস্থা ও ব্যাপ্তি ছিল সীমাবদ্ধ।

আধুনিক অর্থনীতি সেই তুলনায় বিপুলভাবে পরিব্যাপ্ত প্রভাবিত হবার ও প্রভাবিত করার কার্যকারণ সম্পর্কে। সম্পদ এখন আর প্রকৃতিগত নয় মাত্র অথবা সীমিত। অর্থ বিনিয়োগ এখন শুধু কাঁচামাল ক্রয় বা শিল্পকারখানা স্থাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধনে ও গতি সঞ্চারণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এখন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, নতুন শক্তির উৎস আবিষ্কার ও ব্যবহার, নতুন নির্মাণ বস্তুর সন্ধান ও উদ্ভাবন।

আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগার পরিকল্পিতভাবে শুধু নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটন ও যন্ত্র উদ্ভাবন করছে না, এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত উদ্ভাবক সৃষ্টিতে

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও বাজেট তাই এখন আর হিসাব-নিকাশ মেলানো এবং গতানুগতিক চাহিদা ও সরবরাহের সমন্বয় সাধন নয়, একজন নাগরিককে যেখানে অর্থনৈতিক মানুষ বা economic man হিসেবে আমরা বিবেচনা করি, সেখানে সে নিছক একজন দাবার গুটি নয় অর্থনৈতিক বাজার ও অর্থনৈতিক পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহের দ্বারা। সে হতে পারে একজন উদ্ভাবক, একজন বিশেষজ্ঞ, একজন অপরিহার্য কৃৎকৌশলী, একজন শিল্পী বা সৃজনশীল ব্যক্তিরূপে নতুন চাহিদা ও নতুন কর্মপ্রেরণার উৎস। সে হতে পারে একজন তরুণ শিক্ষার্থী যে বাহক নয় গতানুগতিক ও নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহার্য সামগ্রীর; কিন্তু নির্বস্তুক জ্ঞানের। সে এ মুহূর্তে না হতে পারে উৎপাদনশীল শ্রমিক, কিন্তু অপার সম্ভাবনাময় একজন সৃষ্টিশীল মানুষ হতে পারে।

একটি দেশের অসংখ্য সক্রিয়, সচেতন, গণতান্ত্রিক অধিকারপ্রাপ্ত মানুষ তাদের যৌথ জীবনযাত্রায়, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তাদের অবদান, কর্মপ্রেরণা ও স্বপ্ন নিয়ে দেশকে কেমন করে গড়ে তুলবে, তা নির্ভর করে যে ব্যাপক পরিকল্পনা, দূরদৃষ্টি ও সমন্বয়ের ওপর, তা অত্যন্ত জটিল এক কাজ।

একবিংশ শতাব্দীতে সাইবারনেটিক্স, জেনেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়োটেকনোলজি, সুপার কম্পিউটার, ফোটোনিক্স ও কৃত্রিম বুদ্ধি বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স— এর যুগে বাজেট তৈরি যে ধরনের দার্শনিকতা, জ্ঞানের গভীরতা, অন্তর্দৃষ্টি, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, মুক্ত ও উদার চিন্তা দাবি করে, একথায় তার সামান্যতম প্রতিফলনও আমরা লক্ষ করি না আমাদের বাজেটে। বিস্ময়ের কথা, আধুনিক অর্থনীতি যেখানে গভীরভাবে নির্ভরশীল ক্রমবর্ধমান হারে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ফোরমান অগ্রগতির ওপর, সেখানে কোনো শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী প্রযুক্তির দার্শনিক বা অর্থনীতির স্বপ্নদ্রষ্টার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব নেই আমাদের সাম্প্রতিক বাজেটে।

আমি বাজেট নির্মাণকে দর্জির কারুকার্যে সীমিত ও নির্দিষ্ট কাপড়ে জাতির অর্থনৈতিক পোশাক নির্মাণ বুঝি না— যা রুগ্‌ণ দেহের বেরিয়ে আসা হাড়গুলোকে আবৃত করার প্রচেষ্টা মাত্র। এবং সেটাও অপরিহার্য পুষ্টিকর খাবারের মূল্যে, বেরিয়ে আসা হাড়কে ঢাকার জন্য কিছু বাড়তি কাপড় কেনার প্রচেষ্টারূপে। বাজেটের বিস্তারিত হিসাব তুলে ধরে কোনো লাভ নেই। গতানুগতিক অর্থনীতি বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন, বণ্টন, আমদানি-রপ্তানি ও বিনিময়ের মাধ্যমে যে তুলনামূলক মূল্য নির্ধারণ করে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে দৈনন্দিন অভ্যাসে, মূল্যবোধে যে চাহিদা ও সরবরাহ সৃষ্টি করে, সেখানে পরিবর্তন আনতে চাইলে উৎপাদক অপেক্ষক (production function)-কে বদলাতে হবে, যার ভিত্তি হলে নতুন জ্ঞান, নতুন প্রযুক্তি, নতুন দৃষ্টি ও নতুন সৃষ্টি। আমাদের দেশ তরুণদের দেশ, তাদের শিক্ষালাভ, উৎপাদনে অংশগ্রহণের সুযোগ, তাদের প্রতিভার বিকাশ না ঘটিয়ে শুধু

আইনশৃঙ্খলার নামে পুলিশ ও প্রশাসনের ব্যয়বৃদ্ধি দুর্নীতি ও সন্ত্রাসকে যান্ত্রিকভাবে বন্ধ করা যাবে না।

কর্মহীন, শিক্ষাহীন, স্বপ্নহীন অসংখ্য তরুণ-তরুণী নানা অভাবের অগ্নিদাহে বন্ধ কেটলির পানির মতো ক্রমাগত উত্তপ্ত হতে থাকে। সেই বাষ্পের চাপ কেটলির ঢাকনা রোধ করতে পারে না। প্রয়োজন যেখানে তাপমাত্রা কমানো সেখানে এর যান্ত্রিক সমাধান অনুসন্ধান একটি ভবিষ্যতের বিস্ফোরণকে শুধু নিশ্চিত করে। শিক্ষা উপকরণ, যেমন কাগজ বা কম্পিউটারের যন্ত্রাংশের মূল্য বৃদ্ধি, অন্যদিকে নতুন গাড়ির মূল্যহাস একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত যে, শিক্ষার সুদূরপ্রসারী প্রভাব তথ্যবিপ্লবের গুরুত্ব কতটা অনোনুধাবিত এবং আমাদের পথ চলা কতটা লক্ষ্যহীন। নতুন গাড়ি চড়ে আমরা কোথায় যাব তা আমরা জানি না। একটি পরিসংখ্যান নিলেই জানা যাবে যারা কাজ করে মাঠে, অফিসে, কলকারখানায়, শিক্ষায়তন ও গবেষণাগারে তাদের কতজন নতুন গাড়ি চড়ে নতুন তৈরি পথে তাদের কর্মস্থলে যাবে। যারা হ্রাসকৃত মূল্যে গাড়ি কিনে দ্রুত পথ চলবে তাদের কতজনের পথ মিলবে গিয়ে কোনো উৎপাদনশীল কর্মস্থলে?

একজন ব্যক্তিমানুষ তার উদ্ধৃত্ত অর্থে ও সঞ্চিত সম্পদে নিজের জীবনের মানোন্নয়নে এবং সামগ্রিক উৎপাদনশীলতার যে অবদান রাখে তার চেয়ে দক্ষতরভাবে এবং উন্নততর অগ্রাধিকার নির্ণয় যদি কর হিসাবে সংগৃহীত অর্থ বিনিয়োগ করা না হয়, তাহলে অর্থনৈতিক বাজেটের কোনো গুরুত্ব থাকে না। বরং সরকারি ব্যয়ের অপচয় এবং খাজনা আদায়ের জন্য ব্যয় সংঘটিত হয় উৎপাদনশীল মানুষের কৃচ্ছতার মূল্যে।

অনিন্দ্য প্রকাশ

অনিন্দ্য প্রকাশ